মডার্ন কলাম

১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

স্বর্গ-চেতনার উৎস
আমার মা এবং বাবার
স্মৃতির উদ্দেশ্যে
পরম নিবেদন

(কিন্তু না, নিজেকে অত্যন্ত প্রগতিপন্থী বলে মনে করা সত্ত্বেও সুপ্রীতিদেবী ছেলের বউ-এর পোষাক হিসেবে গাউনটাকে ঠিক সুস্থভাবে নিতে পারলেন না।) অপছন্দ না করলেও বিমানবন্দরে ছেলের বউকে প্রথমবার দেখেই কেমন অস্বস্তি লাগল। বেমানান মনে হতে লাগল বাড়িতে নিয়ে এসে। অথচ প্রগতিশীল আত্মমন্যতাই নয়, নিজের এই প্রগতিপন্থা অত্যন্ত উদারভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি সংসারকে ঢেলে সাজিয়েছেন। তাঁর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে জীবন সুরু করা স্বামীর মধ্যবিত্তঘরণী-মায়ের মনের দিকে পেছন ফিরেই তাঁকে প্রায় সব কাজ করে যেতে হয়েছে পদস্থ আমলার মর্যাদামত আদবকায়দা ঘরের ভেতরেও গড়ে তুলতে। এবং তিনি এই গোপন বিশ্বাসকেও মনে মনে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন তাঁর স্বামীর কর্মজীবনের এই যে ক্রমোন্নতি একে ঘটিয়ে তুলতে তাঁরও যথেষ্ট অবদান আছে। আর এই যে তাঁর ছেলেরা চৌকশ আমলার ভবিষ্যৎ সামনে করে নিপুণভাবে গড়ে উঠেছে এরমধ্যেও তাঁর গৃহশৃঙ্খলা রক্ষা এবং পরিবেশ রচনার কৃতিত্ব অনেকাংশে ক্রিয়াশীল। অতএব সবে মিলিয়ে তিনি নিজের সংসারে একজন দক্ষ প্রশাসক এবং সুনিপুণ শিল্পী। এ সবই অবশ্য তাঁর নিজের ধারণা, আর এই ধারণা আত্মবিশ্বাসে পর্যবসিত হতে পেরেছে বলেই তাঁর শাশুড়ী সহজেই আসনচ্যুতা হয়ে আশ্রিতে স্থান নিয়েছেন। কখনও কখনও নতুন সংসারের ধারা নিশ্বাস বন্ধ করে দিতে চাইলে ছোট মেয়ের বাড়ী ঘুরে এসেছেন দিন ক'েকের জন্যে। আব যেহেতু আশ্রয় কোথাও নেই তাই ছেলের সংসারে 'না দায় না দায়িত্বের' চুক্তিতে পড়ে আছেন গত পঁচিশটা বছর। এখন পঁচাত্তর। এখানে তাঁর অবস্থিতির কোন মূল্যই নেই। পেছনের দিকের বারান্দাটায় বেড়া দিয়ে ঘরের মত করে অন্তরীণ হতে হয়েছে তাঁকে। সামনের সজীব ঘরগুলোর উজ্জ্বলতা পেরিয়ে কেউই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায় না, প্রয়োজনও পড়ে না। এমন কি তাঁর ছেলে পরীক্ষিৎ পর্যন্ত গত পাঁচ বছরে একটি দিনও যান নি ওই ঘরে। মায়ের সঙ্গে কথাও যে বলেছেন বা বলে থাকলে ক'টা বলেছেন মনে পড়বে না। মা যখন যখন বেরিয়ে আসেন, সামনে পড়লে কথা বলেন সুপ্রীতি দেবী। সংযোগ একমাত্র তাঁরই সঙ্গে আছে, আর এক-আধটু আছে রুমির সঙ্গে। রুমি সুপ্রীতি-পরীক্ষিতের কনিষ্ঠ সন্তান। সে-ই কেবল কখনও-সখনও ঠাকুমাকে দেখলে কথা বলে। সুপ্রীতি দেবীর সংসারের প্রস্তুনাই এই রকম যে, যে যার নিজের কুঠরীতে স্বকীয় জগৎ গড়ে বাস করতে পারে। কেউ কারো ঘরে ঢুকে কখনই

অন্যজনের অস্বস্তির কারণ হয় না। অথবা একে কখনও অন্যের স্বকীয়তায় মন্তব্য করার সুযোগ পায় না। সুপ্রীতি দেবী নিজেও কখনও রুক্মিকে বা ছোট ছেলে বিশ্বজিৎকে ডাকতে হলে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বন্ধ দরজায় দুবার টোকা দিয়ে, একবার ড্রইংরুমে এসে শুনে যেয়ো, বলেই চলে যান। বাড়ীর রেওয়াজই এই। একমাত্র ছুটির দিনেই যা ছেলেমেয়েদের সকলের সঙ্গে দেখা হয় পরীক্ষিতের, দেখা হয় খাবার টেবিলে। ছজনের মত বন্দোবস্ত আছে কিন্তু সাত বছর আগে প্রসেনজিৎ বিদেশ চলে যাওয়ার পর চারজনই একসঙ্গে খেয়ে আসছেন ছুটির দিনগুলোয়। অবশ্য তার আগেও প্রসেনজিৎ থাকেনি, অল্প বয়স থেকেই সে কনভেন্ট-এ পড়াশোনা করেছে দার্জিলিং-এ। তখন পরীক্ষিতের চাকরীও ছিল বদলির ; আজ এ জেলা কাল ও জেলা তারপর কখনও কখনও দু চার বছরের জন্যে দেশান্তরীও হতে হয়েছে — প্রদেশান্তর। কিন্তু যেখানেই গেছেন সংসারের পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন হতে দেননি সুপ্রীতি, কোন অবস্থাতেই। স্বামীও নিঃশব্দে নির্বিঘ্নে মেনে নিয়েছেন স্ত্রীর ব্যবস্থা। মফস্বল শহরে জন্মানো, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ছেলে পরীক্ষিৎ তাঁর পরিচিত সমাজ সংসারের পরিবর্তে স্ত্রীর নতুন জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দেই আত্মস্থ ক'রেছেন। শুধুমাত্র আত্মস্থই করেন নি তাঁর ভাবসাব দেখে মনে হয় তিনি 'জাতেওঠায়' স্ত্রীর এই সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ভাবে খুশীই হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী যদি এমনই সাহেবিভাবাপন্ন ব্যারিস্টারের মেয়ে না হতেন তাহ'লে ওপর মহলের সামাজিক আদব কায়দা এত দ্রুত রপ্ত করা সম্ভব হ'ত না তাঁর পক্ষেও। তাঁকে বাইরের লোকের অথবা দপ্তরের কর্মীদের কাছে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক বলেই মনে হত। অথচ তিনি যে মাত্র প্রথমপুরুষ আমলা একথাটা আমলা সমাজে কেউ বুঝতে পারেনি সে শুধু তাঁর স্ত্রীর গুনেই। অথচ সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে হঠাৎ মেধার জোরে ওপরে উঠে পড়ে উচ্চপদস্থ সমাজের সঙ্গে অনেকেই খাপখাইয়ে নিতে পারে না। অনেক সহকর্মীই এখনও সে প্রমাণ দিচ্ছে। তাদের অনেকের স্ত্রীরা কোন পার্টিতেই যোগ দেয় না। মিশতে পারে না ট্র্যাডিশনাল অফিসারদের কেতাদুরস্ত পরিবারের সঙ্গে। সেই সব লজ্জা থেকে সুপ্রীতি বাঁচিয়েছেন তাঁকে - আর শুধু তাই নয় ঘরের মধ্যে এমন পরিবেশ গড়ে তুলেছেন যা বংশানুক্রমিক পদস্থদের আভিজাত্যের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাঁর রান্নাঘরে বাবুর্চির রান্না, ছেলেমেয়েদের মানুষ ক'রেছে সুশিক্ষিত আয়া, বাড়ীর চাকর বাকর পর্যন্ত বাছাই ক'রে রাখা - যাদের শেখাতে হয় না তাঁকে সাহেব আর সুপ্রীতিকে মেমসাহেব বলে ডাকবে, ছেলে মেয়েদের বলবে মিসিবাবা। এ ছাড়া চলা-ফেরা কথাবলা আদবকায়দা সব কিছু সুপ্রীতি তাঁর প্রভাবে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যা উচ্চপদস্থ পরিবারে মানায়। পরীক্ষিৎ এ কথাটা মনে মনে সর্বদা স্বীকার করেন যে এই যে গড়ে তোলা এটাও মুন্সীয়ানার কাজ, এর জন্যে প্রগাঢ় শিক্ষা এবং অনুশীলনের প্রয়োজন। পরিমিত কথাবলা পরিমিত মেলামেশা

সব মিলিয়ে নিজেদের অন্য দশটা পরিবারের থেকে পৃথক ক'রে রাখার নিবিড় প্রচেষ্টা সেটা সম্পূর্ণই সার্থক ভাবে রূপায়িত হয়েছে সুপ্রীতির সংসারে পোষাকআশাকে কোথাও দেশী বিলাস প্রশ্রয় পায়নি, খাদ্য তালিকা থেকেও দেশী পদ্ধতি বাদ পড়ে গেছে বহুদিন আগেই, ফলে ইংরেজ এদেশ ছাড়বার তেইশবছর বাদে সুপ্রীতি দেবীকে নতুন খাদ্যসামগ্রী তৈরী করার জন্যে মার্কিন পত্রিকার পথ চেয়ে থাকতে হয়। অবশ্য এতে সমপর্যায়ভুক্ত অন্যান্য পরিবারের গৃহিনীদের চমকলাগাবার প্রয়াসও থাকে - যেটাকে তিনি মনে করেন বড়মানুষী

তবে এহেন মানসিকতা সত্ত্বেও তিনি চোখের ওপর ছেলের বউ-এর পোযাকটাকে ধরে রাখতে পারলেন না প্রথম দর্শনেই। সাত বছর বাদ ছেলে বাড়ী ফিরছে, কাজেই গোটা পরিবার গাড়ীভর্তি হয়ে গিয়েছিলেন বিমান বন্দরে ছেলেকে আনতে, কর্তা আর একখানা গাড়ীও জোগাড় করে নিয়ে গিয়েছিলেন ছেলে ছেলেরবউকে একই গাড়ীর মধ্যে ধরবে না বলে। সাতটা বছরে সেদিনের সেই একুশবছরের প্রসেনজিৎ তো কম কিছু করেনি। ইনজিনীয়ারিং পাশ ক'রে ফিলাডেলফিয়ায় চাকরী ক'রে জনৈক মার্কিন ভদ্রলোকের একমাত্র কন্যা এমিলিকে বিয়ে ক'রে নিয়ে আসছে। ছবিটবি সবই সে যথাসময়ে পাঠিয়ে দিয়েছে, সবিস্তারে স্ত্রীর বর্ণনাও করেছে সময়মত, তার অসুখের সময় এই এমিলির আর তার মার সাহায্য না হ'লে বাঁচত না এ-ও জানিয়েছে এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপই যে সে বিয়ে ক'রছে এটাও সে জানাতে ভুল করেনি এবং সুপ্রীতিও সেজন্য আদৌ দুঃখিত নন। বরং তিনি মনে করেন এ-ও একটা মর্যাদা বাড়বার মত ব্যাপার হয়েছে। এত তো রয়েছে ক'জনের ছেলে আমেরিকায় গিয়ে মেম বিয়ে ক'রে আনতে পারছে? তাঁর স্বামীর চেয়ে বড় অফিসারও তো ভারতবর্ষে কম নেই, তাদেরই বা ক'জনের বাড়ীতে এমনি মার্কিন মহিলা আছে বউ হয়ে? সব মিলিয়ে গর্ব করার মত ব্যাপার একটা বটেই, আর সেই গর্ব বুকের মধ্যে লুকিয়েই সুপ্রীতি বিমানবন্দরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অনেকক্ষণ আগে। তারপর সময় মত অন্যান্য সকলের সঙ্গে প্রসেনজিৎ যখন নেমে এল মা বাবা দুজনেই অবাক হয়ে গেলেন, একমাত্র মুখের আদল ছাড়া কোথাও মিল নেই! এক ছেলে নিয়ে অন্য এক সুঠাম পূর্ণবয়স্ক যুবককে ফেরৎ দিয়েছে সোনার দেশ আমেরিকা। রুমি নিউ মার্কেট থেকে দুটো ফুলের তোড়া কিনে এনেছিল তারই একটা দাদার সঙ্গের মেমসাহেবকে ধরিয়ে দিল এবং দেখে সে প্রীতই হল যে দাদার পাঠানো ছবির চেয়ে মহিলাকে দেখতে কম সুন্দর নয়। ওদেশের ভাল ভাল ক্যামেরাতে নাকি অনেক অসুন্দরকেও ছবিতে সুন্দর করে তোলা যায় এক্ষেত্রে অন্তত সেটা করা হয়নি। পরক্ষণেই আরও ভাল লাগল মহিলার নির্মল হাসি দেখে। কিন্তু কি যে বলল তা ভাল শুনতে পেল না রুমি। বুঝল যে খুব খুশীর কথা-ই বলেছে। পরক্ষণেই মা জড়িয়ে ধরলেন ছেলের বউকে।

ব জড়িয়ে ধরার মধ্যেও মা-র সেই কর্তব্য করার ভাবটা ফুটে রইল।
প্রীতিরও মেয়েটিকে ভালই লাগল। বেশ স্মিত চেহারা, হাসি হাসি মুখ এবং
মনীয়তাও কিছুটা আছে। লম্বায় প্রায় প্রসেনজিতের সমানই হবে। তাই
উন পরে কেমন যেন বেমানান মনে হচ্ছে। তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগল খাস
রকিন মেয়েটির বিমান থেকে নেমেই হাত জোড় করাটা। এতে বিস্মিত
ল সকলেই। ভাবল প্রসেনজিৎ শিখিয়েছে। কিন্তু প্রসেনজিৎ নিজেই সবচেয়ে
শী বিস্মিত হ'ল—শিখলটা কোথায়! তবে কি এই কথাই এমিলি তাকে বলে
সেছিল, দেখো তোমাদের দেশে গিয়ে আমি একটা স্টান্ট দেব, আশ্চর্য
য়ে যাবে-। এই কি তবে সেই স্টান্ট? হলে সত্যিই বেশ মজার
টান্ট বটে আর এটাও যদি সেই স্টান্ট না হয় তবে সেটা প্রকৃতই
টান্ট হবে।

বিমানবন্দরে যতটা না চোখে লেগেছিল বাড়ী এসে চোখে কটু লাগল
নর চেয়ে অনেক বেশী। সুপ্রীতি দেখলেন বাড়ীর মধ্যে এমিলির অবস্থিতি
ক মানাচ্ছে না। সব চেয়ে বড় ঘরটা বড় ছেলের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন
ছানাপত্তরও সেই রকম করিয়ে রেখেছেন, সমস্ত আসবাবপত্রই যতদূর সম্ভব
লভাবে করিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আসলে তার পোষাকটাই মানাচ্ছে না।
দ্য কিছু বললেন না। মনে মনে স্থির করলেন দিন কয়েক যাক তারপর
কদিন ধীরে সুস্থে বলতে হবে কায়দা করে।

দিন কয়েক যাবার অনেক আগে প্রথম দিন রাত্রে এমিলি নিজেই আস্তে
াস্তে শাশুড়ীর ঘরে গিয়ে বলল, আমাদের বাড়িতে শাড়ী নেই কেউ পরতেও
ানে না। নইলে আমার শাড়ী পরতে খুব ইচ্ছে করে।

সুপ্রীতি ইংরাজী যা জানেন তাতে দেশী সাহেব সুবোর সঙ্গে ভাল ভাবেই চলে
ায় কিন্তু খাস আমেরিকান মেমসাহেব-এর ইংরিজী সুপ্রীতি দেখলেন বোঝা
বশ কষ্টকর। তবু বুঝতে তো হবেই। তাছাড়া মেয়েটা আস্তে আস্তে
লবারই চেষ্টা ক'রছে যাতে তিনি বুঝতে পারেন। কিন্তু হুট ক'রে ঘরের
ধ্যে চলে আসা এ কেমন সাহেবীস্বভাব রে বাবা! এ তো তিনি কোনদিন
শানেন নি। যাইহোক এই সামান্য প্রথাভঙ্গকে তিনি খুবএকটা অপরাধ ধরলেন
া। তাছাড়া প্রথম দিন এবাড়ীর নিয়ম কানুন জানাও তার পক্ষে
অসম্ভব। সর্বোপরি যে প্রস্তাব নিয়ে মেয়েটি এসেছে সেই প্রস্তাবটি খুবই
বুদ্ধিমতী বলে অন্য ত্রুটি বিচ্যুতি তিনি ধরলেন না। বরং প্রীত হয়ে
বললেন, ঠিক আছে কালই তোমার জন্য শাড়ী আনিয়ে দেওয়া হবে, আর
রুমিকে বললে সে তোমাকে পরাও শিখিয়ে দেবে।

কথাটা শুনে খুবই খুশী হল এমিলি, সেটা সে নানা ভাবে প্রকাশ
ক'রতে লাগল। সুপ্রীতিও ছেলের বউ-এর সঙ্গে কথা বলে খুশী হলেন। তাঁর
সাহেবদের সম্বন্ধে ধারণাটাই আর একটু শক্ত হ'ল। তাঁর বরাবরের ধারণা

সাহেবরা মানুষ হিসাবে খুব ভদ্র হয়।

সুপ্রীতির ইচ্ছে ছিল না এমিলি তাঁর শাশুড়ীকে প্রথম দিনেই দেখে ফ্যালে তাই শাশুড়ীকে জানতেও দেননি প্রসেনজিৎ-এর বউ আসছে। কিন্তু এমনই দুর্ঘটনা যে বুড়ী নিজেই গন্ধে গন্ধে কেমন ক'রে এসে হাজির হয়ে গেল ঠিক সেই সময়েই, জানতে চাইল, হ্যাঁ গো বউমা শুনলাম নাকি প্রসেনজিৎ বউ নিয়ে এসেছে? তা এই বিটি সেই বউ নাকি?

বৃদ্ধার শব্দগুলোর বিন্দুমাত্র বুঝতে না পেরে এমিলি বারংবার এর ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। দুর্বোধ্য শব্দগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করল বাকভঙ্গী অনুসরণ ক'রে। সুপ্রীতি সংক্ষেপে কি জবাব দিলেন তাও সে বুঝল না। ওঁদের কথা থেমে গেলে সে জানতে চাইল উনি কে?

সুপ্রীতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হ'লেন, এ বাড়ীতেই উনি থাকেন। আশ্রিতা।

ওহ, কাঁধ দুলিয়ে এমিলি বলল, কি সুন্দর! এ দেশে এটাই খুব সুন্দর অথচ আমাদের দেশে বৃদ্ধদের জীবন এত ভাল নয়। তারা খুব কমই এমন ভাবে থাকতে পায়। তারা নিঃসঙ্গ। ইংলণ্ডেও বৃদ্ধদের জীবন নিঃসঙ্গ। অথচ বৃদ্ধেরা কি সুন্দর, সংসারে থাকলে সংসারের শোভা কত বাড়ে।

মেয়েটির কথা শুনে সুপ্রীতি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। মেয়েটি মন যোগানোর মত কথা বলছে, সন্দেহ হ'ল সুপ্রীতির। যদি তাই হয় তবে তো খুবই সাংঘাতিক হবে এই মেয়ে!

শাশুড়ী যখন এই সব কথা ভাবছে এমিলি তখন ভাবছে নিজের দুরবস্থার কথা। যদি সে এদের ভাষাটা জানত তবে কি সুন্দরই না হ'ত। আজ এই বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলতে পারত। কি ক'রে যে সে বৃদ্ধার সঙ্গে একটু ভাবের আদান প্রদান ক'রবে ভাবতে লাগল।

বৃদ্ধা এমিলির দিকে তাকিয়ে নিজের পুত্রবধূকে বললেন, তা বিলেত থেকেই আসুক আর যেখান থেকেই আসুক হিন্দু ঘরের বউ তো। একটু সিঁদুর দিয়ে নিলে ভাল ক'রতে না বৌমা?

ওদের দেশে ওসব নেই—সুপ্রীতি জানালেন।

তা যে দেশে নেই সে দেশে নেই, আমাদের ঘরে যখন এসেছে তখন আমাদের মতই ক'রে নিতে হবে তো—বলেই অন্য প্রসঙ্গে গেলেন, তা প্রসেনজিৎ কোথায় গেল? তাকে তো দেখলামই না। আমার ঘাটে যাবার আগে যখন এসেই পড়ল তা একবার দেখা-ও দিল না? বৃদ্ধা কখনো কোন অভিযোগ করেন না, দীর্ঘ বিশ বছরে এই প্রথম অনুযোগ শুনলেন সুপ্রীতি। তাঁরও একটু মায়া হ'ল, বললেন, সদ্য এসেছে তো বোধহয় ব্যস্ত আছে। হয়ত খেয়ালও নেই। আমি ওকে মনে করিয়ে দেব।

কিন্তু সব মনে আছে অন্তরীণ ঠাকুমার। এই প্রসেনজিৎ ছোটবেলায়

ঠাকুমার খুব প্রিয় ছিল, একটা গল্প শোনার জন্যে কত সন্ধ্যে পেছনে পেছনে ঘুরেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। ঠাকুমার কাছে থাকতে কি ভালই যে বাসত তার নেই পরিসীমা। তারপর যত বড় হয়েছে ততই দূরে সরেছে, আজ শতবছর বাদে দেশে ফিরেও সে একবার সেই ঠাকুমার সঙ্গে দেখা ক'রল না। মনে মনে একটু ব্যথিত হলেন ঠাকুমা। তারপর আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

ঘরে গিয়ে এটা সেটা নাড়তে লাগলেন। গোটা বাড়ীর মধ্যে এই একটা মাত্র ঘরের জিনিষপত্র সেই পুরানো দিনের ঐতিহ্য বহন ক'রছে, ধরে রেখেছে সেই দূর গ্রামের স্কুল শিক্ষকের-কালের স্বকীয়তা। সেই মধ্যবিত্ত সংসারের তোরঙ্গ, বাসন, বিছানা। জীবনের সমস্ত কিছু সমপণের স্রোতে চাপা আক্রোশে বিদ্রোহের মত জ্বালিয়ে রেখেছেন পুরানো সম্পদের জঞ্জাল। হ্যাঁ জঞ্জালই এসবকে বলে থাকেন সুপ্রীতি। আগে অন্তত বলতেন, আজকাল এ ঘরে ঢোকেনও না বলেন কিনা শোনাও যায় না। আর সুপ্রীতি বলতেন বলেই এগুলোকে নিজের ঘরে টিকিয়ে রাখবার উদগ্র ইচ্ছা তাঁকে জুগিয়েছে অবিচল দৃঢ়তা। সমস্ত পরিবারে একা নিঃসঙ্গ ঠাকুমা স্বামীর সম্পদের মধ্যেই পেয়েছেন বেঁচে থাকবার শক্তি। সমস্ত দিনরাত্রির সঙ্গীও ছিল তাঁর হারানো দিনের সংগৃহীত সম্পদ, সংসারের অন্যান্য জিনিষের তুলনায় যেগুলো অত্যন্তই দীন এবং মূল্যহীন। এই সব জিনিষপত্র গুছোতে লাগলেন ঠাকুমা। স্বামীর একখানা ছবি ছিল তোরঙ্গের ওপরটায় সেটিকে অনেকদিন বাদ মুছলেন। কিন্তু অনেক দিন না মোছার জন্য ধুলো চাপ হয়ে জমে গেছে, উঠল না কিছুতেই। ঘষাঘষি করতে করতে স্বামীর কথা মনে পড়ে গেল তাঁর, সে প্রায় চল্লিশ বৎসর আগের কথা একদিন এক ছাত্রকে বোঝাচ্ছিলেন, পৃথিবীতে আপনার কেউ নেই। যাকে যত বেশী আপনার ভাববে তত বেশী পর মনে হবে তাকে। কথাটা তাঁর নিজের ও কানে গিয়েছিল বলে ছাত্রটি চলেযেতেই স্বামীকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন, তুমি যা বলছিলে তাতে তো আমাকেও তুমি আপন বলে ভাবো না —

পরীক্ষিতের বাবা সামান্য কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন, আমার ভাবনার কি মূল্য?

কথাটা মনে হতেই যেন চমকে উঠলেন ঠাকুমা। এইসময় কেন-ই বা তাঁর মনে হ'ল চল্লিশ বছর আগেকার সেই প্রাসঙ্গিক কথাটা। তিনি কি ভুল ক'রছেন? নাতিকে স্নেহ ক'রে যে ভালবাসা তিনি চাইছেন সে কি তবে ভুল? নইলে একথা আজ এমনি ক'রে মনে হবে কেন? এখন মন বদলে গেছে অনেক। বিদেশ যারা না গিয়েছে তারাই সব ভুলে যায় আর অত দূরের দেশ থেকে যে এলো এতদিন বাদে ফিরল সে তো ভুলে যাবেই। এখন সবাই সবাইকে ভুলে যাবে। কারও জন্যে কারও স্নেহ প্রীতি মায়া কিছু থাকবে না। অথচ আগে তো এমনটি ছিল না। তাঁর মনে আছে ছোট

ভাই রেলে ভাল চাকরী ক'রতেন থাকতেন কলকাতায় অথচ দেশে গেলে প্রত্যেক লোকের সঙ্গে দেখা ক'রতেন, আত্মীয় অনাত্মীয় গ্রামের সম্পর্কে কাকা জ্যাঠা সকলের বাড়ীতেই একবার ক'রে যেতেন তিনি। হুগলীতে ছোট বাড়ী ক'রেছিলেন এখন সেখানেই থাকেন, ছেলেরা থাকে যে যার কর্মস্থলে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁরই ছেলেরা অনেক বৎসরান্তেও একবার আসেনা বাবার সঙ্গে দেখা ক'রতে। যুগই বোধহয় বদলেছে, পরীক্ষিতেরও দোষ নয়, প্রসেনজিতেরও নয়। এই যুগে বসে তাঁরই অতটা আশা করা উচিত নয়। চল্লিশ বছর আগে শোনা কথার তাৎপর্য আজ বুঝতে পারলেন তিনি।

এবং তাঁর শেষ মায়াটুকু ছিঁড়ে গেল। পঁচাত্তর বছর বয়সে ঠাকুমা আধুনিকা হ'লেন।

কিন্তু একটা কথা ঠাকুমা কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না যে, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে মফস্বলের স্কুলের সাধারণ একজন শিক্ষক কি ক'রে আজকের দিনটাকে অনুমান করেছিলেন। অন্যথায় সেই সুস্থ সময়ে কেনই বা তাঁর একথা মনে হয়েছিল? ঠাকুমা একা একা থাকেন বলে প্রায়ই নানা কথা মনে আসে তাঁর, ভাবেন। অতীতটাই বেশী ক'রে মনে আসে তাঁর, সোনালী অতীত। বর্তমানকে নিয়ে কখনও টানাটানি করেন না, ভাবেন না ভবিষ্যতের কথাও। শুধু অতীত তাঁর মনের সামনে ছায়াছবির মত বয়ে চলে। পানুর মা, বিরিঞ্চি বাবু, সত্যেন মাস্টারের বউ, রেনু, কাজলদি সনাতন মাস্টার আরও কত মানুষ অশরীরী অস্তিত্বে ভেসে আসে। কারও মুখই আর মনে পড়ে না অথচ প্রত্যেকের নিজ নিজ অভ্যাস, ভঙ্গী, সব স্পষ্ট ফুটে ওঠে স্মরণে। তখন প্রধান শিক্ষকের কোন কোয়ার্টার ছিল না ভাড়া থাকতেন একখানা ছোট ঘরে। বাড়ীর মালিক ছিলেন এক বৃদ্ধ, কারও সঙ্গে কথা বলতেন না, লোকে বলত গঙ্গাবুড়ো। তাঁর কথা পর্যন্ত মনে আছে বেশ স্পষ্ট। একথাও মনে আছে যে তিনি ভাবতেন সবাই তাঁকে গঙ্গাবুড়ো কেন বলে। একদিন কর্তাকে জিজ্ঞেসও ক'রেছিলেন, জবাব পাননি, তাই ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন আচ্ছা তোমার ছাত্রদের যদি জিজ্ঞেস ক'রতে তারা জবাব দিতে না পারলে শাস্তি দিতে তো?

কর্তা হেসেছিলেন। তাঁর গম্ভীর স্বভাবের মধ্যে হাসি বিশেষ একটা ছিল না তাই বর্ষাকালের মেঘলাদিনের রোদের মতই তা সুন্দর লাগত। সে কথাটাও মনে পড়ল ঠাকুমার। হেসে যে কি ক'রেছিলেন সে কথা অত স্পষ্টভাবে এতদিন বাদে আর মনে নেই। এই হয়েছে এক মুস্কিল সারা জীবনের ঘটনাগুলো এক বিনি সুতোয় গাঁথা মালার মত মনে পড়ে বটে, কিন্তু কোনটাই সম্পূর্ণ নয়। অসম্পূর্ণ ঘটনাগুলোর মিছিল চলে স্কন্ধকাটার প্রদর্শনীর মত। একমাত্র ছেলে পরীক্ষিত যখন কৃতী হল বাবা গর্ব অনুভব ক'রতেন। মুখে কিছু বলতেন না কিন্তু তাঁর মত সংযতবাক্ মানুষেরও দু'একটা ঘরোয়া আলোচনায় সে গর্ব কিঞ্চিৎ প্রকাশ পেয়ে যেত। ঠাকুমা নিজে শিক্ষকের সঙ্গে ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট-এর পার্থক্য বিশেষ বুঝতেন না, তবু বুঝতেন যে ছেলে অনেক বড় কিছু হয়েছে। এবং অচিরে একদিন প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন এক গরমের ছুটি কাটাতে ছেলের কাছে গিয়ে, দেখেছিলেন সে এক অন্য জগৎ, অন্য জীবন। তখনও বিয়েটা দেওয়া হয়নি পরীক্ষিতের এবং চাকরীও অল্পদিনই হয়েছে।

দরজার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন ঠাকুমা, এ কী! প্রসেনজিতের মেমটা তাঁর দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে! হাসছে! না তাহলে কোন খারাপ মতলব নেই মনে হচ্ছে, কারণ মেমই হোক আর যাই হোক হাসিটা মেয়েটির সুন্দর! এই হাসি কোন দিশি মেয়ের হলে তাকে ভালবাসতে ইচ্ছে ক'রত। তাতেই বা কি, যখন পরীক্ষিতের বিয়ের সম্বন্ধ আনল ঘটক, কলকাতায় গিয়ে মেয়ে দেখে এলেন কর্তা সত্যেন মাস্টারকে সঙ্গে ক'রে। এসে খুশী মনেই বর্ননা দিলেন মেয়ের, পরিচয় দিলেন বংশের, বললেন, অমন বড় ঘরের মেয়ে যে বউ হয়ে আসবে এও এক সৌভাগ্য। সে কথা ঠাকুমার নিজেরও মনে না হয়েছিল তা নয়, তারপর যখন বউ এল তখন বউ-এর মুখ দেখে প্রসন্নও হয়েছিলেন তিনি, বেশ নরম মুখখানি বৌমার। কিন্তু সেই নরম মুখখানির মধ্যে যে কি কঠোরতা আছে তা টের পেয়েছিলেন কর্তার দেহত্যাগের পরে। তার আগে স্বামীর ঘরেই ছিলেন তিনি, ছেলের সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হ'ত ছুটি-ছাটায় তার কাছে গেলে। স্কুলের চাকরী শেষ হবার পর যে ক'বছর কর্তা বেঁচে ছিলেন বাড়ি বাড়ী ছেলে পড়িয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে ছিলেন, কারও অনুগ্রহ চান নি বা গলগ্রহও হন নি। হতে হ'ল তাঁকে। আর কতদিন যে এইভাবে গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে ভেবে পান না ঠাকুমা। এক আধাসাহেব ছেলের বউ-এর ব্যবহারেই তাঁকে শামুক হতে হয়েছে এবার এসেছে খাস মেম। এ আবার যে কি মূর্তি ধরবে কে জানে? হাসি তো বৌমাও খারাপ হাসে না, যখন কারও সঙ্গে হেসে কথা বলে কে বলবে এত কঠিন মেয়েমানুষ! এ মেয়েও হয়ত একদিন আপন মূর্তিতে ফুটে বেরুবে। হোক। এই বউই একদিন জব্দ ক'রবে ওনাকে—মনে মনে তৃপ্তি পেলেন ঠাকুমা কথাটি ভেবে। করুক। আসলে ওদের সঙ্গে আমাদের মেলে না। যতই মেলাতে চেষ্টা কর না কেন বাছা, যতই তেল দাও না কেন ওদের চামড়া সাদা। ময়ূরের পাখা গুঁজলেই কি কাক ময়ূর হয়ে যায়! বুঝবে এইবার সাহেব সাজা বুঝবে। প্রসেনজিৎও কি আর বউ-এর কথা না শুনে পারবে? অতদূর থেকে বউ ক'রে যাকে নিয়ে এসেছে কি ক'রে ফেলবে তাকে? ঠাকুমার মনে প্রসেনজিতের দেখা না করার ক্ষোভও আর রইল না। আড়চোখে তিনি তাকালেন মেয়েটির দিকে। আরও দুপা এগিয়ে এসে দরজার ঠিক ওপরটায় দাঁড়িয়েছে মেয়েটি। কি লম্বা মেয়ে! আড়চোখে তাকানোর মধ্যেই ঠাকুমা আপাদমস্তক দেখে নিলেন। কিন্তু কিছু করবেন তারও উপায় নেই। না

জানেন ওর ভাষা, না বোঝাতে পারবেন ভঙ্গীতে। অথচ মেয়েটিকে দেখে তো খুব একটা খারাপ মনে হচ্ছে না! আবার ভাবলেন খারাপ ভাল এখনই কি বোঝা যাবে এই তো সবে এসেছে। দুদিন যাক, আপন-বৃঝ বুঝতে শিখুক, তারপর না বোঝা যাবে! নিজমূর্তি ধারণ ক'রতে যেক'দিন দেরী লাগে ততদিনই যা ভাল। ওদের আবার নাকি অন্য রকম না পছন্দ হলে নাকি ওরা চলে যায়, ঝগড়া করে না। তাহ'লে আর কি হ'ল! নিজের ইচ্ছে মত যদি ঘর গোছাতে চাইত তবেই না বুঝতে পারত ব্যাপারটা কতদূর দাঁড়ায়! যাক গে যাক। এখন তো মেয়েটাকে কিছু বলতে না পেরে কেমন যেন লাগছে। আসলে ঠাকুমার অস্বস্তি লাগছিল।

অস্বস্তি লাগছিল এমিলিরও। অন্য এক জগৎ প্রত্যক্ষ ক'রছে এমিলি। এবং এই প্রথম দর্শনেই সে বেশ বুঝতে পারছে এজগতের সঙ্গে তাদের কারও কোন মিল নেই, থাকতেও পারে না। তবু কেমন যেন ভালই লাগছে তার। এই বৃদ্ধা যে-ই হন না কেন বেশ সুন্দর লাগছে এঁকে। এমিলির ইচ্ছে হচ্ছে এঁর সঙ্গে দুটো কথা বলে, আলাপ করে, পরিচয় জানে। কিন্তু উপায় নেই, ওর ভাষা বৃদ্ধা বোঝেন না আর বৃদ্ধার ভাষাও কিছুই বোঝে না এমিলি, শুধু শব্দগুলো কটাস কটাস ক'রে কানে লাগে। প্রসেনজিতের সঙ্গে আলাপ হবার অনেক আগেই এমিলি এদেশ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে, অনেক কথা মানে একটা দেশের অন্তরঙ্গ সব কথা। সেই সব কথা ছিল ছবির মত। যার কাছে শুনেছে সে যেন কথায় কথায় ছবি আঁকতে পারত, আর সেই ছবি এঁকেই সে দূর আমেরিকায় বসে দেখিয়েছিল এই দেশ। অনেক শান্ত সন্ধ্যায় আশ্চর্য আন্তরিকতার সঙ্গে গল্প ক'রত সে, আর সেই গল্পের স্মৃতি টেনে এমিলি প্রসেনজিতকে জিজ্ঞেস করত এখানকার কথা, কিন্তু প্রসেনজিৎ জবাব দিত না। প্রসেনজিৎ বরং বরাবরই নিরুৎসাহ ক'রত, বোঝাত আমেরিকার তুলনায় এদেশ একান্তই অকিঞ্চিতকর। কিন্তু আজ এখানে এসে সেই পুরানো গল্পের বৃদ্ধাকে ঠিকই চিনতে পারল এমিলি। আজ তার মনে পড়ল ঠিক যেন এই বৃদ্ধারই বর্ণনা দিয়ে কল্যাণ বলেছিল দেশে আমার এক দিদিমা আছেন, মায়ের মা, আমাদের বাড়ীতেই থাকেন। তিনি ছোটবেলায় রূপকথার গল্প শোনাতেন কল্যাণকে যে সব দেশের গল্প বলতেন সে সব দেশ কল্যাণ এবং তার গ্রাণ্ডমাদার কেউই কোনদিন দেখেন নি। শুনে শুনে এমিলি জানতে চাইত, তুমি কি তোমার দিদিমার কাছেই গল্প বলা শিখেছ? কল্যাণ হেসে বলত, তা বলতে পার। আজ কল্যাণের দিদিমাকে যেন চিনতে পারল এমিলি এবং তার বারংবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল কল্যাণ বলে তাঁর কোন নাতি আছে কিনা—। আবার ভাবল এটা তো তাহলে কল্যাণদেরই বাড়ী হ'ত। অতএব উনি কল্যাণের দিদিমা নন। কিন্তু কল্যাণ যা বলত তা ঠিক, এখানকার সব বৃদ্ধাই কল্যাণের দিদিমার মত। কাউকেই হয়ত আলাদা ক'রে চেনা যাবে

না। কল্যাণের দিদিমাকে দেখলেও হয়ত একই লোক বলে মনে হবে।

রুমি এসে এমিলির ভাবনাটা ভেঙ্গে দিল। আস্তে কথা বলা তাদের অভ্যেস তবু কোন কোন সময় সেই আস্তে কথাও এমন শোনায় যাতে সচকিত হয়ে উঠতে হয়। রুমির শব্দ পেয়ে এমিলি একমুখ হেসে বিস্ময়বোধক শব্দ করল, আঃ কি সুন্দর বৃদ্ধা মহিলা! জাস্ট লাইক এ গ্রাণ্ডমাদার— !

একথার জবাবে রুমি কি বলবে ভেবে পেল না। মেম-বৌদি বলছে গ্রাণ্ডমাদার। দাদা কি তবে তাই বুঝিয়েছে ? এমিলিকেই কথাটা জিজ্ঞেস করল, গ্রাণ্ডমাদার তোমাকে কে বলেছে ?

এমিলি বলল, কেউ বলেনি, আমি বলছি সেই রকমই দেখতে।

রুমি আশ্বস্ত হ'ল, যাক। বাঁচা গেছে। একদিক দিয়ে তবু নিশ্চিন্ত যে ঠাকুমা মেম বৌদির সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আপন পরিচয়ও দিতে পারবে না। এ বাড়ীতে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই যে বলবে। মার ইচ্ছা নয় মেম বৌদি জানুক। রুমি কলেজে পড়ে, তার মনের ভাব একটু বিদ্রোহী। সে এতটা পছন্দ করে না। সাংসারিক ব্যাপারে কেউ বলে না দেখে সে-ও মার ওপর কোন কথা বলে না। মা যা পছন্দ করে বাড়ীর ব্যাপারে সেই রকমই চলে। যা অপছন্দ করে সেটা চলে না। অনেক ব্যাপারে মার ব্যবহার অসহ্য লাগে, বাড়াবাড়ি বলেও মনে হয় অনেক সময়। এই যেমন, মেলামেশার ব্যাপারে মা অত্যন্তই রক্ষণশীল। সকলের সঙ্গে মেলামেশার প্রশ্নই ওঠে না, বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারেও মা চায় বাছাই করে অর্থাৎ বড় বড় লোকের মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুক রুমি, আজে বাজে মেয়েদের সঙ্গে যেন মেলামেশা না করে। আজেবাজে মেয়ে বলতে মা যে এই মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত ঘরের মেয়েদের বোঝাতে চায় এতেই রুমির আপত্তি। বন্ধু হলে হয়েছে কি ? একজন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে যদি বন্ধু হয় তাহ'লে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়, রুমি বোঝে না। মা অবশ্য কোনদিনই প্রত্যক্ষভাবে নিষেধ করে নি, করেও না কিন্তু পরোক্ষে এমন মন্তব্য ক'রে বসে যে সহ্যও করা যায় না, প্রতিবাদও করা যায় না। সেইদিনকার কথা রুমি জীবনেও ভুলবে না যেদিন তার কলেজের বন্ধু মঞ্জুলা এসেছিল। অন্য অনেক মেয়ের মত সেজেগুজে থাকবার পয়সা মঞ্জুলার আছে, কিন্তু মঞ্জুলার রুচি অন্য রকম। সব সময়েই সে তাঁতের শাড়ী পরে একটা সাধারণ স্যাণ্ডেল পায়ে ঘুরে বেড়ায়। আভরণ বলতে হাতে দুগাছা বালা আর কানে খুবই সাধারণ দুটি রিং। চেহারা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে যেমন হয়, আকর্ষক কিছু নয়। চেহারায় জৌলুস এবং পোষাকআষাকে রীতিমত জেল্লা না থাকলে মার তাদের চোখেই ধরে না, ধরেনি মঞ্জুলাকেও। তাই মঞ্জুলা চলে যাবার পর মেয়েকেই বলেছিল, ওটা আবার কা'কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলি ?

আমার কলেজের বন্ধু মঞ্জুলা—

মা একটা কাস্টার্ড পাউডারের কৌটোর গায়ের লেখাগুলো মনোযোগ দিয়ে

পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক উপেক্ষায় বলে উঠেছিল, তুই আজকাল ঝি চাকর ধরণের লোকেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রতে আরম্ভ ক'রেছিস ?

কথাটা অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে বললেও রুমি তা গভীরভাবে নিয়েছিল, তার লেগেছিল। এবং সেই লাগাটা মনের মধ্যে রেখেছিল বলেই আর কোন বান্ধবীকে সে কোনদিন বাড়ীতে ডাকে নি, আসতে বলেনি কোন বন্ধুকেও। নইলে জয়া, সোমা, বন্দনা কতদিন ঠাট্টা ক'রে মঞ্জুলাকে বলেছে, তুই তো রুমির বাড়ী ঘুরে এলি, আমাদের তো একদিন নিয়েও গেল না রুমি। তোর ভাগ্য ভাল আমরা কি আর ওরকম ভাগ্য ক'রে এসেছি—

শুনতে রুমির খারাপই লেগেছে, ঠাট্টাকে বিদ্রুপ মনে হয়েছে, তবু তাকে বলতে হয়েছে, বন্ধুর বাড়ীতে যেতে কি ভাগ্য লাগে ? তোদের সকলকে নিয়ে যেতে খুব ইচ্ছে করে, একদিন সকলকে নিয়ে যাব।

বান্ধবীদের মধ্যে অত্যন্ত চালাক যে তার নাম বন্দনা, সে আড়ালে একদিন সকলকে বলেছে, দেখিস না রুমি কখনও কারও বাড়ী যায় না! আসলে ও যাতায়াত পছন্দ করে না। এই কথাটি জয়াই সেদিন রুমির সামনে ফাঁস ক'রে দেবার বোকামীতে আলগা চড় খেয়েছিল সোমার কাছে। আর রুমিকে লজ্জা থেকে বাঁচাবার দায়িত্বে মঞ্জুলা প্রতিবাদ করেছিল, না না একথা আমি একদমই বিশ্বাস করি না বন্দনা।

অপ্রস্তুত হয়ে বন্দনা নিজের লজ্জা গোপন ক'রতে বলেছিল, একথা না বললে রুমিকে আমাদের সঙ্গে কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় না বলে জয়াই একথা বলছে আমার নাম দিয়ে। তা বলুক।

সমস্ত ব্যাপারটা খারাপ দিকে চলে যাচ্ছে দেখে রুমি তাড়াতাড়ি প্রস্তাব ক'রল যেদিন বাড়ীতে যাবি, যাবি, আজ চল কোথাও বসে কিছু খাওয়া যাক।

খাওয়ার প্রস্তাবে বন্দনা কখনই অরাজী থাকে না। জানতে চাইল, কোথায় খাবি ?

চল 'আনন্দ'তে যাই। কাটলেট খাওয়া যাক। প্রস্তাব করল সোমা।

কে খাওয়াবি ? বন্দনা জানতে চাইল

আমি, রুমি জানাল।

তুই আগেও একদিন খাইয়েছিস। আজ আমার পালা।

আমি যখন প্রস্তাব ক'রেছি তখন আমারই পালা হওয়া উচিত—রুমি বলল।

বন্দনা প্রতিবাদ ক'রল কি খাওয়া হবে সোমাই বলেছে। প্রস্তাবটা একদিক দিয়ে সোমারও বটে—

জয়া বলল, আমি দেখছি তোদের তর্কাতর্কিতে শেষ পর্যন্ত খাওয়াটাই না পণ্ড হয়। তার চেয়ে রেস্টুরেন্টে চল যার ব্যাগে বেশী পয়সা থাকবে সেই খাওয়াবি।

সোমা চট ক'রে বলল, এ প্রস্তাবে আমি রাজী।

মঞ্জুলা ভাবল সোমা এড়িয়ে যাবার জন্যে বলছে তাই সে বলল, সোমাটা খুব চালাক। ফাঁকি দেবার একটা রাস্তা পেয়ে গেল।

কি ক'রে জানলি, সোমা জিজ্ঞেস ক'রল।

রুমিও জয়ার প্রস্তাবে রাজী হয়ে বলল, আমিও মনে করি জয়ার প্রস্তাবটা ভাল, কারণ আমরা তো কেউই জানি না কার কাছে কি আছে?

বন্দনা বলল, তাই চল।

সামান্য দূরত্বেই 'আনন্দ' রেস্টুরেন্ট। ওইটুকু পথ পার হতে গিয়ে বন্দনা পেছিয়ে পড়ল এবং ইশারা করে ডেকে নিল সোমাকেও। সবার অলক্ষ্যে নিজের হাত পেতে দিয়ে বলল, তোর ব্যাগে ক'টাকা আছে আমায় দে। আমিই খাওয়াব।

সোমা বলল, তুই চল না। আমার ব্যাগে অনেক টাকা।

রুমির যদি আরও বেশী থাকে?

থাকতেই পারে না। সাত মাসের মাইনে দেবার জন্য বাবা আজ আমাকে একটা একশ টাকার নোট দিয়েছেন, সোমা জানাল।

সেটা দে আমাকে, বন্দনা বলল, রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আমি তোকে আবার ফেরৎ দেব। তুই আর একদিন খাওয়াস।

সোমা নোটটা বন্দনাকে তেমনি গোপনেই দিয়ে দিল।

টেবিলে বসে খাবারের অর্ডার দিয়েই সোমা বলল, এবার তা'হলে ঠিক হয়ে যাক কে দাম দেবে, জয়া কি বলিস?

জয়া বলল, সবাই নিজের নিজের ব্যাগ থেকে টাকা বের কর, নাহয় বল কার কাছে কত আছে।

রুমি মনে মনে স্থির জানত তারই টাকা বেশী হবে। কাজেই সে স্থির ভাবে বসে রইল। মঞ্জুলা ব্যাপারটায় বেশ লজ্জা পাচ্ছিল কারণ তার কাছে সেদিন সামান্য কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া কিছুই ছিল না। সে তাই লজ্জিতভাবে বলল, আমার কাছে ভাই আজ কিছুই নেই। শুধু বাসভাড়া আছে।

জয়া নিজের ব্যাগ থেকে একটাকার কয়েকটা নোট বার ক'রতে ক'রতে বলল, আমার কাছে বলবার মত কিছু নেই। থাকবেই বা কোত্থেকে ভাই, আমার বাবা কেতিমারা কেরাণী। মাসের মাঝামাঝি এলে বাবার পকেটেই টাকা থাকে না আমি পাব কোথায়—

সোমা ব্যাগ খোলবার আগেই রুমি বলল, তোরা শুধু শুধু ঝামেলা করছিস কেন বল তো? আগে-খেয়ে তো নিই তারপর যে হোক একজন দিলেই হবে।

সোমা বলল, যে হোক দিলে হবে না। আজ চুক্তি যখন হয়েছে তখন সেই ভাবেই কাজ হবে। তুই এখন বের কর তোর কত টাকা আছে। আমিও বের করছি, বন্দনাও বের করছে।

বন্দনার হাতে ব্যাগ ছিল না। বইখাতার মধ্যে একটা চ্যাপ্টা ছোট্ট ব্যাগ ছিল সেটি বের ক'রে বন্দনা তার ভেতর থেকে একশ এগার টাকা বের করতে রুমি নিজের ব্যাগ আর না খুলে বলল, বন্দনারই পালা।

এবং সেদিনের সেই ঘটনাটাও ভোলে নি রুমি। কারণ তার মনে হয়েছিল বন্ধুরা ইচ্ছে ক'রেই তাকে আঘাত ক'রেছে। তবে সেই আঘাত সে গায়ে মাখেনি নিজের মায়ের ওপর অভিমান ক'রেই। বন্ধুদের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহার সে যে ক'রতে পারে না সেজন্যে তাদের মনে লাগাও কিছু অস্বাভাবিক নয় আর তাই তারা যদি একদিন কিছু ক'রেও বসে তবে সেটা সহ্য ক'রতে হবে বৈকি। এখন মনে হয় মঞ্জুলাকে বাড়ীতে ডেকেই সে ভুল ক'রেছিল। কাউকেই যখন বাড়ীতে আনেনি তখন মঞ্জুলাকেও না আনলেই হ'ত। তাহ'লে বন্ধুদের কাছেও সম্মান থাকত আর বাড়ীতে মা-ও তার সম্বন্ধে অযথা বাজে মন্তব্য ক'রতে পারত না।

কিছু পুরানো কথা রুমির মনে পড়ল। আজ পর্যন্ত মাকে কোনদিন চেঁচিয়ে অনর্থ ক'রতে দ্যাখেনি সে, কোন কথা দুবার বলতেও শোনেনি। কিন্তু এমনভাবেই কথা মা বলে যে সে কথা শুনতেই হয়। আজ যদিও সে জানত তার কোন দোষ নেই তবু মা-র কথাগুলো অন্যকে বললেও তার কানে তো পৌঁছবে! সেটাও যেন দুঃসহ মনে হয়। আসলে অস্ত্রই যেখানে ভয়ের, লক্ষ্যস্থল সেখানে গৌণ। কাজেই এমিলিকে নিয়ে এখন মা-র চোখে পড়ার আগে সরতে পারলে সে যেন বাঁচে। তার আবার এটাও ভয়ের যে এই নতুন আসা বৌটাকেই মা না কিছু বলে বসে।

প্রসেনজিৎ ভেবেছিল এমিলির অসুবিধা হবে। আমেরিকার মত দেশ থেকে ভারতবর্ষে গিয়ে পদে পদে অসুবিধেয় পড়বে। থাকতেই পারবে না। তাই সে ঠিক ক'রেছিল ওখানেই থেকে যাবে। চাকরীবাকরী ক'রে আরও দশজন মেম বিয়ে করা বাঙ্গালীর মত সেবাদাস হয়ে পরবাসেই ঘর সংসার ক'রতে থাকবে। কিন্তু বিচিত্র মেয়ে এই এমিলি। সে-ই কিনা ঝোঁক ধরল ভারতবর্ষে যাবে, বিশেষ ক'রে 'বেঙ্গল-এ' ক্যালকাটা যার মহানগরী! বিস্মিত হয়ে প্রসেনজিৎ জানতে চেয়েছিল, কি হবে সেখানে গিয়ে?

এমিলিও বিস্মিত হয়ে বলেছিল, তোমার দেশ, তোমার মাতৃভূমি আর তুমি আমাকে এই প্রশ্ন ক'রছ কি হবে সেখানে গিয়ে?

আমার না হয় মাতৃভূমি, তোমার এত আগ্রহ কিসের?

এমিলি মিথ্যে কথা বলতে চাইল না বলে একটু থেমে বলল, তোমাদের দেশ সম্পর্কে আমার বিশেষ কৌতূহল আছে। আমি দেখতে চাই।

বেশ তো, কিছুদিন বাদে একদিন গিয়ে দেখে এলেই হবে।

ও না না। আমি সেখানে বাস ক'রতে চাই।

আশ্চর্য।—সত্যিই ভয়ানক আশ্চর্য হয়েছিল প্রসেনজিৎ। তারপর মনে মনে স্থির বুঝেছিল যে এ মোহ, অচিরেই একদিন কেটে যাবে এমিলির এবং ফিরে আসতে হবে। অতএব শুধুমাত্র এমিলির মানসিক তৃপ্তির জন্যেই এই ভারতবর্ষে আসা এবং ফিরে আসা যে নয় একথা নিশ্চিত জেনেই প্রসেনজিৎ ফিরে এসেছিল

ওখান থেকেই একট চাকরী নিয়ে।

সে-ও এক ইতিহাস। কলকাতার কাছাকাছিই একটা চাকরী চেয়েছিল প্রসেনজিৎ কারণ কিছুদিনের মধ্যেই এমিলির মন বদলে গেলে তো ফিরে আসতে হবে, কাজেই দেশে থাকার দিনগুলো বাড়ীতে থাকাই ভাল। সেই ইচ্ছাতে খোঁজ খবর ক'রে মিস্টার লালচাঁদের সঙ্গে নিউইয়র্কে গিয়ে দেখা ক'রেছিল প্রসেনজিৎ। মিস্টার লালচাঁদ বিখ্যাত হীরা গ্রুপ অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর পরিচালকগোষ্ঠী ছগনলাল হীরাচাঁদ-এর চেয়ারম্যান। সারা ভারতবর্ষে বহু রকমের বহু কলকারখানার মালিক। কলকাতাতেই ছগনলাল হীরাচাঁদের প্রধান দপ্তর এবং কর্মকেন্দ্র। প্রসেনজিৎ তার সহবাসী মিস্টার প্রসাদ-এর কাছে শুনেছিল হীরাগ্রুপ অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ বিভিন্ন কারখানার জন্যে কয়েকজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার নেবে। মিস্টার লালচাঁদ যখন আমেরিকা এসে পড়েছে তখন হয়ত এ-ও হতে পারে ভাল লোক পেলে এখান থেকেও নিয়োগ ক'রে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু অতবড় একটা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের সঙ্গে দেখা ক'রে হতাশই হয়েছিল প্রসেনজিৎ। খুব উৎসাহের সঙ্গেই মিস্টার লালচাঁদ বলেছিল, খুবই উত্তম প্রস্তাব যে আপনাদের মত লোকেরা এদেশের এত চাকচিক্য ছেড়ে দেশে ফিরতে চায়। আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী তো ভাল ভাল ছাত্রদের দেশত্যাগের জন্যে বিশেষ চিন্তিত। গত সপ্তাহে চেম্বার অফ কমার্সে এক ভাষণে তিনি বলেছেন শিল্পপতিদের উচিত এইসব ছেলেদের ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা। তা আমি আপনার কথা প্রধান মন্ত্রীকে দেখা হলেই বলব, যে একজনও অন্তত ফিরে এসেছে।

মিস্টার লালচাঁদের কথায় বেশ উৎফুল্ল বোধ ক'রেছিল প্রসেনজিৎ। সেই প্রথম যৌবনে এদেশে এসেছে, থেকেছে যাদের সঙ্গে তারা সহজ কথা সহজ ভাবে বলতেই অভ্যস্ত, আর তাই শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে প্রসেনজিৎ। সেই জন্যে অত উৎসাহব্যাঞ্জক কথাবার্তার পর যখন মিস্টার লালচাঁদের কাছে জানতে পারল চাকরীতে সে ইচ্ছা ক'রলে আগামী মাস থেকেই যোগ দিতে পারে, বেতন পাবে আটশ টাকা, প্রসেনজিৎ ভাবল আটশ টাকা বুঝি সাপ্তাহিক বেতন। নেহাৎ কৌতুহলের বশেই সে জানতে চাইল, ওখানে কি বারে বেতন দেওয়া হয়?

প্রশ্ন শুনে হতভম্ব হয়ে গেল মিস্টার লালচাঁদ। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থেকে জিজ্ঞেস ক'রল, কি বারে মানে?

মানে সপ্তাহের কোনদিন বেতন দেওয়া হয় তাই জানতে চাইছিলাম।

ওখানে সব মাসিক বেতন। শুধুমাত্র রোজমজুরদের সাপ্তাহিক বেতন দেওয়া হয়ে থাকে।

কথাটা শুনে প্রসেনজিৎ-এর কেমন সন্দেহ হ'ল তবে কি আটশ টাকা মাসিক বেতন! কথাটা জানতে চাইল মিস্টার লালচাঁদের কাছে।

শুনে লালচাঁদ প্রসেনজিতের অজ্ঞতায় যেন হতাশ হ'ল। বলল, আপনি

কি জানতেন না? ভারতবর্ষে এটা ভাল বেতনের পর্যায়েই পড়ে। এর সঙ্গে আবার ফ্রি কোয়ার্টার পাবেন। ঠিক আছে, যদি ইচ্ছা করেন আমাকে কালকের মধ্যে জানাবেন আব গাজিয়াবাদ ইনগট কোম্পানীব নামে একটা চিঠি ছেড়ে দিবেন, লিখে দিবেন আমার নির্দেশ অনুসারে আপনি কত তারিখে জয়েন ক'রতে যাচ্ছেন। আপনার ওখানকাব ঠিকানাটাও দিয়ে দিবেন।

সব শুনল প্রসেনজিৎ। মুস্কিল হ'ল এই যে এসব দেশে পছন্দ হোক কি না হোক শেষকালে ধন্যবাদ একটা দিতেই হয়। প্রসেনজিৎকেও দিতে হ'ল। সভ্যকথিত সমাজে ভদ্রতা ইচ্ছা অনিচ্ছাব ধার ধারে না। মনকে আটকে বেধে ভদ্রতা বজায় রাখতে হয় অনেক সময়েই। এই একটা ক্ষেত্রে প্রসেনজিৎ সেই কথাটা বড় তীব্র ভাবে অনুভব ক'রল।

যে বেতনে এখানে একজন বাড়ীর চাকর পর্যন্ত রাখা যায় না সেই বেতনে একজন অভিজ্ঞ ইনজিনীয়ার রাখবে একটা কারখানায়। তারপর বলে এ নাকি কম হ'ল না। কথাটা অপমানজনক মনে হ'লেও প্রসেনজিৎকে শুনতে হ'ল। লালচাঁদ কি মনে করে এখানেও দেশের মত সেই বেকার ইনজিনীয়ারের ভীড় তার চাকরী দেবার অপেক্ষায় বসে আছে? দূর দূর। দরকার নেই দেশে ফেরবার। সব মাতব্বরেরা শুকনো দেশপ্রেম-এর নামে আপন কাজ হাসিল করে।

কথাটা অন্যভাবে বলে এমিলিকে নিরস্ত ক'রতে চাইল প্রসেনজিৎ, বলল, আমাদের দেশে বেতন এত কম যে ভালভাবে সংসার চালানোই যায় না।

কিন্তু তাতেও কামেনি এমিলির রোমান্টিসিজম। সে দমেনি আদৌ, বরং জবাব দিল, বেশী টাকা দিয়ে কি হবে? কি হবে অনেক জিনিস দিয়ে? ওখানেও তো মানুষ থাকে। কত মানুষ থাকে, কত সুন্দর সুন্দর মানুষ—

প্রসেনজিৎ হতাশ হয়ে পড়ল। কিছুতেই দমবে না মেয়েটা। নাঃ চেষ্টা তাহ'লে আবার ক'রতে হয়। যে বেতনই হোক চাকরী খুঁজতে হবে কলকাতার ওপর। তা পেলে বেতন 'যা-ই' হোক না কেন চলে যাবে। এমিলি যখন চায় তখন যেতে তাকে হবেই তারপর আপনি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে ফিরে আসতে চাইলে চলে এলেই হবে। তবে খুব অল্পদিনের মধ্যেই যদি ফিরে আসে একটু মুস্কিল হবে তাতে। যাতায়াত ভাড়া দিতেই হাতের সব টাকা ফুরিয়ে যাবে। তা যাক, এমিলি তো খুশী হোক। ভারতবর্ষ দেখতে চায় এমিলি, তা চাইবে এতে আর দোষ কি? নতুন দেশ কে না দেখতে চায়? প্রতি বছর হাজার হাজার আমেরিকান তো বিদেশ ভ্রমণে বেরোচ্ছে। তাদেরই রক্তের ঐতিহ্য তো এমিলিও বহন করে। কিন্তু সে যদি সুইজারল্যাণ্ড যেতে চাইত বা ভিয়েনা যেতে চাইত বা রোম যেতে চাইত তা'হলে একটা সামঞ্জস্য থাকত। তা নয় সে যেতে চায় ভারতবর্ষ। সেখানে কি দেখবে? রাশি রাশি ভিখিরি কিলবিল ক'রে ছেঁকে ধরবে রাস্তায়, সারি সারি অভুক্ত মানুষের মিছিল চারপাশে ভূতের নৃত্য ক'রবে, কি আছে দেখবার? অথচ মেয়েটা ঝোঁক ধরল ওরই মধ্যে সে যাবে।

তাই আবার খোঁজে থাকতে হ'ল এবং একদিন মিলল সুযোগ। অক্সিজেন

এণ্ড এসিটিলিন কোম্পানী লিমিটেডের পরিচালক সমিতির সদস্য অভিমন্যু সেন তাঁর হেড অফিস লণ্ডনে এসে কোম্পানীর কি একটা কাজেই এসেছিলেন একেবারে ফিলাডেলফিয়ায়। সন্ধান পেয়েই দেখা ক'রল প্রসেনজিৎ। জানাল কলকাতায় কাজ পেলে সে চলে যেতে চায়। অভিমন্যু সেন পেশাদার ডাইরেকটার। সামান্য একজন অফিসার হিসেবে কাজে যোগ দিয়ে নিজের কর্মক্ষমতায় ওপরে উঠতে উঠতে এই অবস্থায় এসেছেন। যোগ্য বলে যোগ্যতা যাচাই ক'রে নিতে জানেন তাই কথাবার্তা বলে প্রসেনজিৎকে বললেন, কোম্পানী আপনাদের মত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক চায় কিন্তু মুস্কিল হ'ল আমাদের দেশে বেতনের হার খুব স্বাভাবিকভাবে এখানকার তুলনায় অনেক কম। আপনার কি অসুবিধে হবে না?

প্রসেনজিৎ বলল, তবু যদি জানতে পারতাম কি রকম পেতে পারি তাহলে একটু ভাববার সুযোগ পেতাম।

অল্পক্ষণ ভাবলেন অভিমন্যু, জানালেন, আমাদের সাধ্যমত সমস্ত সুযোগ সুবিধে দিলেও হাজার টাকার ওপরে ওঠাতে পারব না। সামান্য কমবেশী এক হাজার ধরতে পারেন। ফাইনাল হিসেবটা ওখানে য়্যাকাউনটস ডিপার্ট-মেন্টের সাহায্য ছাড়া বলতে পারব না।

আপনাদের কলকাতার কারখানায় হবে তো?

হ্যাঁ, সেখানকার জন্যেই বলছি—

আমি রাজী।

একটু হাসলেন অভিমন্যু, বললেন, এক কথাতেই? ভাববেন না? এখানকার সুখ সুবিধে, জীবনযাত্রা—

আমি ভাবছি দেশেই ফিরে যাব।

ইংলণ্ডে একজন যেতে চেয়েছিলেন, বেতনের কথা ভেবেচিন্তে আর রাজী হলেন না। কিছু মনে ক'রবেন না, আপনার বয়েস কম তাই বলছি আর একবার ভেবে দেখুন, কাল আমাকে জানাবেন।

আমার দিক থেকে ফাইনাল।

আবার ভাবলেন মিস্টার অভিমন্যু সেন। কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকলেন, তারপর বললেন, বেশ। আপনি কলকাতায় চলে আসুন। এখানকার কাজ গোছাবার জন্যে কি সময় লাগবে আপনার? এখানকার কাজ কি কনট্রাকটে?

না। নোটিশেই ছেড়ে দিতে পারি। আমাকে এক মাসের সময় দিতে হবে।

আসুন দু মাস বাদে। তাহলে আপনি ওখানে গেলেই পাকা লেখাপড়া হবে। আমি টাইপ করে রাখছি আপনাকে কাদিকের মধ্যে আমাদের সার্ভিস কণ্ডিশানগুলো জানিয়ে দেব।

সেই চাকরী নিয়েই কলকাতায় আসা। এসে কিন্তু আরও কিছু বেশীই পেয়েছে প্রসেনজিৎ, সেটা জানতে পারল কয়েকদিন পর। কাজে যোগ দেবার

কয়েকদিন পর তার নিয়োগপত্রের পরিশুদ্ধি পেল একটা তাতেই বেতন হার সংশোধন ক'রে এগারশো করা হয়েছে। টাকার অঙ্কে খুশী হবার কিছু না থাকলেও প্রথম থেকেই এ কোম্পানীর ব্যবহারটা তার ভালই লাগল। তবে এ দেশে এর চেয়ে ভাল চাকরী পাওয়া যে একেবারেই অসম্ভব এই বাস্তব বোধটা তার ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছিল। এখানকার কাগজে রোজই প্রথম পাতায় সংবাদের নামে মন্ত্রীকথিত বিজ্ঞাপন বেরোয় এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, অথচ সে দেখেছে সরকারী চাকরীর অবস্থা আরও খারাপ। দেখা মানে অবশ্য ঠিক দেখা নয়, শোনা। শুনেছে। তাই মন্দের ভালতে সে খুশী থাকবার চেষ্টা ক'রেছে আর বিস্মিত হয়েছে এমিলির খুশী দেখে। ওকে তো আর পয়সা রোজগার করতে হয় না তাই পাখীর পালকের মত মন নিয়ে ও খুব সহজেই খুশী হতে পারে। হোক, তবু এমিলি খুশী থাকলেই হ'ল।

অবশ্য এমিলির খুশী হবার ভাবটা দেখে আজকাল কেমন যেন সন্দেহ হয় প্রসেনজিতের, আবার পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছে না তো! এদেশের গরম হয়ত সহ্য হচ্ছে না, মাথাই খারাপ হয়ে গেল হয়ত। কে জানে নইলে এমনি উদ্দামভাবে কে কবে এই রকম একটা বাজে জায়গাকে ভালবাসতে গেছে, যে জায়গাটা সে দেশের লোকদেরই ভাল লাগে না! আসলে এদেশের ভদ্রলোকেরা যারা একটু সুযোগ পায় অন্য কোথাও চলে যেতে চায়, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী কিংবা কানাডা। অনেক ক'জন ছেলে তো নাকি ইথিওপিয়া, কেনিয়াতেও চলে গেছে চাকরী নিয়ে। এখানে এসেই সব শুনেছে প্রসেনজিৎ। এসব খবর সব চেয়ে বেশী জুগিয়েছে সৌগত। সৌগত বাস্তুকার। ভালই চাকরী সে করে বলে প্রসেনজিৎ শুনেছে, পোষাক পরিচ্ছদ চেহারা চালচলন সব কিছুর মাধ্যমেই তার মোটা আয় বেশ বোঝা যায়, কিন্তু প্রসেনজিৎ বুঝতে পারে না বাস্তুকারদের জন্য এমন কি বিশেষপদ সরকার সৃষ্টি ক'রেছে যার বেতনের অঙ্ক এত ভারী? সৌগত নাকি পুরানো গাড়ীও খুঁজছে কেনবার জন্য, নতুন কেনার নাকি কি সব বাধা আছে, রুমিই এসব খবর জানিয়েছে। প্রসেনজিৎ অবাক হয়ে শুনেছে রুমির গল্প। হ্যাঁ গল্পই মনে হয়েছে তার যদিও সেই গল্পের সবটুকুই সে বিশ্বাস ক'রতে বাধ্য হয়েছে। আর শুনেছে সৌগতর আক্ষেপ জানেন প্রসেন-দা, আমি একবার যেতে পারলে আর কিছুতে আসতাম না। হাজার ভাল কাজ পেলেও নয়। আরে ছোঃ একি দেশ! আমার এক বন্ধু এস, এন, প্রসাদ বিহার য়ুনিভার্সিটির স্কলার, তাঁহা চান্স পাওয়া কাট্ ইথিওপিয়া।

সে কি আমাদের দেশের চেয়ে ভাল? প্রসেনজিৎ জানতে চায়।

ইউনেস্কোর সার্ভিসে গেছে। মাসে পাঁচ হাজার টাকা পাচ্ছে। এখানে থাকলে জন্ম ঘুরে যেত পাঁচ হাজার পেতে—সৌগতর জবাব।

কিন্তু তোমার তো শুনি খুব ভাল চাকরী। তুমি কেন দুঃখ কর। যদি বিদেশ ঘুরতে চাও তো ঘুরেই এস না একবার, এখন তো অনেক সুযোগ।

সুযোগ যদি সত্যিই পাই প্রসেনদা তো সঙ্গে সঙ্গে তা ধরে নেব, এণ্ড ফাট্‌ বলেই হাতে তুড়ি দিয়ে ভঙ্গী ক'রে বুঝিয়ে দিল পালিয়ে যাবে বিদেশে।

প্রসেনজিৎ কথা কম বলে, তাই একথার জবাব দিল না, তবে কথা কম বললেও সব কথা সে মন দিয়ে শোনে, আর তা শোনানোর উৎসাহেই সৌগত বলে চলল, সত্যি বলতে কি জানেন প্রসেনদা আমরা সবাই ধরে নিয়েছিলাম যে আপনি আর দেশে ফিরবেন না। আপনি ফিরে আসাতে অনেকেই অবাক হয়েছে —।

একথারও কোন জবাব দিল না প্রসেনজিৎ। কথাটা তার মনে কোন রেখাপাত ক'রল না। তাই সে একটু হাসল মাত্র। তারপর নেহাৎ ভদ্রতা রক্ষার জন্যেই যেন বলল, ওখানকার জীবন আর এখানে অনেক তফাৎ। তবে ওখানে জীবনের সুখের জন্যে যেমন নানারকম ব্যবস্থা আছে তেমনি এখানকার সমাজে আছে অন্য একটা দিক। সেটা তুমি ওখানে গিয়ে পাবে না।

কি এমন আছে এখানে? সৌগত অবজ্ঞার সুরে জানতে চাইল।

এই যে সবাই মিলে এক সঙ্গে থাকা—এই যে ধর একটা বাড়ীর মধ্যে বাঁধা একটা পরিবার—আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না সৌগত—

এই কথার মুহূর্তেই ঘরে ঢুকল এমিলি। তাকে দেখেই প্রসেনজিৎ যেন অনেকটা ভারমুক্ত হ'ল, বলল, এমিলিই আমাকে কথাটা এমনভাবে বুঝিয়েছে কাল।—এমিলিকেও আলোচনায় আনবার জন্যে প্রসেনজিৎ ইংরিজীতে বলল, কাল তুমি আমাকে এখানকার ফ্যামিলি লাইফ সম্বন্ধে কি বলছিলে যেন মিস্টার দত্ত শুনতে চাইছে।

এমিলি চট ক'রে বলল, মিস্টার দত্ত নয়, সাউগট—

প্রসেনজিৎ ভুলে গিয়েছিল যে এদেশের আদব-কায়দা-প্রথা সব আয়ত্ত ক'রবার ব্যাপারে এমিলি খুবই আন্তরিক। তাই নিজের দেশের মত পদবী ধরে কথা না বলে সে এদেশের মতই কথা বলতে চায়। আর তার জন্যে প্রতি মুহূর্তেই সে শিক্ষা নিতে ছোটে রুমির কাছে। একটু নতুন কিছু পেলেই জিজ্ঞেস ক'রে নেয় রুমি-কে। তাই নিজের ভুল স্বীকার ক'রে নিয়ে প্রসেনজিৎ বলল, দুঃখিত। সৌগত, সৌগত। কালকের কথাগুলো সৌগতকে বুঝিয়ে বল তো —?

ও নিশ্চয়ই। সোৎসাহে এমিলি বলতে লাগল, আমাদের ওদেশে জীবনটা যৌবনের জন্যে আর এদেশে সমস্ত জীবনই একটা জলধারার মত। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবই মাধুর্যময়। শান্ত এবং সুন্দর। জীবন এখানে খুব গভীর।

সৌগত জানতে চাইল, এই ক'দিন এসেই এত কথা বুঝলে কি ক'রে?

সত্যি বলতে কি কথাটা আমি ওদেশে থাকতেই বুঝেছি।

ওদেশে থাকতে! বলে কি মেয়েটা? মনে মনে যারপরনাই বিস্মিত

হ'ল সৌগত। কোন সায়েব মেম যে এধরণের কথা ভাবতে পারে এ তার স্বপ্নের অগোচর ছিল। অবশ্য ওদের সম্বন্ধে আশ্চর্য হওয়া যায় না, ওরা এক অদ্ভুত জাতি। ওদের অত কিছু থাকতেও কেমন ভিখিরীর মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় সব। ইদানীং কি এক ফ্যাশান বেরিয়েছে ভারতবর্ষের সাধুদের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকছে রাস্তার ধারে। ওসব যদি ক'রতে পারে তবে কতরকম সখ যে মাথায় চাপবে তাতেই বা আশ্চর্যের কি আছে? এমিলির এসবও তেমনি একটা সখ মাত্র। হয়ত দুদিন বাদে সখ চাপবে ডাঁটাচচ্চড়ি রান্না ক'রতে বসবে রাঁধুনীকে সরিয়ে দিয়ে। আসলে ওদের সম্বন্ধে অবাক হওয়া যায় না। ভোগবিলাসের চূড়ান্তে পৌঁছে ওদের নতুন নতুন জিনিষের জন্যে মন টানে। অন্য কিছু চায়। আর এই অন্য কিছু চাইতে গিয়ে কেউ বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, কেউ গাঁজা খেয়ে বিদেশ বিভুঁয়ের পথে পড়ে থাকে পাগলের মত, আবার কেউ দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ায় পিঠের ওপর বোঁচকা বেঁধে। এই জন্যেই ওদের ভাল লাগে, বাঁচতে ওরা জানে, জীবনটাকে উপভোগ ক'রতেও জানে। এদেশের মেয়েগুলো কেমন যেন ম্লান বিমর্ষ, মরো মরো ভাব। বিয়ে ক'রতে ক'রতেই কেবল যেন নেতিয়ে পড়ে। কয়েকটা বছরের মধ্যে দেহের মনের সমস্ত আকর্ষণ ফুরিয়ে ফেলে শুধ দুর্বহ দায়িত্বের মত বয়ে বেড়ায় জীবনটাকে। নিজেরা কেমন থাকে সৌগত বোঝে না তবে তেমনি একটি স্ত্রীকে নিয়ে সারাজীবন বাস করবার কথা ভাবতেই পারে না সে। জীবনকে যদি সম্পূর্ণভাবে ভোগ করা না গেল তবে আধ কাপ চা খেয়ে বাকী অর্ধেক ফেলে ওঠার চুক্তিতে নেমন্তন্ন সৌগত কোনমতেই গ্রহণ ক'রতে পারে না। তাই হাজারগুন ভাল এই য়ুরোপের মেয়েরা। ভাগ্যের চাকাটা খুললেই সে সাগর পাড়ি দেবে, আর জীবনকে পাবার জন্যে সঙ্গিনীও নির্বাচন ক'রে নেবে সেখানের লাস্যময়ী হাস্যময়ীদের মধ্যে থেকে উত্তমাকে দেখে। নেহাৎ যদি না-ই যেতে পারে তবে বাধ্য হয়েই রুমির মত আধা উত্তাপে হাত সেঁকতে হবে তা.ক। তবে রুমিই হোক কিংবা মিসেস সেন-এর মেয়ে আভেরীই হোক এদেশী মেয়েদের সৌগত চিনে নিয়েছে, সব মাটির পুতুল — আলমারীতে সাজিয়ে রাখলে সুন্দর থাকে ব্যবহারেই হাতে হাতে রঙ চটে যায়। এমনি ভাবে জীবনটাকে যাকে বলে উপভোগ করা—তা ক'রতে গেলে ওদের আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। স্ত্রীর কাছে যদি সুখই না পাওয়া গেল তো সঙ্গে ক'রে গাড়ীর পাশে বসিয়ে রাস্তার লোককে দেখিয়ে বেড়াবার জন্যে কণ্ট ক'রে বিয়ে না ক'রে মডেল পুতুল কিনে রাখাই অনেক ভাল।

এসব গুচ্ছের ভাবনা একসঙ্গে এসে পড়াতে সেগুলোকে ঠেলে সরিয়ে সৌগত এমিলিকে বলল, তুমি ওদেশে বসে আমাদের দেশ সম্বন্ধে এসব কথা কেমন ক'রে বুঝলে? তোমাদের দেশের বই-টইতে তো শুনেছি এদেশ সম্বন্ধে এমন সুন্দর কথা তৈরী ক'রে লেখে না?

এমিলি সৌগতর প্রত্যেকটি কথা-ই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। তাই সে
ই কথা ছেড়ে জানতে চাইল, তৈরী ক'রে লেখা বলছ কেন ?

সৌগত এটা ভাবতে পাবেনি। এমন একটা সামান্য কথার ওপরেই যে
মলি অসামান্য গুরুত্ব দিয়ে বসবে এ সে কি ক'রে ভাববে তাই জবাব
তও হকচকিয়ে গেল। এবং জবাব সে ঠিকমত দিতেও পারল না, দুবার
ক গিলে বলল, না ও এমনি বললাম আর কি।—তারপরই নিজেকে
মলে নিয়ে বলল, বলছিলাম এই জন্যেই যে তোমাদের ওদেশের লোকেরা
মাদের জীবনের এত নিবিড় কথা সব জানবে কি ক'রে ?

বিশ্বাস করাই এমিলির স্বভাব বলে এমিলি কথাটা বিশ্বাস ক'রল। খুবই
স্ত স্বরে বলল, বই বিশেষ আমি পড়িনি। তোমাদের দেশ সম্বন্ধে তো একটাও
ড়িনি, তবে শুনেছি। অনেকেই তো ওখানে যায় তাদের কাছে শুনেছি। এই
া উনিও ছিলেন গল্প কি ওঁর কাছেই কম শুনেছি।

কথাটা শুনে সৌগত বিস্ময়ে প্রসেনজিৎকে বলল, একি প্রসেনদা, আপনি
া খুন ক'রতে পারেন দেখছি। এইসব কথা বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি আপনি
কে এদেশে আনায় উৎসাহ দিয়ে থাকেন তবে তো আপনি মানুষ খুনের কাজ
'রেছেন—

সৌগতর রহস্য বুঝতে পেরে প্রসেনজিৎ স্মিত হেসে বলল, সত্যি কথাটা
ললে দেশের লোকে আমার ওর ক্ষেপবে। তবে তোমাকে বলেই বলছি। এরকম
রণা হতে পারার মত কোন কথা আমি বলেছি বলে মনে পড়ে না।

এমিলি তাড়াতাড়ি বলল, না না উনি বরং এখানে আসবার ব্যাপারে খুবই
াপত্তি ক'রেছিলেন। আমিই জোর ক'রে এসেছি এবং আমার এ ধারণা নিজস্ব।

সৌগত জানতে চাইল, এ ধারণা তোমার হ'ল কি ক'রে ?

এমিলি একটু ভাবল। তার দুই চোখে কেমন অন্যমনস্কতা ফুটে
ঠল। ক্ষণিকের সেই অন্যমনস্কতায় সে যে কি ভাবতে চেষ্টা ক'রল কেউ
া বুঝল না, এমন কি প্রসেনজিৎও নয়। সকলে কেবল তাকে বলতে শুনল,
ই যে দ্যাখ আলো, যেই জ্বালিয়ে দিক না চোখ যাদের থাকে তাদের সকলেরই
চাখে পড়ে। জ্বলবার পর কে জ্বাললো সেটা যেমন বিচার্য হয় না আমার এই
রানাকেও তুমি সেইভাবে নিতে পার।

সৌগত ইচ্ছে ক'রেই ঢোঁক গিলল, এবং সকলকে দেখিয়ে মুখভঙ্গীও একটু
ক'রল যার ব্যাঞ্জনা কেউ না বুঝলেও প্রসেনজিৎ হাসল। সৌগত আর কিছু
বলল না। আলোচনা গভীর বিষয়ে চলে গেলে সৌগত বরাবরই থেমে যায়।
তাছাড়া কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা বেশীক্ষণ সে সহ্য ক'রতে পারে
না। তার কেমন বিরক্তি এসে যায়। সে হালকা কথাবার্তার আসর পছন্দ
করে, কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে দ্রুত যাতায়াত করাই তার
অভ্যাস। মেমসাহেবরা প্রজাপতির পাখার মত হয় বলেই সৌগতর এতাবৎ
কালের ধারণা, কিন্তু এই এমিলি নামক মেমসাহেবএর কথা শুনে তার

রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ল। কলেজ জীবনে নীলা বলে একটা মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব বেশ গাঢ়ভাবেই জমে উঠেছিল তার। নীলা একদিন রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা উপহার দিয়ে বলছিল, বইটা তোমার কেমন লাগল পড়ে আমাকে পরশুদিনই বলতে হবে। তখন বয়েস ছিল কাঁচা, মন তখন ভ্রমরের মত তাই নীলাকে তুষ্ট করার অভিলাষে সেই রাত্রেই 'শেষের কবিতা'র ঘাড় মটকে ধরে এমন এক প্যাঁচে পড়েছিল যে জীবনে আর কখনও রবীন্দ্রনাথের মুখ দর্শন করেনি সে। এমন শক্ত বই যে বাংলা ভাষায় হতে পারে, তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল বাংলা অক্ষরগুলো অন্য কোন ভাষায় লিখে রেখেছে। এতদিন পরে সেই বইটার কথা মনে পড়ল সৌগতর, এমিলির কথাগুলোও যেন সেই বইটারই মত। সেইরকমই ভারী ভারী —। এ আবার কেমন মেমরে বাবা! ওদেশে আবার বই-টই লিখত না তো, নাটক নভেল দরকার নেই আর কথা বাড়িয়ে। আবার কি কথা বলে বসবে যার জবাব দেওয়া যাবে না!

প্রসেনজিৎ বলল, জান সৌগত, ওদেশে অনেক ছেলেই যায়। পড়তেও যায় সবাই কিন্তু এমনই সে দেশ যে সবাই বদলে যায়। সব্বাই।

কথাটা শুনে এমিলি প্রতিবাদ ক'রে উঠল, সবাই নয়। আমি এমন লোকও দেখেছি যে বদলায়নি। ঠিক তোমাদের দেশে যে লোকগুলোকে একবারে তোমাদের দেশের মত দেখছি, তাদেরই মত ওখানেও থাকতে দেখেছি।

ব্যাপারটা সৌগত ঠিক বুঝল না, বুঝল না প্রসেনজিৎও। তবু সে স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে বলল, থাকতে পারে। তবে সে খুবই কম। অত্যন্তই সামান্য।

সৌগত এই আলোচনায় আদৌ উৎসাহ বোধক'রছিল না। কে কি করে না করে এনিয়ে আলোচনা করাটা সে বরাবরই অপ্রয়োজনীয় মনে করে। কিন্তু এমন কোন কথাও পাচ্ছে না যা দিয়ে এসব গম্ভীর আলোচনার ধারা সে উড়িয়ে দিতে পারে। রুমি যদি এ সময় ঘরে এসে ঢুকত তবু না হয় নতুন কোন প্রসঙ্গ এনে হাজির করা যেত। তাও আসছে না।

প্রসেনজিৎ বোধহয় সৌগতর অস্বস্তিটা বুঝতে পেরেই বলল, তুমি তো ভালই আছ বলে শুনি, এখানে কি সরকারী অফিসে বেতনহার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে ভাল?

সৌগত সামান্য একটু হকচকিয়ে গেল প্রসেনজিৎ-এর সরল প্রশ্নে। সেটুকু সামলে নিয়েই সে বাধো বাধো ভাবে বলল, না মানে তা ঠিক নয়। তবে সব রকমই আছে আর কি।

রুমি বলছিল তুমি নাকি গাড়ী কিনছ? এখানে তো যা দেখি গাড়ী কিনতে পারা বেশ কঠিন ব্যাপার।

সৌগতর দুর্ভাগ্যের জন্যেই হয়ত ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল বিশ্বজিৎ। সে কথাটা শুনতে পেয়েছিল বলেই বাংলায় বলল, সৌগতর টাকার অনেক

পথ আছে। বেচারীর অসুবিধে হচ্ছে এই যে, যে সব টাকা ও পায় তা খরচ করা কখনো কখনো অসুবিধের হয়ে দাঁড়ায়। সামান্য একটু হেসে বলল, এই দ্যাখ না বেচারী গাড়ী কিনবে কিন্তু নতুন গাড়ী কেনবার উপায় নেই। ক্ষমতা থাকতেও পুরোনো গাড়ীতে চড়তে হবে।

প্রসেনজিৎ একথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে বলল, কেন?

ওসব অনেক ব্যাপার এদেশে আছে। তুমি সেসব বুঝবে না। বুঝবে যদি এখানে বরাবরের জন্যে থেকে যাও।

রহস্যজনক কিছু বুঝেও প্রসেনজিৎ চুপ ক'রে রইল। বিশ্বজিৎ সৌগতর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চোখের ইশারা ক'রল। সৌগত যে বিশ্বজিৎ-এর কথার গুরুত্ব দেয় নি সেটাও সে বুঝিয়ে দিল পাল্টা এক ইশারায়।

ওদের ইশারা দেখে হেসে উঠল এমিলি। বিশ্বজিৎ তাকে ইংরাজীতে বলল, সিনেমা দেখতে যাবে?

বাংলা ছবি হলে যাব, এমিলি জানাল।

বাংলা ছবি তো তুমি কিছু বুঝবে না, বিশ্বজিৎ বলল।

না বুঝি তো কি হয়েছে দেখি-ই না।

ইংরিজী ছবির তুলনায় কিছুই না। দেখে তুমি মোটেই আনন্দ পাবে না।

সৌগত এমিলিকে এবং প্রসেনজিৎকে শুনিয়েই বিশ্বজিৎকে বলল, বাংলা ছবি এখনও অনেক পেছিয়ে আছে।

বিশ্বজিৎ বলল, এখন কিছু কিছু ভাল ছবি হচ্ছে। দেবু বলছিল 'ইন্টারভিউ' বলে যে ছবিটা এসেছে সেটা নাকি খুব উঁচুদরের ছবি। ও তো ডি সিকা, ত্রুফো, বার্গম্যানের ছবির সঙ্গে তুলনা ক'রলে মৃণাল সেন-এর এই ছবিটির।

দেবু একটু বেশী বলে, সৌগত মন্তব্য ক'রল।

তা যা-ই হোক ও কিন্তু ছবি বোঝে। ওর মতামতের দাম আছে।

প্রসেনজিৎ জানতে চাইল, এ কি মানুর ভাই দেবু? মানু এখন কোথায়?

মানুদা আমেদাবাদে।

দেবু কি ক'রছে?

ও এখন পুণার ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে পাশ ক'রে এসে নিজে কিছু করবার চেষ্টা ক'রছে।

বাঃ। প্রশংসার স্বর ফুটে উঠল প্রসেনজিৎ-এর কণ্ঠে।

এমিলি এদের কাউকেই চেনে না, তাই এই সব আলোচনার রেশ সে ধরতে পারে না বলে চুপ ক'রে থাকে কিন্তু উৎসুক ভাবে শোনে, মনে রাখতে চেষ্টা করে সম্পর্ক এবং চিনে রাখতে চেষ্টা করে সকলকে।

দেবুর কথা ছাড়, সৌগত বলল, ছবি দেখতেই যদি যাব তবে সে আনন্দের জন্যে। ওখানে বসে ভাবতে যাব কেন? কি বাবা তোমরা সব বল কিছু বুঝি না। সেবার দেবুর কথা শুনে ডি-সিকার একটা ছবি দেখতে গিয়ে কি বিরক্তি লাগল কি বলব। তিনটে টুকরো টুকরো ছবি।

ওই সব ঘোড়ার ডিম না দেখে রক-এন-রোল বা ক্যান ক্যান-এর মত মজাদার একটা ছবি দেখলে অনেক আনন্দ পাওয়া যেত।

ও ঈশ্বর! এমিলি যেন মুখ ফসকে বলে ফেলল।

বিশ্বজিৎ বলল, যার যেরকম ভাল লাগে। অবশ্য সত্যি কথা বলতে কি নাচগানের ছবি ভাল লাগে সকলেরই তবে সত্যিকারের ভাল ছবি যাকে বলে সে তো আর ওগুলো নয়। যাকগে এখন তোমাদের আলোচনার থেকে আমি বিদায় নিই। আমার একটু কাজ আছে, তুমি ব'সো সৌগত।

প্রসেনজিৎ স্ত্রীর ইচ্ছাকে মূল্য দেবার জন্যেই যেন জিজ্ঞেস ক'রল, এখন ভাল বাংলা ছবি কোথায় হচ্ছে?

রুমি বলতে পারে।

এমিলি উৎসাহিত হয়ে বলল, ডেকে আনব রুমিকে?

ডাক, প্রসেনজিৎ বলল।

এমিলি যাবার আগেই এসে ঢুকল রুমি। এমিলি তাতে ছোট ছেলের মত খুশী হয়ে উঠে বলল, ওই এসে গেছে।

কি, রুমি জানতে চাইল।

আমিই খুঁজছিলাম। ভাল বাংলা ছবি কোন হলে হচ্ছে বলতো, প্রসেনজিৎ জানতে চাইল।

ভাল ছবি—ভাবল রুমি, তারপর বলল, কেন মেট্রো কি লাইট হাউসে চলে যাওনা—।

এমিলি বাংলা ছবি দেখতে চাইছে—

বাংলা ছবি তো কিছুই বুঝবে না—

তবু দেখবে।

এমিলি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

রুমি ভেবে পেল না কি ছবির নাম সে বলবে। 'জীবনসঙ্গীত' ছবিতে হোটেলের নাচগান বিলিতি ধরণের সমস্ত ব্যাপার দেখিয়েছে। এমিলির ভাল লাগতে পারে মনে ক'রে বলল, উজ্জ্বলায় একটা ভাল ছবি হচ্ছে।

উজ্জ্বলা। সৌগত যাবে নাকি? প্রসেনজিৎ জিজ্ঞাসা ক'রল।

রুমির দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে সৌগত বলল, না আমি আর যাব না। সিনেমা থিয়েটার আমার বিশেষ ভাল লাগে না।

তৈরী হয়ে নাও চল তিনজনেই যাই।

আমার আজকে শরীরটা বিশেষ ভাল নয়।

তাতে কি গিয়ে তো শুধু বসে থাকা—

আজ থাক আমি অন্য দিন যাব। আজ তোমরা দুজন যাও।

তবে তাই হোক। আমরাই যাই। তাড়াতাড়ি নাও।

প্রসেনজিৎ এমিলিকে নিয়ে অল্পক্ষণবাদেই বেরিয়ে যেতে রুমি এসে

জাঁকিয়ে বসল সৌগতর সামনে, বলল, বাঁচা গেল।

কেন? সৌগত একটা ইংরাজী সাপ্তাহিক দেখছিল, সেটা নামিয়ে রেখে চোখ তুলে জানতে চাইল, বাঁচা যাবে কেন, আর এতক্ষণই বা মরে ছিলে কি ক'রে?

এই যে কি এক মেম বিয়ে ক'রে দাদাটা নিয়ে এসেছে না, তোমাকে কি বলব। এ এক অদ্ভুৎ মেয়ে বাবা! রোজ আমাকে বলবে শাড়ী পরা শিখিয়ে দাও। সিনেমা দেখতে যাবে বলে বলে শাড়ী পরিয়ে দাও।

তাই না কি! সৌগত আশ্চর্য হ'ল কি আশ্চর্য হবার ভাণ ক'রল সে নিজেই সেটা ঠিক বুঝতে পারল না।

আর বল কেন। কোথাও যেতে হলেই বলবে, শাড়ী পরা দেখিয়ে দাও। আমি না হয় পরিয়ে দিলাম রাস্তায় খুলে গেলে কি ক'রবে? —বলেই খুব একচোট হাসল রুমি। হাসল তার সঙ্গে সৌগতও।

আমি বাপু এমন মেম-এর গল্প জীবনে শুনিনি।

আমিও না। তবে ওদের মন খুব ভাল হয়। ওর একসেট গয়না ছিল ঠিক হীরের মত। কি সুন্দর তোমাকে কি বলব অথচ আমাকে দিয়ে দিল।

হ্যাঁ ওদের মন ভাল হয়।

তোমার দাদা কি আর অমনি বিয়ে ক'রেছে? অনেক পেয়েছে তবেই ক'রেছে—ঠাট্টা ক'রল সৌগত। তাতে ক্ষুব্ধ হ'ল রুমি, বলল, ওদের দেশে বিয়েতে মোটেই টাকা দেওয়া নেওয়া হয় না। আর আমার দাদা মোটেই তোমার মত টাকার লোভ করেনি।

আমি কি টাকা পাবার লোভ ক'রে বসে আছি? তুমি জান?

যদি টাকা পাবার লোভ ক'রে নেই তো এমন চুপ ক'রে আছ কেন? ব্যবস্থা কিছু ক'রছ না কেন? আমি কি আর কিছু বুঝি না?

কি তুমি বোঝ শুনি?

তুমি অপেক্ষা ক'রছ কবে আমার বাবা মা তোমাদের বলবেন আর তোমার বাবা জানাবেন এত দিতে হবে। আমি ওসব কায়দা অনেক জানিহে মশায়।

সৌগত একচোট হেসে বলল, তুমি তো তবে খুবই জান দেখছি।

হ্যাঁ হে মশায় মুখে কি আর কেউ স্বীকার করে? তবে আমিও বলে রাখি তোমার অপেক্ষা করার কোন দরকার নেই। মার কাছে আমি কথা আদায় ক'রে নিয়েছি আমার বিয়েতে বাবাকে কুড়ি হাজার টাকা খরচ ক'রতে হবে।

সৌগত ঠাট্টা ক'রে বলল, খরচ না হয় কুড়ি হাজার হ'ল আমি তাতে কি পাব? তাছাড়া কুড়ি হাজার আবার এমন কি টাকা। তোমার বাবারমত একজন লোকের তো পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করা উচিত একমাত্র মেয়ের বিয়েতে।

রুমি একটু হকচকিয়ে গেল সৌগতর কথা শুনে, পরেই বলল, তোমার নিজেরই তো কতটাকা, আবার আমার বাবার টাকা দিয়ে কি হবে ?

তবে বলছ কেন আমি টাকার লোভে বসে আছি ? আমি কি বলি, আর তুমি কি বোঝ। তোমার দাদা অনেক টাকা পেয়েছে কি আমি বলেছি ? পাওয়ার মানে কি শুধু টাকা পাওয়া ? টাকার জন্যে কি বিয়ে ? তবে পাবার জন্যে বিয়ে নিশ্চয়ই—বলেই চোখের ইঙ্গিতে এমন একটা কিছু দেখাল যাতে রুমি ভৎ´সনা ক'রল, যাঃ তুমি ভারী অসভ্য।

কেন ?

তোমার ইশারা বুঝি আর কেউ বোঝে না ?

এখানে আর আছে কে ?

কে কখন এসে পড়ে, চল আমার ঘরে যাই।

চল।

নিজের ঘরে ঢুকেই সৌগতর গলা জড়িয়ে ধরে চট ক'রে তাকে একটা চুমু খেয়ে নিল রুমি। পরক্ষণেই রুমি একসেকেণ্ড ব'সো আমি চায়ের কথা বলে আসি, বলে লঘুচ্ছন্দে বেরিয়ে গেল।

সৌগত পকেট থেকে সিগারেট বের ক'রে ঠোঁটে লাগিয়ে অন্য পকেটে হাত দিয়ে দেখল দেশলাই নেই। দেশলাইটা গেল কোথায় ? মনে পড়ল ঠিকাদার ঘোষ সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়েছিল সেই তাহ'লে কথায় কথায় নিয়ে গেছে। নাঃ শালারা একভাবে না একভাবে ঠকাবেই—সিদ্ধান্ত ক'রল সৌগত।

রুমি ঘরে ঢুকতেই সৌগত বলল, আচ্ছা তোমার দাদা তো নিশ্চয়ই ওখানকার মাল কিছু সঙ্গে এনেছে, একটু খাওয়াতে পার ?

মাল মানে ? রুমি বুঝতে না পেরে জানতে চাইল।

মাল মানে ? এঃ তুমি একবারে কিচ্ছু না। মাল মানে অনেক কিছু —হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, রাম, জিন যা হোক কিছু। আবার মাল মানে তোমরাও। তবে আপাততঃ ওইসব একটা কিছু আমেরিকান জিনিষ যদি আনা থাকে তবে একটু খাওয়ালে ভাল হয়।

না বাবা ওসব দাদা কি এনেছে না এনেছে জানি না।

তবে আর কি পারলে, একটা কাজ কর তাহলে, একটা দেশলাই আনো সিগারেটটা ধরাই।

সেটা বরং এনে দিচ্ছি, বলেই বেরিয়ে গিয়ে একটা দেশলাই এনে দিল রান্নাঘর থেকে। সৌগত ইংরাজীতে ধন্যবাদ জানিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে রুমির মুখ চোখ জড়িয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। হাতের পাঞ্জা দিয়ে পাখার মত বাতাস ক'রে ধোঁয়াগুলো উড়িয়ে দিতে দিতে অন্য অনেক দিনের মতই রুমি অনুভব ক'রল সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে ভারী স্বাদু একটা গন্ধ জড়িয়ে থাকে।

রুমির দিকে তাকিয়ে সৌগত ডাকল, এই!

তার চোখে কোন অনুরাগ বা কোনরকম ভাবেরই প্রকাশ ছিল না তাই ডাকটা যেন হুকুমের মতই শোনাল। রুমির কিন্তু সেসব মনে হ'ল না কারণ সৌগতর স্বভাবই এইরকম। কোন আবেগ কখনও তার মধ্যে দেখা যায় না। রুমি সৌগতর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতেই সৌগত অনেকটা হ্যাঁচকা টানে তাকে নিজের শরীরের ওপরে ফেলেই নিজের বাঁ বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গেই বিছানার ওপর বসে পড়ল।

সৌগতর এবং রুমির শারীরিক গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে এমনি অবস্থায় রুমিকে বিড়ালের মুখে ধরা পাখীর মত দেখায়। তেমনি ম্লান স্বরে চিঁ চিঁ ক'রে রুমি বলতে চেষ্টা ক'রল, কি হচ্ছে কে এসে পড়বে ভারী লজ্জায় পড়তে হবে।

সেকথা গ্রাহ্য না ক'রে সৌগত আরও একটু বেশী চাপ দিয়ে বলল, এ ঘরে এখন কেউ আসবে না।

কথাটা রুমিও জানে বলে প্রতিবাদ ক'রল না। নিজেকে সে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টাও ক'রল না। সৌগতর বাহুবেষ্টনের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র অনুভূতি আছে যা অতি মনোরম। ওর দেহের একটা স্বাদ আছে যা রমনীয়। এবং রুমি অনুমান করে যে একই স্বাদ ওর দেহ থেকে সৌগতও লাভ করে নইলে সে-ই বা ওকে এমনি করে আকর্ষণ করে কেন? কিন্তু একটা জিনিষই রুমি বুঝতে পারে না যে এতই যদি আকর্ষণ তবে সৌগত এই স্বাদ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার জন্যে যে ব্যবস্থা করার দরকার তা ক'রতে এত দ্বিধা করে কেন? এত কথা সে বলে অথচ একবারও বিয়ের ব্যাপারে পাকা কথা কখনও বলে না!

রুমি যখন এইসব ভাবছিল ঠিক সেই সময় মুখ থেকে সিগারেটটা নামিয়ে সৌগত বলল, জান রুমি বাড়ীতে সকলের সঙ্গে একসঙ্গে থাকাটা অত্যন্ত অসহ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে দিনে দিনে —।

কেন?

দশজনের দশরকম ঝামেলায় ভাল লাগে না। তাছাড়া নিজের স্বাধীনতাও থাকে না। তাই একটা একঘরের ফ্ল্যাট নিয়ে নিলাম পার্ক স্ট্রীটে। সামনের মাস থেকে সেখানেই থাকছি।

তোমার বাবামা—

সিগারেটে-এ টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সৌগত নিঃশব্দে।

রুমি-ই আবার বলল, ভাই বোনেদের মধ্যে তুমিই তো বড়।

হ্যাঁ।

তুমি বাড়ী থেকে চলে গেলে অসুবিধে হবে না?

কিছু না। বাড়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো শুধু রাতে ঘুমোনো। বরং আমার ঘরখানা খালি পাবার জন্যে তাদের অনেক সুবিধেই হবে।

তুমি যে থাকছ না একথা তোমার বাবা মা জানেন ?

আর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে বলল, না। তবে কানাডা, কেনিয়া, ইংলণ্ড থেকে শুরু ক'রে কলকাতার বাইরে পৃথিবীর যে কোন একটা জায়গায় যে যাবার চেষ্টা ক'রছি এ সকলেই জানে। আপাততঃ পার্ক স্ট্রীট যাচ্ছি সেটাই শুধু তাদের জানাতে বাকী।

বলে যাবে তো ?

পালিয়ে যখন যাচ্ছি না তখন বলেই নিশ্চয় যাব।

আগে থেকে বলবে না ?

আমি জিনিষটাকে এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে ক'রছি না।

কিন্তু ডিসেন্সি—অর্থাৎ সৌজন্য যাকে বলা হয়—

এতে ডিসেন্সির ঘাটতি হচ্ছে আমি মনে করি না।

রুমি দেখল এ প্রসঙ্গে বেশী আলোচনা আর না করাই বোধহয় ভাল কারণ সৌগতর জবাবগুলো ক্রমাগতই নিষ্প্রাণ এবং দায়সারা গোছের হয়ে যাচ্ছে। তাই সে বলল, তোমাদের বাড়ীর ব্যাপার এর মধ্যে আমার মাথা না গলানোই উচিত।

সৌগত একথার কোন প্রত্যুত্তর ক'রল না। অন্তত সৌজন্য রক্ষার জন্যেও যেটুকু বলা আবশ্যক ছিল তাও সে বলল না। সেই সুক্ষ্ম ব্যাপারটা অবশ্য লক্ষ্য ক'রল না রুমি, সে ভাবছিল আলাদা থাকা এবং নির্ঝঞ্ঝাট সংসার তার নিজেরও পছন্দ। এ বরং একদিক থেকে ভালই হ'ল বিয়ের পরে আলাদা হ'লে তার যে বদনাম হ'ত এখন আর সেটা হবে না। সে বলল, ফ্ল্যাটটা আমায় দেখাবে না ?

নিশ্চয়ই। তুমি যাবে বলেই তো এখন নেওয়া, সৌগতর এই উত্তরে রুমির মনের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। খুশীতে নেচে উঠল হৃদয়। এই তো। এই একটা কথার জন্যে সে যেন এতদিন প্রতীক্ষা ক'রে আছে। মিলনের কথা অনেকদিন অনেকভাবেই বলেছে সৌগত কিন্তু এরকম সরল উদারভাবে ঘর করবার কথা বলে নি কোনদিন। এমন ঋজু স্পষ্ট আহবানে তার নারীসত্ত্বা যেন ধন্য হ'ল। কথাটা বারবার শুনতে চাইল। তাই সে জানতে চাইল, সত্যি ! কবে নিয়ে যাচ্ছ বল ?

আমি ওঘরে গিয়েই তোমায় নিয়ে যাব।

মনে মনে হাততালি দিয়ে উঠল আনন্দে। তারপরই বলল, আমি কিন্তু কথাটা আজই মাকে বলে রাখব।

সৌগত সম্মতি-অসম্মতি কিছুই জানাল না। এটা সৌগতর স্বভাব বলে রুমি সে নিঃশব্দতাকে ইচ্ছার প্রকাশ মনে ক'রেই কাজ ক'রে যায়। মার কাছেও কথাটা আজ রাত্রেই বলবে স্থির ক'রল। মা ঠিকই বলে সৌগতর মত ছেলে হয় না। আজকালকার দিনে এরকম ছেলে কমই পাওয়া যায়। যেমন আয় করে সেই রকম সখ-বেশ-ও আছে। টাকা

আয় করা আর রুচি থাকা দুটো আলাদা জিনিষ। মা এই কথাটা বারবার বিশেষ জোর দিয়ে বলে। এই জন্যে যথেষ্ট বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও অমলকে মা বিশেষ পাত্তা দেয়নি। পরোক্ষে তাকে বুঝিয়েই দিয়েছে এ বাড়ীর সঙ্গে তার খাপ খাবে না। নইলে অমলও কম সুশ্রী ছিল না। পোষাক পরিচ্ছদও তার দেখবার মতই ছিল। নিজে কাজ কিছু করে না বটে কারণ সে প্রয়োজনও তার নেই। মাসে দশ হাজার টাকা বাড়ী ভাড়া পায় তার বাবা। বিখ্যাত এটর্ণী ছিলেন তার ঠাকুর্দা—সেই রোজগারেই তিন পুরুষ সুখে দিনাতিপাত ক'রছে। একমাত্র ছেলে হিসেবে সমস্ত সম্পত্তিই একা পাবে অমল। এত কিছু জেনেও মা যখন পাত্তা দিল না তাকে তখন রুমি কিন্তু মনে মনে একটু ক্ষুব্ধই হয়েছিল, কারণ পরিচিত চক্ষুর আড়ালে ইতিমধ্যেই কয়েকদিন অমল-এর দুর্দ্ধর্ষ মোটরসাইকেলের পেছনে বসে শহর থেকে দূরের জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে শুদ্ধ বাতাস খেয়ে এসেছিল সে। দেহে না হলেও মনে স্বাদ পেয়েছিল অমল-এর পৌরুষ অভিনন্দনযোগ্য। আজ কোন ক্ষোভই তার রইল না। সত্যিই মার দূরদর্শিতা অভাবনীয়। অমনি কি আর বাবার মত অমন জাঁদরেল মানুষ মা-কে খাতির ক'রে চলে!

আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিল রুমি। কি ক'রবে কি বলবে স্থির ক'রতে পারছিল না। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস ক'রে বসল, ঘরটা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর?

ঘর কেন বলছ? একঘরের ফ্ল্যাট।

তবে তো নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হবে —। গাড়ী কিনলে রাখবে কোথায়?

গ্যারেজ আছে তখন ভাড়া নিয়ে নেব।

রুমি আর কথা খুঁজে পেল না। মনে মনে তার ছোট্ট সংসারের নক্সা আঁকতে লাগল। কখন কি ক'রবে কিভাবে সাজাবে ঘরখানাকে এইসব চিন্তায় তার মন ভরে রইল। আবার তার মা-র কথা মনে হ'ল। বেগবান মোটর সাইকেলের শব্দে রুমির মনেও বোধহয় তালা লেগে যাচ্ছিল। মা সেসময় ঠিকই করেছিল, সৌগতই বা কম কিসে? ওদের বাড়ীভাড়ার আয় নেই বটে কিন্তু ওর বাবার বিশাল ব্যবসা। বজবজের ওদিকে কোথায় যেন বিরাট কারখানা। আরও কিসের কিসের যেন ব্যবসা আছে, মা জানে। প্রত্যেক ছেলে মেয়ে এমনকি সৌগতর মার নামেও শেয়ার ভাগ করা আছে। অমলদের মত সৌগতর বাবারও গাড়ী আছে, নিজেদের বাড়ীতেই বাস করে সৌগতরা, কাজেই কমটা কিসে? উপরন্তু নিজের ক্ষমতায় সৌগত সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বোপার্জনে সে নিজেকে গড়ে তোলবার সাহস রাখে। ইনজীনিয়ার সে, আশা রাখে ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রবে। কাজেই যোগ্যতরকেই বরণ ক'রেছে রুমি, ক'রতে পেরেছে মায়েরই জন্যে!

সে যখন এইসব ভাবছে তখনই সৌগত বলল, চল কোথাও যাওয়া যাক।

কথাটা বাবার কাছেই, এবং সরাসরি নিজেই উত্থাপন ক'রল সৌগত। শুভেন্দু সে সময় স্বগতর রেখে যাওয়া ব্যারিস্টারের খসড়া চিঠিটা পড়ছিল। অবশ্য সামনের চেয়ারে আগে থেকে এসে বসলেও চিঠিটা শেষ হতেই সৌগত কথা তুলল, বাবা তোমাকে একটা কথা বলব বলে এসেছিলাম।

কি কথা? শুভেন্দু জানতে চাইল।

আমি কিছুদিনের জন্যে অন্যত্র যাচ্ছি।

অন্যত্র মানে?

মানে এবাড়ীতে আমি থাকছি না—

চশমাটা চোখ থেকে খুলে রাখতে হ'ল শুভেন্দুকে। তারপর বলল, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝছিনা।

আমার কাজকর্মের ব্যাপারে একটু ঝামেলার জন্যে আমি অন্য একজায়গায় একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি।

কারণ আর কিছু আছে কি?

না কিছু নেই।

তবু যেন ব্যাপারটা বোধগম্য হল না শুভেন্দুর। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে বসে থেকে জানতে চাইল, তোমার মা জানে?

এখনও নয়।

কারণটা কেউ জানে?

কারণ কিছুই নেই বাবা। ব্যাপারটা খানিকটা খেয়ালও বলতে পার।

খেয়াল! এরকম উদ্ভট খেয়াল?

সৌগত চুপ ক'রে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল, এটা নেহাৎই সাময়িক ব্যবস্থা। কিছুদিনের জন্যে যাচ্ছি।

সব ঠিক হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

অথচ আমরা কেউই কিছু জানিনা, আশ্চর্য!

সৌগত বাবার কথা শুনে লজ্জিত বা দুঃখিত কিছুই হ'ল না —। ওসব অনুভূতিই তার নেই।

শুভেন্দু বলল জানিনা কি ব্যাপার, তবে সময়টা তুমি ভাল বাছ নি। কারখানার শ্রমিকরা নোটিশ দিয়েছে ধর্মঘট ক'রবে। এসময় আলাপ আলোচনা বা পরামর্শ করার মত একমাত্র তুমিই আছ। দূরে গেলে সেটুকুও হবেনা।

স্বগত তো আছে। আমি আর কতটুকুই বা থাকি? ওরা হঠাৎ ধর্মঘটের নোটিশ দিতে গেল কেন?

ত্রিদিব বলে একটা ছোকরাকে ছাঁটাই করা হয়েছে সেইজন্যে। আমার কারখানা, আমি কাকে রাখব বা ছাড়াব তাতে ওদের কথা শুনতে হবে ?

কেন শুনবে তুমি ? ওসব নোটিশ-ফোটিশ বাজে, সব তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে।

বোধহয় তা নয়। মধ্যে ওরা দুদিন মিটিং ক'রেছে। তাতে ঠিক ক'রেছে যদি না ত্রিদিবকে কাজে নেওয়া হয় তাহ'লে ওরা সামনের মাসের তিন তারিখ থেকে ধর্মঘট ক'রবে।

ক'রবে বললেই হ'ল ?

ক'রলেই বা ক'রছি কি ?

পুলিশের সঙ্গে কথা বলে রাখ পাণ্ডা দেখে কয়েকটাকে য়্যারেস্ট করিয়ে দাও সব সিধে হয়ে যাবে।

আমি থানার অফিসার-ইন-চার্জকে ফোন ক'রেছিলাম। কাল সন্ধ্যেবেলা একজায়গায় বসে আলোচনাও হয়েছে, ওরা বলছে সময়টা বড় খারাপ, নকশালপন্থীদের সামলাতেই সব ব্যস্ত এখন ওরা লেবারের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে রাজী নয়। তাছাড়া এইসব ইউনিয়নওয়ালা পার্টিদের এখন ক্ষেপাতেও পুলিশকে নিষেধ আছে।

তাহলে ? মানুষের ধনসম্পত্তি সব জলাঞ্জলি হবে আর পুলিশ কিছু ক'রবে না ?

ওরা বলছে এখন কিছুদিন থামিয়ে রাখুন, দেশের অবস্থা একটু স্বাভাবিক হলেই এদেরকে ঠাণ্ডা করা যাবে। আসলে ওরা, যা বুঝলাম এখন নকশালদের দমন ক'রতে ব্যস্ত।

আমার মনে হয় তুমি ভালরকম কিছু টাকা দিতে রাজী হলেই ওরা ঠিক ক'রে নেবে। আরও এখন সুবিধে আছে, পাণ্ডাগুলোকে নকশাল বলেও তো ধরে নিতে পারবে—

সে কথা কি আর হয়নি ? পাণ্ডাগুলোর পেছনে যে পার্টির নেতারা আছে। ওরাই তো দাবী ক'রবে নিজেদের লোক বলে। তখন ঝামেলা হবে, সে রিস্ক পুলিশ নিতে চাইছে না।

পুলিশই যদি রিস্ক মনে করে তা'হলে এসব সামলাবে কে ?

আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না। এভাবে কি য়্যাডমিনিস্ট্রেশন চলে ? আমাদের লিগ্যাল য়্যাডভাইসার সন্তোষবাবুকে ব্যারিস্টার দাস-এর সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলাম মিস্টার দাস এই ড্রাফটিংটা পাঠিয়েছেন। তিনি তো বলে দিয়েছেন কারখানায় সাবধানতামূলক একশ চুয়াল্লিশ ধারার জন্যে কোর্টে দরখাস্ত করতে।

সে না হয় হ'ল কিন্তু ধর্মঘটের কি হবে ?

কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পাব। তারপর বুঝব কতদূর কি হবে। স্বগত এসেই বেরিয়ে গেছে, সে না ফিরলে কিছু বুঝছি না।

তোমার পক্ষে কতজন লেবার আছে ?

এখন কাউকেই দেখছি না। ভেতরে ভেতরে কতজন আছে এখনই তা জানাতে পারবো।

যদি দশভাগের একভাগও থাকে তা'হলে স্ট্রাইক সুরু ক'রতে দাও। দু'তিন দিন গেলেই তোমার পক্ষের লোকদের কাজে যোগ দিইয়ে দাও। ব্যাস দেখো আপনি ওদের নার্ভ ফেল ক'রে যাবে।

শুভেন্দু কথা বলল না। পরামর্শটা তার মনঃপুত হ'ল না। আসলে ধর্মঘট হতে দেওয়াটাই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধ। মালিকের সম্মানের ওপর আঘাত বলে তার ধারণা। বন্ধ করার জন্যে যে কোন বুদ্ধি করা উচিত, ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্যে নয়।

সৌগত বলল, আচ্ছা তোমার পুরানো লোকগুলো যেমন, গোলক, নিশাপতি, ইয়াকুব এরা তো সব ঠিক আছে ?

হুঁঃ। শব্দ ক'রল শুভেন্দু, তারপর বলল, সবচেয়ে হারামজাদা ওই নিশাপতি। ব্যাটা বুড়ো হয়ে গেছে এই কারখানায় কাজ ক'রতে ক'রতে কারখানা আমি কেনবার আগে থেকে ও এখানে কাজ করে অথচ ব্যাটা বলে কিনা আমাদের পরিশ্রমে তৈরী কারখানা !

তুমি না লোকটাকে ভাল বলতে।

তাই তো মনে করতাম। ও-ই সবচেয়ে শয়তান। সামনে ও নেই অথচ পেছনে থেকে সমস্ত লোককে যত কুপরামর্শ সব ও-ই দিচ্ছে !

শুনে সৌগত চুপ ক'রে রইল।

ত্রিদিব ছোকরাটার সঙ্গে ওকেও তাড়ানো উচিৎ ছিল, তখন বুঝিনি বলেই তাড়াই নি।

একথার সূত্রে সৌগত যেন আলো খুঁজে পেল, সে বলল, যে ক'টা ওই রকম বদমায়েশ আছে সব ক'টাকে এক সঙ্গে ছাঁটাই ক'রে দাও। একজনের জন্যে ঝুঁকি নেওয়াও যা দশজনের জন্যে নেওয়াও তাই।

ওদের কথার মধ্যেই স্বগত এসে ঢুকল। বলল, অমর এসেছে বাবা।

কই ? এখানে আসতে বল —।

স্বগত বাইরে গিয়ে ডেকে আনল অমরকে। কারখানার সবচেয়ে ফাঁকিবাজ কর্মীদের অন্যতম অমর এসে দাঁড়াতে আগের দিন হ'লে অন্য প্রতিক্রিয়া হ'ত কিন্তু সেই অমরকেই বিশেষ খাতির ক'রে শুভেন্দু জিজ্ঞেস ক'রল, খবর কি ?

অনেক খবর আছে স্যার। খুব বিজ্ঞের ভঙ্গী ক'রে বলবার চেষ্টা ক'রল অমর। আজ সকালে ইউনিয়ন অফিসে মিটিং হয়েছে স্যার। মিটিং-এ নিশাপতিদা আপনাকে খুব একচোট নিলে। বলে, এই কারখানা আমাদের পরিশ্রমেই আজ এতবড় হয়েছে। মালিক তো মূলধন একবারই জুগিয়েছে আর প্রত্যেকদিন কাজ ক'রেছি আমরা। মূলধন দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কি কারখানা এতবড় হয়ে গেছে ? আমরা খাটতে খাটতে দিনে দিনে একে এত

বড় ক'রে তুলেছি অথচ আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি নেই। মালিকের বাড়ী হয়েছে দুখানা, গাড়ী হয়েছে, লক্ষ-লক্ষ টাকা জমা হয়েছে ব্যাঙ্কে—

কথার মধ্যেই শুভেন্দু তাকে থামিয়ে বলল, সঞ্জয় কি বলল?

সঞ্জয় স্যার মিটিং-এ কিছু বলে নি —।

বলেছে। সে-ই প্রথম কথা বলেছে, তুমি তখন যাওনি। তুমি দেরী ক'রে গেছ।

শুভেন্দুর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল অমর, বলল, আপনি স্যার দারুণ লোক। আমরা যা জানি না আপনি স্যার তাও জেনে ফ্যালেন।

শুভেন্দু এই বাজে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, তোমাকে বলা রয়েছে কোন মিটিং তুমি ফেল ক'রবে না এই কি তার নমুনা? যাগকে শোন আমি অতুলবাবকে বলে দিয়েছি তোমার সেই কেসটা তুলে নেবে—মনে আছে তো?

কথাটা শুনে চমকে উঠল অমর, শুভেন্দু লক্ষ্য ক'রেও না দেখার ভাণ ক'রল। কিন্তু মনে মনে অমর অনেক বেশীই চমকেছিল। দিনে দিনে বুঝতে পারছিল বড় ভয়ঙ্কর লোকের পাল্লায় সে পড়েছে। আজ সে সভয় বিস্ময়ে ভাবল তাদের মালিক নামক লোকটির অজানা কি পৃথিবীর কিছুই থাকে না! তার একটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত সংবাদ যা কাকপক্ষীর জানবার কথা নয় তাও সে কি ক'রে এই ভদ্রলোক জেনে বসে আছে এই তো মহাবিস্ময়কর। এর অসাধ্য কি আছে দুনিয়ায়। তার নিমেষের জন্য কৌতূহল হ'ল জানতে চায়, আপনি স্যার এত খবর কি ক'রে পান? —নেহাৎই অসম্ভব বলে কৌতূহল দমন ক'রতে হ'ল তাকে। তবে সে বুঝল নেহাৎ অনর্থক চেষ্টা ক'রছে সঞ্জয়রা, কোন ফল হবে না। যা হয়েছে ত্রিদিব-এর ভাগ্যে তার বেশী কিছু হবে না এদের বেলাতেও, এই বাজারে মাঝখান থেকে চাকরীটা যাবে। চাকরীটা গেলে আর কি একটা চাকরী জোগাড় হবে এই সময়ে। বুঝবে ব্যাটারা, এত লপচপানি সব বেরিয়ে যাবে। নাকখৎ দিয়ে আবার কাজে ঢুকতে হবে ওই ত্রিদিবকে। চাকরী যেখানে ক'রতেই হবে সেখানে কি মালিকের সঙ্গে ঝগড়া করা সাজে। করাটাও তো বেইমানী। এসব কথা বললে বলবে দালাল। আরও কতরকম খিস্তি দেবে! তাই অমর কখনও বলে না। ওদের সঙ্গে মিশেই থাকে। যা ওরা বলে তাতেই সায় দেয়। সেটুকু অনয়াসেই করা যায় কিন্তু মুস্কিল বেধেছে এই কাজই মালিকের মত মতো ক'রতে গিয়ে। মালিক চায় ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে মিশে নেতৃত্বে থাকতে হবে। নেতাদের গোপন বৈঠকের খবরগুলো পর্যন্ত চাই। এ বড় অস্বস্তিকর কাজ। সব সময় ভয় লাগে কখন ধরা পড়ে যায়। আর ধরা একবার পড়লে যে কি হবে তা অমর ভাল ক'রেই জানে। তার নিজেরই সহকর্মীরা পায়ের তলায় পিষে থেঁতলে মারবে তাকে।

মালিকের নির্দেশ এমনই দুর্লঙ্ঘ্য যে যত বিপদজনকই হোকনা মানতে তাকে হবেই। একদিন তো শুধুমাত্র চাকরী রাখার তাগিদ ছিল আজ আবার নতুন কথা শোনালো যে। তার মামলার খবর যে কি ক'রে মালিক জানল কে জানে। ইচ্ছে ক'রলে এই মামলা তুলে যেমন নিতে পারে তেমনি আবার চাপিয়েও দিতে পারে ইচ্ছে ক'রলে। তবে একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে মালিক যখন জেনেই গেছে তখন যদি খুশী হয়ে এ মামলা তুলে নেওয়াতে পারে তো খুবই ভাল হয়, বেঁচে যাবে অমর, শাপে বর হবে। যেভাবেই হোক মালিককে খুশী ক'রে এখন সেই বন্দোবস্তই করাতে হবে।

সৌগত অমর-এর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর ভাবনাগুলো পড়তে চেষ্টা ক'রছিল। সে বুঝতে পারল, বাবার কথা শুনে, হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে গেল অমর। কি মামলার কথা বাবা বলল তা সে-ও জানে না কিন্তু ভীতিপ্রদ কোন ব্যাপার এটা বুঝেই সৌগত আরও বেশী ভয় দেখানোর জন্যে বলল, বাবা তুমি ত্রিদিবকে ছাড়িয়ে দিলেও সে বাইরে থেকে ইনফ্লুয়েন্স ক'রছে। ওকে নকশালপন্থী বলে ধরিয়ে দাও এখন পাঁচ বছর শ্রীঘর বাস তাহ'লে নিশ্চিত হয়ে যায়।

ছেলের কথায় কিছুই বলল না শুভেন্দু। চুপ ক'রে রইল। কিছুক্ষণ বাদে অমরকে বলল, শোন অমর, আজ রাত্রে ইউনিয়নের কয়েকজন বাদল সরকারের বাড়ী যাবে। সেখানে যা কথা হয় জানাবার দায়িত্ব তোমার রইল। তুমি এখন যেতে পার।

অমর বেরিয়ে যেতে স্বগত বলল, বুঝলে বাবা, আমার তো মনে হয় বাদল সরকারের দলের সঙ্গে ইউনিয়ন যতক্ষণ থাকছে ততক্ষণ আমাদের এত ভাববার কোনই দরকার নেই। বাদল সরকার তো নিজেই বলল তাদের দলের হাতে যে সব ইউনিয়ন আছে তাদের মালিকদের কোন ভয় করবার কারণ নেই।

কি ভয়ের কথা বলেছে সেটা খেয়াল ক'রেছ? শুভেন্দু প্রশ্ন ক'রল। তারপর নিজেই জবাব দিল, প্রাণের ভয় নেই। কিন্তু ওদের দলই তো শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে মজুরী বাড়ানোর জন্যে।

সৌগত বলল, আসলে এদের কথায় নির্ভর করা যায় না।

বাদল সরকারকে বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের সঙ্গে যেমন ভাল-মানুষী ক'রছে তেমনি আবার শ্রমিকদের কথাতেও সায় দিয়ে চলছে সমানে। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ক'রতে গেলেই ওর ক্ষমতা থাকবে না। নিজের গদিটাতো বজায় রাখতে হবে—।

স্বগত ছেলেমানুষ। বাপের বিরাট ব্যবসার প্যাঁচে জড়িয়ে বয়সের তুলনায় বদ্ধি তার একটু বেশী প্যাঁচানো হয়ে গেলেও সে তার বয়সোপযোগী কথা বলল, তোমার সঙ্গে যখন কথা বলে মনে হয় সব সমস্যা নিমেষে

সে সমাধান ক'রে দেবে। তোমাকে কোন ঝঞ্ঝাটেই পড়তে দেবে না অথচ—

সবকিছু কি আর নেতাদের হাতে থাকে? তবে আসল জিনিষ যেটা সেটা তাদের হাতেই থাকে, তার নাম লাগাম। সেটা ওরা ঢিল দিলেই ঝামেলা, টেনে ধরলেই ঠাণ্ডা। তবে ব্যাপার কি জান, যে একবার যে কোন পক্ষে বেইমানী করে তার চরিত্র থাকে না। তাকে কখনই বিশ্বাস করতে নেই।

বাঃ আমাদের পক্ষে যারা থাকবে তাদেরও বিশ্বাস ক'রব না? স্বগত জানতে চাইল।

না।

কেন?

সে যখন তার নিজের লোকেদের সঙ্গে বেইমানী ক'রেছে তখন সে আমাদের সঙ্গে বেইমানী যে কোন মুহূর্তেই ক'রতে পারে। তবু এদেরকে দিয়েই কাজ করাতে হবে।

সৌগত কি যেন ভাবছিল। এবার বলল, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।

শুভেন্দু এবং স্বগত দুজনেই তার দিকে তাকাল। সৌগত বলতে সুরু করল, ওরা ধর্মঘট সুরু ক'রলে বেছে বেছে কয়েকজনকে ছাঁটাই কর। তারপর দেখবে ওদের ইসু বদলে যাবে। এখন যে ধর্মঘট ত্রিদিবের জন্যে সুরু ক'রছে তখন সেই ধর্মঘট অন্যদের পুনর্নিয়োগের দাবীতে চলতে থাকবে।

প্রস্তাবটা শুভেন্দুর ভাল লাগলেও তার সেই একই মানসিকতা প্রবল হয়ে রইল। তার মনে হচ্ছিল, এ যেন তার মর্যাদায় আঘাত। তাই সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। সৌগত সেটা বুঝেই বলল, আর একটা ধারণা তোমায় বদলাতে হবে বাবা। ধর্মঘট হলে সম্মান যায় না, বরং সম্মান বাড়ে। দেখবে সরকারী মহলে তোমার গুরুত্ব কত বেড়ে যাবে।

সত্যিই চিন্তাধারাটির সঙ্গে পরিচয় ছিল না শুভেন্দুর। ভালও লাগল, কিন্তু মনের সঙ্গে গ্রহণ করা গেল না কিছুতেই। ছেলের কথা উপেক্ষা ক'রতে না পেরে বলল, দেখা যাক ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। কাল বোঝা যাবে। অর্থাৎ ধর্মঘট বন্ধ করা না গেলে তবেই এপথ তিনি নেবেন।

স্বগত বাবার মনোভাব বুঝতে পেরে বলল, তুমি বাবা ঝামেলা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে শুধু শুধুই কিছু বাজে লোককে সুযোগ নিতে দিচ্ছ। আজকাল ইণ্ডাস্ট্রিতে ঝঞ্ঝাট না ক'রলে ঝঞ্ঝাট এড়ানো যায় না। মিস্টার তালুকদার তো দেখলে কেমন নিজেই শ্রমিকদের খুঁচিয়ে স্ট্রাইক করিয়ে লক আউট ক'রে দিল। এখন তো শোনা যাচ্ছে বিনাসর্তে কাজে যোগ দিতে শ্রমিকরা রাজী আছে।

তালুকদারের কি? ওর তো পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। ওর কোম্পানী

গেলেই বা কি থাকলেই বা কি? দুটো কারখানা বিক্রি ক'রে দিলে, এটাও থাক না থাক ওর এসে যায় কি তাতে? নিজে তো আর কষ্ট ক'রে গড়ে নি —

স্বগত একথার কোন প্রতিযুক্তি উপস্থাপিত ক'রতে পারল না। বিরাট একটা প্রতিষ্ঠানকে নানা মতলবে আসল ওয়ারিশদের ফাঁকি দিয়ে তালুকদার কিভাবে দখল ক'রেছে স্বগতও তা শুনেছে! সেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ লক্ষ টাকা কিভাবে নিজের খেয়াল মেটাতে ওড়ানো হয়েছে সে কথাও প্রায় কিংবদন্তী। তাই বাবার কথা স্বগত অস্বীকার ক'রতে পারল না। কিন্তু বেয়াদব 'লেবারদের' জব্দ ক'রতে হ'লে অমনি সবই করতে হয়। এদিক দিয়ে বাবা যেন একটু প্রাচীনপন্থী। আজকাল ইউনিয়নওয়ালা পার্টিগুলো শুধু ছোটলোকগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে চায়। মুখে সব বাঘ মারে, কাজে যে কত সৎ তা তো এক ওই বাদল সরকারকে দিয়েই বোঝা যাচ্ছে। সব সরকারই সমান। তাদের একজনকে দেখবার সুযোগ হয়েছে, অন্য লোকে দেখেছে অন্য নেতাকে।

শুভেন্দু হাতের চিঠিখানা পড়তে সুরু করায় সৌগত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শুভেন্দু স্বগতকে বলল, বাদল সরকারকে কিছু জানতে না দিয়েই ওদের পার্টির বড় নেতাদের হাতদিয়ে পার্টিফাণ্ডে কিছু চাঁদা দিয়ে দিতে পারলে ভাল হ'ত। ওদের লীডার সোমেনবাবু তো ব্যারিস্টার, মিস্টার দাস-এর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় নিশ্চয়ই আছে। ওকে বললে কাজ হয় না কি?

স্বগত বলল, শুধু শুধু চাঁদা দিতে গেলে নেবে কেন? সন্দেহ ক'রবে না? বরং সরকারকেই পার্টি ফাণ্ডের চাঁদা বলে পাঁচহাজার টাকা দিয়ে দাও সে সেই টাকা যা করে করুক।

তা দিলেও বাদলকে কিছু দাবী আদায় ক'রে দিতেই হবে, নইলে শ্রমিকরা ছাড়বে না। অথচ যদি ওপর থেকে কোন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় তো পার্টির ইমেজ-এ শ্রমিকরা কোন উচ্চবাচ্য না-ও ক'রতে পারে। তার পরেও যদি দু-চারজন লাফালাফি করে তো তাকে নকশালপন্থী বলে পুলিশের হাতে তুলে দিলেই মিটে যাবে।

স্বগত মনে মনে স্বীকার ক'রতে বাধ্য হ'ল বাবার বুদ্ধি তারিফ করবার মতই বটে। নইলে কি আর নিজের চেষ্টায় এতবড় কারখানা গড়ে তোলা যায়? কিন্তু এতকিছুর মধ্যেও একটাই দোষ বাবার—কৃপণতা। একটা পয়সা হাত দিয়ে গলে না। বন্ধুবান্ধবদের কাছে মুখ রাখা যায় না এইজন্যে। তারা বলে, তোর মত ইণ্ডাস্ট্রি আমাদের থাকলে জীবনটাকে ভোগ করে যেতাম। তাছাড়া সবাই কত টাকা খরচ করে সে-ই কেবল পেরে ওঠে না। মা তবু দুঃখটা বুঝে বিশ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ইজ্জতটা বাঁচায় নইলে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ অনেকদিন আগেই ছাড়তে হ'ত। তবে মা-র দানের সাধ্য

তো অত্যন্তই সীমিত বলে অনেকবারই মা-র কাছে অনুযোগ ক'রতে হয়েছে, আচ্ছা মা, তুমিই বল এত টাকা যদি সময় থাকতেই কিছু কাজে লাগাতে না পারলুম তো বুড়ো হয়ে পেয়ে ক'রব কি? একটি পয়সা বাবা দেবে না—

ব্যাপারটা বোধহয় মায়েরও মনে লেগেছিল যার জন্যে মা একদিন জানালেন, তোমার বাবা চান তুমি অন্ততঃ তাঁর ব্যবসা দেখ। তোমার দাদা তো নিজেদের ব্যবসা দেখল না তুমিও যদি না দেখ তাহ'লে চলে কি ক'রে?

অনেকটা আদুরে ছেলের স্বরে মায়ের ছোট ছেলে স্বগত বলেছিল, আমার বয়সী কোন ছেলে কি ব্যবসা করে মা? তোমারও বুদ্ধিটা বাবার মতই হয়ে গেছে —।

আমার বুদ্ধিতে কি আর বলছি? তোমার কিছু হাতখরচার জন্যে দরবার ক'রতে যেতে উনি বললেন, সুনুকে ব্যবসা দেখতে বল ওর একটা বেতন ঠিক ক'রে দিচ্ছি কোম্পানী থেকে। তাতে আস্তে আস্তে ব্যবসাটাও বুঝে নিতে পারবে —।

সেই থেকে স্বগতর কারখানায় যাতায়াত। ব্যবসা বুঝে নিতে নয়, বাবাকে সাহায্য করতে নয়, পয়সা পেতে। এসব কাজকর্মের ঝঞ্ঝাট তার ভাল লাগে না, মাথাতেও আসে না। তাই বেশী ঝামেলা না ক'রে বাবা যা বলে তাই ক'রে যায় সে। প্রথম প্রথম নানা রকম দায়িত্ব দিতে চেষ্টা ক'রেছিল শুভেন্দু, ছেলের সেসব এড়িয়ে যাবার অবিরত চেষ্টা দেখে দৈনন্দিন কাজের থেকে একরকম অব্যাহতি দিয়ে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং গোপনীয় যোগাযোগের ব্যাপারগুলোই শুধু ছেলের ওপর দিয়ে রেখেছে। স্বগত সন্তুষ্ট। নির্ঝঞ্ঝাট কাজ এবং হাতখরচার তুলনায় ভাল অঙ্কের টাকা, তার ওপর আছে অফিসের নামে কেনা গাড়ীটার ওপর স্বচ্ছন্দ অধিকার। মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোনর ওপর যে বাবার নিষেধ পড়েনি সে-ও কেবল এই অফিসে নামটা জড়ানো থাকারই ফলে।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠতেই শুভেন্দু রিসিভার তুলে ধরল, হ্যালো! হ্যাঁ বলছি। আপনি? ও আচ্ছা আচ্ছা। কোথেকে বলছেন? এদিকে এসেছেন? চলে আসুন আমি একাই আছি —।

স্বগত আর অপেক্ষা ক'রল না। যে ফোন ক'রছে করুক। এখনই আসবে সে এটাও বোঝা গেল। এবার সে যেতে পারে। অসীম বলেছে আজ সাকিয়া হোটেলে খাওয়াবে। অসীমের খাওয়ানোতে ভোজনের চেয়ে পান-এর আয়োজন থাকে বেশী। তাতে সোনার ভালই হয় স্বগতর হয় মুস্কিল! খেতে বসলে কি আর মাত্রা রেখে খাওয়া যায়? বাড়ী এসে হয় মা নয় বাবার সামনে কখনও না কখনও পড়তেই হয়। সোনার আর কি? ব্যাটা একটা ঘরে একলা শুয়ে থাকে সকালে উঠে যায় নিজেদের বাড়ী। ও ব্যাটা পাঁড় মাতাল হয়ে ফিরলেই বা কি, কোন রকমে দরজার

চাবির গর্ত চিনতে পারলেই হবে। যাক তবু অল্প-স্বল্প একটু খেলেও বেশ মেজাজ আসে।

ঘরের বাইরে এসে দুবার শিস দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সদর দরজার ঘন্টি বেজে উঠল। দারোয়ান গণেশ মিশ্র ঘরে ঢুকেই জানাল, বেলিয়াঘাটা থানাকা বড়া সাব—

শুভেন্দুও দারোয়ানকে তার ভাষাতেই বলল, নিয়ে এসো।

গণেশ মিশ্র বাইরে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিশাল একজন লোক এসে ঢুকল তার পরনে টেরিলিনের কালো রঙের প্যান্ট, গায়ে হাওয়াই সার্ট। আগন্তুককে দেখেই শুভেন্দু বলল, আসুন আসুন। এ পাড়ায় এসেছেন এখানে চলে আসবেন এর জন্যে আর ফোন করবার কি প্রয়োজন?

আপনাকে এ সময় পাব কি পাব না জানি না তো, বলতে বলতেই আগন্তুক বসে পড়ল সামনের চেয়ারে। হাওয়াই সার্টের তলায় কোমরে রিভলভার বাঁধা ছিল অসুবিধে ক'রছিল বলে একটু সরিয়ে নড়িয়ে রাখতে রাখতে বলল, আপনার ফ্যাকটারির পেছনের বস্তির বিশেটাকে শেষ ক'রে এলাম। শালা হয়রাণ ক'রে মারছিল। গোটা এলাকার ছোকরাগুলোকে ক্ষেপিয়ে অস্থির ক'রে তুলেছিল! খুব বাড় বেড়েছিল কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। আজ ওদের দলেরই একটা ছোকরা খবর দিতে শালাকে আটকে রেখে গিয়ে দেখি মিথ্যে নয়। খবরটা ঠিক। ব্যস দেখা মাত্রই গুলি। দুটো লাগতেই শালা শেষ, তার ওপর আবার তিনটে চালিয়েছি যাতে আর বেঁচে উঠতে না পারে। আর দুটোকে সাফ ক'রতে পারলেই আর কেউ নাম ক'রবে না নকশালবাড়ীর।

শুভেন্দু শুনল। একটু বিস্মিত হ'ল সে। এতবড় যে একটা ঘটনা, একটা নরহত্যা—সঙ্গে সঙ্গে ক'রে এসেও আশ্চর্য নির্বিকার এই পুলিশ অফিসার! আবার শান্ত ভাবে নিন্দা ক'রে যাচ্ছে! শুভেন্দুও বেশ চুপচাপই শুনল। কে বিশে, কোন বস্তিতে থাকে কিছুই জানেনা শুভেন্দু, কিন্তু একজন নকশালপন্থী নেতৃস্থানীয় যুবক যে কমেছে এতে সে আদৌ বিচলিত হবার মত কিছু দেখল না। পুলিশ তার দায়িত্ব পালন ক'রেছে। সত্যিই এইসব ছোকরা আজকাল দারুণ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি ক'রেছে। এভাবে ওগুলোকে শেষ না ক'রলে উপায়ও নেই। শুভেন্দু বলল, তা এপাড়ায় কি মনে ক'রে?

বিশে তো এপাড়াতেই একটা বাড়ীতে ছিল। মিটিং ক'রছিল। একটা ঘরের মধ্যে ছ-সাতজন ছিল তিনটেকে ধরেছি দু-তিনটে পালিয়ে গেল। যাক শালারা আর কোথায় যাবে আর একদিন মরবে। —শেষ কথাগুলো স্বগতোক্তির মত ক'রে বলল।

এইসব রাজনীতি এসে দেশটাকে একদম জ্বালিয়ে দিল। শুভেন্দু মন্তব্য ক'রল।

সে আর বলতে। সবচেয়ে ক্ষতি ক'রল এই মাও-এর বাচ্চাগুলো। দেশের শান্তি নষ্ট ক'রেছে কত মেয়ের সিঁন্দুর মুছে দিয়েছে—

ভেতর থেকে মহাদেব এসে দাঁড়াতে তাকে দেখেই শুভেন্দু জানতে চাইল, ক খাবেন মিস্টার চৌধুরী। র‍্যাম না হুইস্কি?

কথা বন্ধ ক'রে মহাদেব-এর দিকে তাকিয়েছিল পুলিশ চৌধরী। শুভেন্দুকে বলল, যাহোক একটা হ'লেই হ'ল। দাগা অটোমোবাইলস-এর হরিশচন্দ্র সেদিন এক বোতল কিং অব দি কিংস পাঠিয়েছিল, ভাল মালটা পর্যন্ত এদেশে তৈরী হয় না, আশ্চর্য!

এদেশে কি ক'রে হবে, এদেশ কি আর আঙুরের দেশ?

তা বটে। এইজন্যেই ওসব দেশে গেলে আর কেউ আসতে চায় না।

শুভেন্দু এসব অপ্রয়োজনীয় কথার আর কোন জবাব দিল না। হাতের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পুলিশ চৌধুরী বলল, আপনার ফ্যাক্টরীর ব্যাপারে বিশেষ বাড়াবাড়ি যারা ক'রবে তাদের নাম-ধামগুলো আমায় দিয়ে রাখবেন সব ব্যাটাকে এবার বুঝিয়ে ছাড়ব। লপচপানির দিন চলে গেছে। দিল্লীর অর্ডার এসে গেছে যেভাবে হোক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে!

শক্ত না হলে কখনও য়্যাডমিনিষ্ট্রেশন চালানো যায়!

সত্যি কথা বলতে কি ওই যে ওনারা একবার গদিতে বসেছিলেন ওনারাই দেশের বারটা বাজিয়ে রেখে গেছেন। গদিতে বসলেই হয়? য়্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো শিখতে হয়। এই যে এত বড় একটা ইনডাস্ট্রি আপনি চালাচ্ছেন কি অমনি হয়েছে?

শুভেন্দু কেমন যেন সন্দেহ হ'ল চৌধুরীর কথাগুলো শুনে। লোকটা কথাবার্তা যে রকম বলছে তাতে বেশ মনে হচ্ছে যে পেটে ওর এখনও হজম না হওয়া সুরাসার বেশ জমা হয়ে আছে। তাই তো এসে থেকেই এমন অনর্গল বকে চলেছে সে শুধু শুধুই। শুভেন্দু কোন কিছুরই বাহুল্য পছন্দ করে না। আতিথেয়তার জন্যে সব রকম আয়োজন রাখা, তাছাড়া মদ্যপদের সন্তুষ্ট করার মত সহজ উপায় আর নেই বলে মদ্যপানের বন্দোবস্ত বেশ ভাল রকমেরই রয়েছে। নিজে মাঝে মাঝে যা পান ক'রে থাকে সে গভীর রাত্রে নিজের ঘরে বসে। তারপর আর ঘর থেকে বেরোয় না। পানের অভ্যেসটা অনেকটাই বড়মানুষের সমাজী কায়দা বজায় রাখতে, তাই প্রবল মাত্রাবোধে তা পরিমিত।

সৌগত পরিমিতির গণ্ডী জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মানতে চায় না।

বাবার কাছ থেকে বেরিয়ে সোজা সে 'সারেন' হোটেলে গিয়ে উঠল অন্য কোন কাজ না পেয়ে। অন্ধকার সম্মোহিত ঘরের মধ্যে ঢুকে চোখ দুটোকে অভ্যস্ত করার জন্যে দু মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। গিজগিজ ক'রছে লোক। কোন টেবিল খালি নেই। চারপাশে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল কোথায় বসে। একবার ভাবল বাইরে বেরিয়ে রাস্তার ওপারের ব্যালোরিণাতে চলে যায়। ইচ্ছেটা জমল না। আর বেরোতে ইচ্ছে ক'রল না। একজন লোকও উঠছে না যে সেখানটায় গিয়ে বসে। ভালভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রতে লাগল কোন কোণে কোনও আনাচে কানাচে লোকের চোখ এড়িয়ে একটা জায়গা অন্তত পড়ে আছে কিনা। পিঠে একটা ছোঁয়া লাগতেই চোখ ছিটকে গেল পেছন দিকে।

হ্যালো মিস্টার দাত্তা সাচিং ফর ? এ টেবল্ জিজ্ঞাসা ক'রল আগন্তুক সাহানী। সারেন-এর ম্যানেজার।

গুড ইভিনিং মিস্টার সাহানী। হাউ ইউ ? —খুসী হয়ে সৌগত জানতে চাইল।

অত্যন্ত মধুর ইংরাজীতে সাহানী জবাব দিল, সুন্দর। বেশ কিছুদিন বাদে এলেও সারেন আপনার দেখা পেয়ে অত্যন্ত সুখী।

কিন্তু আজ খুবই ভীড় যে দেখছি—

হ্যাঁ আজকাল ভীড়টা একটু বেশীই হচ্ছে। নো ম্যাটার, এখনই জায়গা পেয়ে যাবেন। চলুন ততক্ষণ বরং আমার ঘরে গিয়ে বসবেন।

চলুন, তাই যাওয়া যাক।—

সাহানী সারেন-এর ম্যানেজার। সাহানীর কোন একভাই, যে নাকি কোনদিন কলকাতা দেখে-ই নি চণ্ডীগড়ে পড়াশোনা করে, এর মালিক। তাই সকলে বলে ম্যানেজার সেজে থাকা সাহানীই আসলে মালিক, আইনের চোখ তো কাগজে তৈরী তাই সে কাগজপত্রই দ্যাখে বলে কাগজপত্রের ব্যবস্থা অন্য রকম। সাহানীর ঘরে এসে কিন্তু সৌগত একটু হকচকিয়ে গেল। ঘরটা হোটেলেরই বাড়ীতে কিন্তু হোটেল-এর মত বিলাসী আবহাওয়া নয় ঘরটির। পরিচ্ছন্ন এবং পরিমিত আয়োজনে পরিমার্জিত। তবু মনে হয় অমন একটা হোটেল-এর মালিক হলে যেমন হওয়া উচিত তেমন নয়।

টেবিলের দুপাশে সর্বসাকুল্যে তিনটি চেয়ার। পেছনের দিকেরটিতে বসে যেন ডুবে গেল সাহানী, সামনের দুটির একটিতে বসে সেই তুলনায় কম ডুবল সৌগত। বসেই সাহানী বলল, আপনার ড্রিংস কি এখানেই আনাব মিস্টার দত্ত ? আজ না হয় খদ্দের না হয়ে আপনি আমার অতিথিই হলেন—

না না। তার কোন প্রয়োজন নেই। সৌগত ভদ্রতা ক'রল।

গলার স্বরে প্রগাঢ় আন্তরিকতা ফুটিয়ে সাহানী বলল, আমরা ব্যবসাদার বলে কি অতিথিকে একটু আপ্যায়নও ক'রতে পারব না ?

ওকথা কেন বলছেন? সৌগত প্রতিবাদ ক'রতে চাইল।

সাহানী বিগলিত স্বরে অনুযোগ ক'রল, আসলে আপনারা ব্যবসাদার লোকদের কিছুতেই ঠিকভাবে নিতে পারেন না। আমাদের ঠিক সহ্য ক'রতে চান না অথচ আমরা কি দোষ ক'রেছি জানি না।

সৌগত সাধারণ সৌজন্যবোধের জন্যেই সাহানীর অনুরোধ কৃত্রিম মনে হলেও উপেক্ষা ক'রতে পারল না। তবু বলল, আপনার ব্যবসার জায়গায় এসেছি এখানে আমি আপনার খদ্দের! অন্যদিন না হয় আপনার আতিথ্য গ্রহণ করা যাবে।

স্যর, অতি নম্র ভঙ্গীতে সাহানীর মত লোক বলল, অন্যদিনের কথা সেইদিনই হবে। আজ যখন সুযোগ এসেই গেছে তখন আজই সেটা ব্যবহার ক'রতে দিন।

তবু ইতস্তত ক'রল সৌগত, কিন্তু আমি তো আপনাদের হোটেল-এ প্রায়ই আসি—আপনি যদি রোজই এমনি করেন তবে তো আমার আসা-ই বন্ধ ক'রে দিতে হয়।

এরকম বলবেন না দয়া ক'রে। আজকের দিনটা অন্য দিনের থেকে আলাদা। চট ক'রে সাহানী বলে ফেলল, ম্যাকচুয়ালী আজকের দিনে আমি প্রথম একটা রেস্টুরেন্ট করি। আপনি আমার খদ্দের ছাড়াও আপনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সৌহার্দ আছে, নয় কি? সেটুকু দাবী কি নেই?

বাধ্য হয়েই সৌগত বলল, হ্যাঁ সে তো নিশ্চয়ই। আর আপনার প্রতিষ্ঠা দিবস বলছেন তখন আর কি করা।

ঠিক আছে। আমি অত্যন্ত খুশী হলাম। আপনার মত খানদানী লোক তো নিশ্চয়ই লোকের কথার ইজ্জত রাখবে আমি জানি। —বলেই কি এক বেল টিপল সামান্য একটু শব্দ শোনা গেল ঘরের বাইরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে এসে ঢুকল একজন বেয়ারা! সাহানী তাকে হুকুম ক'রল, কাপুর সাবকো বোলাও —।

অল্প পরেই একটি নবযুবক এল যাকে দেখলে য়ুরোপীয় নয় বলে মনে করা মুস্কিল। বয়সও তার এত কম যে হোটেল-এর সান্ধ্য পোষাক না তার দেহে আঁটা থাকলে তাকে কোন স্কুলের ছাত্র বলেই মনে হ'ত। তাকে দেখে সাহানী হিন্দিতে বলল, আমার বিশেষ বন্ধু। এর জন্যে স্কচ হুইস্কি আর চিকেন ক্রোম এক প্লেট এখানে পাঠাও। হুইস্কি তুমি নিজে দেখে পাঠাবে।

সৌগত আপ্যায়নে প্রীত হলেও একটু হকচকিয়ে গেল। সেই সময়েই সাহানী বলল, আমরা, বুঝলেন মিস্টার দাত্তা, যারা হোটেল-এর ব্যবসা করি তারা সব হোটেলকেই ঘর দুয়ার মনে করি। রাত বারটা পর্যন্ত তো এখানেই থাকি কোনদিন একটা দুটো-ও বেজে যায়।

খুবই স্বাভাবিক সৌগত সায় দিল।

তাহ'লেই বুঝুন ঘর কি আর আমাদের আছে? এই আমাদের ঘর, এই আমাদের সংসার।

আপনার তো আর হোটেলই ব্যবসা নয়। অন্য ব্যবসাও তো আছে—সৌগত আন্তরিক হবার চেষ্টা ক'রল।

সে আমার নিজেরই ব্যবসা। কিন্তু হোটেল তো আমার নিজের ব্যবসা নয়।

ওই একই হ'ল।

না। এক নয়।

কেন?

আপনার সুপারভিশানে যত বাড়ী তৈরী হয় সব কি আপনার নিজের বাড়ী? —নিজের রসিকতায় নিজেই খুব একচোট হাসল সাহানী।

সৌগতকে বুঝতে হল সত্যিই ও ম্যানেজার। বুঝে চুপ ক'রে রইল। সাহানী-ই জিজ্ঞেস ক'রল, কি বলুন?

হ্যাঁ, ঠিক। সায় দিল সৌগত। আসলে এদের ব্যাপারগুলো ঠিক বুঝতে পারে না সে। বেশী গভীরে গেলে সব কেমন গুলিয়ে যায়। পয়সা রোজগার করার কায়দায় এরা অদ্ভুত রকম দক্ষ আর সে দক্ষতা যে কোথায় পায় সৌগত মনে করে তা দেবতারও অজ্ঞাত। দেবতাদের যা অজ্ঞাত তা আর কোন দরকার আছে জানবার? অতএব ওপাতা বন্ধই থাক। যে যা করে করুক, যে যেভাবে চলে চলুক। কি হবে ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে? এখন দু পেগ প্রকৃত স্কচ হুইস্কি সামনে এলে বাঁচা যায়। সেই কবে এক ঠিকেদার একটা ভ্যাট সিক্সটি নাইনের বোতল দিয়েছিল তারপর আর আমদানী করা বস্তু জিবে পড়েই নি। এ বেটা সাহানীর ভাল হোক, উন্নতি হোক এই সুবুদ্ধিটা দীর্ঘদিন টিকে থাক, মনে মনে ভাবল সৌগত।

পয়সা যারা রোজগার ক'রতে জানে তাদেরকে ভাল লাগে সৌগতর। দু-চারটে আজেবাজে লোক মাঝে মাঝে লোভে পড়ে ব্যবসা ক'রতে চলে আসে সেই ব্যাটারাই যত ঝামেলা পাকায়। তারা চায় সব নিজেরাই আত্মসাৎ ক'রবে। তাদের খালি দাও দাও রব। পেতে হলে দিতে হয় একথাটা শিখে আসে না ব্যাটারা। এরা সব দিতে জানে, আর দিতে জানা মানেই তো পেতে জানা! এদিকে সবচেয়ে ওস্তাদ সনৎ ঘোষ। তার সেই প্রথম দিনের কায়দাটা এখনও মনে আছে সৌগতর। সন্ধ্যে উতরে যাবার একটু পরে চৌরঙ্গী দিয়ে পার্ক স্ট্রীটে পায়ে হেঁটেই ঢুকছিল সৌগত। এশিয়াটিক সোসাইটির নতুন বাড়ীটার নিচেই সেলাইকলের দোকানের সামনেটায় যেন ভুঁইফুঁড়ে উঠল সনৎ ঘোষ। মিস্টার দত্ত যে! এদিকে কোথেকে? —এমনভাবে সনৎ কথাগুলো বলল যেন সৌগতর সঙ্গে তার কতদিনের চেনা। অথচ সৌগত তাকে চিনতে পারল শুধুমাত্র কয়েকদিন আগে সনৎ ঘোষ-এর করা একটা

ঢালাই কোন অনুরোধ না মেনে ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিল বলে। সে সেদিন রুক্ষ স্বরেই বলেছিল, বি সিওর মিস্টার ঘোষ আমার সাইটে এরকম কাজ আমি কখনই নেব না।

আগে অনেক অনুরোধ উপরোধ ক'রলেও সনৎ সেই মুহূর্তে চুপ ক'রে থেকে রাজমিস্ত্রিদের বলল, ঠিক আছে কুদ্দুস ভেঙ্গে আবার ঢালাই কর।

তারপর এই সন্ধ্যায়ে প্রথম দেখা। সৌগতকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সনৎ বলল, দেখে তো মনে হচ্ছে অফিস থেকেই সোজা—

সৌগত অস্বীকার ক'রতে পারল না। তার চোখে পড়ল সনৎ-এর সঙ্গেই একজন সুবেশ মহিলা আছে। সৌগতর দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে সনৎ বলে উঠল, ওঃ আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই আমার বান্ধবী কেয়া, আর ইনি হলেন ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার দত্ত।

সনৎ একজনের পদবী বলল না একজনের বলল না নাম। দুটোই সে জানত না। অথচ এই ত্রুটিটুকু সৌগতর নজরে এল না। মহিলাটি হাত তুলে নমস্কার করায় প্রতি নমস্কার ক'রতে হ'ল সৌগতকেও। এবং অনেকটা মহিলাটির খাতিরেই সনৎ ঘোষকে জিজ্ঞেস ক'রল আপনি এসময়—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সনৎ বলল, আমরা একটু চা-টা খাবার ইচ্ছায় এসেছিলাম। আসুন না সন্ধ্যেটা একসঙ্গে কাটানো যাক।

সৌগত প্রস্তাব নাকচ ক'রে দেবার জন্যে বলল, না না আপনারা যান।

সনৎ খুবই আন্তরিকভাবে বলল, আপনাকে দেখে খুব একটা কাজে যাচ্ছেন বলে তো মনে হচ্ছে না। যদি আমাদের খুব একটা অপছন্দ না করেন তবে একটু অসুবিধে ক'রেই না হয় সঙ্গ দিলেন, খুব খুশী হবো।

কেয়াও সনৎ-এর সঙ্গে সায় দিয়ে বলল, আসুন না —।

সনৎ-এর অনুরোধ উপেক্ষা করা ভদ্রতায় বাধল বলেই সৌগত বাধ্য হ'ল ওদের সঙ্গে যেতে।

আর সেই পানভোজনের আসর ভাঙ্গার পর কেয়া বান্ধবী হয়ে গেল সৌগতর। কি ক'রে যে এই পরিবর্তন হয়ে গেল আজ আর খেয়াল নেই। তবে অনেকদিন সেই সখ্যতা ছিল। তারপর আস্তে আস্তে আকর্ষণ কমে যেতে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেল। তা ছাড়া শেষের দিকে কেয়ার বিল মেটাতে হ'ত সৌগতকেই। অনেকটা সেজন্যেও সৌগত এড়িয়ে চলতে লাগল কেয়ার সঙ্গ। কারণ কেয়ার খরচ উসুল করা সৌগতর পক্ষে সম্ভব হ'ত না সাধারণ সময়ে। উসুল একবারই মাত্র ক'রতে পেরেছিল কেয়াকে শিলং নিয়ে গিয়ে।

বেয়ারা এসে কাঁচের পেয়ালা সোডার বোতল আর এক বোতল শীতল পানীয় সৌগত আর সাহানীর সামনে বসিয়ে দিল। কাঁচের পেয়ালায় সোনালী পেয় প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে নিঃশব্দ স্থির। সৌগত রমনীয় তরল পদার্থটির দিকে

পরম আগ্রহে তাকিয়ে রইল। অন্য একজন বেয়ারা নামিয়ে দিল এক প্লেট সুস্বাদু খাবার, চিকেন ক্রোল।

সৌগত বলল, সব আয়োজনই আমার একলার দেখছি —। আপনিও কিছু খান।

সাহানী বলল, আপনিই খান।

একা একা—দ্বিধান্বিতভাবে সৌগত বলল।

সাহানী তাড়াতাড়ি বলল, একা কেন আমিও তো খাচ্ছি। —বলে ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতলটা টেনে নিল। তারপর যেন কৈফিয়তের সুরে বলল, অনেক রাত পর্যন্ত থাকতে হবে তো—কড়া কিছু পান ক'রলে কাজ চালাতে পারব না।

আসলে সাহানী নিজে মদ খায় না, খুব প্রয়োজনে কখনও খাবার ভঙ্গী ক'রে একআধঢোঁক খেয়ে সঙ্গীকে সাহায্য করে মাত্র। বেশীর ভাগ সময় নানা ছল চাতুরীতে এড়িয়ে যায়। সেটা জানে না বলেই সৌগত সাহানীর কাজে ওজর ধরতে পারল না। চিকেন ক্রোল-এর প্লেট এবং পেয়ালার মদ এক সঙ্গেই ফুরোল।

সাহানী তাড়াতাড়ি বলল, অন্য কি খাবার আনাব, কি পছন্দ বলুন।

খাবার আর কিছু নয়।

না না, সাহানী বেল বাজাতেই দৌড়ে এল প্রথম বেয়ারা। তাকে সাহানী বলল, চিকেন মসল্লম নিয়ে এস আর কাপুর সাবকে বল ড্রিংক্‌স পাঠাতে।

চিকেন মসল্লম-এর সঙ্গে আরও দুপেগ স্কচ হুইস্কি নিঃশেষ হতে সৌগতর মনে হ'ল শরীর তার পাখীর পালকের মত হাল্‌কা হয়ে গেছে। দেশী হুইস্কি আর আসল বিদেশী জিনিষে যে অনেক তফাৎ তা সে সাহানীকে শুনিয়েও দিল এবং হুইস্কির আমেজে বেশ কয়েক দফা ধন্যবাদও জাঁকিয়ে দিল তাকে। সাহানী বলল, আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন এটাই যথেষ্ট অনর্থক ধন্যবাদ দেবেন না।

একশবার দেব, সৌগত বলল, জানেন মিস্টার সাহানী, এই রকম অতিথি সৎকার আমাদের মধ্যে কেউ ক'রতে জানে না। বিশেষ ক'রে আপনি, একজন জিনিয়াস ব্যবসাদার।

সাহানী অনুরোধ ক'রল, আর এক পেগ আনাই।

আনান কিন্তু এটাই শেষ, সৌগত জানাল।

বসুন আমি একটু রেস্টুরেন্টটা ঘুরে আসি, বলে সাহানী বেরিয়ে যাবার অল্পক্ষণ পরেই বেয়ারা আর এক পেগ হুইস্কি এনে হাজির ক'রল। সৌগত বুঝল সাহানীই পাঠিয়ে দিয়েছে।

সাহানী যখন ফিরে এল তখন সৌগত পানপাত্র সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। সাহানীকে দেখেই সে এক ঢোঁকে বাকী হুইস্কিটুকু শেষ ক'রে ফেলল। এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সাহানী বলল, আপনি এখনই চলে যাবেন?

হ্যাঁ।

আমি ট্যাক্সি ডাকিয়ে দিচ্ছি, একটু অপেক্ষা করুন।

না। দরকার হবে না, রাস্তায় বেরিয়েই ডেকে নিতে পারব।

বেরিয়ে এল সৌগত। বাইরে এসেই কেমন জ্বালা ক'রতে লাগল শরীর। নাঃ ভেতরটা যে এয়ারকণ্ডিশান করা ছিল এতক্ষণে বোঝা গেল তার প্রতিক্রিয়া। সৌগতর মনে হ'ল যেভাবে তারা বাস করে সেভাবে বাস করার কোন অর্থই হয় না। বাড়ীটা অন্তত এয়ারকণ্ডিশান হওয়া উচিত। জীবনের যত উপকরণ আছে তা ভোগ ক'রতে না পারা বেদনাদায়ক। সৌগতর মাঝে মাঝে বড়ই খারাপ লাগে এবং খারাপ লাগে বলেই মনে হয় এর চেয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া ভাল, অন্য কোন দেশে, আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা বা অন্য কোন দেশে, যেখানে জীবনকে ভোগ করার উপকরণ সহজলভ্য।

সামনে একটা ট্যাক্সি দেখে তার ভেতরে ঢুকে পড়ল সৌগত।

পরের দিন আফিসে এল সাহানী, গুডমর্ণিং মিস্টার দাত্তা।

গুডমর্ণিং, হাসিমুখে অভ্যর্থনা ক'রল সৌগত, হঠাৎ কি মনে ক'রে?

আপনার জন্যে একটা সুসংবাদ আছে।

তাই নাকি? কি সেটা?

মিস্টার মুখার্জী তিনমাসের ছুটিতে যাচ্ছেন। আসলে ছুটি নয় দিল্লীতে যাচ্ছেন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের একটা কাজে।

তাই নাকি? কবে?

সোমবার।

সামনের সোমবার? হঠাৎ।

হ্যাঁ হঠাৎ-ই ডাক এসেছে দিল্লি থেকে। জরুরী তলব। আর সুসংবাদ হচ্ছে এই যে মিস্টার মুখার্জীর কাজ দেখবার দায়িত্ব আপনার ওপর থাকছে।

তাই নাকি? আপনি এত খবর—আমি কিছু জানি না—হতবাক হয়ে গেল সৌগত। তাতে একটু হাসল সাহানী, বলল, অনেক ঘটনাই ঘটে মিস্টার দাত্তা যার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক রহস্যই উদ্ঘাটন হয় না কোন দিন।

এতবড় ঘটনা অথচ আমরা কিছু জানিই না—সৌগত ব্যাপারটা বিশ্বাস ক'রতে চাইল না। সাহানী বলল, শীঘ্রই জানবেন। যাইহোক আসল কথাটা শুনুন, একটা বড় সাপ্লাই অর্ডার বেরোবার আছে। মিস্টার মুখার্জীরই এটা করার কথা ছিল, আপনার হাতেই আসছে। আপনি কোটেশন নিন কিন্তু কিন্তু অর্ডারটা যেভাবেই হোক আমাকে করিয়ে দিতে হবে। আপনার যা দরকার জানাবেন, অসুবিধে হবে না।

সাপ্লাই অর্ডারটার ব্যাপার আমি জানি। কোটেশন চেয়ে চিঠি বোধহয় দু একদিনের মধ্যেই যাবে।

হ্যাঁ। আমার কাছেও যাবে। তবে মিস্টার মুখার্জী তো আনম্যানেজেবল লোক। আপনি হলেন ভদ্রলোক যার সঙ্গে চুক্তি করা যায়। তাই এই য়্যাডভান্স দিয়ে গেলাম, বাকী পরে হবে। —বলে পকেট থেকে পাঁচশ টাকা বের ক'রে সৌগতকে জোর ক'রে ধরিয়ে দিয়ে সাহানী বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, পরে কথা হবে, গুডবাই।

সৌগত নোটগুলো চট ক'রে পকেটে পুরে ফেলল। টাকা যখন সাহানী দিয়ে গেল তখন সে তো আর কাঁচা কথা নয়। এমনি কি আর কেউ টাকা দেয়, বিশেষ ক'রে এতগুলো টাকা। সাহানীটা কত খবর রাখে দেখে আশ্চর্য হ'ল সৌগত। যে খবর তার কাছে পর্যন্ত এখনও এসে পৌঁছায় নি সেই খবর একজন বাইরের সামান্য ঠিকাদার কি ক'রে পেল ভেবেই সে অবাক হয়ে গেল। যাই হোক এখনই খবর নিতে হয় মনে ক'রে হেড ক্লার্ক অবনীবাবুকে ডাকলো। অবনীবাবু লোকটা নির্ভরযোগ্য এবং খুবই বিশ্বাসী। পয়সাকড়ি প্রচুর পায় এবং অনেক সময় পাইয়েও দেয়। গোপন বহু ব্যাপারে বিশ্বস্তভাবে লেনদেন ক'রে আসছে এতদিন সৌগতর সঙ্গে। কাজেই এ অফিসের পুরানো লোক হিসেবে ওর কাছে সব খবরই থাকার কথা মনে ক'রে অবনীবাবুকে জিজ্ঞেস ক'রল, আচ্ছা অবনীবাবু আমাদের অফিস থেকে কারও কি দিল্লী যাবার কথা আছে ?

অতিভোজনে অবনীবাবুর শরীরে মেদ কিছু জমেছে কিন্তু তুলনামূলক-ভাবে পেটটা এত বড় যে সামঞ্জস্যহীনতার জন্যে বেমানান মনে হয়। সৌগতকে আসতে দেখে অবনীবাবু বলল, সেরকম তো শুনিনি —

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সৌগত বলল, খবরটা নিতে পারেন ?

নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু দিল্লী বহুদিন ধরেই আমাদের কাছ থেকে কিছু প্রজেক্ট ওয়ার্ক করবার মত অভিজ্ঞ ও দক্ষ ইনজিনীয়ারচ াইছে। আমরা পাঠাইনি।

তা'হলে দেখুন তো এখন কেউ যাচ্ছেন কিনা। আমাকে খবরটা দেবেন। আমি অপেক্ষা ক'রছি।

ঠিক আছে, আমি এখনই খবরটা নিয়ে আসছি।

পেটটাকে নাচাতে নাচাতে অবনীবাবু এল প্রায় আধঘন্টা বাদেই। বলল, মিস্টার মুখার্জী সোমবার দিল্লী যাচ্ছেন তিন মাসের জন্যে।

তাই নাকি ? সৌগত খুবই খুশী হ'ল মনে মনে। তা'হলে সাহানীর সব কথাই তো সত্যি। সবই জানে সাহানী, এবং সবচেয়ে আগে।

হঠাৎ কি ব্যাপার বলুন তো ?

অবনী গলার স্বর খুব নিচু ক'রে বলল, মনে হচ্ছে বড় সাহেবই মুখার্জী সাহেব-এর ন.ম পাঠিয়েছিল। এতে মুখার্জী সাহেবও খুশী হবে বড়সাহেব-এর অসুবিধেও দূর হবে। মুখার্জী-সাহেব বুঝলেও না যে বড়সাহেব তাঁকে এখান থেকে হটিয়ে দিল।

বাঃ, সৌগত উচ্চারণ ক'রে ফেলল। পরমুহূর্তে বলল, মিঃ ওয়ার্ধা তো খুব চালাকী ক'রে কাজটা ক'রল।

বড়সাহেব তো চালাকীর জোরেই আজ এত বড় হয়েছে নইলে ওরকম লোকের চাকরীই কবে চলে যাওয়া উচিত ছিল —।

সৌগত একটু হেসে বলল, আপনি মশায় বেশ মজার কথা বলেন তো! একটা এতবড় এলাকার কর্তাব্যক্তি আর আপনি বলেন কিনা তার চাকরীই চলে যাওয়া উচিত ছিল!

অবনী বলল, কথাটা খুব খারাপ লাগছে তাই না? বুঝেছি আমি একজন কেরাণী বলছি বলে কথাটা শুনতে খারাপ লাগছে—আপনিও তো একজন ইঞ্জিনীয়ার, শিবপুর থেকে তো পরীক্ষা দিয়েই পাশ ক'রেছেন, একবার দেখবেন তো বড় সায়েবের ডিপ্লোমা খানা — ? জ্ঞানের পরীক্ষা করার কথাটা বাদ দিতেই বলছি। আসলে কি জানেন? সেন্ট্রাল গুণ দেখে এদের চাকরী দেয় নি, ওসব য়্যাডমিনিস্ট্রেটিভ র‍্যাঙ্কে চাকরীতে বসায় আস্থাভাজন দেখে। মাড়োয়ারী অফিসগুলো যেভাবে নিজস্ব লোককে খাজাঞ্চি রাখে আমাদের সরকারও একই দৃষ্টিভঙ্গীতে আমলা নিয়োগ করে।

সৌগত বেশ মজা পাবার ভঙ্গী করে মুখের সামান্য প্রশ্রয়ের হাসিটুকু ফুটিয়ে রেখে বলল, আপনার তো চমৎকার একটা থিয়োরী আছে দেখছি—

বলিনা মশাই, সব বুঝি, কাউকে বলি না। চাকরী কেউ খেতে পারবে না জানি, কি দরকার ঝামেলায় জড়িয়ে ?

ঝামেলার কি হ'ল ?

না কারও কানে গেলে লাগান-ভাঙ্গান ক'রে একটু পেয়ার পাবার চেষ্টা ক'রলে আমাকে অকারণ কুনজরে পড়তে হবে আর কি। আসলে মুখেরই যা বড়াই নইলে জাতে তো আমরা কুকুর।

মানে ? সৌগত কৃত্রিম বিস্ময় চোখে মুখে ফুটিয়ে জিজ্ঞেস ক'রল, আমি তো পদবী দেখে মনে ক'রেছিলাম আপনারা জাতে ব্রাহ্মণ —। কুকুর বলে জাত আছে নাকি ?

হায় ভগবান! হতাশ হয়ে অবনী বলল, আমরা মানে আমি নই। আমি তাদেরই কথা বলছি যারা ইংরেজ আমলে তাদের তেল দিয়ে সুখে থাকতে চাইত এখন আবার কর্তাদের তেল দিয়ে পিঠচাপড়ানো চায়।

সৌগত মনে মনে হাসল, ইচ্ছে হ'ল বলে যে আপনিই মশাই বড় কর্তাদের তেল দেওয়াতে এ অফিসের মধ্যে এক নম্বর, মুখের ওপর বলতে পারল না। শুধু বলল, কথাটা যখন আমরা বলে বলছেন তখন আর প্রতিবাদ করার কিছু থাকে না।

তা তো স্যার বলবই। আমি নিজেও কি স্বজাতের বাইরে? বাইরে থেকে লাভ কি ? অনেক দেখেছি, অনেক ঠকে এখন শিখেছি নিজেরটা নিজে না দেখলে

কেউ দেখে দেবে না। যে ক'টা দিন এই অফিসে আছি তা বাদে কোন শর্মা একমুঠো ধূলো দিয়েও পুঁছবে না। সত্যি কথা বলতে কি এখন যতটুকু কুড়িয়ে নিতে পারি আখেরে লাগবে ততটুকুই।

কোন কথা বলল না সৌগত। অবনী সুযোগ পেয়ে বলল, চোখের সামনেই তো দেখছেন বড়সায়েব লুটেপুটে খাচ্ছে। এতবড় দেশের কোন জমিতে যে তার কত বড় বাড়ী উঠেছে বা এত হাজার ব্যাঙ্কের কোনটায় যে কোন নামে তার কত টাকা জমা পড়ছে কে তার খবর রাখছে বলুন? আমরা শেয়াল-কুকুরের দল সিংহভাগের পরে পড়ে থাকা হাড়গোড় গুলো-ও তো চাইতে পারি—

আপনি কি শুধু হাড়গোড়গুলোই চাইছেন অবনীবাবু? গতবার পুজোর আগে অফিসের আদায়ে কমিশন তো আপনি মন্দ পান নি —

অবনী একটু বিব্রত হয়ে বলল, কে আপনাকে এসব কথা বলে বলুন তো?

আরও যারা হাড়গোড় চাটে তাদেরই কেউ বলে নিশ্চয়, নইলে আমি আর জানব কি ক'রে?

ওসব মিথ্যে কথা। সামান্য কয়েকটা টাকা পেয়েছিলাম। তাছাড়া জানেনই তো সার আপনারা না পাইয়ে দিলে আমার পাবার কোন চান্সই নেই। আমার সঙ্গে তো আর পার্টিদের সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই —

তা যা হোক হোল, এখন একটা খবর জানেন কিনা বলন তো? আমাদের ঠিকাদার সাহানী আছে না, ওর সঙ্গে কানেকশানটা কার?

অবনী একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, ভাবল তার প্রতিই বুঝি ইঙ্গিত করছে সৌগত, তাই থতমত খেয়ে বলল, ওর সঙ্গে কনেকশান কারও আছে বলে তো মনে হয় না। ও তো নতুন ঢুকেছে।

নতুন কেন? একটা কাজ শেষ ক'রে আর একটা কাজ ওর চলছে।

হ্যাঁ, ওই নতুনই হ'ল। অন্য সকলে তো অনেক পুরানো।

চট ক'রে কথার ধারা ঘুরিয়ে দিল সৌগত, মিস্টার মুখার্জীর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কিরকম?

মুখার্জী সাহেব-এর সঙ্গে সম্পর্ক কারোরই বিশেষ ভাল নয়। যে কয়জনকে মুখার্জী-সাহেব একদম পছন্দ করেন না সাহানী তাদেরই একজন।

সৌগত অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলল, মিস্টার মুখার্জীর জন্যে দুঃখ হয় একজনের সঙ্গেও বনিয়ে চলতে পারলেন না ভদ্রলোক—একজনের সঙ্গেও ভাল সম্পর্ক নেই ওনার!

তাহ'লে কি হয় স্যার, প্রত্যেকেই ওঁকে ভয় করে, সম্মানও করে।

তাতে কি লাভ?

তা যা বলেছেন। যে কটা টাকা হাতে নিয়ে উনি রিটায়ার ক'রবেন তাতে একটা মেয়েরই বিয়ে দিতে পারবেন না, বাকী তিনটির কথা ছেড়েই দিন।

তাই নাকি? চারটি মেয়ে ভদ্রলোকের? পুয়োর সোল—উৎকণ্ঠা এবং অনুকম্পা দুটোই প্রকাশ করবার চেষ্টা ক'রল সৌগত কিন্তু কোনটাই যথাযথ শোনাল না।

অবনী বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন ওসব সম্মান-টম্মানের কোন দাম নেই। আসল দাম পয়সার। পয়সা থাকলে সম্মানও পাওয়া যায় কিন্তু সম্মান দিয়ে পয়সা পাওয়া যায় না। কিন্তু আশ্চর্য কি জানেন, মানুষ হিসেবে মুখার্জী সাহেব খুবই ভাল।

সৌগত শুধু শুনল। সে কথা বলার মধ্যেই মনে মনে বুঝে নিতে চেষ্টা ক'রছিল আসলে ঘটনাটা কি ঘটছে। সাহানীর নিশ্চয়ই এমন ক্ষমতা আছে যা দিয়ে সে মিস্টার মুখার্জীর মত একজন কর্তাব্যক্তিকে সরিয়ে দিতে পারে। যদি তা-ই হবে তাহ'লে আবার সাপ্লাই অর্ডারটা পাবার জন্যে তাকে টাকা পয়সা দেবে কেন, এত তোয়াজই বা ক'রবে কেন? ওপর মহল থেকেই তো সরাসরি করিয়ে নিতে পারে। তাহ'লে হয়ত এমন হ'তে পারে নিজের অসুবিধের জন্যে ওয়ার্ধা-ই কায়দা ক'রে সরিয়েছে মুখার্জীকে আর সেই খবরটা আগেভাগে জানতে পেরে সাহানী নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে চাইছে। কিন্তু আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে অবনীবাবু যে খবর বলতে পারল না তাও গতকালই জেনে গেছে সাহানী যে মুখার্জীর কাজের দায়িত্ব অন্য কাউকে না দিয়ে সৌগতকেই দেওয়া হচ্ছে। কথাটা মনে আসতেই মনে মনে হাসল সৌগত, ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়-এর জায়গায় সৌগত দত্ত! যে ললিত মুখার্জীকে দিয়ে আপন মতলব মত কাজ করাতে না পেরে ঠিকাদাররা অসন্তুষ্ট, সেই ললিত মুখার্জীর দায়িত্ব দেওয়া হ'ল সৌগত দত্তর ওপর! যোগ্য লোকই ওয়ার্ধা খুঁজে বের ক'রেছে বটে — মনে মনে ভাবল সৌগত। এই না হ'লে আর ওয়ার্ধা এত উঁচুতে উঠে সম্পূর্ণ অযোগ্যতা নিয়েও বসে থাকবে কি ক'রে? মুখার্জীর হাতে এই বিরাট কাজের দায়িত্ব থাকলে ওয়ার্ধার-ও অসুবিধে হচ্ছিল যে —।

অবনী সৌগতর ভাবনার মুহূর্তগুলোকে নেহাৎই চুপ ক'রে থাকা মনে ক'রে বলে চলল, অবশ্য ওসব ভালর কোন অর্থ হয় না। এ অফিসের সব সাহেব মুখার্জী সাহেব-এর মত হ'লে আমাদেরও ছেলেমেয়ে নিয়ে উপোসে থাকতে হ'ত। ওসব আগে চলত, এখনকার দিনে অচল।

সৌগত বলে ফেলল, অচল হ'লে আর চলছে কি ক'রে? —পর মুহর্তেই সে বলল, যাক গে মুখার্জী সায়েব-এর কথা ছাড়ুন। মুস্কিল হ'ল মিস্টার মুখার্জীর ওপর যত কজের দায়িত্ব দেওয়া আছে কে দেখবে সে সব বলুন তো? কি ঝামেলাই যে হবে মশাই আমি কিছু বুঝছি না। ওইসব ঝামেলার জের আমাদেরও পোয়াতে হবে।

ব্যবস্থা কিছু একটা হবেই।

তা তো নিশ্চয়ই হবে কিন্তু কি হয় কে জানে—

আজ কালই আমি বুঝতে পারব।

সৌগত দেখল একজন লোক তার দিকেই তাকিয়ে দূর থেকে নমস্কার ক'রে এগিয়ে আসছে। তাই দেখে সে অবনীকে বলল, ঠিক আছে দেখুন শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়।

লোকটি সামনে এসে দাঁড়াতে সৌগত হাতের সামনে খোলা ফাইলের কাগজে মনোনিবেশ করার ভঙ্গী ক'রল। অবনী বুঝল তাকে এবার যেতে হবে। সৌগত যখন বুঝল অবনী চলে গেছে চোখ না তুলেই সে বলল, কি চান বলুন?

আমি 'ভাগীরথী উদ্যোগ' থেকে আসছি, জানলেন আগন্তুক।

কি ব্যাপার বলুন? সৌগতর নীরস জিজ্ঞাসা।

আপনাদের এখানে আমাদের কোম্পানীর নাম এনলিস্ট করাবার জন্যে একটা দরখাস্ত ক'রেছি তিন সপ্তাহ হ'ল, কোন জবাব পাইনি।

সময় হলেই পাবেন, কঠিন এবং নীরস জবাব সৌগতর।

মিস্টার সুজয় ঘোষ আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে বলতে বললেন আর এই চিঠিটা দিয়ে দিয়েছেন, বলে একটা বন্ধ খাম সৌগতর হাতে দিতেই সে বলল, আপনি কত তারিখে চিঠি দিয়েছেন লিখে দিয়ে যান কাল এসে খবর নিয়ে যাবেন।

লোকটি চলে যেতেই সৌগত খামটি খুলে দেখল সাদা কাগজে মোড়া পাঁচটা একশ টাকার নোট। পাঁচশো টাকায় কি হবে? মনে মনে ভাবল সৌগত। ওয়ার্ধাকে একটা বোতল তো দিতেই হবে। অবনীবাবুই কি আর বিশ পঁচিশ টাকা না নিয়ে কাজ ক'রবে? কি আর থাকবে অবশেষে? সুজয় ঘোষ কি পাঁচশ টাকা দেবার কথাই বলে দিয়েছে? বোধহয় লোকটা সুজয়-এর নিজের কেউ হবে। যাইহোক ফাইলটা আনলেই সব জানা যাবে।

মনীশ এল বেল টিপবার প্রায় সাত আট মিনিট বাদে, ভীষণ বিরক্ত হ'ল সৌগত, সরকারী অফিসের বেয়ারাগুলো যেন কচ্ছপের মত, নড়ে আর না। মেজাজেও রাজকীয় ভাব। ইচ্ছে হ'লে কাজ ক'রবে নইলে কোথায় গিয়ে বসে থাকবে যে কার সাধ্য তাকে খুঁজে আনে। কিন্তু বলবারও উপায় নেই —এমন এক কায়দায় অসহযোগিতা ক'রবে যে সে হয়ে উঠবে আরও দুঃসহ। কাজেই ওদের খুশীর ওপর আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গতি নেই। কোন রিপোর্টকে ভয় পেতে বয়ে গেছে ওদের—ইউনিয়ন আছে কেন? কাজে গাফিলতির কথা ইউনিয়ন মানবে না ধরে নেবে শ্রমিকের ওপর জুলুম হচ্ছে। ছোটখাট অফিসার পর্যন্তকে তো গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না কেউ, তাই নিজের সম্মান নিজেকেই রাখতে হয়, আর তা রাখতে ছোটখাট অনেক কিছু হজমও ক'রতে হয় না বোঝার ভাণ ক'রে। অনেক কিছুই উপেক্ষা ক'রতে হয় যেমন সৌগত মনীশের

দেরীতে আসা ক'রল, বলল, বড়বাবুকে একবার ভাগীরথী উদ্যোগের কি চিঠি আছে নিয়ে আসতে বল তো —।

মনীশ চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই অবনী দুটো কাগজ হাতে ক'রে এসে ঢুকল। সৌগত বলল, এনেছেন ?

অবনী কাগজদুটো সৌগতর টেবিলে নামিয়ে দিল, জানতে চাইল, আপনার পার্টি তা আগে বলেননি কেন ?

আমার চেনা নয় সুজয় ঘোষ পাঠিয়েছে।

সুজয় ঘোষ এর নাম শুনে অবনী ভ্রূ-কুঁচকে বলল, সুজয় বাবুর কি দরকার এর মধ্যে মাথা দেবার ? ভাগীরথী উদ্যোগের মালিক মালদার পার্টি, সে নিজেই আসত !

আপনি চেনেন নাকি ?

চিনি না জানি, ক্যালকাটা রোলিং মিল, জানকীনাথ টেক্সটাইলস-এর মালিক জগদীশ রুংতার ভাগীরথী উদ্যোগ। ভাগীরথী উদ্যোগ এবছর গুড়ের মরশুমে ছলক্ষ টাকা লাভ ক'রেছে, এখন কন্ট্রাকটরী ক'রতে চায়। এখানে কিছু লোকসান দেখিয়ে ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দেবার মতলব।

কি ক'রে লোকসান দেখাবে ?

প্রথম বছর তো খরচ বেশী দেখিয়ে দেবে।

আপনি তো অনেক খবর রাখেন দেখি—কিন্তু ঠিকাদার ওদের ক'রবেন কি ক'রে ?

সেদিকে কোন ত্রুটি পাবেন না এই দেখুন সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে হিন্দুস্থান কোম্পানীর। জীবন বীমার বাড়ীগুলোর কাজ নাকি ভাগীরথী উদ্যোগ সাব-কন্ট্রাকটে ক'রেছে। এদের চারজন গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার আছে।

কাজ তো সব গোছানোই আছে। কিন্তু এভাবে তো—

ওরা হ'ল পাকা ব্যবসায়ী। যেভাবে হোক কাজ ওরা ঠিকই গুছিয়ে নেবে মাঝখান থেকে আমরা কেন ফাঁকে পড়ি ?

আমি তো এত জানি না। আজ যে লোকটা এসেছিল আমি ওকেই মালিক মনে ক'রেছিলাম।

অবনী ব্যাপারটা বুঝল। সৌগত যখন তাকে ডাকিয়ে ভাগীরথীর চিঠি আনতে বলল তখনই অনুমান ক'রেছিল যে হাতে কিছু এসেছে। এখন বুঝল ভাগীরথীর লোকটা অথবা সুজয় ঘোষ সে-ই হোক সামান্য কিছু দিয়েই কাজ করিয়ে নিতে চেয়েছে। তাই সে বলল, ঠিক আছে। আপনার কাছে এবার ওরা এলে বলে দেবেন, আমার যা করবার ক'রে দিয়েছি আপনি অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা করুন।

মিস্টার ওয়ার্ধার কি ব্যবস্থা করা যাবে ?

আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনি চুপচাপ বসে যান। ভাগীরথী

এখানে এসেছে মিস্টার প্রসাদ-এর জোরে। মিস্টার প্রসাদই সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে।

তবে আবার আমার কাছে পাঠাল কেন সুজয় ঘোষ ?

সুজয় ঘোষকে বোধহয় ওরা প্রসাদ-এর কথা জানায় নি। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। ওদের রহস্য কেউ জানে না। আপনি এক কাজ করুন ঝেড়ে লিখে দিন রেকমেণ্ডেড টু এস, ই। লিখে আমার কাছে অফিসিয়ালি পাঠিয়ে দিন। লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার ক'রবে ওরা সামান্য দু একশ টাকা খরচ ক'রবে না ?

এক একদিন টাকা নিয়েই হয় সমস্যা। এত টাকা হাতে এসে যায় যে কিছু করবার থাকে না। আজকের দিনটাও সেইরকম, তাই অফিস ছুটির পর রাস্তায় বেরিয়ে সমাধান খোঁজবার ভাবনায় কয়েক পা হেঁটেই ফেলল সৌগত। ছশো অপ্রয়োজনীয় টাকার নোট পকেটে অথচ করবার কিছু নেই। ভাবল পার্ক স্ট্রীটের নতুন ঘরটার জন্যে একটা ভাল দেখে খাট কিনে ফেলে বাড়ীওয়ালাকে তার ফার্নিচার তুলে দেয়, পরমুহূর্তে ভাবল অকারণ কি হবে কিনে ? দুদিন বাদেই যদি সুযোগ এসে যায় তো সব ফেলে রেখেই চলে যেতে হবে দেশ ছেড়ে। বরং ভুল হ'ল, কিছু টাকা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিলে ভাল ছিল। কাল তাই দিতে হবে।

আপাততঃ কি করা যায় ? বিশ্রী এই বিকেলগুলো কিছু করবার থাকে না। শুধু রাশি রাশি মানুষ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছে, আর ছুটছে গমের বস্তার মত যাত্রীবাহী বাসগুলো। চৌরঙ্গীতে ট্রামগুলোর তবু একটু ইজ্জত থাকে, অন্য রাস্তায় এগুলোকে দেখলে কষ্ট হয় সৌগতর। সব কিছু মিলিয়ে প্রত্যহের পরিচিত দৃশ্যে কেমন একঘেয়েমী থাকে আজকাল। এখানে উইক-এণ্ড নেই, কাছাকাছি বেড়াতে যাবার জায়গা নেই, আনন্দের আয়োজন নেই, আছে শুধু বৃদ্ধবয়সের উপযোগী কিছু তীর্থ আর তীর্থযাত্রার আয়োজন। যৌবনের জন্য কিছুই নেই এদেশে অথচ আমেরিকা সে মনে হয় যৌবনের দেশ। ইয়োরোপকেও হয়ত ফেলা যেতে পারে তার পর্যায়ে। এ নেহাৎই বৃথা আফশোষ, এখনই যখন আর সেখানে পৌঁছানো যাচ্ছে না তখন এখানকার মধ্যে কোথায় বিকেলটাকে মনোরম করা যায় তারই না হয় চেষ্টা করা যাক। পথ চলতে চলতে নাম মনে ক'রতে লাগল সৌগত—সারেন—ব্লুফক্স—হাওয়াই—পার্ক—একের পর এক সান্ধ্য হোটেলগুলোকে মনে পড়তে লাগল সৌগতর। অন্য সবগুলোর চেয়ে হাওয়াইকেই বেশী প্রীতিপ্রদ মনে হ'ল এই বন্ধ্যা সন্ধ্যার অচল সময়টায়। স্নিগ্ধ-নিষ্প্রভ আলোর তলায় টেবিলে টেবিলে স্বচ্ছ সুরাপাত্রে রঙীন পানীয় উঠছে ঝলমলিয়ে। আর একটু পরেই কোনও এক সুন্দরীর সুতনু সর্পিল ভঙ্গীতে গীতিময় হয়ে উঠবে ঝাঁজাল সঙ্গীতের ঝাঁকানিকে অতিক্রম ক'রে। তার

শরীরের ভাঁজে ভাঁজে জ্বলে উঠবে হীরকদ্যুতি। তার হাতের মুদ্রায় সম্মোহ। ব্যাণ্ডমাস্টার সওদাগর সিং সুর দিয়ে অদ্ভুৎ মায়াজাল বিস্তার করে সময়ে সময়ে। সব মিলিয়ে হাওয়াই-ই এখন একমাত্র আকর্ষণ।

রাস্তার ধারের টিনের ঝাঁপের ছোট্ট দোকানটা থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিল সৌগত। পকেট থেকে মোমকাঠির দেশলাই বের ক'রে ধরিয়ে নিল একটা। এইটুকু করবার জন্যে যেটুকু সময় ব্যায় হওয়া উচিত তার চেয়ে একটু বেশী সময়ই দাঁড়াল। আসলে সে চাইছিল সন্ধ্যার অন্ধকার একটু ঘন হোক। নইলে তার ভাল লাগে না, বাইরে অন্ধকার না হ'লে কোনদিনই তার হোটেল রেঁস্তুরেন্টে গিয়ে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। অথচ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় ভাল রকমই জানে এই সব হোটেলের ভেতরে কখনও দিন হয় না, চিররাত্রি। ভেতরে গেলেই সে পেতে পারে সেই স্নিগ্ধ অন্ধকার, নরম আলোর আমেজ। তবু এই একটা তার অভ্যেস, বাজে অভ্যেস বলেই এখন মনে হ'ল তার। তাই অযথা কাল হরণের জন্যে ধীর পায়ে বাঁ পাশে দোকানগুলোর শোকেসে ঝোলানো সার্ট, ফোমরবারের গদি, মোটর সাইকেল, ওষুধ এমন কি বই পর্যন্ত দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে হেঁটে চলল। মাঝে মাঝে চোখ পড়তে লাগল বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসা দু একটি সুবেশ তরুণীর দিকে। দুচারজনের বেশবাশ দেখে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ল মাঝে মাঝে। কি সব অদ্ভুৎ পোষাক হয়েছে আজকাল, মনে মনে ভাবল সৌগত। তখনই মনে পড়ল আজকাল নাকি কোন কোন ছোকরা বাসের ভীড়ে মেয়েদের জামা ব্লেড দিয়ে কেটে দিচ্ছে। ভালই করছে, সৌগত সিদ্ধান্ত ক'রল, এই রকম পোষাক পরলে কেটে দেখা উচিত ওদের দেহে কি আছে। দেহের মধ্যে কি থাকলে এমন গরম হতে পারে? সত্যি বলতে কি তার এইসব মেয়েদের প্রত্যেকটিকে একবার ক'রে পেতে ইচ্ছে করে। এদিক দিয়ে রুমি অনেকটা পুরানোপন্থী। পোষাকের এত বাহার সে জানে না অথবা পছন্দ করে না। সমস্ত দিক থেকে চিন্তা করলে অনেক মডার্ণ মেয়ে হ'ল শান্তা। সে অনেকটা প্রকৃতির মত। কোন সময় কোন ডিজাইন সাজসজ্জায় চালু হচ্ছে তা শান্তাকে দেখলেই বোঝা যায়। কোথায় যে এত ডিজাইন সে পায় সৌগত বোঝে না। আজ শান্তা যেটা পরছে আগামীকাল সেই পোষাকে অন্য মেয়েকে দেখা যায় রাস্তায়, আগে নয়। সত্যি শান্তার মধ্যে প্রাণের বন্যা আছে। সারারাত নাচো শান্তা নাচবে। সারারাত শুধু মদ খাও শান্তা পরের সময়ের কথা না ভেবে মদই খেয়ে যাবে সমানে পাল্লা দিয়ে। বড় রহস্যময়ী মেয়ে এই শান্তা, আজ পর্যন্ত জানাই গেল না কোথায় বাড়ী, কিছুতেই জানতে দেবে না। কোথায় কখন আসতে হবে বলো ঠিক পেঁৗছে যাবে, কখনো বলবে না তুমি এস। শান্তার কথা মনে হতে সৌগতর মনে হ'ল এই সময় শান্তার সঙ্গে দেখা হ'লে ভাল হ'ত। উপায় তো নেই, কি ক'রে দেখা করা যাবে? নাঃ এই একটা দোষ মেয়েটার, আগে

থেকে কথা বলা না থাকলে আর পাবার উপায় নেই ওকে।

ঘড়িতে দেখল পাঁচটা চল্লিশ। নাঃ সময়টা কিছুতেই কাটছে না। অফিস থেকে আগে না বেরোলেই ভাল ছিল! পাঁচটায় ছুটি, পনের মিনিট আগেই বেরিয়ে এসেছে সে। এখন কোথায় যায়? বরং পার্ক স্ট্রীটে নতুন ভাড়া নেওয়া ঘরটায় গিয়েই কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা যাক। দুই চোখ বন্ধ ক'রে না ঘুমিয়ে নিঃশব্দে শুয়ে থাকা। তবে আগে কিছুটা হুইস্কি বা ভাল ব্রাণ্ডি খেয়ে নিতে পারলে ভাল হ'ত। চুপচাপ শুয়ে তার আমেজটা পুরোমাত্রায় ভোগ করা যেত। একবার শুয়ে পড়লে আবার উঠে আসা আর হয়ে উঠবে না। ভাবতে ভাবতে কিছুই ঠিক ক'রতে না পেরে সে এসে পৌঁছে গেল পার্ক স্ট্রীটে চৌরঙ্গীর মোড়ে। ডান দিকে ময়দানের পাশটায় পাথর হয়ে আছে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী—সৌগতর নজরে পড়ল। মহাত্মা গান্ধী, মনে মনে বলল সৌগত অকারণেই। বাবার কথা মনে হ'ল সৌগতর, বাবা গান্ধীভক্ত। শুধু গান্ধীভক্ত বললে ঠিক হবে না, ভক্তিটা গান্ধীকে কেন্দ্র ক'রে নেহরু, লালবাহাদুর—যে যখন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু তার ওপরেই পড়েছে। গান্ধী দেশকে স্বাধীন ক'রে গেছে — একবার গান্ধীর মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রতে চাইল সে। সৌগত বেইমান নয়, সে সব সময় স্বীকার করে স্বাধীনতাটা যদি এভাবে না এসে পড়ত তা'হলে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে যে সব সুযোগ সুবিধে ভোগ ক'রছে তা তো আর পেত না! সত্যিই ইংরেজরা সব লুটেপুটে খাচ্ছিল নইলে ইংরেজরা চলে যাবার পর এই কয়েক বছরের মধ্যে দেশের এতগুলো লোক বড় লোক হ'য়ে গেল কি ক'রে? তখন বিড়লাদেরই বা আজকের তুলনায় কতটুকু কি ছিল? এখন তো কত ছোট ছোট বিড়লা জন্মে গেছে নানা পদবী নিয়ে, ইংরেজরা থাকলে কি উঠতে পারত এরা? সবই তো বিদেশে চলে যাচ্ছিল। গান্ধীর মূর্তির সামনে এসে রাজনৈতিক ভাবনাগুলো খেলা ক'রতে লাগল সৌগতর মনে অথচ সৌগত কোনদিন কোন রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় নি। ওসব হয় নেতাদের নয় বাজে ঝামেলার লোকদের কাজ — তার ধারণা। তবে আজ নিজের ভাবনার প্রকাশ দেখে নিজেই যেন অবাক হয়ে গেল সৌগত, এত কথা তার মনের মধ্যে আছে তা সে নিজেই জানত না! আর সত্যি কথা বলতে কি গান্ধীর এই মূর্তির সামনে এমনভাবে দাঁড়ায়ও নি সে কখনও। কখনও অবকাশ হয় নি তার। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রাস্তার গাড়ীগুলোকে দৌড়াদৌড়ি ক'রতে দেখল তারপর একটা জুতো বুরুশওয়ালাকে ডেকে তার বাক্সের ওপর বাঁ পাটা তুলে দিয়ে বলল, ক্রীম লাগা।

মনের ভাব বদলাতে একটা দরজার ব্যবধান যে যথেষ্ট এ কথা বোঝা গেল

হাওয়াই-এর কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে দুটো পা পৌঁছে যাবার মুহূর্তেই। সুন্দরভাবে লালচে রঙকরা দেয়ালের গায়ে অন্ধকারের ছায়া লেপ্টে আছে। প্রথম ঢুকেই টেবিলের দুপাশে বসা মুখ, দূরের কাউন্টারের সামনের মানুষ কোনটাই স্পষ্ট ক'রে দেখা যায় না। শুধু এক অদ্ভুৎ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে কাউন্টারের পেছনে সকলের নাগালের অনেক বাইরে সাজিয়ে রাখা নানা রকমের সারি সারি বোতল। সেদিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে রইল সৌগত কয়েক সেকেণ্ড। তারমধ্যেই তার চোখ এই মৃদু আলোর অন্ধকারকে অভ্যেস ক'রে নিল। তখন সে এক পা দু পা ক'রে এগোতে লাগল চারদিকে চোখ রেখে। বাঁ দিকে বাঁক নিতেই ঘর ভরিয়ে মাইক বলে উঠল, নাউ মিস রিনা দাস প্রেজেন্টস হার মেলডিয়াস ভয়েস উইথ হার নিউ কম্পোজিশানস।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোনটা, কাউন্টারের বাঁপাশে, আলোকিত হয়ে উঠল, দেখা গেল একদল বাদ্যযন্ত্রীর পশ্চাদপটে মাইক সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘাঙ্গিনী রিনা দাস একটা চাঁপাফুল রঙের শাড়ী পড়ে। আর প্রায় সেই মুহূর্তেই ঝাঁজাল শব্দের একটা বিরাট মেঘ যেন লাফিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। তার মধ্যেই মেশানো রিনার কণ্ঠস্বর। তীব্র, তীক্ষ্ণ এবং উত্তেজক। কিন্তু রিনার গান! সৌগত ভাবল বেরিয়ে যায়। এই ঘরটুকুর মধ্যে এত কড়া শব্দের মাইকে রিনার গান শুনতে বসে থাকার কোনই অর্থ হয় না। তা ছাড়া, সে ভাল ক'রে চোখ বুলিয়ে নিল চারিদিকে, একটা বসবার জায়গাও খালি নেই। এই শ্রোতা কি রিনার, না পরের প্রোগ্রামের জন্যে সবাই আগে-ভাগে এসে জায়গা ক'রে নিয়েছে? সৌগত দাঁড়িয়ে ভাবল ওপাশে গিয়ে বসবার জায়গা খুঁজবে, না বেরিয়ে যাবে? রিনার গানে যে আকর্ষণ আছে তার চেয়ে অনেক বেশী আছে ওর দেহে। সেটা বোধহয় ও নিজেও বোঝে নইলে অত দেমাক কিসের? ভাল গাইয়ে যারা হয় তারা তো রেডিও-সিনেমা-জলসায় গান গাইবে, এখানে আসবে কেন? এখানে গানের সঙ্গে অন্য কিছুও লাগে — অথচ রিনার কি সতীপণা। এ সতীপণা অবশ্য ভালই লাগে এখন যে সতীপণা করে জলি, সে কি ভাল লাগে না? পরে যাই হোক, যখন সে নেশা ধরার মত সুরে গলা-জড়িয়ে ধরে বলে, সত্যি দাত্তা এত লোক জীবনে দেখলাম কিন্তু ওনলি ইউ, তোমাকে ছাড়া আর ভালবাসবার মত কাউকে পেলাম না — তখন বিশ্বাস যেন আপনি এসে যায়। সেই মুহূর্তে বিশ্বাস না ক'রে পারা যায় না। অথচ তার পরই, জলির ফ্ল্যাট থেকে বাইরে বেরোন মাত্র সব মিথ্যে মনে হয় তবু পরে যখন জলি আবার বলে তখন আগের সব ভুলে যেতে হয়। বর্তমান সত্য হয়ে ওঠে। এসব সতীপণা সৌগত অনেক দেখেছে। এসব মেয়েদের সকলকেই চেনে সৌগত, দ্যাখনা সতীপণা। এছাড়া ওদের আছেই বা কি, চিৎ হ'লে তো সব মেয়েই এক। জলি, সবিতা, রাখী

—সবই তো দেখা হ'ল। মুখে ওরা যাই বলুক না আসলে ট্যাক্সি। অনেককেই চড়িয়েছে। বুকে তুলেছে রিনা-ও। ও যদি হলফ ক'রে অস্বীকার করে তবু সৌগত বিশ্বাস ক'রবে না।

একটা চড়া সুরের হিন্দি ছবির গান ধরেছে রিনা দাস। গানটা সৌগতর ভাল লাগে কিন্তু এখন লাগল না। বরং খুবই খারাপ লাগল। বেয়ারা আবদুল এসে অভ্যর্থনা ক'রল উর্দু মেশানো হিন্দিতে, সায়েব কি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ?

না, এইমাত্র। — বাংলা মেশানো হিন্দিতে জবাব দিল সৌগত।

আমি এখনই জায়গার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

থাক, দরকার নেই, আমি একটু ঘুরে আসি।

আবদুল খুব গোপন খবর দেবার ভঙ্গীতে বলল, আজ জায়গা পাবেন না সাব। আজ স্পেশাল নাচের প্রোগ্রাম আছে মার্থারণ।

নামটা যাদুমন্ত্রের মত কাজ ক'রল। সৌগত মনের চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে চুপ ক'রে রইল। আর একবার কলকাতা এসে নাচ দেখিয়ে মোহিত ক'রে গিয়েছিল এই মার্থা। রসের তৃষ্ণা না মিটতেই অকস্মাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল লঠ্‌য়া যৌবনের সুরাসার। আবার সে ফিরে এসেছে আপন ইচ্ছাতেই, এসেছে এই হাওয়াই-তে। ব্যাপারটা কি সোজা উত্তেজনার ? আজ তো তবে খাবারের স্পেশাল মেনু! বাইরেও নিশ্চয়ই ব্যানার পড়েছে, কি আশ্চর্য সৌগত লক্ষ্যই করেনি! যাক তবু সার্থক হয়েছে ঢোকা। কিন্তু যদি অতবড় ব্যাপারই আছে তবে আবার গোলাপের সঙ্গে কদমফুল কি দরকার ছিল ? কি দরকার ছিল রিনা দাস-এর এই মেঠো প্রোগ্রামের ? অকারণ সকলের কানের পোকা না বার ক'রে দিলে কি আর চলছিল না ? যাক গে কিছুক্ষণ না হয় কান বন্ধ করেই কাটানো যাক আর কি হবে।

সাব! — আবদুল ডাকছে। কয়েক মুহূর্তের চিন্তার অবসরেই সরে গিয়েছিল সে, ফিরেও এসেছে, বলল, আসুন সাব, জায়গা ক'রে দিয়েছি।

দুচারটে টেবিলকে পাশ কাটিয়ে আবদুল একটা কোণে নিয়ে গেল। সেখানে একটা টেবিলে দুজন বসেছিল একটা অতিরিক্ত চেয়ার দিয়ে বসিয়ে দিল সৌগতকে। ঠিক সুস্থভাবে নিতে না পারলেও সৌগত বসবার জায়গাটুকু যে পেল এতেই কিছুটা খুশী হ'ল। আবদুলকে বলল, হুইস্কি। আর শোন, আজকের স্পেশাল মেনু কি আছে ?

ফ্রায়েড চিকেন ক্রীম স্পেশাল, আবদুল সবিনয়ে জানাল।

ঠিক আছে তাই দাও, হুকুম ক'রল সৌগত। সামনের লোকদুটোকে চোরা চোখে তাকিয়ে দেখল বেশ আরাম ক'রে সিগারেট টানছে। কথা বলছে না। ওরা কি বিরক্ত হয়েছে তার উপস্থিতিতে ? হলেই বা কি আছে ? উঠে তো আর যাবে না সৌগত, ওরা যদি রাগ করে থাকে তো রাগ ক'রেই বসে থাক। বরং ওরা কত রাগ ক'রতে পারে তাই দেখবে সৌগত। এমন

বিল-কাপে অনেকগুলো বিলই জমেছে। বেশ ভালরকমই মাল টেনেছে তাহ'লে দুজন। এরই মধ্যে বুঁদ হয়ে গেছে। ওদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে রিনার ওপর নজর গিয়ে পড়ল। পেছনের টেবিলে কে একজন বলে উঠল—উয়োমেন বাই ব্রেস্ট। যা-ই বলুন মিস্টার বক্সী এরকম ব্রেস্ট খুব কম মেয়ের দেখা যায়।

অন্য লোকটির জবাব শোনা গেল না। সৌগত বুঝল আলোচনাটা রিনা সম্পর্কেই হচ্ছে। যে লোকটা আলোচনা সুরু ক'রল, শুনেই সৌগত বুঝতে পারল নেশার ঘোরে বকছে লোকটা। পেটে একটু মাল পড়লেই যারা বকবক করে তাদের থেকে সৌগত আলাদা। সে যতই গিলুক চুপ ক'রে থাকবে। বক্সী পদবীর লোকটি সৌগতর পেছনে বসে থাকার জন্যে সৌগত তার মুখ দেখতে পাচ্ছিল না, সে কোন শব্দ ক'রল না। অন্য লোকটি আবার বলল, কি ঠিক বলিনি? উয়োম্যান বাই ব্রেস্ট—বেশ জোরে উচ্চারণ ক'রল লোকটি। তারপর অপেক্ষাকৃত আস্তে অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলল, বউগুলো সব নিমাই হয়ে যায় আর দেখুন তো মশাই ব্রেস্ট না থাকলে সে আবার কিসের মেয়েমানুষ? আপনি দেখেছেন, এই মেয়েটার মত আর একটা দেখেছেন?

বক্সী নামক লোকটি এত প্রশ্নের পরেও আশ্চর্য নিঃশব্দ। চুপচাপ। সৌগতর একবার দেখবার ইচ্ছে হ'ল লোকটা একমুখ খাবার পুরে বসে আছে কিনা। ভদ্রতার ভয়ে পেছনে তাকাতে পারল না। কি জানি কেন তার ওই বক্সীর মুখ থেকে একটা শব্দ শোনবার অথবা তার মুখটা একবার দেখবার বড্ড ইচ্ছে হ'তে লাগল। শুধু ওই বক্সী নয়, যে লোকটা অনবরত বকে চলেছে তাকেও ওর একবার দেখবার ইচ্ছে হ'ল। সৌগত নিজেই ভাবল এরকম ইচ্ছে হবার সঙ্গত কোন কারণ থাকতে পারে না কারণ এরকম দৃশ্য তো আজ নতুন নয়, অসংখ্যবার এরকম দৃশ্য চোখে পড়েছে, অনেকেরই মুখ দেখা গেছে কখনও দেখতে ইচ্ছে হয়নি। মাতালও বহুরকম দেখেছে সে। মল্লিনার বাবা দুবোতল ধেনো টেনে এসে রোজ রাতে বউকে না পিটিয়ে ঘুমোত না এ তার চোখের সামনেই ঘটেছে। তার সহকর্মী অজিতেশ, তার মুখ দিয়ে এমনি সময়ে কথা খুবই কম বেরোয় সেই অজিতেশ দু পেগ খেলেই খিস্তি ক'রতে সুরু করে, অশ্লীল কথাবার্তা বলে চলে। তাদের অফিসের বয়স্ক কেরানী চন্দ্রবাবু একদিন গল্প ক'রতে ক'রতে বলেছিল, জানেন দত্তবাবু একটু আধটু মালটাল খাই। অনেকদিন ধরেই খাই। আমার কিন্তু নেশা যাকে বলেন তা কোনদিনই হয় না, তবে মাল খেলে আমার শুধু ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে।

তখন কি করেন? জানতে চেয়েছিল সৌগত।

বেড়াই। আগে তো অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতাম আজকাল

বুঝলেন কিনা, বয়েস হয়ে গিয়েছে বলে বউ বলে রাত ক'রে না বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে শুয়ে পড়তে। তাই একটু আধটু ঘুরেই শুয়ে পড়ি।

এছাড়াও অনেক রকম মাতাল দেখে অভ্যস্ত তবু কেন যে আজ পেছনের মাতাল দুজনকে দেখবার এত ইচ্ছে হচ্ছে সৌগত ভেবে পেল না। আর ভাবনার অবসরও বেশী পেল না, আবদুল এসে রুমাল, কাঁটাচামচ ইত্যাদি নামিয়ে দেওয়াতে। অর্থাৎ শীঘ্রিই খাবার আসছে। ড্রায়েড চিকেন ক্রীম—রসনা উন্মুখ হয়ে উঠল। মনটাও যেন একটু নড়ে চড়ে বসল! রিনার গান অনেকটা সহ্য হয়ে এসেছে। ভাল না লাগলেও খুব একটা বিরক্তিকর মনে হচ্ছে না। শব্দটা ঘরের আয়তনের তুলনায় আর একটু কম হলে ভাল ছিল। ওপাশে কে একটা অসভ্য লোক বসেছে দারুণ শব্দ ক'রে চলেছে ছুরিচামচের। অভ্যেস নেই আর কি। কাঁটা চামচের পাঠ নিচ্ছে বোধ হয়। আজকাল কাঁচা পয়সা অনেকেই রোজগার ক'রছে, কানুন না জেনেই হুটহাট ঢুকে যাচ্ছে সব জায়গায়। তাদেরই একটা কেউ এসেছে আর কি! আসুক। তবে ব্যাটা এমন একটা কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারত যে কায়দা কানুন জানে। পয়সা তো অনেকই আছে সঙ্গীর জন্যে না হয় কিছু খরচাই হ'ত! আসলে ব্যাটারা কৃপণ। নিজের জন্যে কিছু কিছু খরচা কখনো কখনো ক'রে ফেলে।

আবদুল বিরাট একটা চীনামাটির প্লেট নামিয়ে দিল সামনে। ড্রায়েড চিকেন ক্রীম—আজকের স্পেশাল মেনু।

গুড ইভিনিং স্যার, আবদুল-এর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে একজন পদস্থ হোটেল কর্মী, নিজের পরিচয় দিল সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, আই য়্যাম মেহেরা।

থ্যাঙ্ক য়ু, সৌগত বলল।

পরক্ষণেই চোস্ত ইংরিজীতেই মেহেরা ধীরস্বরে বলল, আপনাকে নীরো দ্য এম্পায়ার দিই? নতুন ফ্রেঞ্চ হুইস্কি, পৃথিবীর সেরা। আপনি আমাদের পুরোনো এবং সম্ভ্রান্ত খদ্দের—

সৌগত খুশী হ'ল। ইংরিজীতেই, বলল, এ কি নতুন জিনিষ? আগে তো কখনও পাই নি!

না স্যার এটা ফ্রান্সের—কোম্পানীর একটা নতুন তৈরী হুইস্কি। খুবই ভাল হয়েছে। দেখুন না একটু আস্বাদন ক'রে —।

বেশ দিন —

আবদুল এতক্ষণ প্রতীক্ষা ক'রছিল, সৌগতর কথা শেষ হওয়া মাত্র চলে গেল, মেহেরাকে আর কিছু ক'রতে হ'ল না। মেহেরা কিন্তু তখনই গেল না, বলল, আপনাদের দু'চারজন অভিজাত খদ্দেরের জন্যে এসব সেরা জিনিষ আনাতে হয়। কলকাতার কোনো দোকানে এ জিনিষ পাবেন না, দু একটা

মাত্র অভিজাত হোটেলেই শুধু পাবেন। অলরাইট, আমাদের স্পেশাল খাবার টেস্ট করুন। —বলে আর দাঁড়াল না মেহেরা।

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুৎই ঠেকল, মুরগীর মাংস তবে হাড় নেই। কাঁটা-চামচটা ঢুকিয়ে মনে হল মাখনের মধ্যে চামচ দিয়েছে সে, মুখে দিয়ে বুঝল ব্যাপারটা নতুন বটে। মুরগীর মাংসকে তার হাড় থেকে ছাড়িয়ে আশ্চর্য-রকম গলিয়ে মাখনে পরিণত ক'রেছে আর কী তার স্বাদ! সত্যিই স্পেশাল, অভিনব। মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

অন্য একটা কি গান গাইছে রিনা দাস। বেশ গানটা। কথার বিন্দুবিসর্গ না বুঝলেও সুরটা কানে বড়ই সুন্দর লাগছে। রিনার দিকে তাকাল। অদ্ভুৎভাবে সারা দেহ ঝাকাচ্ছে মেয়েটা। শরীর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে গাইছে গানটা। এই তো দোষ! এমন অঙ্গভঙ্গী মেয়েটার যে শরীর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সমস্ত ঘরটা যেন চনমন ক'রছে। তার পেছনে বক্সীর সঙ্গী লোকটি উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, আঃ আঃ। ঘর সুদ্ধ চেয়ে আছে রিনার দিকে। সুরে সুরে শরীর দোলাচ্ছে রিনা, দোলাচ্ছে না ঝাঁকাচ্ছে। সত্যি বলতে কি সৌগতরও খেতে ইচ্ছে ক'রল না, চেয়ে থাকতে ইচ্ছে ক'রল। সামনের দিকের একটা টেবিল থেকে একটি অল্পবয়স্ক ছোকরা পেগটা হাতে উঁচু ক'রে তুলে ধরে উঠে দাঁড়াল, উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল, জিন্দেগী জিন্দেগী।

ছোকরাটিকে দেখে সৌগত ভাবল, জীবনটাকে ভোগ ক'রতে পেয়েছে এরা, ভোগের জীবন। এত অল্প বয়সে জীবনকে ভোগ ক'রতে পারার ভাগ্য ক'জনের হয়? ছেলেটা নিশ্চয়ই মাড়োয়ারী, নইলে এত পয়সা আর কাদের হবে? আজকাল তো জীবন ওদেরই সার্থক। যা কিছু ভোগের আয়োজন সবই ওদের জন্যে, যা কিছু ভাল জিনিষ তৈরী হয় কেনে ওরাই। আগে, কলকাতা যখন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল তখন যে সব বাড়ীতে বড় বড় সাহেবরা থাকত এখন সেসব বাড়ী মাড়োয়ারীদেরই দখলে। কলকাতা সহরে স্কুলের বাস যতগুলো আছে তার প্রায় চারভাগের তিনভাগই মাড়োয়ারীদের স্কুলের। সবই যখন ওদের, সায়েবদের জায়গায় যখন ওরাই বসেছে তখন পার্কস্ট্রীটের হোটেলগুলো যে ওরাই চালাবে এতে আর ভাববার কি থাকতে পারে? তবে এত কম বয়সেই এত সুখ করায়ত্ত হবে! সৌগত নিজের অজান্তে যেন ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল।

ওহো—ওহো—ওঃ—ওঃ—ওঃ—ওঃ—উন্মত্ত চীৎকারের মত শব্দে রিনার দিকে নজর ছুটল সৌগতর। গানের মধ্যেই আশ্চর্য সুরে শব্দ ক'রছে রিনা। আর তারও চেয়ে বিস্ময়কর ভঙ্গীতে কাঁধ পর্যন্ত শরীরের ওপরের অংশ সামনের দিকে দোলাচ্ছে শব্দের তালে তালে। দৃশ্য এবং শব্দে যেন উন্মাদ ক'রে দিচ্ছে ভেতরটাকে। নদীতে হঠাৎ বান এসে পড়লে যেমন মাঝিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে নৌকা বাঁধতে বা সামলাতে তেমনিভাবে নিজেকে সামলাবার জন্যে

ব্যস্ত হয়ে পড়ল সৌগত, নইলে এই মুহূর্তে এক উথালপাতাল বন্যাবেগে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় ফেলবে তারই শংকায় সে বিহবল হয়ে পড়ল। সে বেশ বুঝল সংযমের যে বালিয়াড়ী ছিল তা রিনার সুরের ধাক্কায় ভেঙে তলিয়ে গেছে, ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে রিনার শারীর মুদ্রার স্রোতোবেগ।

হৈ হৈ ক'রে উঠল আপাতশান্ত দর্শকমণ্ডলী। অভিনন্দন, উচ্ছ্বাস, আসক্তি —সব মিলিয়ে একটা কিছু অথবা সব কিছু একসঙ্গে মিশে রইল সেই শব্দের মধ্যে। অনেক কণ্ঠের এক ঝলক শব্দ একনিমেষ রিনা দাস-এর সুর ডুবিয়ে দিল। উৎসকে ছাপিয়ে উঠল অভিনন্দন। নাঃ রিনা দাসকে অস্বীকার করা যায় না। মার্থার নাচ কি সম্মোহ রচনা করে জানেনা সৌগত, রিনার সুর আর প্রকাশছন্দ যা করে তাই বা কম কি? রক্তের মধ্যে কি এক যাদু স্পর্শ রেখে যায় সে যে রক্তের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার হয় আর তা এত দ্রুত হয় যে তার কাছে পৃথিবীর সব রকম মাদক দ্রব্যই ম্লান হয়ে যায়। সৌগতর ইচ্ছা হ'ল সে উঠে গিয়ে এখনই জাপটে ধরে রিনাকে। শেষবারের মত চেষ্টা ক'রে দেখে একবার তাতে যা হয় তা হবে। ধরা না দেবার, আর আগুন ধরাবার খেলার নিষ্পত্তি সে এখনই ক'রে ফেলে। উয়োম্যান বাই ব্রেস্ট—ঠিকই বলেছে পেছনের লোকটা।

আবদুল এসে নামিয়ে দিল সোডার জলের বোতল, কাঁচের সুন্দর গ্লাসে সেই লোভনীয় ফরাসী সুরা, নতুন এবং অভিনব। সৌগত বস্তুটির দিকে তাকিয়ে দেখল। আবদুল বোতলের ছিপিটা খুলে অতি সন্তর্পণে হুইস্কির গ্লাসে সোডা ঢালতে লাগল।

আবদুলকে ডেকে আর এক পেগ হুইস্কি আনতে বলল সৌগত। খুব খুশী হয়েছে সে, খুবই খুশী। সত্যিই একটা আসল ফরাসী হুইস্কি আনিয়েছে এরা। রিয়্যালি ওয়াণ্ডারফুল, স্বগত উচ্চারণ ক'রল সৌগত। এক পেগ খেয়েই মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে কি সুন্দর সুর বাজছে। লঘুছন্দে নৃত্যের উৎসব চলেছে মনোহর এক স্বপ্নের মধ্যে। নাঃ এরকম মদ একা বসে নির্জন ঘরে খেতে হয়। নিভিয়ে দিতে হয় ঘরের বাতি—স্বপ্নের মধ্যে অসংখ্য তারার প্রদীপ জ্বলতে থাকে সমস্ত স্নায়ু জুড়ে। রঙ-বেরঙের বাতি। তা থেকে রঙমশালের রোশনাই ঠিকরে ঠিকরে বেরোয়। এই তো স্বর্গ। ওই স্নায়ুর মধ্যে বেজে চলা নূপুরের নিক্কণ এ তো সেই অপ্সরাদেরই নাচের শব্দ!

আবদুল হুইস্কি এনে দিতেই সৌগত বলল, মিস্টার মেহেরাকে একবার পাঠিয়ে দেবে আর এক প্লেট চিকেন ক্রীম নিয়ে আসবে।

অভিবাদন ক'রে চলে গেল আবদুল। একটু বাদেই এল মেহেরা, ইয়েস স্যার —!

ইংরাজীতেই ধন্যবাদটা দিল সৌগত, বলল, আপনাদের এই সুন্দর আবিষ্কারের জন্যে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মেহেরা বলল, আপনাদের মত সম্মানিত খদ্দেরদের জন্যে আমরা গর্ব করতে পারি। হাওয়াই—আপনাদের সন্তুষ্ট ক'রতে সব সময়েই সচেষ্ট।

এরকম কথা শুনলে সৌগত বরাবরই একটু বেশী খুশী হয়ে ওঠে। শুনতেও চায় সে। তাই গর্বিত স্বরে বোকার মত বলল, সেটা আমরা স্বীকার করি।

মেহেরা আর কথা বলা প্রয়োজন মনে ক'রল না। তার কাজ সে ক'রে যাচ্ছে। করেও তারা কলের পুতুলের মত। দম দেওয়া কলের পুতুল যেমন নিয়মমত নড়ে চড়ে মাথা নাড়ে মেহেরাও তেমনি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে খদ্দেরদের আপ্যায়নের জন্যে যতটুকু কথাবলার দরকার ততটুকু নিখুঁত ভাবেই বলে, আন্তরিকতার নিপুণ অভিনয়ে। তাছাড়া এখানে যারা আসে মদ খায় পাগলের মত ব্যবহার করে, বোকার মত কথা বলে তাদেরকে ওর মানুষ বলেই মনে হয় না অথচ এরাই নাকি সব বড়মানুষ! এক একজন আবার হাউমাউ ক'রে কাঁদে—সে খুব কম। তবে তাদের দেখলে মুখের ওপর সজোরে একটা লাথি মারতে ইচ্ছে করে মেহেরার। অথচ তা সম্ভব নয় বলেই অনেক সময় সেইসব গাড়োল-গুলোকে খাতির ক'রে যত্ন ক'রে শান্ত ক'রতে হয়। কত রকম লোকই যে আসে, কত মূর্তিই যে দেখা যায় বড়মানুষগুলোর! মেহেরার মনে হয় মদ হচ্ছে একটা এমন জিনিষ যা সকলের আসল রূপ বের ক'রে দেয়। সেজে থাকা বড়মানুষীর মুখোস টেনে ছিঁড়ে আসল লোকটিকে যখন সামনে আনে তখন সেই একসময়ের বড়মানুষ খ্যাঁকশিয়ালের করোটির মত ভ্যাংচাতে থাকে সমাজটাকেই। মাঝে মাঝে কাজের ঝামেলা কম থাকলে সে এক কোণে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ লুকানো এই প্রাণীগুলো মানুষ কিনা। সে ভেবে পায় না মনুষ্যত্ব এদের কোনখানে? সহানুভূতিশূন্য, বিবেকহীন, স্বার্থপর এই জীবগুলোও যদি মানুষ হয় তাহলে মানষের নিচে আর কোন প্রাণী আছে পৃথিবীতে?

সৌগত সম্বন্ধে কিছু মনে হবার আগেই মেহেরা সেখান থেকে থেকে সরে গেল। সৌগত নিজে উঠে পড়ল খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে। সে বেশ বুঝতে পারছিল নির্ভেজাল ফরাসী সুরা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে। সময় থাকতে উঠে পড়া উচিত। এখানেই বেহেট হয়ে যাওয়ার আগে বেরিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে। হাত ঘড়িতে দেখে নিল ন'টা। এখনও সময় আছে। এখনও গিয়ে পৌঁছোলে জলিকে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। না পাওয়া গেলে পাড়ায় ঢুকে কাউকে একটা খুঁজে নিলেই হবে। নইলে এত আনন্দ উত্তেজনার মধ্যেও কেমন জোলো জোলো লাগছে যেন সন্ধ্যেটা। সবচেয়ে ভাল হ'ত এই সময় রবীনকে পেলে। রবীনের মত মেয়েমানুষ বাছিয়ে খুব কমই দেখা যায়। ব্যাটার এলেম আছে। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে আবদুল দৌড়ে এল। সৌগত পকেট থেকে ছটা দশটাকার নোট বের ক'রে দিয়ে বলল, ফেরৎ টাকা তুমি নিয়ে নিয়ো। ইতিমধ্যে সে মিলিয়ে নিয়েছিল পঞ্চান্ন টাকা বিল হয়েছে।

এরকম বকশিসের বিনিময়ে যে বড় রকমের সেলাম পাওয়া যায় সেটার জন্যে আর সৌগত অপেক্ষা ক'রল না। পরে যেদিন আবার আসবে সেদিন আবার খাতির ক'রবে আবদুল, জায়গা না থাকলেও দৌড়ে গিয়ে জায়গার ব্যবস্থা ক'রে দেবে, ব্যবহার ক'রবে একান্ত অনুগত ভৃত্যের মত।

কোনদিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে এল সৌগত। গেটে যে পাগড়ী বাঁধা দারোয়ান দরজা খুলে দিয়ে সেলাম ক'রল সেদিকেও সে ভ্রূক্ষেপ ক'রল না। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সির দরজা খুলে উঠে পড়ল তাতে। পকেট থেকে সিগারেট বের ক'রে ধরিয়ে নিল। পেছনে হেলান দিয়ে শুয়েই পড়ল প্রায়, বলল, আমীর আলি এভিন্যু।

এতদিনের অভ্যেস-এ তৈরী হওয়া অদৃশ্য বেড়া দিয়ে প্রত্যেকের ঘর যে আলাদা ছিল সেটা এমিলি এসে কি আশ্চর্যভাবে প্রজাপতির মত ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে চলাফেরা ক'রতে লাগল। শুধু তাই নয় রুমির মাঝে মাঝে মনে হয় মার সযত্নে তৈরী বেড়াটাকে যেন ভেঙ্গেই দিয়েছে এমিলি। হয়ত না জেনেই ভেঙ্গেছে। কিন্তু অবাক হবার বিষয় হচ্ছে এই যে মা কিছু বলে নি, বাধা দেয় নি, প্রতিরোধ করে নি। যখন তখন রুমির ঘরে এসে ঢুকে পড়া, কিছু একটা ঠেকলেই এসে জিজ্ঞেস ক'রে নেওয়া বা নেহাৎ মন খারাপ হ'লে গল্প করা, সব কিছুর জন্যেই কেমন অবলীলাক্রমে বেছে নিয়েছে সে রুমিকে। রুমি বান্ধবী এবং সঙ্গিনী। রুমি ভগ্নী এবং সহচরী। ডাকেও সে বোন বলেই, সিস্টার। এদেশে আসবার আগে প্রসেনজিতের কাছে তার সংসারের খবর নেবার সময় বোনের কথা শুনে জেনে নিয়েছে যে এদেশে স্বামীর বোনের সঙ্গে সম্পর্কটা বোনের মতই হয়, তাই রুমির সঙ্গে ব্যবহারের সময় সে বলে নিয়েছে বোন বলেই ডাকবে। রুমির না মানার কিছুই ছিল না তাছাড়া এত সরল এমিলির ব্যবহার যে তার সব কিছুই মেনে নিতে হয়। সব কিছুতে ইচ্ছা না থাকলেও আপত্তি করা যায় না। এই যখন তখন ঘরে এসে ঢুকে পড়া—রুমির সব সময় ভাল লাগে না কিন্তু আপত্তি করে না সে। কি জানি কেন করা যায় না। একেবারে অন্তরতম ভঙ্গীতে ঘরে ঢকেই জিজ্ঞেস করে, কি করা হচ্ছে?

রুমি জবাব দিতে না দিতেই পাশটিতে বসে পড়ে, বলে, সুন্দর ছোট মেয়ে একা একা কি কর তুমি বসে?

এমিলির ভাবভঙ্গী দেখে হেসে ফেলে রুমি প্রায় সময়েই, হয়ত বলে, শিবপুজো ক'রছি—বলে বাংলাতেই। এমিলি ঠাট্টা আন্দাজ ক'রে বলে, আইাম সরি, কান্ট ফলো ইউ—আমাকে তোমার সুন্দর ভাষাটা শিখিয়ে দাও না!

আমি অত্যন্ত দুঃখিত সেই ক্যাপসুলটা আমার কাছে নেই যেটা তোমার পেটে জলের সঙ্গে চালান ক'রে দিতে পারলেই তুমি বাংলা ভাষাটা শিখে অনর্গল কথা বলে যেতে পারতে। শিবপূজো বুঝে নিতে পারবে —

কি বুঝে নিতে পারব বললে যেন, আমি কখনও শুনিনি আগে।

অনেক কিছুই তো শোননি, শুনছ এবং শুনবে। একটু ধৈর্য ধর ঠাকরুণ, যত তাড়াতাড়ি চাইছ তত তাড়াতাড়ি তোমায় বাঙ্গালী করি কি ক'রে?

রুমির জবাবে খুব হাসে এমিলি। ইংরাজী সব কথার মধ্যে রসিকতা ক'রে যে সে ঠাকরুণ শব্দটা বাংলায় ব্যবহার ক'রেছে সেটাও এমিলির কান এড়ায়নি। মানে না বুঝলেও শব্দটা তার হাসির উস্কানি দিয়েছে বেশী। সে তাই ক্রমাগত হাসতে হাসতে উচ্চারণ ক'রবার চেষ্টা করে, 'ট্যাকরুণ'। কি মানে তোমাদের এই ট্যাকরুণের?

রুমি মজা ক'রে বলে, মানে হচ্ছে তোমার মত একটি মেয়ে যে দাদার বউ —।

সত্যিই? বিস্ময়কর। একটা খুবই সুন্দর শব্দ। কি মিষ্টি।

এতটা রুমি বিশ্বাস করে না। এখানকার সবই ভাল লাগে একথা রুমি বিশ্বাস ক'রতে চায় না, মনে করে এমিলি বাড়িয়ে বলছে। সকলের মন যোগানোর জন্যে এই রকম বলা ওর অভ্যেস। নইলে সব কিছুই 'আহা কি সুন্দর', 'কি মিষ্টি' এ আবার হতে পারে নাকি? এ সব বাড়িয়ে বলা কথা। মেয়েটা একটু ঢঙ্গী আছে। যতটা ভাল তার চেয়ে ভাল সেজে দেখাতে চায়। তা চাক। তবু অনেকের চেয়ে ভাল। অন্তত এখানকার মেয়েদের চেয়ে অনেক ভাল ওবা। তাই অনেক সময় ভাল না লাগলেও ওর কথাতে সায় দেয়, বলে, সবুর কব অনেক মিষ্টি কথা তোমাকে শিখিয়ে দেব দাদাকে বলবে।

এমিলি অন্য অর্থ ক'রল কথাটার বলল, খুব ভাল হবে আমি একদম বলব না যে এই মিষ্টি ভাষা আমি শিখেছি। হঠাৎ একদিন পি-কে এই ভাষা বলব। খুব চমক হবে তাই না?

তা হবে না, রোজ বলতে বলতে তবেই না ভাষা শিখতে পারবে—

তবে?

আমি কিছু মিষ্টি শব্দ তোমায় শিখিয়ে দেব, দাদাকে সেগুলো বলবে। আর কাউকে নয়। বুঝলে?

ও সুইট গার্ল—বলে উচ্ছ্বসিত ভাবে হেসে নিল এমিলি, বলল, তুমি মিস্টার দত্তকে যে কথাগুলো বল?

তুমি অত্যন্ত দুষ্টু মেয়ে, রুমি বলল আদরের সুরে।

ঠিক তোমারই মত? বলে হাসতে হাসতেই জড়িয়ে ধরল এমিলি রুমিকে।

রুমি হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস ক'রল, তুমি দাদাকে বাংলা শেখাতে বল না কেন ?

এমিলি বলল, ও এক আশ্চর্য লোক। নিজের সম্বন্ধে নিজের দেশ সম্বন্ধে কিছু বলে না। ওখানে থাকতেও বলত না।

তবে তুমি কি ক'রে এত কথা জানলে ?

অন্য বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে —।

কোন বন্ধু ?

কত বন্ধু থাকে যারা গল্প করে।

হঠাৎ রুমির পুরানো কৌতুহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, জানতে চাইল ওখানে তোমাদের অনেক পুরুষ বন্ধু থাকে, তাই না ?

অনেক নয়। তবে আমাদের ওখানে বন্ধুত্বে এসব বাছাবাছি হয় না।

কি রকম ?

তোমাদের যেমন পুরুষ বন্ধু মাত্রেই তার সঙ্গে বিয়ে হবে ওখানে তা নয়। তার অবশ্য কারণ আছে এটা রক্ষণশীল দেশ, মেয়েরা এখানে আমাদের মত খোলা নয়।

তোমরা নিশ্চয়ই এটাকে ভাল বলবে না ?

আমি তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক মেনে নিতে পারলাম না।

কেন ?

সবাই যে ওই জীবনই পছন্দ করে, এমনও নয়।

রুমি সেই দুচারজনের কথা ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চায় না। তাই বলল, দুএকজন ব্যতিক্রম তো সবসময়েই থাকে।

দুএকজন নয়, সংখ্যায় অনেক আছে যারা ওই জীবন সম্বন্ধে সুখী নয়।

রুমির হিসেব মেলে না। এই মেয়েটা একরকম কথা বলে অথচ অন্যরকম দেখা যায় ছবিগুলোতে। সেখানে শুধু হৈ হুল্লোড়, খাও-দাও-স্ফূর্তি কর। মনে হয় ভোগ করার জন্যেই জীবন ওদের। পান করার জন্য হাজার রকম মদ, গান করার জন্যে নানান রকম সুর, স্নান করার জন্যে সূর্য ও সমুদ্র। দুস্তর মরু সাধনার পর উদ্যান লাভের স্বাদ ওদের জীবনযাত্রায়। অথচ এমিলি বলছে অনেকে চায় না, তবে চলছে কি ক'রে ? প্রশ্নটা এমিলিকে ক'রতে সে বলল, অনেকে তো চায়।

রুমিও চায়। তার ভাল লাগে। কেমন সুন্দর হৈ চৈ ক'রে জীবনটাকে রমণীয় ক'রে রাখা, নাচে গানে ভরিয়ে রাখা অবসর, পানের মধ্যেও সুন্দর একটু আমেজ আছে। সে দেখেছে। একদিন সৌগত তাকে নিয়ে গিয়েছিল এক হোটেলে, সামান্য একটু ককটেল খাইয়েছিল, বলেছিল, দেখ দেখ খেয়ে দেখ। মজা পাবে।

রুমি বলেছিল, ওরে বাবা! নেশা হয়ে যাবে বাড়ী ফিরব কি ক'রে ?

সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিচ্ছু হবে না। এটুকু খেলে নেশা হয় না।

নেশা যাকে বলে সত্যিই তা হয়নি, তবে ওইটুকুতেই নেশার আমেজ এসেছিল। মৌজ হয়েছিল। তারপর যখন বাজনদারদের সুরে নাচের বোল ফুটে উঠেছিল তখনই শরীরটার মধ্যে চনচন ক'রে উঠেছিল রক্ত। সৌগত প্রশ্ন ক'রেছিল নাচবে?

আমি যে জানি না।

এমন কিছু নয়। ওই দেখ প্রায় সকলেই নাচতে উঠছে, ওদের অনেকেই জানে না। ওই যে দেখ, ওই মহিলা অনেকে ওকেই লক্ষ্য করে, ও জানে। একটু দেখলেই পারবে।

একে তো ইচ্ছে তাকে অনুপ্রাণিত ক'রছিল, তারওপর সৌগতর যোগানো উৎসাহে নেমে পড়েছিল রুমি। কেমন নেচেছিল সে জানে না, কিন্তু আনন্দ পেয়েছিল প্রচুর। বিয়েটা হয়ে গেলে মাঝে মাঝে সৌগতর সঙ্গে যাবার এবং নাচবার সুযোগ সে পাবে। রুমি মনে করে উপভোগ করার নামই জীবন। অথচ আমেরিকার এই সুন্দর মেয়েটা বলে কিনা তারা উপভোগ করার জীবন পছন্দ করে না! গরীবেরা অনেক সময় এরকম ভেবে থাকে যতদূর জানা গেছে এমিলি তো গরীবের মেয়েও নয়। ওর কাকা তো নাকি খুবই বড়লোক! তবে যে কেন এই সব বলে রুমি ভেবে পায় না। তাছাড়া ভারত সম্বন্ধে এতকথা জানা সত্ত্বেও সে কেন যে এখানে আসবার জন্যে এত পীড়াপীড়ি ক'রত সে-ও আশ্চর্য। স্বামীর দেশ, শ্বশুরশ্বাশুড়ী—এসব বস্তাপচা পুরোণো মানসিকতা এখন সতীসাবিত্রীর দেশের মেয়েদের মন থেকেই উবে গেছে তা আবার মাকিন যুবতী! ওসব কিছু নয় আসলে ওরা দেশ বেড়াতে ভালবাসে তাই এসেছে। কিছুদিন কাটলেই পালাবে।

এমিলি হঠাৎ প্রশ্ন ক'রল, আচ্ছা বোন তুমি বল তো জীবনটা কি?

রুমি এই আকস্মিক প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল। তারপর বলল, জীবনটা আবার কি? জীবন, জীবন। হঠাৎ এ প্রশ্ন ক'রছ কেন?

আনন্দ স্ফুর্তির প্রসঙ্গ তুললে কিনা তাই বলছি —

তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আছে?

আমি বলছি এই যে, আনন্দের জন্যে জীবন, না জীবনের জন্য আনন্দ?

জীবনের জন্যে আনন্দ। তাতে কি?

জীবনের জন্যে অনেক কিছু লাগে—তার মধ্যে আনন্দ একটা, তুমি কি বল?

হ্যাঁ।

এবার তুমি তোমার উত্তর খুঁজে নাও।

রুমি কেমন যেন বিস্মিত হয়ে পড়ল, জানতে চাইল, তোমার কি দর্শন ছিল পাঠ্য?

কেন ?

তুমি যে রকম কথা বলছ —

হায় ভগবান! —বড় হতাশ হয়েই বলল এমিলি, দর্শন না পড়লে বুঝি মানুষের সাধারণ ভাবনা চিন্তাগুলোও জাগবে না ? আমি পড়েছি পদার্থবিদ্যা। তাও বেশী দূর পড়া হয়নি। তোমার দাদার পড়ার চাপ ছিল খুব বেশী, ওর জন্যে নোট লিখতে লিখতে আমার সমস্ত দিন চলে যেত, নইলে বেচারীর খুবই অসুবিধে হ'ত।

বলে কি মেয়েটা! এসব আবার হয় নাকি! বইপত্তরে যা পড়া যায় তাতে ওদেশের মেয়েরা পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে খালি ডেটিং করে, আর সপ্তাহ শেষে বেড়াতে যায়। মেয়েটা অতি চালাক তো বোধহয় এখানে আসবার আগে সীতাসাবিত্রীর কোন জীবনী বই ইংরাজীতে লেখা পেয়ে পড়ে এসেছে। অবশ্য রুমিও ঠিক জানেনা সীতাসাবিত্রীর জীবনীতে এই রকম আছে কিনা। রামায়ণ পড়লে নাকি সীতার কথা জানা যায়, সাবিত্রীর গল্পও বোধহয় ওতেই আছে। নামদুটো খালি শুনেছে রুমি ঠাকুমার কাছে। ছোট বেলায় হঠাৎ কোনদিন কোন কারণে ঠাকুমাকে প্রণাম ক'রে ফেললে ঠাকুমা বলতেন, সীতাসাবিত্রীর মত হও দিদু। আশীর্বাদ করি জন্ম জন্ম এয়োস্ত্রী হও।

তখনই একদিন রুমি জিজ্ঞেস ক'রেছিল, সীতাসাবিত্রী কে ঠাকুমা ?

ওরা সব সতী ছিলেন। আরও অনেক কথা ঠাকুমা বোঝাবার চেষ্টা ক'রেছিলেন সেই সতীদের সম্বন্ধে, রুমি শোনে নি। শোনবার ধৈর্য ছিল না, কোন কিছু জানতে ওই একটা লাইনই যথেষ্ট। কে শুনবে ওই সীতাসাবিত্রী কে না কে তার ঘ্যানঘ্যানানি। তাছাড়া একদিন একটা ঘটনায় সে আরও নিরুৎসাহ বোধ ক'রল, মিসেস বোস মা-র সঙ্গে হৃদ্যতা থাকায় তাদের বাড়ীতে এসেছিলেন গল্পগুজব ক'রতে। তাঁর সঙ্গেই কি সব আলোচনার মধ্যে মাকে বলতে শুনেছিল, আমি ওসব পছন্দ করি না! এটা আধুনিক যুগ। এখন যারা ওই সব পুরানো ভাবনা নিয়ে চলে তারা মানুষের অগ্রগতি সম্বন্ধে কোন খবরই রাখে না। লক্ষ্য ক'রে দেখবেন অশিক্ষিতদের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশী।

মিসেস বোস-এর জবাবটা মনে নেই তবে মা-র কথাটা সেই থেকেই মনে আছে। সত্যিই ওসবের কোন মানে হয় না। দিদিমা ঠাকুমাদের মত বুড়ো-হাবড়ারা তাদের আমলের ওইসব সীতাসাবিত্রীকে মনে ক'রে বসে আছে। আর আছে অশিক্ষিতেরা, সত্যিই তাই। তাদের ড্রাইভার রামবচন মাঝে মাঝে সুর ক'রে কি সব গান গায়। রুমি কাণ ক'রে শুনেছে সে গান কোন ছায়াছবির গান নয়। জানতে চেয়েছে, তুমি ওসব কি গান গাও রামবচন ?

ওসব রামায়ণ মিসিবাবা—রামবচন জানিয়েছে। তখন দ্বিতীয়বার মনে পড়েছে মা-র আর মিসেস বোস-এর সংলাপ। ঠাকুমার মত ক'রে রামবচনও উপযাচক হয়েই বোঝাতে চেষ্টা ক'রেছে তুলসীদাসজীর রামায়ণের মহিমা। রুমি মনে মনে নিরুৎসাহ হয়েও বলেছে, রোজ পড় বুঝি?

হ্যাঁ মিসিবাবা। রামজীকে কৃপা—দারুণ ভক্তের মত ভঙ্গী ক'রে রামবচন বলেছে। তার সেই সময়কার মুখভঙ্গীতে ড্রাইভার রামবচন, অফিসের কেরাণীদের টাকা ধার দিয়ে চড়া সুদের ব্যবসায়ী রামবচন সব হারিয়ে গিয়ে ফুটে উঠতে চেয়েছে এক মহাত্মা রামবচন। রুমির চোখে সে সব ধরা পড়ার কথা নয় এবং তার লক্ষ্যেও পড়ার কথা নয় যে মহাত্মা রামবচন ফুটতে গিয়ে তার চাতুর্যই ফুটে উঠেছে সাধুত্বের পরিবর্তে। সে সব যাক মার কথাটা যে মিলে গেছে সেই জন্যেই শুধু নিশ্চিত ভাবে আত্মসমর্পণ ক'রেছে সেই বিশ্বাসের কাছে যে এসব অশিক্ষিতদের পাঠ্যবস্তু। আমেরিকানদের কৌতুহল বেশী হয়ত তাই ওরা অনেকসময় অনেক আদিম মানুষের কথা, অশিক্ষিত লোকেদের শব্দ—সব জোগাড় ক'রে থাকে। অনেক পয়সা থাকলে লোকের যেমন অদরকারী জিনিষও জোগাড় করার ইচ্ছে হয় এ-ও তেমনি আর কি। এমিলিকে কথাটা সে জিজ্ঞেস ক'রে বসল, তুমি কি সীতাসাবিত্রীর জীবনী পড়েছ?

সীতাসাবিত্রী! শব্দগুলো বিস্ময়ের সঙ্গে শুনে আপ্রাণ চেষ্টায় বিকৃতভাবে উচ্চারণ ক'রল এমিলি, জানতে চাইল, সে কে?

পড়নি?

আমি তাকে জানি না। সে কে?

এবার বিপন্ন হ'ল রুমি। বলল, আমাদের দেশের আগের দুজন মহিলা। রামায়ণে আছে। রামের স্ত্রী সীতা।

রামায়ণ, রামায়ণ—ও আমি জানি রামায়ণ হচ্ছে হিন্দুদের মহাকাব্য। ইলিয়ট-ওডেসির মত। কি সুন্দর তোমাদের দুটো মহাকাব্য আছে। আমেরিকার কোন মহাকাব্য নেই।

মহাকাব্য থাকলে কি হয় রুমি বোঝে না কিন্তু না থাকলে যে কোন ক্ষতি হয় না তা সে আমেরিকাকে দেখলেই বেশ বুঝতে পারে। আর আমেরিকার এই মেয়েটা ঈর্ষা ক'রছে মহাকাব্য আছে বলে! ওসব বাজে ভাবনা। মহাকাব্যটাব্য কিছু নয় আসলে মেয়েটাই অদ্ভুৎ। মেয়েটা চায় নতুন কিছু দেখতে, জানতে, শিখতে! রোজ এক কথা তোমাদের ভাষাটা শিখিয়ে দাও! মুখে শুধু বলা-ই নয়, কাণ পেতে থাকে কথাগুলোকে ধরবার জন্যে। শুনে শুনে 'না' 'দাও' এরকম দুএকটা কথা শিখেও নিয়েছে এরই মধ্যে। কে যে সখ ক'রে একটা ভাষা শিখতে চায় রুমি বোঝে না। এই যে পড়াশোনা ক'রতে হয় তাকে, এটাই কি ক'রতে ইচ্ছা করে? শুধুমাত্র বন্ধুবান্ধব আছে একটু হৈ চৈ করা যায় তাই কলেজ যাওয়া। তার বাইরে যেটুকু পড়া

সে কেবল ওই পরীক্ষাটা উৎরোবার জন্যে। অবশ্য এখন বিয়ের ঠিকই হয়ে গেছে ওসব পরীক্ষা পাশ না পাশের ভাবনাই নেই আর। মাসতুতো বোনরা ডলিদি মিলিদি আর লিলির পরীক্ষা পাশ আর অনেক পড়াশোনা করার প্রয়োজন ছিল। ডলিদি, মিলিদিকে পাত্রস্থ ক'রতে কি ঝঞ্ঝাট না পোহাতে হয়েছে মাসীমা মেসোমশাইকে। প্রত্যেকবারই একটা সুপাত্রের জন্যে কাকে না অনুরোধ ক'রেছেন! লিলির জন্যেও ক'রতে হবে দুদিন বাদে। লিলি তা জানে বলেই পড়াশোনা মন দিয়ে ক'রে ভাল ছাত্রীর সুনাম কিনছে। তার জন্যে তো আর কোন সৌগত প্রতীক্ষা ক'রে বসে নেই! মনে মনে গর্ব অনুভব ক'রল রুমি। সে প্রায় স্বাধীন এখন, তার এখন না পড়লেও চলে। আর অদ্ভুৎ এই মেয়েটা বলে কিনা সে পড়বে! আরে বাবা দুদিনের জন্যে এসেছিস বেড়িয়ে ঘুরে দেখেটেখে দাদাটিকে নিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ দুলিয়ে চলে যা। ওসব বাজে ঝামেলা ক'রে কি লাভ? তা রোজ বলে শেখাও শেখাও, এ কি শাড়ীপরা যে দশবার দেখাতে দেখাতে কোনরকমে যেমন পরছিস তেমনি পরতে পারবি? এ একটা ভাষা শেখা যা আমরা পাঁচ পুরুষের চেষ্টাতেও পেরে উঠছি না। কি ঝামেলা! ইংরেজীতেই না যত ছেলে মেয়ে ফেল করে! আর তুই মেম এই সতের দিন এসেই বাংলা ভাষা শিখে নিবি! একে পাগলামী ছাড়া আর কি বলে! তাছাড়া বাংলা শেখবার এই শখটা যে কেন সে কথা শুনলেই এটা যে নিছক পাগলামী সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। রুমি একদিন জানতে চেয়েছিল, কি করবে তুমি বাংলা শিখে?

সকলের সঙ্গে কথা বলব! জান, আমার ওই বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করে, ঠাকুমার কথা বলেছিল এমিলি।

সর্বনাশ! শব্দটা বাংলায় উচ্চারণ ক'রেছিল রুমি, কিন্তু তার মুখভঙ্গী দেখে এমিলি কিছু আন্দাজ ক'রে জানতে চেয়েছিল, এনিথিং রং?

ও না। —মুখে বলেছিল রুমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছিল ওই ইচ্ছার কথা জানলে মা এই বাংলা শেখা একঝরেই বন্ধ ক'রে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে রুমিকেই বলে দেবে, না না ওকে আর শেখাতে হবে না। এটা যে পাগলামী তা তো মা বুঝবে না! অথচ রুমি নিজে এর কিছু কিছু পাগলামীকে প্রশ্রয় দেয়। নিজের পাগলামীতে নিজেই মেতে থাকে এমিলি, তার তো কোন ক্ষতি করে না, কাজেই প্রশ্রয় না দেবার কি থাকতে পারে! তাছাড়া ওর স্বভাবে কেমন ছেলেমানুষী আছে। শিশুর মত। কিছুদিন আগে কে যেন পরীক্ষিৎকে বিরাট এক ভেট পাঠিয়েছিল! তাতে ছিল বিরাট বিরাট পঞ্চাশটি আপেল, পঞ্চাশটি এমন কমলালেবু যা বাজারে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়, নানা রকম কেক প্যাস্ট্রিতে ভর্তি বিরাট তিনটে ব্যাক্স, বিরাট টিনে ভর্তি কাজুবাদাম আখরোট আরও কত কি। আর এক গোছা ফুল ছিল, তার মধ্যে কি ক'রে একটা বিরাট গাঁদা ফুল এসে পড়েছিল বোধহয় দোকানীর অলক্ষ্যে। এমিলি ক'রল

কি সব ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে গাঁদা ফুলটা তুলে নিয়ে বলতে লাগল, কি সুন্দর। কি সুন্দর ফুল। কোনদিন তো এ ফুল দেখিনি? এ ফুলের কি নাম মা?

সুপ্রীতির মত কঠোর নিয়মানুবর্তী মানুষেরও কি হয়েছে কিছুই বলেন না এই বেহিসেবী বউকে। বেশ স্নেহের সুরেই তাই জবাব দিলেন, এ ফুল তো তোমাদের দেশে নেই, এর নাম—সুপ্রীতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন উচ্চারণ ক'রলেন, গাঁদা। —নামটা আসলে সুপ্রীতির ভাল লাগে না। অথচ গাঁদাই হোক বা হাঁদাই হোক বিদেশী কারও পক্ষে যে এ জাতীয় কোন নামই খারাপ লাগার কোন অবকাশ নেই একথাটা তাঁর চিন্তায় এল না। নামটা শুনে এমিলি দুবার চেষ্টা ক'রল সেটা উচ্চারণ ক'রতে। তারপর গন্ধটা শুঁকল। সুপ্রীতি জানালেন, গন্ধ নেই।

সেটা এমিলিও বুঝেছিল, এবার সে ফুলটাকে নিজের গালের ওপর রাখল, বলল, সুন্দর। কি সুন্দর! কি যেন নাম বললেন?

সুপ্রীতি মেয়েটার কাণ্ড দেখে হেসে আর একবার বলেছিলেন নামটা।

ওখান থেকে সোজা রুমির ঘরে, এসেই বলল, দেখ বোন কি সুন্দর ফুল! আমার মনে হয় এটা গোলাপের চেয়ে সুন্দর।

তোমার মাথাটি খারাপ হয়ে গেছে, রুমি হেসে বলল তাকে।

কেন?

গোলাপের চেয়ে সুন্দর ফুল আছে?

আছে আছে। পৃথিবীতে কোনটাই শেষ নয়।

ব্যস্। রুমির বিপদ হয় এই সব কথা বললেই। এই সব ভারী ভারী তত্ত্ব কথাকে তার বড্ড ভয়। সংক্রামক ব্যাধির মত সে এসব এড়িয়ে চলে। রুমি বুঝতে পারে না এই যে মেমটাকে দাদা জুটিয়ে এনেছে আসলে এটা কি? দার্শনিক, না ছেলেমানুষ?

বাড়ীর একজনের ঘরে অন্য কেউ দৈবাৎ কোন কারণে কখনও ঢুকলে হাজার দরকার থাকলেও তাকে না ডাকা সুপ্রীতির অভ্যেস। সেই অভ্যেসকে তিনি মনে করেন ভদ্রতা, শিষ্টাচার। আসলে ব্যবহারিক রীতির মধ্যে নিজের পছন্দটুকুকে শিষ্টাচার বলে চালিয়ে দেওয়া তাঁর স্বভাব এবং এই স্বভাবকে বিনাবাধায় দীর্ঘদিন লালন করার সুযোগ পেয়ে তাকে তিনি অশ্বমেধ-এর ঘোড়া ক'রে তুলেছেন। নিজের পারিবারিক পৃথিবীতে চক্রবর্তী রাজার ভূমিকায় তাঁর অধিষ্ঠান।

ঘরের বাইরে সুপ্রীতির বারংবার চলাফেরার শব্দ পেয়ে রুমি জানতে চাইল, মা কিছু বলছ?

এমিলির কাজ হ'লে যেন একবার আমার ঘরে যায়, নেপথ্যে সুপ্রীতির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। রুমি এমিলিকে বলল, তোমাকে মা ডাকছে —।

বারান্দাতেই সুপ্রীতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তিনি এমিলিকে দেখে একটা

বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র তার হাতে দিয়ে বললেন, দেখ।

এমিলি ওপরের ছবিটার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল—পালকিতে চড়ে নববধূ যাচ্ছে। কিন্তু পালকি জিনিষটি তার অপরিচিত হওয়ায় সে বোঝবার জন্যে মনে মনে খুবই চেষ্টা করে কিছুই বুঝতে পারল না। সুপ্রীতি স্মিত হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি বলতে পার?

ও না। ভারী আশ্চর্য লাগছে, এটা কি জিনিষ মা, প্রশ্রয় পেয়ে এমিলির কৌতুহল মুখর হ'ল।

সুপ্রীতি বললেন, এটা এক ধরণের রথ। এর চাকা নেই মানুষে কাঁধে ক'রে নিয়ে যায়। এর মধ্যে বসে দুজন লোক যেতে পারে — ছবিটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন, এই দেখ দুপাশে চারজন লোক কাঁধে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, মাঝখানে নতুন বউ বসে আছে। অনেক আগে আমাদের দেশে এই জিনিষ চলত, একে বলে পালকি!

এমিলির আগের উৎসাহ যেন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এল। তাকে ঈষৎ ব্যথিত দেখাল। সে শুধু উচ্চারণ ক'রল, লোকে কাঁধে ক'রে মানুষকে নিয়ে যায়!

সুপ্রীতি তার মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য না ক'রে বললেন, হ্যাঁ।

আর কথা বলল না এমিলি। সুপ্রীতি পুত্রবধূকে নতুন জিনিষ দেখিয়ে চলে যেতে এমিলি রুমিকে বলল, কিন্তু একটা জিনিষ আমার এখানে কেমন যেন লাগে, এই মানুষের গাড়ী টানা। রুমি বুঝল এমিলি রিক্সা গাড়ীর কথা বলছে। কথাটা মনে ধরল। রুমিরও হঠাৎ যেন মনে হ'ল সত্যিই এটা ঠিক নয়, হওয়া উচিত নয়। কিন্তু গরীব লোকগুলো ক'রবেই বা কি, বেচারীরা এই রিক্সা টেনেই তো খায়! তবু এমিলির এই খারাপ লাগাটা ঠিক, তাই রুমি শুধু বলল, ওরা খুবই গরীব।

এমিলি কথা না বলে শুধু মাথা নেড়ে বোঝাতে লাগল — না। এই 'না' যে কি তা বুঝল না রুমি, বুঝতে চাইল-ও না।

এমিলি আপন মনেই বলল, চিরদিন তো এদেশে মানুষ এত বেশী ছিল না, কিন্তু এই রথ প্রমাণ করে যে এখানকার সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে অবিচার চিরদিনের।

মানুষ বেশী হবার ব্যাপারটা রুমি বুঝল না। মাঝে মাঝে এমিলির অনেকগুলো কথা যেমন তার দুর্বোধ্য মনে হয় এটাও তেমনি মনে হ'ল। এরকম কথা সে কখনই বোঝবার চেষ্টা করে না। কি হবে অকারণ ভেবে? তার ধারণা এই মেয়েটা কিছু কিছু আবোল তাবোল কথা বলে নইলে রিক্সা টানার সঙ্গে মানুষ বেশী হবার কি সামঞ্জস্য থাকতে পারে? তাছাড়া এর মধ্যে অবিচার-এরই যে কি আছে সে ভেবে পায় না। তবে এমিলির কথা শুনে হঠাৎ একটা কথা মনে এল রুমির, জানতে চাইল, আমাদের দেশের এই টানা রিক্সার কথা তুমি জানতে না?

না।

তুমি এদেশ সম্বন্ধে এত খুঁটিনাটি কি ক'রে জানলে? রুমি জানতে চাইল।

কিছু বই পড়ে আর কিছুটা শুনে।

কার কাছে শুনলে?

অল্পক্ষণ চুপ ক'রে রইল এমিলি, তারপর বলল, এখানের অনেকেই তো যায়, যাদের সঙ্গে আলাপ হ'ত তারাই গল্প ক'রত।

দাদাও বলত বুঝি?

কথাটা আগেও অনেকদিন জিজ্ঞেস ক'রেছে রুমি, এমিলি আজও সেই আগের দিনগুলোর মতই জবাব দিল, ও-ই একমাত্র লোক যে দেশের সম্বন্ধে কিছুই বলত না আমাকে, জিজ্ঞেস ক'রলে বলত জানি না।

রুমির হঠাৎ মনে এল, আচ্ছা তুমি তো অনেক ছেলের সঙ্গে মিশেছ কাউকে কখনও তোমার ভাল লাগেনি?

কেন লাগবে না? — সহজ এবং অকপট উত্তর এমিলির, লেগেছে। মানুষকে মানুষের ভাল তো লাগবেই।

অনেক দ্বিধা ক'রেও রুমি কৌতূহল দমন ক'রতে পারল না, জানতে চাইল, আগে কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ের বিষয়ে কথা হয়নি তোমার?

এমিলি একটু থেমে রইল, তারপর বলল, এসব প্রশ্ন পরে একদিন ক'রো।

কেন, পরে কেন? এখনই বল না — রুমি বন্ধুত্বের সুরে আবদার ক'রল।

অনেক কিছু থাকে যা চট ক'রে বলা যায় না, এমন কাজও আছে যা চট ক'রে ফেলা যায় না।

রুমি বুঝল প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইছে এমিলি। সে-ও বিশেষ চাপাচাপি না ক'রে বলল, তোমাদের অনেক সুখের জীবন।

সবাই তাই ভাবে, এমিলি বলল।

কেন? ভাবে বলছ কেন?

বলছি এই জন্যে যে ঠিক এই কথাটাই আমি তোমার সম্বন্ধেও ভাবি।

রুমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে বলল, বেশ তুমি যখন কিছুই বলবে না তখন তোমার ওখানের বন্ধুদের কথা বল?

আমার একজন বন্ধু ছিল, আহা বেচারা বড় ভালমানুষ! তার অনেক কিছু আছে, অনেক ব্যস্ত সে মানুষটা তবু আমার প্রতি জন্মদিনে সে ঠিক এসে হাজির হ'ত, নিজে হাতে কেক কাটত। সারাদিন বড় ব্যস্ত মানুষটা অথচ কোন লোকের সামনে পড়লেই শিশুর মত হাসে। — কথাগুলো এমিলি গানের মত ক'রে বলে যেতে লাগল, তন্ময় হয়ে শুনছিল রুমি, এমিলি থেমে যেতে সে জানতে চাইল, নিশ্চয়ই তোমার এই বন্ধুটি পুরুষ মানুষ?

প্রকৃত অর্থে।

প্রকৃত অর্থ মানে?

আমরা অনেক সময় মুখে দাড়ি হওয়া দেখলেই পুরুষ মানুষ বলে মনে করি কাজ তাদের যেমনই হোক না কেন। অথচ চরিত্রের দিকে তাকালে তা হবে না। আমার বন্ধুটি তার বিপরীত।

রোমান্সের গল্প পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল রুমি, জানতে চাইল, কেন? তোমার এই বন্ধুটির কি দাড়ি নেই?

রুমির নির্বুদ্ধিতায় যেন হতাশ হয়ে পড়ল এমিলি, বলল, তা নয়। আমরা যে কোন অমহিলাকেই পুরুষ মানুস মনে করি পুরুষের যোগ্য গুণ না থাকলেও। কিন্তু ইনি একজন প্রকৃত অর্থে পুরুয; সাহসী, উদার, কাজে দক্ষ, চঞ্চল এবং বুদ্ধিমান।

এমন যোগ্যলোকের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব ছিল?

এখনও আছে।

রুমি একটু বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল, দাদা জানে?

উনি চেনেন! ওর সঙ্গেও খুবই ভাব আছে তাঁর। ওকে খুব ভালবাসেন।

তাই নাকি! —রুমি বিস্মিত হওয়ার বেশী আর কিছু বলল না।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল রুমি চিন্তায় — রহস্য ঘনীভূত হয়ে ওঠায়। আর এমিলির নিঃশব্দ মনের মধ্যে সুখস্মৃতি তার দেশের-স্বজনের। বেশ কিছু সময়ের পর রুমি প্রশ্ন ক'রল, তার চেয়ে বুঝি দাদার সঙ্গে আগে আলাপ?

তার সঙ্গে আমার আলাপ আজন্ম!

কে সেই ব্যক্তি?

একমুখ হেসে এমিলি জানাল, আমার কাকা। অথচ বাবার সঙ্গে তাঁর অদ্ভুৎ অমিল। বাবা নির্ঝঞ্ঝাট পল্লীজীবন পছন্দ করেন। নিজে ক্ষেত খামার নিয়ে থাকতেই ভালবাসেন অথচ কাকা বিপরীত। দুনিয়ার ঝামেলা তিনি কাঁধে ক'রে বেড়ান। দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের সন্ধান তাঁর। প্রয়োজনের চেয়ে বেশী অর্থের দিকে তাঁর ঝোঁক, আবার যখনই কোন সংস্থার সাহায্য দরকার পড়ে কাকাই আগে টাকা পৌঁছে দেন।

রুমি শুনে আবার বিস্মিত হ'ল। তার এতক্ষণের কল্পনা নিমেষে চুরচুর হয়ে গেল। এমনভাবে টুকুরোগুলো ছিটিয়ে পড়ল যে সে আর সেগুলোকে কুড়োবার মত মনের জোরও পেল না। এমিলি আরও বলল, আমার কাকা-ই আমার বিয়েটা দিয়েছেন।

কেন তোমার বাবা? রুমি জানতে চাইল।

এমিলি জবাব দিল না। সে বলল না যে এ বিয়েতে তার বাবার অমত ছিল। একথা বললে প্রসেনজিৎকে ছোট করা হবে ভেবেই কথাটা চেপে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, আমার চেয়ে কাকা ভারতবর্ষকে বেশী জানেন। টি. ভি. তে এখানকার নোংরা রাস্তাঘাটের ছবি তুলে যখন দেখায় আরও অনেক কদর্য জিনিষে ভারতবর্ষ দেখিয়ে যখন ছোট করার চেষ্টা করা হয়

তখন কাকা অসন্তুষ্ট হন। ঘরে যে-ই থাকে তাকে বলেন, এরা বেছে বেছে খারাপটাই শুধু দেখাচ্ছে, এরা ভালগুলোকে যত্ন ক'রে বাদ দিয়েছে, একে মিথ্যাচার বলে কিন্তু ভারতবর্ষ হচ্ছে সত্যের দেশ। কাকা মনে করেন দারিদ্র্য ভারতবর্ষের যন্ত্রণা, তাকে নিয়ে মজা করা উচিত নয়।

রুমি এসব দারিদ্র্য-টারিদ্র বোঝে না। এসব কথার তাৎপর্যও ধরতে পারে না। তাছাড়া দেশ ভারতবর্ষ এসব নিয়ে ভাববার অবকাশও তার নেই। তবু এমিলির কাকার কথা তার খুবই ভাল লাগল, বলল, আশ্চর্য মানুষ তো!

হ্যাঁ, খুব সুন্দর মানুষ।

তুমি এখানে চলে এসেছ নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে চিঠিপত্র লিখবেন?

লিখবেন, তবে খুব কম। কারণ তাঁর চিঠি লেখবার অভ্যেস খুবই কম। সে বড় মজার ব্যাপার — একমুখ হাসির সঙ্গে এমিলি বলল, কারও কথা যদি ওঁর খুব মনে হয় তবে চিঠি না লিখে হয়ত গিয়েই হাজির হয়ে গেলেন। চিঠি লিখবেন না। আমরা বললে বলেন, কি জানি কেন চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে না।

তোমার কাকার ছবি যদি থাকে আমাকে দেখিয়ো তো —

ও এখনই — বলে আর নিমেষমাত্র দেরী না ক'রেই এমিলি চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে গেল ছবি আনতে।

একটা বই-এর প্যাকেট হাতে ক'রে ঘরে ঢুকছিল বিশ্বজিৎ। কাকার ফটো নিয়ে ফেরবার পথে এমিলি একবারে মুখোমুখি পড়ল। এমিলি বোঝে না বিশ্বজিৎ কেন যেন সকলকে এড়িয়ে চলে। এবাড়ীতে কারও সঙ্গে কখনই কথা বলে না। সে যেন এবাড়ীর কেউ নয় এমনি ভাবে থাকে। সব অপরিচিতের মধ্যে একজন লোক যেভাবে অন্তরীণ হয়ে বাস করে তেমনি ভাবেই থাকে। কারণ বোঝে না এমিলি, অনুমান করারও চেষ্টা করে না, মনে মনে একটু ভয় পায়। ভয় হয়ত ঠিক নয় তবু ভয় আর সমীহ মেশানো একটা এমন ভাব যার জন্যে গায়ে পড়ে সে-ও আলাপ জমাতে পারে না। অথচ ছেলেটাকে ভাল লাগে। সপ্রতিভ, সুশ্রী, শান্ত। মুস্কিল এই যে ঘরে থাকলে সারাক্ষণ টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে বই পড়ে, দরজা ভেজানো থাকে জানালা দিয়ে দেখা যায়। ঘর থেকে বাইরে বেরোলে হয় কলঘর, নয় খাবার ঘর আর তাও না হ'লে একেবারে রাস্তা। কথা যা দুচারটে তাকে বলতে শোনা যায় তা রাঁধুনি বা চাকরের সঙ্গে। আরও অদ্ভুৎ হচ্ছে এই যে বাড়ীর কেউ কখনও ওর সঙ্গে যেচে কথা বলে না। কেন বলে না এমিলি বোঝে না। এই অল্প ক'দিন সে এসেছে এর মধ্যেই ব্যাপারটা তার নজরে এসেছে অথচ রুমিকে একদিন প্রশ্ন করাতে সে বলেছে, কেন সবাই তো কথা বলি। ও কথাবার্ত্তা একটু কম বলে তাই এরকম। — ঘটনাও তাই, এমিলি বুঝেছে। সে নিজেও দু একদিন সাধারণ ভদ্রতাসূচক দু একটা

কথা বলে দেখেছে শুধু সেইটুকুরই জবাব দিয়েছে বিশ্বজিৎ, কথা বাড়ায় নি। অবশ্য জবাবটুকু ভদ্রভাবে আন্তরিকতার সঙ্গেই দিয়েছে।

মুখোমুখি দেখা হওয়াতে এমিলির খুব ইচ্ছা হ'ল বিশ্বজিৎ-এর সঙ্গে কথা বলে। অন্তত সাধারণ ভদ্রতা হিসেবেও বলা প্রয়োজন। অনেকটা তার মুখ ফসকেই বেরিয়ে গেল, হ্যাল্লো! কেমন আছ?

চট ক'রে দাঁড়িয়ে গেল বিশ্বজিৎ, জবাব দিল, রাজকীয়ভাবে!

বিশ্বজিৎ-এর কথা শুনে কেমন থতমত খেয়ে গেল এমিলি, কি ব্যাপার কিছু বুঝল না। তবু কিছুটা দুঃসাহস বশেই বলে ফেলল, আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

যদি তোমার আপত্তি না থাকে ঘরে এস বলছি—বিশ্বজিৎ আহ্বান জানাল।

ও নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই — গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বলে বিশ্বজিৎ-এর পেছন পেছন ঘরে ঢুকল এমিলি! বিশ্বজিৎ হাতের বই-এর প্যাকেটটা ধপ ক'রে এক জায়গায় ফেলে নিজের পড়ার টেবিলের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, বস।

এমিলি বাধ্য শিশুর মত বসতেই বিশ্বজিৎ নিজের শোবার খাট দেখিয়ে বলল, এই আমার বিছানা। — একটা আলমারী দেখিয়ে বলল, এটা ভর্তি আমার পোষাক। চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে বলল, এই ঘর থেকে আমাকে কেউ বের ক'রে দিতে পারবে না কোনদিন। অথচ এটা ভারতবর্ষ নয়। এখানে এরকম ঘর, এত পোষাক আর এই আরামদায়ক বিছানা আছে, পাঁচ হাজারে একজনের। আগেকার দিনে ছোট ছোট সামন্ত রাজাদের এইরকম, ধর এই পাঁচ-দশ হাজার প্রজাই থাকত। রাজা ছিল সবচেয়ে বেশী সুখী। অতএব আমিও রাজকীয়ভাবেই আছি।

বিশ্বজিৎ-এর কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল এমিলি! কি শুনছে সে! কার কথা শুনছে! আশ্চর্য এক মানুষ কথা বলছে যেন! এত লোক এতদিন এতকথা বলেছে কেউ তো একথা বলে নি, এমন কথাও নয়! কথাগুলোর যে ব্যঞ্জনা তা ফুটে উঠেছে বিশ্বজিৎ-এর বলার ভঙ্গীতে। ব্যথিত, ক্লিষ্ট একজন দুঃখী মানুষ যেন কথা বলছে। সে কিছুক্ষণ থেমে আরও বলতে লাগল, তোমরা ভারতবর্ষকে বুঝবে না, এদেশের লোকই বোঝে না! এদেশকে বোঝবার দরকার নেই, নিজের দেশের কালো মানুষদের কথা কি তোমরা বোঝ? বোঝা সম্ভব নয়।

পরমুহূর্তেই বিশ্বজিৎ বলল, আমি দুঃখিত। ভাল আছি বলতে গিয়ে এত কথা বলে ফেললাম। কিছু মনে ক'রো না।

ও না। কখনই নয়। আমার শুধু আশ্চর্য লাগছে যে তোমার এমন অনুভূতি অথচ তুমি কাউকে মনের কথা বল না —

কাকে বলব?

আমাকে বলবে — সরলভাবে আবেদন জানাল এমিলি, তারপরই বলল, আমি ভারতবর্ষকে একদম জানি না, শুনে শুনে যতটুকুসম্ভব তাই আমার জ্ঞান।

তবে কি জান ভারতবর্ষকে আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে, দেখতে ইচ্ছে করে।

তোমাকে বলে কি হবে? তুমি এই দারিদ্র্য নিয়ে বিদ্রূপ ক'রতে পারবে, তোমার দেশে গিয়ে ইচ্ছে ক'রল ব্যঙ্গ ক'রে মজাদার কিছু প্রচার ক'রতে পারবে যা তোমাদের দেশের অনেকে ক'রে থাকে।

প্রিয় বিশ্বজিৎ, কোনটাই পারব না আমি। না কোন উপকারে লাগতে পারব না বিদ্রূপ ক'রব তোমাদের! কারণ তুমি জান না, তোমার দেশ, বিশেষ ক'রে এই বাংলাদেশকে ভালবেসেই তোমার দাদাকে আমি বিয়ে ক'রেছি।

এমিলির কথার অর্থ বিশ্বজিৎ কিছু বুঝতে পারল না। কিন্তু এমিলির কথার স্বরে যে গভীর আন্তরিকতা ছিল তা স্পর্শ ক'রল তাকে। সে কিছু বুঝতে না পেরে অসমাপ্ত কথা শোনবার জন্যে চুপ ক'রে রইল। কিন্তু এমিলিও কথা বলছিল না বলে একটু বাদে বলতে হ'ল, আমি তোমার কথা শুনে বিস্মিত হচ্ছি।

হওয়া স্বাভাবিক, আমিও তো হচ্ছি তোমার কথা শুনে। মানুষ যত নতুন অবস্থার সামনে আসে ততই সে বিস্মিত হয়। যেদিন প্রথম তোমাদের দেশের সম্বন্ধে আলোচনা শুনলাম, আমাদের দেশে বসে সেদিনও এমনি আশ্চর্য লেগেছিল আমার।

কি শুনেছিলে, ভারতবর্ষের লোক সব নেংটি পরে রাস্তার ওপরে শুয়ে থাকে, এই তো?

এমিলি অতি মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলল, নিজের জ্ঞান এবং ধারণা সব সময় মেলে না। আমি এমন একজন লোককে চিনতাম যে এদেশের সম্বন্ধে অত্যন্তই শ্রদ্ধা পোষণ করে, অথচ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ সচেতন। —কথাটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর কেমন বদলে গেল, নরম হয়ে এল। পাখীর বাচ্চার মত শান্ত স্বরে সে বলল, আমার কাকার কাছেই প্রথম এদেশের কথা শুনি। উনি এদেশকে খুবই শ্রদ্ধা করেন।

বিশ্বজিৎ এমিলির কথাগুলো অর্ধেক বিশ্বাস এবং অর্ধেক অবিশ্বাসের সঙ্গে শুনছিল। আমেরিকার কেউ এদেশকে বা অন্য কোন দেশকে শ্রদ্ধা ক'রতে পারে একথা তার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু এই যে মেয়েটি এর সরলতাকে অবিশ্বাস করার সঙ্গত কোন কারণও সে খুঁজে পাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশিয়ান এক ভদ্রলোক কিছুদিন ধরে বাংলাভাষার ক্লাস ক'রছে, ভদ্রলোক যথেষ্ট আন্তরিক ব্যবহার করার চেষ্টা ক'রলেও তাকে কেমন যেন কৃত্রিম মনে হয়, তার সঙ্গে মিশতে গিয়ে মনে হয় নির্দিষ্ট একটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে কর-মর্দনের হাত বাড়াচ্ছে আলেক্সি শেপিলভ। বাংলায় বললেও আলেক্সির কথা থেকে বলার ভঙ্গীকে পৃথক বলে মনে হয় অথচ এই মেয়েটা ইংরাজী ছাড়া কিছু বলতে না পারলেও মনে হচ্ছে নিবিড় বন্ধু কথা বলছে। কিন্তু আমেরিকানরা যদি অন্য দেশকে শ্রদ্ধাই ক'রবে তবে কি ক'রে এমন দানবিক

ভাবে বোমা ফেলে চলেছে ভিয়েৎনামের ওপর, কেমন ক'রে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে শোষিত মানুষের অধিকার লাভের চেষ্টাকে দমন ক'রে রেখেছে রাইফেল-এর আগায় ? মেলেনা, হিসাব মেলে না। পৃথিবীময় দরিদ্র বঞ্চিত জনগণকে চাপা দিয়ে রেখেছে ডলারের তলায় যে আমেরিকা তার অধিবাসীরা কখনও অন্য দরিদ্র দেশকে শ্রদ্ধা ক'রতে পারে ?

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজিৎ-এর সেই বিখ্যাত লেখকের লাইনও মনে পড়ল, আমেরিকার জনগণ নয়, সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থাই বিশ্বের মুক্তি আন্দোলনের প্রধান শত্রু। — কিন্তু --- জনগণ চাইলে কি সেই শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত ক'রতে পারে না ? পরিবর্তন ক'রতে পারে না ? তবে করে না কেন ? নিশ্চয়ই জনগণও সেই শাসন ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত ! সেই ব্যবস্থাতেই অভ্যস্ত। তবে আর কি ক'রে --

কি ভাবছ, জানতে চাইল এমিলি।

অনেক কথা।

কি কথা, অনেক গোপন ব্যাপার ? — বিশ্বজিৎ-এর সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেকটা সাহস এসে যাওয়ায় এমিলি নিকটজনের কৌতুকে প্রশ্নটা ক'রে ফেলল।

বিশ্বজিৎ এমিলির ঠাট্টাটা বুঝে বলল, ঠিক সে রকম কিছু নয়।

কোন বন্ধুর কথা ভাবছ কি ?

ঈষৎ হেসে বলল, না।

এমিলি বুঝল যে আর প্রশ্ন করা ঠিক হবে না তাই সে অন্য প্রসঙ্গে গেল, সেদিন বোন আমাকে বলছিল এদেশে নাকি স্বামীর ভাইকে নাম ধরে ডাকে না। কি যেন একটা বলছিল। আমি ভুলে গেলাম — মনে করবার জন্যে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল এমিলি, ভেবে না পেয়ে বলল, বল না।

কথাটা জানত না বিশ্বজিৎ-ও, বলল, আমি তো জানি না।

সে কি ? তুমি কেন জান না ? তোমার ভাষা —

আমি কাউকে কখনও বলতে শুনি নি। —

কিন্তু তোমাদের এটা খুব সুন্দর। প্রত্যেকটি লোকের আলাদা আলাদা সম্মান আছে। ভারী সুন্দর। বাস্তবিকই খুব চমৎকার ব্যবস্থা। স্বামীকেও এদেশে কি বলে যেন ডাকে, বোন শিখিয়েছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, 'ওগো'। ইট্স্ এ নাইস, রোমান্টিক—'ও গো' — আবার এমিলি উচ্চারণ ক'রল শব্দটা। কথাগুলো বলতে বলতে মধুর হাসিতে ভরে উঠল সে। উপভোগ্য সেই দৃশ্যে মুগ্ধ হতে বাধ্য হ'ল বিশ্বজিৎ। প্রচণ্ড বিদ্বেষে যে মেয়েটিকে সে এতদিন উপেক্ষা ক'রে চলছিল আজ আর তাকে ঘৃণা করার চেষ্টা ক'রতে পারল না। দুচার সেকেণ্ড এমিলির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই বিশ্বজিৎ গম্ভীর হ'ল, না যতই হাসুক এরা সেই মার্কিন বুর্জোয়া গোষ্ঠীরই

প্রতিনিধি যারা ভিয়েৎনামের মত ছোট দেশের ওপর নির্মমভাবে টন টন বোমা ফেলে ধ্বংস ক'রে চলেছে মানুষের জীবন, সমাজের ভবিষ্যৎ। এও সেই মাকিন শাসকগোষ্ঠীর নির্বাচকদের একজন যে শাসকগোষ্ঠী কালের ইতিহাসকে ক'রছে কলঙ্কিত। এ মেয়েটিও সেই আত্মসুখসর্বস্ব সমাজের শরিক যে সমাজ বর্বর আত্মাভিমানে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মদমত্ত দম্ভে মানুষের স্বাধীন চেতনাকে শিশুর শরীরের সঙ্গে দলিত মথিত ক'রে নিজেদের বিলাসের উপকরণ অব্যাহত রাখবার জন্যে যে কোন ধ্বংসে বদ্ধপরিকর। ঘরে বাইরে কোথাও কোন সমঝোতা নয়, চরম ঘৃণা দিয়ে মাকিন শাসকগোষ্ঠীকে মানুষের সমাজের রায় জানিয়ে দেওয়া উচিত, বিবেকহীন, মনুষ্যত্বহীন একটা জাতিকে সচেতন করবার অন্য উপায় যখন আর না থাকে তখন অন্তত ঘৃণা দিয়েই সেই প্রতিকারের অক্ষমতা পুরণ ক'রতে হয়। অতএব, আর কোন কথাবার্তা না বলেই বিশ্বজিৎ নিজের জামা খুলে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে বোঝাল এবার সে কলঘরে যাবে।

আকস্মিক এই ভাব পরিবর্তনে হতবাক হয়ে গেল এমিলি বিস্ময়ে। এরকম ঘটনা সে জীবনে আর কখনও দেখেনি। এই তো বেশ ভাল কথা বলছিল ছেলেটা আর মহর্তের মধ্যে কি ভাবান্তর হ'ল—হতভম্ভ হয়ে বিশ্বজিৎ-এর ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে এমিলি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তারপর কি ক'রবে না ক'রবে ভেবে না পেয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল রুমির সামনে। ওকে দেখেই রুমি ঠাট্টা ক'রে প্রশ্ন ক'রল, কি এত সময় লাগল যে, অনেক বেছে আনতে হ'ল বুঝি?

ওর কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে এবং বোঝবার চেষ্টা না ক'রে এমিলি ঠোঁটের সামনে তর্জনী ধরে কথা না বলবার ইসারা ক'রল, নিজে বলল, আমি জানি না কি হ'ল।

এমিলির সন্ত্রস্ত ভঙ্গী দেখে রুমিও বিচলিত হয়ে জানতে চাইল, কি হ'ল?

কি কারণ আমি জানিনা কথা বলতে বলতে হঠাৎ বিশ্বজিৎ উঠে পড়ল কথা বলল না।

ও, গভীর নিশ্চিন্ততায় রুমি বলল, এই ব্যাপার? পরক্ষণে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলল, ওর কি হয়েছে কেউ জানে না। কারও সঙ্গেই প্রায় কথা বলে না।

ব্যাপারটা আমার কেমন আশ্চর্য মনে হচ্ছে।

কেন?

এমিলি এই 'কেন'র জবাব দিতে পারল না। কেন যে তার আশ্চর্য মনে হয় সেই কথাটা সে নিজেও কোন দিন ভেবে দেখেনি বলেই আজ বোঝাতে পারল না তার বিস্ময়ের কারণ। কিন্তু এতদিনের ব্যবহারের চেয়ে আজকের ব্যবহারেই তাকে অধিকতর বিস্মিত ক'রল বিশ্বজিৎ। তবে রুমিকে সে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না এতে বিস্ময়কর কি আছে। সে নিজেও ভাবতে

গেলে কোন কারণ খুঁজে পায় না। কেউ যদি অন্য সকলকে এড়িয়ে একা থাকতে চায় অস্বাভাবিক হয়ত বা তার ব্যবহার হতে পারে তবে বিস্ময়ের কিছু থাকে না, কিন্তু আজকের ব্যবহার তো কথা না বলা নয়, বরং স্বাভাবিক ভাবে বলতে বলতে হঠাৎ থমকে যাওয়া — এতেও কিছু বিস্ময়কর না পাওয়াটাই তো অস্বাভাবিক। সেকথা বলা চলে না, বলল-ও না। তবে এখানকার একটা স্বভাব দেখে সে ভেবে পাচ্ছে না এদেশের এটাই রীতি কিনা। এদের বাড়ীর প্রত্যেকেই আত্মমগ্ন, কেউ কারও সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবর রাখে না একই পরিবারের একান্ত আপনার লোক সবাই অথচ সকলে সকলের অপরিচিতের মত বাস করে। এদেশের কথা যতটুকু শুনে শুনে সে জেনেছে তাতে তো এ বাড়ীর সঙ্গে মেলে না।

কল্যাণ কিন্তু অন্যকথা বলত। সে বলত এদেশের একান্নবর্তী পরিবার-গুলোর কথা, ভাই-এর প্রতি ভাই-এর প্রীতির কথা, বাবার প্রতি ছেলের কর্তব্য ও ভালবাসার কথা। আরও কত সব কথা বলত শুনতে রূপকথার মত মনে হ'ত। পূর্বপাকিস্থানের ছাত্র সিরাজুল-ও জিজ্ঞেস ক'রলে সায় দিয়ে বলত সত্যিই তাদের দেশের জীবনযাত্রাও ওই রকম। এমিলির মনে আছে একদিন সে জানতে চেয়েছিল, তোমাদের দুদেশের জীবনযাত্রাই যদি এক রকমের, ভাষাও যদি এক তবে তোমরা আলাদা হ'লে কেন?

হিন্দুস্থানে থাকলে মুসলমানদের নানা রকম অসুবিধে—সেইজন্যেই আলাদা দেশ দরকার ছিল আমাদের — সিরাজুল জবাব দিয়েছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাকার আগ্রহে যতটুকু এমিলি জেনেছিল তারই ওপর নির্ভর ক'রে এমিলি প্রশ্ন ক'রেছিল, তোমাদের দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন তোমার বয়স কত?

পাঁচ-ছ বছর হবে, সিরাজুল-এর জবাব।

তবে তুমি কি ক'রে জানলে যে মুসলমানদের স্বার্থ রাখবার জন্যেই দেশটাকে ভাগ করা হয়েছিল?

তা ছাড়া অন্য আর কি কারণ থাকতে পারে?

রাজনীতি এমিলিব আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল না, তার জানা-ও ছিল না রাজনীতির জটিল ইতিহাস সে শুধুমাত্র কৌতুহল বলেই প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছিল বলে বেশী কথা আর বাড়াল না। তবে সেই যে দুই পাশের দুজন একই কথা বলেছিল কোথায় সেই রূপকথার মত জীবন? এবাড়ীতে যেন মিলছে না। আবার নিজেই সে ভাবল, এই তো ক'দিন মাত্র এসেছে, এর মধ্যে কি ক'রেই বা বুঝবে সে? অতশীঘ্রি কি আর বোঝা যায়? অতএব সিদ্ধান্ত করা থেকে সে বিরত থাকল। তবু বাড়ীর কেউ যে বিশ্বজিৎ-এর খোঁজ নেয় না এটাই তাকে পীড়িত ক'রতে লাগল। অবশ্য কে-ই বা কার খোঁজ করে? একটা দিনের জন্যেও তো ছেলেদের কাউকে বাবার সঙ্গে কথা বলতে দেখে নি এমিলি!

বাবা কেবল মাঝে মাঝে তার সঙ্গে আর মা-র সঙ্গে কথা বলেন। তাছাড়া যতক্ষণ তিনি বাড়ীতে থাকেন কারও সঙ্গেই কথা বলেন না, শুধু বাড়ীর আবহাওয়া থমথমে থাকে বলে বোঝা যায় তিনি বাড়ীতে আছেন।

কি জানি কেন, রুমিও বোঝে না, বাবা বাড়ীতে থাকলে সমস্ত বাড়ীটা কেমন গম্ভীর হয়ে থাকে, অথচ উনি না থাকলে যে খুব হৈ চৈ হয় আদৌ তা নয়, তবু রুমি বিশেষভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখেছে, বাবা থাকলে এবং না থাকলে বাড়ীর আবহাওয়ায় পার্থক্য বোঝা যায়। রুমি আর একটা জিনিষ বুঝতে পারে না বাবার কথা মনে হলেই কেন ছোটদার কথা মনে পড়ে। অথচ দুজনের চরিত্রে বোধহয় বিন্দুমাত্র মিল নেই, বিশেষ করে ইদানীং যা দেখা যাচ্ছে তাতে বাবার চরিত্রের সঙ্গে বিশ্বজিৎ-এর বৈপরীত্যই বেশী ক'রে ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয় বিশ্বজিৎ এই এক বছর ধরে কেমন যেন বদলে চলেছে। যদিও ছোট বেলা থেকেই জীবন সম্বন্ধে ও কিছুটা উদাসীন তবু আজকাল কি যে হয়েছে অনেক বেশী উদাসীন হয়ে পড়েছে, নিজের প্রয়োজন এবং ব্যবহারিক জিনিষপত্র সম্পর্কেও। ছোট বেলাতেই, রুমির মনে আছে, ঠাকুমা বলতেন, ছোটদা নাকি ঠাকুর্দার মত হয়েছে। ঠাকুর্দার-ও নাকি খাওয়াপরায় ভাল মন্দের কোন তারতম্য ছিল না। কোন কিছুর ওপরেই নাকি লোভ ছিল না। খুব অনাড়ম্বর জীবন ভালবাসতেন তিনি। কথাটা যে সত্য তা মা-ও জানতেন, তবে বিশ্বজিৎ-এর সঙ্গে শ্বশুরকে তিনি একভাবে ভাবতে চাইতেন না। তাঁর ধারণা ছিল আগেকার কালে সব লোকই ওই রকম সাদামাঠা থাকত। তাছাড়া ঠাকুর্দার এই সরল জীবন যাত্রাকে অর্থনৈতিক অক্ষমতা বলে মা মনে করতেন একথা রুমি জানে। বাবার অজ্ঞাতে এজাতীয় আলোচনা মাকে ক'রতে সে শুনেছে। তাঁর আরও কতগুলো ধারণা ছিল স্কুল মাস্টারদের ওসব লোভ থাকতে নেই। ছোটদা যেহেতু বড় মানুষের ছেলে অতএব সে সেই রকমেরই হবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু রুমি বেশ জানে এখনও ছোটদা তেমন হয়নি। বরং এখন এমনই হয়েছে যে সব কিছুই ওর কাছে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার উপকরণ মাত্র। মা এত জানে কিনা রুমি বোঝে না। কারণ মা অদ্ভুৎ এক নির্লিপ্ততা দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রাখে। কাউকে নিয়ে কোন চিন্তা ক'রতে কখনও মাকে সে দেখে নি। একটু চিন্তা ক'রলে বোধহয় ভাল হ'ত। বাড়ীর ঝি রাঁধুনী পর্যন্ত ভাবতে সুরু ক'রে দিয়েছে যে ছোটদাকে নিয়ে, তাকে নিয়ে ভাবা মা-র একান্তভাবেই উচিৎ। আজকাল রাঁধুনী খেতে দিলে, ভাল সন্দেশ বা ভাল কোন জিনিষ দিলে বিশ্বজিৎ নাকি জানতে চায় ওটা কোথা থেকে এসেছে। যদি কোন লোক বাবাকে উপহার বা ভেট হিসেবে পাঠিয়েছে শোনে তবে আর তা খায় না। এসব আদিখ্যেতা ভাল লাগে না রুমির। বাবার কাণে একদিন কথাটা পোঁছালে কি হবে সেটা কি একবারও ছোটদা ভেবে দেখেছে? ভাবলে

আর এসব ক'রত না। কি বুদ্ধি যে মাথায় চেপেছে কে জানে। লোকে ভালবেসে দিয়েছে তাতে কি হয়েছে রুমি বোঝে না। বাবাকে সবাই মানে বলেই না দেয়! নইলে কে আর দিতে যাচ্ছে কাকে? যাকে ভালবাসে তাকেই না দেয়! এই যেমন সৌগতকে কত লোকে কত জিনিষ দেয়। কি হয়েছে তাতে? বন্ধুদের বাবারা-ও সব অফিসে কাজ করে, কেউ তো পায় না! বড় কাজ ক'রলে তবেই পায়। এই সেবার ডলি মাসীর বিয়ের সময় ঘরের গাড়ী মেরামতে গিয়েছিল কিন্তু একখানার জায়গায় তিনখানা গাড়ী কোত্থেকে সব এসে পড়েছিল। একখানা গাড়ী হলেই সবাই বিয়েতে যেতে পারত বলে বাবা দুখানা গাড়ীকে আবার ফেরৎ দিয়ে দিল। খাতির ভালবাসা থাকলেই কখনও কোন জিনিষের জন্যে ঠেকতে হয় না।

রুমি ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে ভূতে জিনিষ জোগায় তাদের বাড়ীতে। না চাইতেই কত জিনিষ এসে হাজির হয়ে যায়। অনেক সময় রুমি এমন জিনিষ এসে পড়তে দেখেছে যা পেয়ে সত্যিই খুব আনন্দ হয়েছে তার। মনে মনে যেন সে ওই জিনিষটাই চাইছিল। অথচ ছোটদাটার আজকাল কি হয়েছে ওসব চোখে পড়লেই কেমন অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে, মুখে কিছু বলে না কিন্তু চোখে চোখ পড়লে সব বোঝা যায়। রুমি অবশ্য সে সব গ্রাহ্য করে নি, কেউই করে না। ওর অসহিষ্ণুতা নিয়ে ও নিজের ঘরে আছে, কার কি তাতে? আজ এমিলি কথা তুলল বলেই এত সব মনে এল। আর একদিন কথা তুলেছিল সৌগত, বলেছিল, বিশ্বজিৎটার কি হয়েছে বুঝছি না। আগে দেখা হলে কথা-টথা বলত, আজকাল এড়িয়ে যায়। ব্যাপারটা কি বলতে পার?

কি ক'রে জানব? রুমি জবাব দিয়েছিল, তোমার সঙ্গে তো তবু কথা-বার্তা বলত, আমাদের সঙ্গে তো কোনদিনই বলে না।

কেন বল তো? তোমাদের বাড়ীতে অবশ্য কেউই বিশেষ কথা বলে না।

কে কার সঙ্গে বলবে? কারও সঙ্গে কারও না আছে বয়সের মিল না আছে গল্প করার সম্পর্ক। এই যে তুমি আসো আমি কি তোমার সঙ্গে কম কথা বলি?

আগে তো বিশ্বজিৎ-ও বলত দুচারটে।

এখন কেন বলে না আমি জানি না। কেউ-ই বোধহয় জানে না। তবে আজকাল দেখি গাদা গাদা বই নিয়ে আসে বাণ্ডিল ক'রে। যখন বাড়ীতে থাকে দরজা বন্ধ ক'রে কি সব পড়ে। বাড়ীর বাইরে গেলে ঘরে তালা দিয়ে যায়।

কেন?

জানি না।

তোমার মা কিছু বলে না?

ওর ঘরে ও তালা দিচ্ছে মা কি বলতে যাবে?

সৌগত এ প্রশ্নের জবাব দেয় নি। চুপ ক'রে ছিল, থেমে গিয়েছিল বিশ্বজিৎ প্রসঙ্গ। আজ অনেক ক'দিন পরে আবার এমিলি তুলল। আজ রুমিই থেমে যেতে চায়, থামাতে চায় বিশ্বজিৎ প্রসঙ্গ। অন্য কারও কথা নিয়ে আলোচনা করা তার একান্তই অপছন্দের। মা বলে, যে যা ক'রছে ক'রতে দাও। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলানো একদম অনুচিত। কথাটা রুমি-ও বিশ্বাস করে। এমিলি মেয়েটার কিন্তু বড্ড বেশী কৌতুহল। সব কিছু জানতে চায়, বড় তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলতে চায়। রুমি এতটা পছন্দ করে না। যদি মেম না হয়ে দেশের মেয়ে হ'ত তা'হলে এতটা বরদাস্ত ক'রত না সে মোটেই, কবে থামিয়ে দিত এসব বাড়তি আগ্রহ, বুঝিয়ে দিত এবাড়ীতে ওসব চলে না। কিন্তু বিদেশী মেয়ে বলেই অনেকটা সমীহ ক'রে তেমন কঠোর হতে পারে না সে। তাছাড়া সে লক্ষ্য ক'রেছে এমিলির ব্যাপারে মা-ও তেমন কঠোর নয় আরও সেইজন্যেই সে অনেকটা বেশী ঔদার্যে সব সহ্য ক'রে নেয়।

এমিলি এবাড়ীকে বোঝে না। সে মনে করে এটাই স্বাভাবিক। এদেশের লোকেরা এই রকমই। তাছাড়া তার যেটুকু অপছন্দ সেটুকু সে নিজের ত্রুটি বলেই মনে করে। মনে করে ভাষা না জানার জন্যেই সে সকলের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা ক'রতে পারছে না। তার ধারণা বাংলাভাষাটা শিখতে পারলেই সব সমস্যা মিটে যাবে। তার খুবই ইচ্ছে করে এই বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলার। ওঁর মধ্যে যেন অনেক কথা লুকিয়ে আছে কোন খনির মত। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারলে সে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের আত্মার শব্দ শুনতে পাবে। কল্যাণ বলত, মানুষের দেহটা সব নয়। দেহের ভেতরেও যেমন অনেককিছু থাকে যার মাধ্যমে আসল মানুষটাকে দেখা যায় দেশের ব্যাপারেও তেমনি, তুমি যদি আমার বাংলাদেশকে দেখতে চাও তা'হলে তার মাঠ-ঘাট-ঘর-বাড়ী দেখলেই হবে না, দেশের আত্মাকে দেখতে হবে। আর তা দেখতে হ'লে খুঁজে বেড়াতে হবে, বের ক'রতে হবে। কল্যাণের কথাগুলো বিমুগ্ধ হয়ে শুনছিল এমিলি। এই যে আমরা এক দেশ থেকে আর এক দেশে আসি এতে সব দেখা হয় না। অর্ধেক দেখি। — থেমে থেমে আস্তে আস্তে কথা বলত কল্যাণ, বলত শান্ত স্বরে। — সবাই বস্তুগত কিছু পাবার আশায় এদেশে আসি। কেউ আসি লেখাপড়া শিখে বেশী পয়সা রোজগারের আশা নিয়ে, কেউ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, কেউ রাজনৈতিক লাভ ওঠানোর জন্যে, এমনি আরও কত কি। এতে দেশকে জানা যায় না।

কথাগুলো মনে পড়ে এমিলির। কল্যাণ-এর সব কথা মনে পড়ে। আশ্চর্য স্নিগ্ধ কথাগুলো শুনতে শুনতে কখনও কখনও তার মনে পড়ে যেন

দাদার সমাধির কথা। অমন দুরন্ত দাদার দেহটা ঘিরে রেখেছে যে সমাধিবেদী কি শান্ত তা! কি আশ্চর্য নীরব, নির্জন দুপুরে পাখীগুলো কথা বললেও তা সচকিত করে না — কল্যাণের কথাগুলোর মধ্যেও অমনি প্রশান্তি, আব্যর যুদ্ধে নিহত দাদার স্মৃতির মতই জীবন্ত তা।

রুমি কলেজে গেছে, নিজের বন্ধ-দরজা ঘরে সুপ্রীতি কি ক'রছেন এমিলি জানে না, ওপাশে বৃদ্ধা একা কি যেন বই পড়েন আপন মনে, নইলে শুয়ে থাকেন — এমিলির নিঃসঙ্গ লাগে। সে ঘরের মধ্যে বসে কখনও বই পড়ে কখনও আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে। আজ কোন বই ছিল না বলেই নিজের পুরানো দিনের কথাগুলোকে মেলে ধরছিল। কল্যাণ-এর সঙ্গে কোন বিষয়েই বিন্দুমাত্র মিল ছিল না দাদার। এমনকি দাদার মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ ক'রে কল্যাণ বলেছিল, দেশের স্বাধীনতার জন্যে মরলে সে মৃত্যুর একটা মহৎ ঐশ্বর্য থাকে, কোন আমেরিকার সৈনিক ভিয়েৎনামের মাটিতে গিয়ে যখন মরে তার চেয়ে নিরর্থক মৃত্যু আর কিছু হতে পারে না। — দাদা ভিয়েৎনামের যুদ্ধেই মারা গেলে কাকার সুবাদে মৃতদেহ বিশেষ বিমানে দেশে এনে সমাহিত করা হয়। কল্যাণ মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়েও বলেছিল প্রত্যেক মৃত্যুই দুঃখজনক কিন্তু এমন দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু যেন অবিলম্বে বন্ধ হয় এই পৃথিবীতে।

মাকে মনে পড়ে এমিলির। শান্ত সংযতবাক্ মা শুধু একটা কথাই বলেছিলেন, এই যুদ্ধ যারা চালায় তাদের ধিক।

কেবল বাবা কোন কথা বলেন নি, একটিও শব্দ করেন নি, দাঁড়িয়ে সমস্ত কাজ শেষ ক'রেছিলেন, তারপর শেষ মাটিটুকু তুলে নিয়ে দিয়েছিলেন পাশের গাছটার গোড়াতে। দাদাও বাবার মত গোঁড়া আমেরিকান ছিল, ফিলাডেলফিয়া নগরীতে আমেরিকার স্বাধীনতার পতাকা যে প্রথম উড্ডীন হয়েছিল এ নিয়ে বাবার অপরিসীম গর্বের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিল দাদা। তাই দেশের প্রকৃত সৈনিকের মত সে দ্বিধাহীনভাবে ভিয়েৎনামের যুদ্ধে চলে গিয়েছিল তখনকার বিপন্ন সহকর্মীদের সহযোগিতা ক'রতে। দাদার মৃত্যু প্রসঙ্গে বলা কথাগুলো ভাল লাগেনি এমিলির, একমাত্র এই এক সময়েই মাত্র ভাল লাগেনি কল্যাণের কথা, কিন্তু পরে সে ভেবে দেখেছে সত্যিই কল্যাণ অন্যায় বলেনি, হয়ত অপ্রিয় ছিল অন্যায় ছিল না। সত্যিই ঐ মৃত্যু নিরর্থক। ঠিকই বলেছিল কল্যাণ। ভিয়েৎনামের ওপর যতবড় যুদ্ধই হোকনা, জনসন, নিকসন, কোন প্রেসিডেন্ট-এরই ছেলে মরবে না, মরবে আমেরিকার অগণিত সাধারণ নাগরিকের সন্তানেরা — যাদের পাঠানো হবে ভিয়েৎনামের কমিউনিস্ট অগ্রগতি ঠেকাতে। কল্যাণের এইসব কথা শুনলে এক এক সময় মনে হ'ত সে বুঝি কমিউনিস্ট। সে কি কমিউনিস্ট? জানতেও চেয়েছিল এমিলি।

আমি গরীব ঘরের ছেলে এমিলি, বলেছিল কল্যাণ, আমার বাবা ছিলেন কৃষক। সামান্য জমির ওপর আমরা বেঁচে থাকি। অনেক কষ্টে লেখাপড়া

সাধারণ কিছু শিখেছি। পড়াশোনা নিয়ে এতবেশী ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে রাজনীতি করার অবসর হয়নি।

কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনলে মনে হয় তুমি কমিউনিস্ট।

আমার মত গরীব দেশের প্রায় সব লোকেরই কথা এইরকম।

পূর্বপাকিস্তান-ও তো তোমাদেরই মত কিন্তু ওই যে বসীর আসে ও তো তোমার মত কথা বলে না।

জানি না। আমি বলি আমার অনুভূতির কথা।

তুমি বরং তোমার দেশের কথা বল। শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।

বলে আর তোমাকে কতটুকু বোঝাতে পারব এমিলি, যদি তোমাকে দেখাতে পারতাম তবে তুমি আমাদের বাংলাদেশের কথা বুঝতে। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে সে দেশ সকল দেশের সেরা। স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা — বাংলা গানটা গেয়ে শুনিয়েছিল কল্যাণ। শ্রবণে সুখকর লাগাতে এমিলি বলেছিল, তোমার ভাষাতো কিছুই বুঝিনা কল্যাণ গানটা আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও না —

কল্যাণ বুঝিয়েছিল, সেই অর্থটি এখনও মনে আছে এমিলির, ভোলে নি। কল্যাণ বলত, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। কিন্তু কল্যাণ যে সব গ্রামের কথা বলত কোথায় তা? এ তো সহর কলকাতা, ফিলাডেলফিয়ার সঙ্গে পার্থক্য অনেকই আছে তবু চরিত্রে তো একই। এখানে চারপাশে যারা আছে তাদের সঙ্গে ওদেশের পার্থক্য কেবল চামড়ার রঙে, নইলে ভাষাও সবাই ইংরাজীই বলে। চালচলন আদবকায়দা এমনকি যতদূর দেখছে খাওয়া-দাওয়ার ধরণধারণও এদের ওদেশেরই মত। কল্যাণ গল্প ক'রত বাঁশগাছের নিচে দিয়ে শান্ত শীতল কাঁচামাটির রাস্তার ওপর বসে থাকে কাঠবিড়ালী, কালো কুচকুচে উজ্জ্বল একরকম লম্বা পাখী লেজ ঝুলিয়ে রাস্তার ধারের উঁচু জায়গায় বসে থাকে আপন মনে। কোথায় সে সব? হঠাৎ হারিয়ে গেল কল্যাণ, তার বাড়ীর ঠিকানাটা জানা থাকলেও না হয় গিয়ে দেখা ক'রে বলা যেত, কই দেখাও তোমার দেশ, তোমার গ্রাম, স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা তোমার জন্মভূমি! উপায় নেই। কল্যাণ জানা নামের ঘন কালো উজ্জ্বল মানুষটা যে কোথায় থাকে তার ঠিকানা কে বা জানে? কল্যাণ যখন কথা বলত ওর গভীর কালো চোখের মনিতে যেন ফুটে উঠত সেই স্বপ্ন দিয়ে তৈরী দেশের প্রতিবিম্ব। কোনদিন সে দেশ দেখেনি এমিলি তবু যেন দেখতে পেত, কল্পনার পর্দায় ছায়া ফুটত। তারপর অকস্মাৎ একদিন উধাও হয়ে গেল কল্যাণ। এমিলির মন চৈত্রের ঝড়ের মত ক'রে খুঁজল তাকে, পাওয়া গেল না। সন্ধান পাওয়া গেল প্রত্যাবর্তনের পথে বেইরুট বিমানবন্দর থেকে এক ছুঁড়ে দেওয়া চিঠিতে। সে লিখেছে দেশে ফিরে যাচ্ছে, প্রথমে নিজের গ্রামে। তারপর খুঁজে নেবে কোন কলেজে অধ্যাপকের কাজ।

সুন্দর ফিলাডেলফিয়াকে সে বিদায় জানাচ্ছে, এমিলির অসীম ভালবাসার স্মৃতি নিয়ে যাচ্ছে হৃদয়ে। —ব্যস এইটুকুই। চিঠিটা বয়ে এনেছে বোবা শূন্যতা। সেই শূন্যতার বোঝা নিয়ে এমিলি উপলব্ধি ক'রেছে জীবনের মূল অনেক গভীরে। সত্যিই ভারতবর্ষ নামে একটা দেশ আছে, সেখানে একটা প্রদেশ আছে নাম পশ্চিমবাংলা, সত্যিই সেখানে মানুষ এখনও জন্মায় যাদের হৃদয় স্বপ্নের বর্ণময়তায় ভরপুর অথচ বস্তু জগতের কর্তব্যকে তারা যে মর্যাদা দেয় সে বড় বিশাল।

এখন কল্যাণ তার মনে দিনের বেলার সেই ধ্রুবতারা, তাকে পথ দেখিয়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে এনে এইখানে হাজির ক'রেছে। এখন সেই ধ্রুবতারা বুকের মধ্যে ব'সে টিপ টিপ ক'রে জ্বলছে নিজেকে লুকিয়ে। সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় বসে থাকা ছাড়া অন্য পথ আর নেই, তখন আবার পথ দেখাবে ধ্রুব-তারা—পৌঁছে দেবে সেই স্বপ্নের দেশে যে দেশে কল্যাণ-এর দিদিমা বসে বসে রূপকথার গল্প শোনান কালো পাথরের রাজপুত্রকে। এমিলি বিশ্বাস করে সত্যিই সে স্বপ্নের জগৎ নইলে এমন মানুষ জন্মায় কি ক'রে নারীকে যে ভোগের সামগ্রী মনে করে না, যে রক্তের উত্তপ্ত তৃষ্ণায় হয় না আকুল। বান্ধবীদের কাছে যত পরুষের গল্প শুনেছে তাদের সবাই দেহ ভরে কামনা আর ভোগের তৃষ্ণা নিয়ে স্বচ্ছন্দ বিহার করেছে যৌবনমদে মত্ত তার বান্ধবীদের সঙ্গে। তারও মনে আছে স্কুলের জীবনের বন্ধু হেনরীকে, স্টিফেনকে, দেখেছে সে দুর্দ্ধর্ষ জিমফ্লেচারকেও। তার পাশাপাশি দেখেছে কল্যাণকে ঝড়ের দাপাদাপির পাশে যেন স্নিগ্ধ বাতাস, যা ওড়ায় না ছড়ায় না। কিন্তু জড়ায়। এমিলি অল্পদিনের মধ্যেই উপলব্ধি ক'রেছিল সে জড়িয়ে যাচ্ছে। একথা ভালভাবে বুঝেও নিজেকে খুলতে চায়নি এমিলি বরং কোমল ঔদাসীন্যে প্রশ্রয় দিয়ে জড়িয়ে বাঁধনটাকে আরও শক্ত হতে দিতে চেয়েছিল। কারণে অকারণে নিমন্ত্রণে আমন্ত্রণে নিকট ক'রে তুলেছিল সম্পর্ক, সহজ ক'রে তুলেছিল কল্যাণের পরিচয়। বাবা ভয় পেয়েছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন ওই কালো লোকটির সঙ্গে এমিলি কতদূর এগোচ্ছে। এমিলি দূরত্ব জানাতে পারেনি তবে নিজে না জানা সত্ত্বেও বাবাকে অভয় দিয়েছিল বেশী দূর নয়, স্রেফ বন্ধুত্ব। এমিলির মনে পড়ে কল্যাণও কথা দিয়েছিল তাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। কিন্তু কথা তো রাখল না সে। একদিন নিঃশব্দে গোপনে ফিরে এল দেশে, ঠিকানাটা পর্যন্ত জানিয়ে এল না। এমিলি আশা ক'রেছিল পরে হয়ত চিঠি লিখে ঠিকানা জানাবে, তাও জানাল না। কেন তা এমিলি বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে সেই দিনটার কথা মনে আসে, সেই দিনটির জন্যেই কি এরকম ক'রে না বলে সে চলে গেল। সন্ধ্যার পর নির্জন পথ ধরে হেঁটে বেড়াতে ভালবাসত কল্যাণ। প্রায়ই বেড়াত। অনেকদিনই এমিলি সঙ্গে থাকত, সেদিনও ছিল। হঠাৎ এমিলির মাথায় এক অদ্ভুৎ প্রশ্ন এসেছিল, আচ্ছা কল্যাণ, এখানে তো তুমি ভাল চাকরী পেয়েছ।

কল্যাণ হয়ত একটু অবাক হয়েছিল, আলো কম থাকায় বোঝা যায়নি, সে শুধু বলেছিল, পেয়েছি।

তুমি যা বল তাতে সুন্দর বাসস্থানও পেয়েছ!

পেয়েছি। কেন বল তো?

এখানে কি তুমি পাও নি?

হঠাৎ এমিলির দিকে তাকাল কল্যাণ, জানতে চাইল, আজ তুমি এসব প্রশ্ন কেন ক'রছ? আমার দেশের কথা শুনে তুমি কি বোঝ নি মানুষের জীবনকে আমেরিকা সুখের উপকরণ যত দিতে পারে ভারত দিতে পারে না তার কিছুই। কিন্তু তাতে কি?

তবে তুমি সেখানে ফিরে যেতে চাও কেন? কত লোক তো কত দেশে গিয়ে থেকে যায়, তোমাদের দেশের কত লোকই তো এখানে এসে রয়ে গেছে।

তাদের কথা জানিনা এমিলি, কল্যাণ তার সেই অদ্ভুৎ শান্ত স্বরে বলেছিল, ওখানে আমার মা আছেন।

মাকে তুমি এখানে নিয়ে আসতে পার —

তা সম্ভব নয়। তিনি এখানে এসে থাকতে পারবেন না। তাছাড়া আমার যে জন্মভূমি তার কাছে আমার যে ঋণ তা অস্বীকার করি কি ক'রে?

মানুষ এখন আন্তর্জাতিক। সমস্ত পৃথিবীই তার জন্মভূমি, তার দেশ।

কল্যাণ অল্পক্ষণ চিন্তা করল, বলল, তোমার কথাটা তোমার ঔদার্যের মতই সুন্দর কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি জান এমিলি, আমার দরিদ্র অনুন্নত দেশকে যদি আমার নিজের ভোগবাসনার লোভে ছেড়ে দিই তবে সে আমার ঔদার্য হবে না, আমার ক্ষুদ্রতাই হবে। আমি জানি এদেশে থেকে যে উন্নত বিদ্যা আমি আরম্ভ ক'রলাম তা হয়ত আমি ওখানে গিয়ে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারব না কিন্তু যতটুকু পারব তাই আমার দেশের ভবিষ্যৎ মানুষের উপকারে লাগবে। আমার জন্মভূমিতে যারা জন্ম নেয় তারা আমার ভাই, তাদের প্রতিও আমার দায়িত্ব আছে —। প্রকৃতঅর্থে একে অনেকে সংকীর্ণতা বলতে পারে, আমারও ভেবে চিন্তে দেখলে তা-ই মনে হবে, কিন্তু নিজের মায়ের প্রতি ভাই-এর প্রতি দায়িত্ববান হওয়া যদি সংকীর্ণতা হয় তবে ওই শব্দটাকে আমি গৌরবের বলেই মনে ক'রব।

এমিলির মনে পড়ল সে একথার জবাব দিতে পারে নি। কল্যাণের হৃদয়ের পরিচয় তার যা জানা ছিল তাতে এজবাব খুবই স্বাভাবিক। নিজের দেশকে সে গভীর মমতার সঙ্গে জানে, ভালবাসে। সেই ভালবাসা দিয়ে সে দেখে নদী মাঠ-জনপদ, বিচার করে পশুপাখী এবং মানুষের। শুধু নিজের দেশ কেন, কল্যাণের সঙ্গে আলাপের সমস্ত দিনগুলোকে মিলিয়ে এমিলি দেখতে পায় প্রকৃত-অর্থে কল্যাণ আন্তর্জাতিক মানুষ। আমেরিকারও সে কত প্রশংসা ক'রেছে প্রত্যেক কথায়। সে দেশের পাইন, ওক, ক্রীসমাস — সব গাছ দেখেই সে

অপূর্ব আনন্দের স্বাদ পেয়েছে, গভীর আনন্দ প্রকাশ ক'রেছে সে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি দেখে। আসলে কল্যাণ পৃথিবীর প্রতিই অপরিসীম মমতা সম্পন্ন। অনাবিল ভালবাসায় তৈরী তার হৃদয়। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে তাকে দেখলে বিচারে বিভ্রান্তি আসবে — আসবে বুঝেই এমিলি শুধু নীরব শ্রদ্ধায় শুনে গেছে তার কথা, মনে মনে খুশী হয়েছে, বলেছে, তোমার কথা শুনতে শুনতে আমার কি মনে হয় জান কল্যাণ? মনে হয় তুমি যদি ইউলিসিস-এর মত হতে, তোমার জাহাজ যদি বন্দরে বন্দরে ভিড়ে দেশ দেশ থেকে তোমায় সঞ্চয় ক'রে দিত অভিজ্ঞতা, তা'হলে পৃথিবী একজন সুন্দর মানুষকে পেত তার মহিমা প্রচার করার জন্যে।

সে কথার জবাব দেয়নি কল্যাণ, শুধু নীরবে তার দুই চোখের দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে সামনের আকাশের দিকে চেয়ে থেকেছে। এই রকমই সে করে। এমিলি অনেকবারই দেখেছে প্রসন্নতা অথবা বেদনায় হাসি অথবা দীর্ঘশ্বাসের পরিবর্ত তার এই অভিব্যক্তি। কখনই তাকে হাসতে দেখেনি এমিলি অথচ এক একসময় তার মুখের দিকে চেয়ে প্রসন্নতা বা আনন্দ সে বেশ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে। আবার কখনও সেই একই নিঃশব্দ মুখমণ্ডলে সে ফুটে উঠতে দেখেছে গভীর বেদনা। এখনও কেমন যেন করুণ দেখাল কল্যাণের উজ্জ্বল মুখখানা। এমিলি বুঝল না সে কোন ব্যথার কাজ ক'রে ফেলল কিনা। শঙ্কিত প্রতীক্ষায় চেয়ে রইল সে কল্যাণের দিকে। অল্পক্ষণ পরেই কল্যাণ বলল, ভাবতে আমার বড় খারাপ লাগে, জান এমিলি, পৃথিবীটা ক্রমাগত শীতল হয়ে আসছে। আমাদের সভ্যতার প্রয়োজনে আমরা নিজেরাও দূষিত ক'রে তুলছি এর জল-বাতাস-মাটি।

কেন? এমিলি বুঝতে চাইল কল্যাণের কথার তাৎপর্য।

তোমাদের এখানকার হাডসন নদীর কথাই ধরনা, নিউইয়র্কের কারখানাগুলোর যত দূষিত জল বয়ে বয়ে তার জলই দূষিত হয়ে পড়েছে। এই সমস্যায় আমেরিকা রাশিয়া জাপান কেউ আলাদা নয়। পরমাণবিক ভস্মের কল্যাণে জীবন হয়ে পড়ছে বিকৃত, সমুদ্র হয়ে উঠছে বিষাক্ত। সভ্যতা বিকাশের সুরু থেকে সেই যে অরণ্য উচ্ছেদ আরম্ভ হয়েছে তাতে প্রাচীন প্রাণী জগতের মত বহু গাছকেও আমরা পৃথিবী থেকে নির্মূল ক'রে ছাড়ব বলেই মনে হয়।

কথাটা এমিলি একটু ভেবে দেখল। অরণ্যের সঙ্গে তার পরিচয় কিছুই নেই তাই সে কল্যাণের কথা কিছু কিছু বুঝলেও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারল না। এই সুন্দর ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন এই সব নগর যে একদিন ছিল গভীর অরণ্য এ তার ভাবনাতেই আসে না। একজন মানুষ যেমন জন্ম থেকেই মানুষ, একটা গাছ যেমন সুরু থেকেই গাছ তেমনি এই শহরগুলোও তো চিরদিনই শহর। সাজানো এই বাড়ীগুলো তার জন্মের

আগে থেকেই আছে তার মৃত্যুর পরেও থাকবে — যেমন আকাশের তারারাজি তেমনি এই শহর এবং অরণ্য। সবকিছুই শাশ্বত বলে তার নিস্তরঙ্গ মনের ধারণা। কল্যাণের আজকের কথা সেখানে প্রথম অভিঘাত। কিন্তু সেই সামান্য অভিঘাত তার মনে বিস্তার পেল না। কোন কূলকিনারা না পেয়ে সেখানেই হারিয়ে গেল। তাই বলে কল্যাণকে সে নিরুৎসাহ ক'রল না, বলল, তোমরা যে জিনিষ আগে বুঝবে আমরা তা বুঝব অনেক পরে। তোমরা কতকিছু পড়, কত বিষয় আলোচনা কর আর আমরা। নিজেই একচোট হেসে নিল হো হো ক'রে, বলল, হেল্যাণ্ড কোম্পানীর ডিজাইনের বই থেকে উলবোনার নক্সা খুঁজি।

তবু তো কিছু কর, কল্যাণ বলল, তুমি ইউলিসিস-এর কথা বলছিলে না, আমাদের সকলের মধ্যেই টুকরো টুকরো ইউলিসিস আছে। সকলেই একটা না একটা কিছু খুঁজি। তোমরা যারা উল বোনো তারাও তো নতুন কিছু খোঁজ।

হয়ত হবে, কিন্তু তুমি যে সেই অরণ্যের কথা বলছিলে তাই বল। ভারি ভাল লাগছে শুনতে—

বলছিলাম এই যে ধর পাইন ক্রীসমাসট্রিতে ভরে আছে তোমাদের প্রাঙ্গণ কি প্রান্তর, হয়ত একদিন এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এরা না হলেও সংখ্যায় যা কম সেইসব গাছ হয়ত আর থাকবে না পৃথিবীতে। দেশের কথা মনে আছে আমার ছোটবেলায় সদরের রাস্তার ধারে ধারে বিরাট বিরাট কত মেহগিনী গাছ ছিল বড় হয়ে আর একটাও দেখিনি। চালান হয়ে গেছে সব কাঠ চেরাই-এর কারখানায়।

আচ্ছা কল্যাণ, অনেকদিন ধরে ভেবেছি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রব, আজ করি। তুমি কাকে ভালবাস ?

প্রশ্নটা শুনে আকস্মিকভাবে কেমন হকচকিয়ে একটু হেসে বলল, কি জানি। পরক্ষণেই সে হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার মত বলল, সত্যিই তো ব্যাপারটা কোনদিন ভেবে দেখা হয়নি —

কথাটা তুমি সত্যি বলছ না, এমিলি অনুযোগ ক'রলে কল্যাণ বলল, সত্যিই যদি সত্যি কথা না বলি তা'হলে বলব তোমার এই পোষাকটাকে।

মাঝে মাঝে তুমি এমন দুষ্টু ছেলে হয়ে ওঠ যে তোমাকে কিছুতেই ঠিক কথা বলানো যায় না।

কিন্তু ব্যাপার কি জান, মিথ্যে কথাও তোমাকে আমি বলতে পারব না। কাজেই এ কথার জবাব দিতে গেলে কোন কথাটা সত্যি হবে তা আমি নিজেই জানি না।

এমিলি নিজের বাঁ হাতের পাঞ্জায় কল্যাণের ডান হাতের পাঞ্জা আঙুলে আঙুল জড়িয়ে হাঁটছিল। হাতে একটু চাপ দিয়ে সে বলল, আমার মনে

হয় মানুষের চেয়ে প্রকৃতিকেই তুমি বেশী ভালবাস।

কল্যাণ বলল, তাও ঠিক নয়। কারণ আমি নিজেও যেহেতু একজন মানুষ এবং যেহেতু নিজের চেয়ে কোন কিছুকেই বেশী ভালবাসি না অতএব তোমার কথাটা মানতে পারলাম না।

নিজেকে ভালবাসাটা এর মধ্যে পড়ে না। আচ্ছা তুমি একটা কথা আমাকে ঠিক ক'রে বল তো কোন মানুষকে কোনদিন তুমি ভালবেসেছ?

অন্ধকারেও এমিলির দিকে ফিরে তাকাল কল্যাণ, দূরের আলোর ক্ষীণ প্রতিবিম্ব ঝলকে উঠল তার চশমার কাঁচে, সে বলল, তোমার কি কখনও মনে হয়নি এমিলি আমি কোন মানুষকে কখনও ভালবেসেছি?

এমিলি জবাব দিল না। সামনে দূরের বিরাট পাইন গাছটাকে ঘিরে নিবিড় অন্ধকার। তারও ওপাশে বেশ কিছুটা দূরে রাস্তার বাতিস্তম্ভের ছোঁড়া উজ্জ্বলতাকে আড়াল ক'রে রেখেছে পাইনের স্তূপীকৃত অন্ধকার। সেইদিকে তাকিয়ে স্তব্ধ এমিলির নিস্তেজ পদচারণা কল্যাণের বেশীক্ষণ সহ্য হ'ল না, সে বলল, কি জানি কেন, বুঝলে এমিলি কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারি না। এই যে এখন হাঁটছি — মনে হচ্ছে যেন কত যুগ ধরে হাঁটছি। আমার দেশের এক কবির কথা আমার বারংবার মনে হচ্ছে — হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।

কথাটা যেন এমিলিরও মনের। তাই সে বলল, আর একবার বলতো?

এবার বাংলায় কবিতার লাইনটি বলল কল্যাণ তারপর বলল তার তর্জমা। তারওপর বলল, কতগুলো শব্দ এক এক সময় এমনভাবে জুড়ে যায় যে তার অনুবাদ করা খুবই কঠিন হয়। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যদি তোমাকে আমার ভাষায় কবিতাটি বোঝাতে পারতাম তবে তুমি এক অপূর্ব আনন্দের স্বাদ পেতে।

আমারও খুব দুঃখ হচ্ছে অমন সুন্দর কবিতাটা আমি পড়তে পারি না —।

আচ্ছা পৃথিবীতে এত ভাষার সৃষ্টি না হলে কত ভাল হ'ত বল তো? সারা পৃথিবীর লোকের যদি একই মাতৃভাষা হ'ত তা'হলে কত সুবিধে হ'ত —

ঠিকই বলেছ তুমি। এই ভাষার তফাতের জন্যেই আমরা পরস্পরকে অর্ধেক বুঝি অর্ধেক বুঝি না।

অনেক সমস্যাই শুধু এই ভাষার জন্যে। কি জানি কি প্রয়োজন ছিল এই পার্থক্যের, হয়ত সৃষ্টি বৈচিত্রের জন্যেই এই নানা ভাষার আয়োজন।

ঈশ্বর তো এত সব সৃষ্টি ক'রেছেন? আমাদের যেমন একই জিনিষ বারবার ক'রতে ভাল লাগে না তেমনি ভাল লাগে না বোধহয় ঈশ্বরেরও তাই এত বৈচিত্র এই পৃথিবীতে। নইলে এমন অনেক জিনিষ আছে যা না হ'লেও চলত।

কি না হ'লে চলত জানি না। আমার তো মনে হয় সবকিছুরই প্রয়োজনীয়তা আছে। এই যে তুমি, তোমাকে না হ'লে আমার কি চলতে পারত?

কথাটা শুনেই চমকে উঠল এমিলি। এমন কথা সে প্রথম শুনল কল্যাণের মুখে। নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইল, কথাটা কি তুমি সত্যি বললে ?

আমার কথা শুনে তোমার কি মনে হয় ?

মনে হয় তুমি মিথ্যে বল না। কিন্তু দৈবাৎ কখনও কখনও মনে হয় তুমি সত্যি বলছ না, অর্থাৎ যা বলছ তা তোমার অন্তরের কথা নয়।

অন্তরের বাইরে কথার কোন উৎস নেই এমিলি।

এমিলি চুপ ক'রে ভেবে নিল, স্বীকার করল কথাটা ঠিক। প্রত্যেকটি কথাই জন্মের আগে ভাবনা থাকে। কিন্তু এই যে কল্যাণ বলল ওকে না হ'লে তার চলতে পারে না এটা কি সত্যিই মনের কথা কল্যাণের ? যদি হয় — শিহরিত হ'ল এমিলি আহ্লাদে। তার সে পুলক ব্যাপ্ত হ'ল সারা দেহে, কল্যাণের সংলগ্ন হ'ল সে। তার সঙ্গে নিবিড় ভাবে গা ঘেঁষে চলতে লাগল।

কল্যাণ বলতে শুরু ক'রল, জান এমিলি, এদেশে যখন প্রথম এসে পড়লাম কেন জানি না একটু অসুবিধে হ'লেই আমার মার কথা মনে হ'ত। মনে হ'ত মা থাকলে বুঝি এটা আর হ'ত না। ছোট ছোট অসুস্থতায় মার অনুপস্থিতি টের পেতাম খুবই বেশী। মনে হ'ত এত বড় পৃথিবীতে আমার চেয়ে একা আর কেউ নেই। তারপর যখন তোমার বন্ধুত্ব এল দেখলাম তার সঙ্গে মিশে আছে মায়ের সেই আজন্ম পরিচিত স্নেহস্পর্শ। মায়ের পরিপূরক আমি কাউকে মনে করি না, তবে মায়ের অনুপস্থিতির জন্যে যে গভীর একাকীত্ব এবং নৈরাশ্য তা থেকে তুমি মুক্ত ক'রেছ আমায়।

সত্যিই তুমি বিস্ময়কর। আশ্চর্যজনক। পুলক দমন ক'রতে না পেরে বলে উঠল এমিলি। নিজের বাঁ হাতের প্রত্যেকটি আঙ্গুল দিয়ে ধরা ছিল কল্যাণের ডান হাতের আঙ্গুলগুলোর প্রত্যেকটি, সেই বাঁধন শক্ত ক'রল সে। কল্যাণও প্রত্যুত্তরে মৃদু চাপ দিতে পরম আনন্দে হ্লাদিতা হ'ল সে আর একবার। হঠাৎ খুশীর খেয়ালে সে প্রশ্ন ক'রে ফেলল, আচ্ছা কল্যাণ আমাকে যে তুমি ভালবাস তার জন্যে তুমি কি ক'রতে পার ?

কল্যাণ বলল, আমি আমার মাকেও খুবই ভালবাসি এমিলি। তোমার প্রশ্ন শুনে সত্যিই আমার মনে জিজ্ঞাসা জাগছে, আচ্ছা বলত তাঁর জন্যে আমি কি ক'রতে পেরেছি ?

বার বার আমার সঙ্গে তুমি তাঁকে টেনে আনছ কেন কল্যাণ ?

কারণ তাঁর পরই আমি যে রমণীকে ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি সে তুমি। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার কি জান, এই পৃথিবীতেজাত প্রাণীমাত্রেই স্বার্থপর, আত্মতৎপর। নিজেকে যতই যা কিছু ভাবুক, অন্যজীব থেকে মানুষ এ বিষয়ে পৃথক নয়। আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। ভালবাসা বলবে ? সে-ও তো নিজের একটা মনোবৃত্তিকেই চরিতার্থ করা মাত্র।

কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল এমিলি। জীবনকে এত নগ্নভাবে কল্যাণ যে কেন দ্যাখে এমিলি বোঝে না। কল্যাণকে কখনো কখনো কেমন যেন নির্মম মনে হয়। অথচ আশ্চর্য নরম সুরে কোমল কথাগুলো যখন বলে তখন কি মুহূর্তের জন্যে নির্মম বলে ভাবা যায়! কিন্তু কি বিস্ময়কর ব্যাপার ফুলের জন্যে, গাছের জন্যে, মাটির জন্যে, যে কোন মানুষের জন্যে এত যার মায়া সেই লোক কি ক'রে এত কঠোর হয়!

আজও প্রশ্নটির জবাব পায়নি এমিলি! তাই সে মনে করে কল্যাণকে সে বুঝতে পারে নি। তবু সে বুঝতে চায়। হাজার নির্মমতা সত্ত্বেও বুঝতে চায় তাকে। জানতে চায় কি এমন কারণ ছিল যার জন্যে জীবনকে এমন কঠোর ভাবে বেঁধে রেখেছিল কল্যাণ? এই ভারতবর্ষের শত শত ছেলে ওদেশে গেছে ওদেশেই বিয়ে ক'রে ঘর সংসার ক'রছে, হয়ত ফিরেও এসেছে কেউ কেউ। কিন্তু কল্যাণের মত এমন কঠোরভাবে মনের গতিকে রুদ্ধ ক'রে পালায় নি তো কেউ! হ্যাঁ কল্যাণ তো পালিয়েই এসেছে। পালিয়েই সে দেশে ফিরেছে সে বিষয়ে এমিলির সন্দেহ নেই। ফেরবার পথে বেইরুট থেকে দুলাইন চিঠি সে ছেড়েছিল এমিলির উদ্দেশ্যে। জানিয়েছিল দেশে ফিরছে। কিন্তু ফিলাডেলফিয়ায় থাকতে কেন বিদায় জানায় নি? কেন একবারের জন্যেও বলেনি যে সে দেশে চলে যাবে? জানিয়েছিল কল্যাণের এক বন্ধুস্থানীয় বসীর। সে একদিন এসে জানাল, মিঃ জানা দেশে চলে গেছে।

এমিলি চিঠিটা সেইদিনই পেয়েছিল। তাই বলল, জানি।

কবে আসবে কিছু বলে গেছে?

আবার আসবে কেন? পড়াশোনা তো শেষ ক'রে ফেলেছে সে।

ও! বসীর একটু থেমে আসল ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিল, যদি কিছু মনে না কর তো বলি, ভেবেছিলাম তোমরা একসঙ্গেই চলবে!

কথাটা ধরে এমিলি আত্মগোপন করবার জন্যেই বলল, আমরা বন্ধুমাত্র।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমরা সবাই সকলের বন্ধু।

এমিলি কথাটায় সায় দিতে বসীর খুশী হয়ে বলল, তোমাকে প্রথম যেদিন মিঃ জানার ঘরে দেখি সেদিন মনে হয়েছিল তোমার বন্ধুত্ব খুবই মনোরম।

কেমন ক'রে মনে হ'ল?

জানি না।

তোমার বাড়ী কি কোন নদীর ধারে?

হ্যাঁ। শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়েই আমার বাড়ী!

কি নদী বললে?

নামটা তোমার বোঝবার পক্ষে অসুবিধেজনক। কিন্তু নদীটা খুবই সুন্দর। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

আমার মনে হয় বাংলাদেশের মানুষমাত্রেই একটু ভাবুক হয়। ভাবপ্রবণ।

বাঃ অদ্ভুৎ আইডিয়া তো তোমার।

শুনেছি তোমাদের দেশেতো মাঝিতেও সারাপথ গান গায়?

হ্যাঁ।

কল্যাণ তোমাদের দেশের খুব প্রশংসা ক'রত।

কিন্তু কল্যাণের বাড়ী তো আমাদের দেশে নয়। ভারতে বাড়ী, পশ্চিম বাংলায়।

কল্যাণ বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা যা-ই হোক পূর্বপশ্চিম মিলে বাংলা এক। ভাষা অবিভাজ্য। সংস্কৃতি-ও অবিভাজ্য।

বসীর চুপচাপ শুনল। মন্তব্য ক'রল না।

পাশের রাস্তাটা দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে চলে যাচ্ছে কিসের যেন ফিরিওয়ালা। মাঝে মাঝে দুএকজন এমনি লোক এ রাস্তা দিয়ে যায়। কি বলে যে চেঁচায় লোকগুলো এমিলি বোঝে না। প্রথম প্রথম সে বেশ বিস্মিতই হয়ে গিয়েছিল এইরকম হাঁক শুনে, রুমি একদিন বলেছে ওরা ফিরিওয়ালা, জিনিষ বিক্রি করে। কিন্তু কি বিক্রি করে আর কি বলে তা দুর্বোধ্য। আজও অমনি এক উৎকট চিৎকারে স্মৃতিরা সব এলোমেলো হয়ে গেল। নিমেষে কয়েক হাজার মাইল দূরে সরে গেল জন্ম-নগরী, ফিলাডেলফিয়া। আবার কলকাতা, ভারতবর্ষ! তার স্বপ্নের স্বর্গ বাংলাদেশ। এখানে নরম পেলব মাটিতে অসংখ্য ফুল-ফসল, ভাবুক মনে অফুরন্ত ভালবাসা। এখানে ফসল কাটার গান, নৌকা বাওয়ার গান, ছাদ পেটানোর গান। এখনও সে সব দেখা হয়নি। কল্যাণ বলত, সহর তো পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে ধার ক'রে পাওয়া, প্রতিবিম্ব। বাংলা হ'ল গ্রাম। সব দেশেই সহরগুলো আন্তর্জাতিক, গ্রামই প্রকৃত দেশ। রোজই গ্রাম দেখবার কথা ভাবে এমিলি, প্রসেনজিৎকে বললে বলে পরে একদিন হবে। রুমিকে বলায় রুমি বলেছে, আগে কিছুদিন থাক। ভাষাটা শিখে নাও নইলে তো কিছুই বুঝবে না।

কথাটা মনে লেগেছে এমিলির, সত্যিই তো কথা না বুঝলে কি ক'রে জানবে মানুষদের? আর মানুষকে না বুঝলে দেশের কি-ই বা বোঝা যায়! এমনিতে মাঠঘাট বনবাদাড় ঘুরতে কতক্ষণই বা ভাল লাগে? কল্যাণ যে গানের কথা বলত গ্রামের মানুষেরা গায় সে সব গান বুঝতে হলেও তো ভাষাটা জানা দরকার। কিন্তু শেখাটা হয়ে আর উঠছে না। রুমিকে বারংবার বলছে রুমি বোধহয় বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছে না যে সে শিখতে পারবে। আজ প্রসেনজিৎ এলে তাকে ধরতে হবে একটা বই কিনে এনে দেবার জন্যে, যাতে বাংলাভাষাটা শেখা যায়। বইটা এলে রুমিকেও ভাল ক'রে পাকড়াতে পারা যাবে। সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে বাড়ীতে পর্যন্ত কারও সঙ্গে ভালভাবে কথা বলা যায় না। যারা কথা বলতে এবং বুঝতে পারে তারাও সামান্যই

দুচারটে কথা বলে। ওই যে কোণের দিকে বৃদ্ধা ঘরের মধ্যে একলা থাকেন, তাঁর হাতে এমিলির মতই সময় অফুরন্ত, অথচ তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায় না একটাও। রুমিকে কতদিন জিজ্ঞেস ক'রেছে, উনি কে, সদুত্তর পায়নি। রুমি এড়িয়ে গেছে। প্রসেনজিৎকে জিজ্ঞেস ক'রতে ইদানীং সে জানিয়েছে উনি হলেন বাবার মা। শোনার পর বেশ বিস্ময় জেগেছে এমিলির। ঠাকুমা তো এমন একা নিঃসঙ্গ কেন? কল্যাণ-এর কাছে ঠাকুমা দিদিমার যে গল্প এমিলি শুনেছিল তাতে ঠাকুমা দিদিমার রূপ তো এদেশে অন্য। ঠাকুমারা এদেশের সংসারে খুব রমণীয় স্থানে বাস করেন। নাতি নাতনীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক খুবই মধুর। অথচ এ বাড়ীতে সেরকম তো কই নয়! ঠাকুমা এখানে একা নিজের ছোট্ট একটু এলাকায় প্রায় বন্দী। কেউ তাঁর কাছে বিশেষ যায় না, তিনিও এদিকে আসেন কদাচিৎ। যতদূর এমিলি বুঝেছে সুপ্রীতি এই রকমটাই পছন্দ করেন! তবু এমিলির কেমন যেন অনুকম্পা হয় বৃদ্ধার প্রতি। ইচ্ছে করে গিয়ে ওঁর কাছে বসে, মেশে। একদিন এমনি এক দুপুরে চুপচাপ গিয়ে সে হাজিরও হয়েছিল ওঁর ঘরের সামনে। আপন মনে কি যেন ক'রছিলেন বৃদ্ধা। এমিলিকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন, হয়ত অবাক হয়ে নয় অনেকটা ভাবলেশহীন চোখে। এমিলিও বোবার মত চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, তার খুব অসহায় মনে হচ্ছিল নিজেকে। এমনি সময় বৃদ্ধা হাতের ইশারায় তাকে ডেকে কাছে বসতে বললেন নিজের একমাত্র বিছানার ওপরেই। সেইক্ষণেই কল্যাণের কথা মনে পড়ল এমিলির, কল্যাণ বলেছিল বড়দের সঙ্গে দেখা হলে আমাদের দেশে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রতে হয়। প্রণাম করার পদ্ধতিও কল্যাণ দেখিয়েছিল, শুধু মাত্র দেশাচার দেখাবার জন্যেই। সেটা এবাড়ীতে আসবার দিন কাজে লাগিয়েছিল এমিলি, দ্বিতীয়বার লাগাল, বৃদ্ধার ঘরে ঢুকে। ঠাকুমা সঙ্গে সঙ্গে পরম প্রীতিতে এমিলির মুখখানা নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন।

সেইদিন সেই নির্জন দুপুরে অদ্ভুৎ যন্ত্রণার মধ্যে কল্যাণের বাংলাদেশের ঠাকুমাকে দেখতে পেয়েছিল এমিলি। সেইদিন সে দারুণভাবে অনুভব ক'রেছিল মূকবধিরের যন্ত্রণা। তারপর থেকে প্রত্যেক নিঃসঙ্গ দুপুরেই এমিলি ভেবেছে বৃদ্ধার কাছে যায় কিন্তু যায় নি। নিজেকে সে ঠাকুমার কাছে যাবার যোগ্য ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রে চলেছে এই দিনগুলোতে। প্রসেনজিৎকে জিজ্ঞেস ক'রে শিখে নিয়েছে বাবার মা-কে এদেশে বলে ঠাকুমা। শব্দ বারংবার একা একা উচ্চারণ ক'রে শিখে নিয়েছে। রুমির কাছে শিখেছে প্রথম দেখা হ'লে জিজ্ঞেস ক'রতে হয়, আপনি কেমন আছেন? শরীর ভাল তো? দিনে দিনে শিখেছে না, হ্যাঁ, আচ্ছা ইত্যাদি দুচারটে শব্দ। তার মধ্যে 'আচ্ছা' শব্দটা উচ্চারণ ক'রতে রীতিমত হয়রাণ হ'তে হয়েছে তাকে, এখনও ঠিকমত পেরে উঠছে না বলে যখন তখন

একা একাই উচ্চারণ করে 'আচ্ছা'।

সৌগত প্রসেনজিৎকে বুঝিয়ে দিল, লোকে যখন দেশ ছেড়ে পালাতে চাইছে সেইসময় তুমি আমেরিকার মত স্বর্গ থেকে এদেশে এসে বুদ্ধির কাজ করনি।

প্রত্যেকদিনের খবরের কাগজ এবং কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলের মৌখিক সংবাদ যা আসে সৌগতর কথাটা মেনে নেবার পক্ষে তা যথেষ্ঠ। কাজেই কথাটা প্রসেনজিৎও স্বীকার ক'রল, বলল, কিন্তু উপায় ছিল না। কলকাতায় কাজ পাওয়ার চেষ্টা বহুদিন ধরেই ক'রছিলাম কিন্তু সুযোগটা এল ঠিক এই সময়েই। তবে আমি একটা জিনিষে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম সৌগত, কলকাতার মত জায়গায় একটা কাজের সুযোগ পেতে দুবছর লেগে যায়! এরকম হ'লে তো বিক্ষোভ হবেই।

বিক্ষোভ-টিক্ষোভ সব বাজে। গুণ্ডা বদমাসরা সব লুটে পুটে নেবার ধান্দায় আছে — সৌগত তার মত প্রকাশ ক'রল।

প্রসেনজিৎ ব্যাপারটা ঠিক জানে না। সবই তার কাছে কেমন বিস্ময়কর এবং নতুন, কাজেই সে শুধু শ্রোতাই। জানতে চাইল, তাই নাকি?

দেখছ না টাকা চাইছে না দিলেই খুন ক'রছে।

কই, টাকা চাওয়ার কথা তো কাগজে লেখে না?

কাগজে আর কতটুকু খবর বেরোয়? গতকাল গোলপার্কের দক্ষিণদিকে একটা লাস পড়েছিল, লিখেছে কোন কাগজে?

শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল প্রসেনজিৎ।

সৌগত সেই সুযোগে বলে যেতে লাগল, এখন সারা পশ্চিম বাংলায় দৈনিক যত লোক মরছে তার অর্ধেকও কাগজে ছাপা হয় না।

তাই নাকি? আতঙ্কে এবং বিস্ময়ে প্রসেনজিৎ-এর চোখ বড় হয়ে গেল।

অবস্থা খুবই খারাপ। এমন এমন এলাকা আছে যেসব জায়গায় আমাদের কন্ট্রাক্টাররা কাজ নিতেই চায় না।

প্রসেনজিৎ নিঃশব্দ বিস্ময়ে শুধু শুনল কথাগুলো। মনে মনে যথেষ্ঠ ভয় পেয়েছিল সে। সত্যি এ অবস্থায় চলতে পারে না। কে যে মরছে, কেন মরছে এবং কে মারছে কিছুই সে ঠিকমত বুঝছে না। সমস্ত ঘটনাটাকে কেমন আচ্ছন্ন ক'রে ছাপছে কাগজগুলো। তা থেকে কিছু বোঝা যায় না। শুধু আতংকিত হওয়া যায় মাত্র। আরও আতংকজনক কথা বলছে সৌগত।

সৌগত প্রসেনজিৎ-এর ভাবসাব লক্ষ্য ক'রে বলল, পুলিশ থেকে বাবাকে বিশেষ সাবধান করে দিয়েছে। বাবার কারখানার পেছনের বস্তিতেই নক্সালদের বিরাট আড্ডা। শোনা যায় ওখানের ঘাঁটিতে নাকি স্টেনগান রাইফেল সবকিছুই আছে।

বল কি ? পুলিশ তো জানে।

জানলে কি হবে ? ওদের এমন সব ঘাঁটি আছে যেখানে পুলিশ ঢুকতেই পারে না। দেখছ না মিলিটারী দিয়ে পাড়া ঘিরে ঘিরে সব ধরছে।

এখানকার অবস্থা যে এমন হয়ে উঠেছে জানলে কলকাতা আসাটা এড়ানো যেত।

তবে আমার বাবার যা রিপোর্ট তাতে শীঘ্রি এসব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা যাবে। পুলিশ বলে কিছু দাগীকে শেষ ক'রে ফেলতে পারলেই সব মিটে যাবে।

এরকম অবস্থা তো বেশীদিন চলতে পারে না।

চায়ের কাপ হাতে ক'রে ঘরে ঢুকে রুমিও ওদের কথায় যোগ দিল, কি অবস্থা ব'লো না দাদা আমার এক বন্ধুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে —

শুনে সৌগত আঁতকে উঠল, তোমার আবার কোন বন্ধু ?

বন্ধু মানে আমার সঙ্গে পড়ত গোপা বলে একটা মেয়ে। তার মামা নাকি নক্সাল দলে আছে। তা ভাগ্নী কি দোষ ক'রেছে ?

দয়া ক'রে ওই মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছাড়। পুলিশে কখনও শুধু শুধু কাউকে ধরে না জানবে। ওরা অনেক খবর রাখে।

তা আমি মানি না। গোপার মত ভাল ছাত্রী খুব কম আছে। অথচ তাকে স্রেফ সন্দেহ ক'রে ধরেছে।

শুধু শুধু কই তোমাকে তো সন্দেহ ক'রতে গেল না ?

ওর মামা এইসব করে বলে —

মোটেই নয়। খোঁজ নিয়ে দেখ গে মামার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্নীও করে।

ভাল ছাত্রী ! প্রসেনজিৎ একটু বিস্মিত হয়েই জানতে চাইল, কি করে ?

এই নক্সালপন্থী রাজনীতির কথা বলছে — রুমি জানাল।

মাই গুডনেস ! ছাত্ররা এর মধ্যে জড়িত ?

ওমা ! তুমি বল কি দাদা ? যত মরছে সবই তো ছাত্র।

বিস্তারিত সংবাদ খুব কমই জানে প্রসেনজিৎ তাই সব কথাতেই তার বিস্ময়। তাছাড়া রুমির কথার সঙ্গে সৌগতর কথা তো বিন্দুমাত্র মিলছে না। রুমি কলেজে পড়ে, অনেক খবরই সে রাখে, হয়ত সে-ই ঠিক। কে জানে কি ঘটছে তবে যাই ঘটুক এই সময়টা আসা সে এড়িয়ে গেলেই পারত। তবে এমিলি বাইরের এই ঝড় ঝাপটার ব্যাপারটা বিশেষ বুঝছে না তাই, নইলে এদেশে বাস করবার আগ্রহ তার হয়ত আর এক ঘন্টাও থাকত না। সেই বোধহয় ভাল ছিল সবকিছু গুটিয়ে চলে এলেও ওদেশ তো আর ভারতবর্ষ নয়, ফিরে গেলে চাকরী একটা ঠিকই জুতে যেত। নিদেনপক্ষে চলে যাওয়া যেত কানাডায়। সেখানে প্রচুর সুযোগ এখন। উইলিয়ম তো ইংলণ্ড থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে কানাডা চলে গেছে একবছর আগেই। কানাডা থেকে সে লিখেছিল ইচ্ছে ক'রলে তোমরা এখানে চলে আসতে পার, বলতো কাজের ব্যবস্থা করে তোমাকে লিখতে

পারি। প্রস্তাবের উত্তরে এমিলি জানিয়েছিল, ধন্যবাদ। ইণ্ডিয়া। আপাতত সেখানেই ফিরে যাব আমরা। সেখানেই শান্ত জীবন কাটাতে চাই।

সত্যিই শান্ত জীবন এমিলির অভিপ্রেত। প্রসেনজিৎ-এর মনে হয় এমিলি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি প্রেমিক। পাখীর ডাক, সবুজ গাছ, প্রশস্ত প্রান্তর তাকে আকর্ষণ করে। সহর ছেড়ে গ্রামে সে যেন বেশী থাকতে চায়। দেশে থাকতে এক একদিন উদ্ভট প্রশ্ন করে বসত সব, তোমাদের দেশে নাকি গাছের তলায় শিষ্যদের সঙ্গে বসে গুরুদেব সামগান ক'রতেন আগেকার দিনে? কেন তা বন্ধ হ'ল?

প্রসেনজিৎ হাঁ। কি জবাব দেবে সে এ কথার! কত জায়গায় কত গান হয়, কেন তা বন্ধ হয় যারা শুনতে যায় তারাই রাখে তার সন্ধান। প্রসেনজিৎ কোনদিন ওসব গানটান শুনতে যায় নি বলেই সে এসব জানে না। তাছাড়া জীবনের সুরু থেকেই মিশনারী স্কুলে পড়ে ওসব গুরুশিষ্য ব্যাপার-স্যাপারগুলোও অজানা তার। অতবড় দেশ ভারতবর্ষ, কত গ্রাম সেখানে, গ্রামগুলোতে গাছও নিশ্চয় অনেক আছে এখন কোন গাছের তলায় বসে গান হয় সে খবর যে জানে সে জানে, প্রসেনজিৎ কেমন ক'রে জানবে তা? আজকাল সব জায়গার ছেলেমেয়ে আমেরিকায় চলে আসছে কে যে কি গল্প করে তারই বা কি ঠিক? এক একদিন কোথা থেকে সব অদ্ভুৎ বই জোগাড় করত এমিলি তা থেকে পড়ে পড়ে এমন প্রশ্ন ক'রত যে জবাব জানা তো দূরের কথা শুনেই মাথা ভোঁ ভোঁ ক'রত। অথচ সে সব প্রশ্নই ভারত সংক্রান্ত। মাঝে মাঝে প্রসেনজিৎ এমিলির ভারত চিন্তায় অবাক হয়ে যেত। সাহিত্য নয়, বিজ্ঞান নয়, নন্দনতত্ত্ব নয় ওর জানার বিষয় ক'রে নিয়েছে ভারতবর্ষ। তবে ভারতবর্ষের মধ্যে গ্রাম নদীর যাবতীয় সবই বাংলা-দেশের নাম করে। তাই প্রসেনজিৎ একদিন জানতে চেয়েছিল, আমাদের দেশের যত খবর আমিও জানি না অত খবর কে তোমাকে দিল?

অত বড় দেশ তোমাদের। কতভাবে খবর আসে — এইটুকুই জবাব এমিলির।

তা আসে। প্রসেনজিৎ নিজেই দেখেছে এমিলির সংগ্রহে ভারত সম্বন্ধে বই সংখ্যায় অনেক। তাছাড়া এমিলি নিজেও একদিন বলেছিল কে একজন ছাত্র অনেক গল্প ক'রত তাদের দেশের। গল্প ক'রত এমিলির বন্ধু বসীরও। প্রসেনজিৎ বসীরকে চেনে, পূর্ববাংলায় বাড়ী। এমিলিকে খুবই পছন্দ ছিল তার এমিলিও প্রাণ ঢেলে মিশত তার সঙ্গে। কিন্তু বসীর বিয়ের প্রস্তাব ক'রে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। কেন প্রসেনজিৎ জানে না। এমিলিকে একবার জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিল, তুমি কি জান না সেন, বিয়ে করা আর বন্ধুত্ব এক জিনিষ নয়?

নিশ্চয়ই জানি।

তবে এটাও জানো বসীর বন্ধু হতে পারে ওকে বিয়ে করা চলে না।

আশ্চর্যের এই যে এই কথাবার্তার অল্প কিছুদিন বাদেই তার সঙ্গে বিয়ের ঠিকঠাক হয় এমিলির। প্রসেনজিৎ বসীরের ভাগ্য দেখে নিজে সাহস কিছুতেই ক'রত না তবে এমিলির উৎসাহ বুঝেই প্রস্তাব ক'রেছিল। দিনটা মনে আছে প্রসেনজিতের, বিস্তারিত না হ'লে ঘটনাটাও মনে আছে। সব খুঁটিনাটি মনে থাকে না প্রসেনজিতের। সে কারিগরী বিদ্যার মানুষ। নিজের কাজের বাইরে যে জীবন সেটুকু শুধু আরাম বিরাম আর তৃপ্তির। তৃপ্তি এমিলির কাছে অসীম। জীবনকে মধুর ক'রে তোলার সমস্ত উপকরণ এমিলির অন্তরে আছে বলে এমিলি শ্রীময়ী। তাই তার ভাললাগার মধ্যে অক্ষম অনুপ্রবেশ অপছন্দ করে প্রসেনজিৎ নিজেও। বরং তার ভাললাগার আয়োজন ক'রতে পারলে সে নিজেও তৃপ্ত হয়। যেমনটি এমিলি পছন্দ করে তেমনি ক'রে সে খুশী হতে চায়। সুজয়, রন্টু এরা কত কথাই বলেছিল প্রসেনজিৎকে। সাবধান ক'রেছিল, তুই কাজটা ঠিক করছিস না প্রসেনজিৎ। বসীর-এর সঙ্গে কিছু ক'রতেই বাকী রাখেনি ওই মেয়ে। ওকে বিয়ে ক'রলে ঠকবি।

আমিও তো এখানে অনেক মেয়ের সঙ্গেই সব কিছু ক'রেছি, আমি তো ভাবছি না যে এমিলি আমাকে বিয়ে ক'রলে ঠকবে?

এমিলি কি কম ছেলের সঙ্গে মিশেছে?

সেটাই তো এখানের ভাল। দশজনকে ভালভাবে দেখে পরখ ক'রে একজনকে বেছে নেবার অবকাশ এখানে আছে। আমিও তো কত মেয়ের সঙ্গে ডেট ক'রেছি, রাত কাটিয়েছি, দিন কাটিয়েছি কত তবু আমি বলতে পারি অনেক মেয়ের চেয়ে এমিলি ভাল।

তুই কি দেখেছিস তুই-ই জানিস। তবে দেখিস শেষকালটায় ফেঁসে যাস না।

কি আর হবে? জীবনটা তো একরকম জুয়াখেলা, দেখাই যাক না।

ব্যস কথা ওই পর্যন্তই। জীবনটা জুয়া খেলা বললেও প্রসেনজিৎ জানত জুয়া সে খেলেনি। সে বেছে বের ক'রেছে। আর তার তো মনে হয় অনেক ছেলের সঙ্গে মিশে থাকলেও তাকেও খুঁজেই বের ক'রেছে এমিলি। অতএব —

প্রসেনজিৎ সুখী। একজন স্ত্রীর কাছে যা যা একজন স্বাভাবিক স্বামী চেয়ে থাকে তার সবই পূর্ণমাত্রায় পরিবেশন ক'রেছে এমিলি। প্রবাসের সহবাসী বন্ধুদের আশঙ্কা অমূলক হয়েছে, ঈর্ষা যদি কারও থেকে থাকে নিষ্ফল হয়েছে তা। প্রসেনজিৎ নিঃসংশয়। এমিলির এদেশ সম্বন্ধে আগ্রহের আধিক্যকে সে প্রকৃতি প্রেমই মনে করে। কখনও কখনও তার মনে হয় এ ওর এক সূক্ষ্ম বিলাস। তা হোক, এ বিলাস রমণীয়।

এতদিন বাদে দেশে ফিরে সবই কেমন নতুন মনে হচ্ছে প্রসেনজিৎ-এর। এমন কি মা বাবার সঙ্গেও যেন নতুন করে পরিচয় ক'রে নিতে হ'ল তাকে। এ যেন এক অন্য জগতে এসে পড়েছে সে, যেখানে সবই তার অপরিচিত। শুধু সে শুনেছে এখানকার নাম, জানে এর পরিচয়। মা বাবাকে দেখে মনে হ'ল

যেন দীর্ঘক্ষণ বাদে ঘুম থেকে উঠে সে অপরিচিত পরিবেশে পরিচিত মুখ দেখছে। বিশ্বজিৎকে দেখে বিপরীত চিন্তা হ'ল তার। যে ভাইকে সেই কতটুকু দেখে গিয়েছিল সেই ভাইটিকেই যেন সে দেখতে চাইছিল স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে। বর্তমানের যুবকটি তার অচেনা, ভাই-এর নাম ধরে এলেও সেই ভাইটি এ নয়। আর ইদানীং রুমির একটা ছবি যদি মা না পাঠাত, তবে সম্ভ্রম ক'রে হয়ত এড়িয়েই থাকতে হ'ত কথা না বলে। সৌগতর সম্বন্ধে মনে ছিল কেবলমাত্র নামটা। তা-ও মুখে স্বীকার না ক'রে স্মৃতির অতল থেকে উদ্ধার ক'রতে হয়েছে তাকে। তারপর দ্রুত জুড়ে নিতে হয়েছে পুরানো পরিচয়ের ছেঁড়া সুতো কারণ, সে দেখেছে সৌগত এবাড়ীতে প্রেয় অভ্যাগত। মায়ের প্রশ্রয় ঘিরে আছে তাকে, যতদূর বুঝেছে তাকে জড়িয়ে রয়েছে রুমির অনুরাগ। অথচ যে বিশ্বজিৎ-এর বন্ধু বলে তার পরিচয় সেই বিশ্বজিৎ সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। আর এই একটা ব্যাপার তাকে বিস্ময়ের গভীর অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে যে শুধু এই সৌগতর ক্ষেত্রেই নয় বিশ্বজিৎ অনুপস্থিত বাড়ীর সমস্ত ব্যাপারেই। কোন কোনদিন রাত্রেও শব্দ পাওয়া যায় না তার, হয়ত আসে না, প্রসেনজিৎ জানে না। এবাড়ীতে অন্যের সম্পর্কে কৌতূহল অনেকটা নিষিদ্ধ বস্তু। একমাত্র সামান্য কৌতূহল প্রয়োজনবোধে রাখতে পারেন মা, তিনি রাখেন কিনা তা প্রসেনজিৎ জানে না।

জানার চেষ্টাও প্রসেনজিৎ করে না। বিশেষ প্রয়োজনীয় নয় এমন কোন কিছু জানবার জন্যেই প্রসেনজিৎ বিশেষ চেষ্টা করে না। তেমনিই চেষ্টা করে না সৌগতকে বুঝতে। সে আসে যায় কথা বলে, প্রসেনজিৎও বলে। তার বেশী আগ্রহ নেই। অথচ সৌগতর সম্বন্ধে সামান্যই জানে সে। বেশী জানবার কিছু থাকতে পারে একথাও মনে করে না। একজন মানুষের কি পেশা এটাই তাকে জানবার পক্ষে সবকিছু বলে প্রসেনজিৎ মনে করে। পেশা ছাড়া আর কি দিয়েই বা মানুষকে জানা যায়? কি দিয়েই বা বিচার করা যায় মানুষকে? পেশা ছাড়া চলা বলা আচার আচরণ থেকে কিছুটা বোঝা যায় তাও তো পেশার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রসেনজিৎ-এর ধারণা। অতএব বেশী দেখবার আর কি দরকার? এমিলিও অনেকটা একমত। প্রথম আলাপের কালে এমিলিকে প্রসেনজিৎ জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমরা বন্ধুদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের যোগ্য বলে কাকে মনে কর?

আমরা বলতে কাদের বোঝাচ্ছ আগে আমাকে বুঝতে দাও —

মেয়েদের কথা আমি বলছি, প্রসেনজিৎ জানিয়েছিল।

একটু ভেবেই এমিলি জবাব দিয়েছিল, যে কথাবার্তায় বুদ্ধি এবং ভদ্রতার পরিচয় দেয়, আচারে ব্যবহারে নিজেকে কৃষ্টিমান বলে বোঝাতে পারে, দৈনন্দিন ব্যবহারে যাকে সহনশীল বলে মনে হয় সাধারণত তাকেই বন্ধু করা চলে।

কি দেখে প্রাথমিক বন্ধুত্ব আসতে পারে ?

জানি না। তবে কোন কোন সময় পেশা, বা ভবিষ্যৎ পেশার সম্বন্ধে আন্দাজ। কারণ অনেক সময়ে দেখা যায় পেশা-ই মানুষের স্বভাব তৈরী করে। কথাগুলো বলে সঙ্গে সঙ্গেই এমিলি বলেছিল, আমি জানি না তোমাদের দেশের মেয়েরা কি ভাবে সমাধান করে—

আমিও জানি না। যে বয়েসে এখানে চলে এসেছি সেটা এসব কিছু জানা বোঝার বয়স নয়। কাজেই আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তবে আমার মনে হয় সব দেশের মেয়েরাই সমান।

আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তোমাদের দেশের চিন্তাধারা আলাদা তোমরা জীবনকে অন্যভাবে দেখতে অভ্যস্থ।

তাই কি ?

হ্যাঁ তাই। আর অনেকটা এই জন্যেই ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নতি অন্য দেশের মত হয়নি। হতে পারে না। আধ্যাত্মিক জগৎ আর অর্থের জগৎ দুটো পরস্পর বিপরীত।

আর কথা বলেনি প্রসেনজিৎ। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারে না। আধ্যাত্মিকতা যে কোথায় তা সে দেখতে পায়নি। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পার্থক্য না ধরলে দুদেশের মানুষেরই জীবনযাপনের প্রণালী এক। সেখানেও এমনি অফিসে কারখানায় যাওয়া আসা, দৈনন্দিন কাজকর্মের শেষে স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘরসংসার, এই তো জীবন সেখানেও। সেখানেও এই ইঁট সিমেন্ট-এর বাড়ী, এই মোটরগাড়ী, এই বেশবাস, এই বিলাস, এই জীবনেরই অনুলিপি জীবন সেখানেও। তারতম্যটা কোথায় ? অথচ এমিলি বলছে আছে। ভুল বলছে এমিলি, এমিলি জানে না বলেই বলছে। প্রসেনজিৎ-এর নিজের দেশ সে জানবে না অন্যরকম কিছু হলে। সাতপাঁচ ভেবে প্রসেনজিৎ সিদ্ধান্ত ক'রল আসলে এমিলি কল্পনাপ্রবণ বলে অতশত ভাবে। ভাবুক না। ভাবনারও তো আনন্দ আছে, পাক না এমিলি সেই গভীর আনন্দ।

এমিলির প্রকৃতি অনেকটা শিশুর মত। পাতলা একখানা বই এনে সৌগতর সামনেই রুমির হাতে দিয়ে বলল, এই দেখ বই।

সৌগত জানতে চাইল, কি বই ?

রুমি একমুখ হেসে জানাল, বাংলা শেখার বই।

বাংলা শেখার বই। কথাটা উচ্চারণ ক'রল সৌগত আকাশ থেকে পড়ার ভঙ্গীতে। তারপর অনেকটা ব্যঙ্গ ক'রেই প্রসেনজিৎকে বাংলায় বলল, আমরা যেখানে ভাষাটা ভুলতে পারলে বাঁচি সেখানে এই ভাষা আবার কেউ শিখতে চায়। কি প্রসপেক্ট আছে এই ভাষার ?

এমিলি সৌগতর অকস্মাৎ বাংলা বুঝতে না পেরে একবার সৌগতর আর একবার প্রসেনজিৎ-এর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। সৌগতর কথার কি

জবাব দেবে প্রসেনজিৎ ভেবে পেল না তাই সে চুপ ক'রে থেকে এমিলিকে বলল, সৌগত জানতে চাইছে বাংলা শিখে তোমার কি লাভ হবে?

শেখাটাই তো লাভ।

কথাটা সৌগতর মাথায় আসে না। ভাল একটা চাকরী পাবার জন্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া, কেন্দ্রীয় সরকার ইদানীং যেসব সার্কুলার দিচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে চাকরীর উন্নতি ক'রতে হলে হিন্দী ভাষাটাও শিখতে হবে আজ না হোক কাল। কিন্তু এই খাস মেম, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশের মেয়েটার মাথায় চেপেছে কিনা বাংলা শিখবে! এদেশেও যেমন বড়লোকেদের নানারকম খেয়াল হয় তেমনি সব দেশেই। নইলে আমেরিকার মত দেশের ধনী নাগরিকেরা কেন হিপি হয়ে এদেশের পথে ঘাটে ভিখিরির মত পড়ে থাকে? রবিশঙ্কর ভট্টাচার্যের সেতার শুনে মোহিত হয়ে ঢালাও অর্ডার দিয়ে বসে যারা পাঠাও সেতার সেতারই শিখব, সেইসব বড়লোকদের শখ কি আর শুধু একরকমই হয়? কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিখবে তো?

রুমি বইটা নেড়ে চেড়ে দেখে বলল, দাদা বইটা আনলে বুঝি?

হ্যাঁ। কেন ঠিক হয় নি?

হয়েছে। এই বই থেকেই অক্ষর চিনতে পারবে।

চিনতে পারবে কি কাল রাত্রেই কিছু শিখে ফেলেছে জিজ্ঞেস কর। প্রসেনজিৎ খবর দিল।

তাই নাকি বৌদি?

একমুখ হেসে এমিলি বইটা চেয়ে নিয়ে অ, আ দেখিয়ে বলল, দু তিনটে মাত্র শিখেছি কিন্তু লিখতে না শিখলে মনে থাকবে না। সুতরাং একই সঙ্গে আমাকে লিখতেও হবে।

প্রসেনজিৎকে বিস্মিত ক'রে এমিলি মাস তিনেকের মধ্যেই একরাত্রে একটা বাংলা ছোটদের বই গড়গড় ক'রে পড়ে শুনিয়ে দিল। প্রসেনজিৎ যখন হাঁ ক'রে বসে আছে পড়া থামিয়ে এমিলি রহস্য ক'রে বাংলায় জিজ্ঞেস ক'রল, কি দেখছ?

প্রসেনজিৎ ইংরেজীতে জবাব দিল, আশ্চর্য জিনিষ দেখছি।

এমিলি বলল, আশ্চর্যের কিছুই নেই। মানুষের অধ্যাবসায় আমাদের চাঁদে পৌঁছে দিয়েছে। তবে তুমি যে খুশী হয়েছ এতেই আমি পুরস্কৃত।

তোমার পুরস্কার তোমার অন্তরেই আছে এমিলি।

ফাদার পিয়ের বলতেন কাজ যে করে ঈশ্বর তাকে পুরস্কৃত করেন। আমি কাজ করবার চেষ্টা করি, পুরস্কার কিভাবে আসবে কোথা দিয়ে আসবে সে ভাবনা আমার নেই। জান সেন, তোমাদের হিন্দু ধর্মের একটা নির্দেশ আমার খুব ভাল লাগে, তোমাদের কোন ধর্মগ্রন্থে, নামটা আমার মনে নেই নাকি আছে, 'ফলের জন্যে লোভ না ক'রে কাজ ক'রে যাও'। বলতো কি সুন্দর নির্দেশ।

কাজ করলে ফল যখন হবেই তখন কি প্রয়োজন ফলের লোভে তাকিয়ে থেকে ? যেমন কাজ ক'রবে তেমনিই ফল হবে—

প্রসেনজিৎ এমিলির কথা শুনে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সে নিজে হিন্দু কিনা। কারণ এসব কথা যে তাদের ধর্মে আছে এবং কোন বইতে আছে সে জানে না। অথচ এমিলি বলছে এ নাকি ওর ধর্মে আছে, হিন্দু ধর্মে। প্রসেনজিৎ মাঝে মাঝে খুবই বিপদে পড়ে এমিলির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, তখন সে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা সে আবার করল, বলল, আমি তো দার্শনিক নই ওসব জানি না।

স্ট্রেঞ্জ ! দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে উচ্চারণ ক'রল এমিলি, তারপর বলল, মানুষের জীবনের উপলব্ধিই তো দর্শন। প্রত্যেক মানুষেরই তো উপলব্ধি থাকে। তার জন্যে কি দার্শনিক হ'তে হয় ?

আমি গীয়ারবক্স-এর শব্দ শুনে বলে দিতে পারি তার কোন স্ক্রুটা ঢিলে হয়ে গেছে, সেটা আমি জানি।

দুঃখিত ডারলিং তোমাকে কথাটা ব'লতে বাধ্য হচ্ছি মানুষ হিসেবে তার সমগ্রতার ছোট্ট একটা অংশ হচ্ছে গীয়ারবক্স সম্বন্ধে বা তার দৈনন্দিন পেশার জগৎ সম্বন্ধে তার জ্ঞান। তার জীবনের আর যে বিরাট অংশ পড়ে আছে পেশার বাইরে, আসল জীবন তো সেইটুকুই।

প্রসেনজিৎ একটু থেমে থেকে বলল, তা ঠিক।

আসলে কি জান আমরা যতই ছিটিয়ে দেব নিজেকে ততই প্রসারিত হয়ে যাব, গুটিয়ে নেব যত ততই ক্ষুদ্র মনে হবে নিজেদের।

বইটা হাতে তুলে নিয়ে প্রসেনজিৎ বলল, রুমি তাহ'লে তোমাকে অনেক তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দিয়েছে।

ও আমাকে অনেক সাহায্য ক'রেছে। কিন্তু মুস্কিল কি জান আমি কথা শিখতে পারছি না।

কথা শেখা তো আরও সহজ। আর কিছুদিন থাকতে থাকতে আপনি শিখে যাবে। আসল তো পড়তে লিখতে শেখা।

আমি যদি আর একটু তাড়াতাড়ি শিখতে পারতাম তাহ'লে ভাল হ'ত।

একটু হেসে প্রসেনজিৎ বলল, মানুষ বেয়ে উঠতে পারে, লাফিয়ে উঠতে পারে না।

যেমন ভাবে হাসলে এমিলিকে খুবই মিষ্টি দেখায় তেমনি হেসে এমিলি বলল, মানুষের পূর্বপুরুষেরা পারে।

প্রসেনজিৎ সে হাসির উপযুক্ত জবাব দেবার পর বলল, ক্ষেত্রবিশেষে। পড়াশোনা ক'রতে দিলে আর তারা পারবে না।

প্রসেনজিৎ-এর কথায় দুজনেই খুব হাসল। সেই হাসির মধ্যেই এমিলি বলল, আমি আদৌ বিশ্বাস করতে পারি না যে বানর মানুষের পূর্বপুরুষ।

কারণ বানর থেকে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষ যদি হয়েছে তবে বানররাও রয়েছে কি ক'রে? সব তো আস্তে আস্তে মানুষই হয়ে যেত।

কথাটা শুনে কৃত্রিম গাম্ভীর্যে মাথাটা খুব ক'রে নাড়ল প্রসেনজিৎ, নেড়ে বলল, তবে তুমি এটা বলতে পার মানুষও এক শ্রেণীর বানর। উঁচু শ্রেণীর বানর।

হলেও সব মানুষ কিন্তু নয়, কিছু কিছু মানুষ — বলে আবার একচোট হাসল এমিলি। আরও বলল, আমি বানর হতে আদৌ রাজী নই।

তোমাকে হ'তে দিচ্ছে কে? হাসতে হাসতে বলল প্রসেনজিৎ। তারপর বলল, আর মানুষের পূর্বপুরুষ যদি সত্যিই বানর হয়ে থাকে তাহ'লে সে উত্তরাধিকার তুমি অস্বীকারই বা ক'রছ কি ক'রে?

এমিলি প্রগল্‌ভ হয়ে প্রসেনজিৎ-এর গলা জড়িয়ে ধরল দুইবাহুতে, বলল, মানুষ ঈশ্বরের সন্তান, সমস্ত প্রাণীই তাঁর সৃষ্ট অতএব আমরা সবাই তো এক।

প্রসেনজিৎ তার পুরানো প্রসন্নতার হাসি মাখিয়েই বলল, তবে তো ঝামেলা মিটেই গেল। অতএব মানুষকে মানুষের মত চলতে হবে সকলকে তার নিজের নিজের মত। ধীরে ধীরে শেখো, একদিনে কিছুই শেখা যাবে না।

আসলে কি জান? একান্ত গোপনীয় কথা বলার সন্তর্পণে এমিলি বলল, আমি তোমার দিদিমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। উনিই ভারতবর্ষ, উনিই বাংলা দেশ।

প্রসেনজিৎ অবাক হয়ে বলল, কি রকম? উনিই ভারতবর্ষ, উনিই বাংলা দেশ কি রকম?

সেটা যে কি রকম তা তোমায় পরে বলব। আমার মনে হয় এদেশের যত রূপকথা উপকথা সব ওঁর মনের মধ্যে আছে। আমি শুনেছি তাই থাকে।

আমার ঠাকুমার মনের মধ্যে আছে একথা কে তোমাকে বলল?

তোমার ঠাকুমা বলে নয় যে কোন দেশের ঠাকুমা দিদিমাদের মনেই থাকে তাই বলছি। ওঁরা সবাই রূপকথার জগতে বাস করেন।

প্রসেনজিৎ এমিলির মুখের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে তার কথা শুনতে লাগল।'

এমিলি তার স্বভাবের চেয়ে ধীর স্বরে বলল, আমার যদি ছেলে হয় তাকে যদি আমি বাংলাভাষা শেখাতে পারি তাহ'লে সে ওই ঠাকুমার কাছে অনেক মজার দেশের সন্ধান পাবে যা আমরা কোনদিনই তাকে দিতে পারব না। জানো, আমার মনে হয় শিশুদের যদি উপকথা প্রচুর পরিমাণে উপহার দেওয়া যায় তাহ'লে তারা বড় হয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। সুস্থ রোম্যান্স মানুষকে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

প্রসেনজিৎ মনে ক'রতে পারে না কোনদিন সে ঠাকুমার কাছে ক'টা উপকথা বা রূপকথার গল্প শুনেছে। ছেলেবেলায় ঠাকুমার সঙ্গ সে বিশেষ পায়

নি, বাবা মার সঙ্গ-ও নয়। যতদূর মনে আছে খুব অল্প বয়েস থেকেই সে স্কুলের বোর্ডিং-এ থেকে মানুষ। মাসে দুমাসে একবার মা বাবা দেখতে গেছে তাকে। চিঠি গেছে মাঝে মাঝেই। শিশুবয়সে, তার মনে আছে মা-বাবার যাবার আশায় প্রায় রবিবারেই পথ চেয়ে থাকত সে। অনেকদিন না দেখা হ'লে কোন কোন রবিবারে চেয়ে থেকে থেকে নিরাশ হয়ে কেঁদে ফেলত। যেদিন বাবা-মা যেত ছাড়তে ইচ্ছে হ'ত না তাদের, ইচ্ছে হ'ত মা-বাবার সঙ্গে চলে যায়। লম্বা ছুটির দিনগুলোয় বাড়ীতে আসতে পেত, ছুটি ফুরোলে আর বোর্ডিং-এ ফিরে যেতে ইচ্ছে হ'ত না। তবু যেতে হ'ত। বাবার ছিল বদলীর চাকরী, দূরে বদলী হ'লে ট্রেনে ক'রে একাই রাখতে যেতেন। ওপর ক্লাসে পড়ার সময় বাবা আর যেতেন না, যেত তাঁর অফিসের কোন অধস্তন কর্মচারী বা তাঁর আর্দালী। ছুটিতে এসে কদাচিৎ সে ঠাকুমাকে দেখেছে কারণ ঠাকুর্দা তখন বেঁচেই ছিলেন, তাঁর কাছে কোন গ্রামের স্কুলের সঙ্গেই থাকতেন ঠাকুমা। কোনদিন ঠাকুমার সঙ্গে দেখা হ'লে সস্নেহ প্রশ্রয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, আপনমনেই বলতেন রাজ-রাজেশ্বর হও দাদু, রাঙাটুকটুকে বউ হোক।

রাজ-রাজেশ্বর কি ঠাকুমা? প্রসেনজিৎ অনেকদিন জিজ্ঞেস ক'রতে চেয়েছে মুখের মধ্যে আটকে গেছে, ভেবেছে পরে হবে। অন্য একদিন জিজ্ঞেস করবে, আজ লজ্জা ক'রছে।

কিন্তু সেই পর তার জীবনে বিশেষ হয়নি। দু একবার হয়েছে। সে সব কথা মনেও নেই এখন, মনে নেই তার আবেদনটুকুও। তবু এমিলির কথা শুনে স্মৃতিরোমন্থন। আছে, হয়ত হৃদয়াবেগেরও কিছু মূল্য আছে। হৃদয়াবেগ সৃষ্টি করে মায়া, মোহ, বন্ধন। কারণ কলেজ জীবনে সে হোস্টেলের অনেক ছেলেকেই মাসের প্রথম সপ্তাহের দিনগুলোতে শুধু বাড়ীর কথা মনে করতে দেখেছে, বাবার পাঠানো টাকা আসবে। সে নিজেও এখন উপলব্ধি করে তারও মনের মধ্যে জন্মে গিয়েছিল বাবা মানে তাঁর পাঠানো টাকা। মা মানে অদৃশ্য একজন কারও অস্তিত্ব যা থাকলেও চলে, না থাকলেও। আর সেই কারণেই সে আমেরিকা থেকে ফিরে আসবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। কোথা'ও থাকা, বেঁচে থাকা, ভালভাবে জীবন কাটানো। এমিলি পাগলামী না ক'রলে সেই সুখের দেশ সোনার চাকরী অনায়াস জীবন ফেলে এখানে আসত না প্রসেনজিৎ। এমিলির মত আবার উল্টো। যেখানে সেখানে অনাত্মীয় নির্বান্ধব জীবন যাপনকে সে মনে করে পোকার মত বেঁচে থাকা। সে বলে, প্রাণী জগতে যত ওপরের স্তরে উঠতে থাকবে দেখবে গোষ্ঠীবদ্ধতা তত বেশী। সমাজ জীবনের দিকে প্রাণীজগৎ স্তরে স্তরে উঠেছে।

প্রসেনজিৎ জানেনা কথাটা আসলে কল্যাণের। কল্যাণই বলত, জান এমিলি আমাদের সমাজের সৌন্দর্য ছিল যৌথ পরিবার। এক সঙ্গে বহুলোক, সকলে সকলের সুখদুঃখের ভাগীদার হয়ে বেঁচে থাকা সে এক অপরূপ দৃশ্য।

ঠাকুমা কাকীমা জেঠিমা আর ভাই-এ দাদায় দিদিতে ভর্তিবাড়ীর মধ্যে সকলের একজন হয়ে বেঁচে থাকা যে কি সুন্দর তোমাকে কি বলব। কিন্তু তা আর থাকছে না আমাদের দেশেও। প্রতীচ্যের অনেক কিছুই আমরা নিয়েছি তার মধ্যে এই স্বতন্ত্র থাকার ইচ্ছা, আত্মকেন্দ্রিকতাও একটা। এ অনেকটা পোকার মত জীবন। হয়ত অনেকে বলবে যৌথ পরিবার সামন্ততান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব, আসলে কিন্তু তা নয়। পৃথিবীতে আবার সেই যৌথ পরিবারের প্রয়োজনীয়তা আসবে। একা আলাদা থাকার মধ্যেই কি স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ হয়? স্বকীয়তার বিকাশ কি স্বার্থপরতার মধ্যেই? আমি বিশ্বাস করি না। কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়মের বন্ধনে থেকেও যে সৈনিক প্রকৃত বীর সে যুদ্ধক্ষেত্রে আপন শৌর্যে প্রকাশ করে তার স্বকীয়তা। সমাজের মধ্যে থেকেই মানুষ উন্নতি করে, বনবাস ক'রে নয়।

এমিলি বলেছিল, তবু তো তোমাদের দেশে এখনও কিছু কিছু যৌথ পরিবার আছে—

তা আছে। তাছাড়া তোমাদের দেশে যেমন পাখীর মত, ডিম ফুটে বেরোলেই আলাদা, আমাদের তা নয়। বাবা মা যতদিন থাকেন ততদিন ছেলেরা প্রায়ই এক সঙ্গে থাকে। তবে তাও যাচ্ছে। চাকরীর জন্যে কোন ছেলেকে দূরে যেতে হ'লে আলাদা হয়ে যাচ্ছে সে বাবার সংসার থেকে, দুচারটে অমানুষ স্বেচ্ছাতেও যাচ্ছে।

অমানুষ কেন? সে যদি চায়—

এই চাওয়াটা আমাদের দেশে এখনও বেইমানী বলে ধরা হয়।

তবে হ্যাঁ — এমিলি বলেছিল, সবাই মিলে থাকাটা আমার মনে হয় বেশ সুন্দর, হয়ত খুব মজাদারও।

একসঙ্গে হাসি, একসঙ্গে কান্না, একসঙ্গে গান সে কেমন সুন্দর বলত? ক্ষিধে পেলে মেজকাকীমা, ঘুম পেলে ঠাকুমা, রাগ হ'লে জেঠিমা, বেড়াতে যাব ছোট কাকু, কি মধুর বল তো?

সত্যিই সুন্দর। জান কল্যাণ, আমার যে কাকা আছেন না, তিনিও আমাদের সকলের ভালবাসার লোক, ঠিক তোমাদের ভারতের কাকার মত। তোমাদের দেশ সম্বন্ধেও আমার কাকা খুব শ্রদ্ধাশীল।

তিনিই শ্রদ্ধেয় যিনি অন্যকে শ্রদ্ধা করেন।—

সেই সব আলাপ আলোচনা থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিল এমিলি, অনেক কিছুই নিতে চেয়েছিল কল্যাণের কাছ থেকে। নিতে চেয়েছিল কল্যাণকেও নিজের সঙ্গে, কিন্তু সেই চাওয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই সরে গেছে কল্যাণ। তাই বলে এমিলি কল্যাণের ভাললাগাকে ছুঁড়ে ফেলে নি। নাকের সামনে নিয়ে যাওয়া ফুলটা সরিয়ে নেবার পরও যেমন গন্ধ তার থেকে যায় তেমনি রয়ে গেছে কল্যাণের অনুভূতিপ্রবণ মনের স্পর্শ যা তাকে দিনে দিনে

ক'রেছিল নবরসে সঞ্জীবিত। কল্যাণের মনের রঙে এমিলি নিজেকে রাঙিয়ে নিয়েছিল অথবা সে আপনি রাঙা হয়েগিয়েছিল যার সঙ্গে অনুরাগের কোন সম্পর্ক ছিল না।

কিন্তু সেই যে রস, যা ছিল কল্যাণের হৃদয়ের সম্পদ তার কোন অস্তিত্ব প্রসেনজিৎ-এর হৃদয়ে নেই। কারণ সে কোথাও পায়নি তা। কল্যাণ তার দিদিমার কাছে যে রূপকথা সংগ্রহ ক'রতে পেরেছিল প্রসেনজিৎ পায় নি তার সামান্যতম কণিকাও, তাই এমিলির কথার সঙ্গে মেলে না তার অভিজ্ঞতা। সে মেকী সমাজের কৃত্রিমতার মধ্যে আত্মিক বঞ্চনায় মানুষ। সে আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজলেও কোথাও সে হৃদয় পায় না যার সন্ধান কল্যাণ দিয়েছিল এমিলিকে। তাতে কি আসে যায়! সব মানুষ এক রকম হবে তার কি কথা আছে? বৈচিত্র্যেই পৃথিবীর মাধুর্য। এই বৈচিত্র্য মানুষের আকৃতি থেকে সুরু ক'রে মানসিকতা পর্যন্ত সর্বত্রই সমানভাবে উপস্থিত। একমাত্র মানুষই দুটো জিনিষ মিলিয়ে তৈরী করার চেষ্টা ক'রেছে, ঈশ্বর করেননি। তাই পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তুতে পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট! এমিলি তা জানে, বোঝে এবং এই বৈচিত্র্য সে অনুমোদন করে। তাই যখন তার কথা শুনে প্রসেনজিৎ নিজের মনটাকে খুঁজছিল তখনও প্রসন্ন বিস্ময়ে এমিলি চেয়েছিল তার দিকে। তারপর যখন প্রসেনজিৎ বলল, 'কি জানি ডারলিং, আমি ঠিক সে রকম বুঝি না। রূপকথা মানুষের জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করে আমি জানি না' তখনই এমিলি বলল, তুমি হয়ত এটা অনুভব করনি। কিন্তু যদি সুযোগ আসে আমি ব্যাপারটা তোমাকে দেখিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রব।

আমি খুব খুশী হবো।

তুমি এটা কি বিশ্বাস কর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিক্ষা নেওয়া যায়?

করি।

অনেকে বলে সব শিক্ষা কাজে লাগেনা, আমি বিশ্বাস করি না। আচ্ছা বলতো এমন কোন শিক্ষা কি আছে যা কাজে না লাগে?

কি জানি —।

সব শিক্ষাই কাজে লাগে। আসলে তুমি তোমার শিক্ষা বা জ্ঞান দিয়ে কি কাজ পেতে চাও তার ওপরেই সব নির্ভর ক'রছে। সৌগত সব শিক্ষাকেই, যা বুঝলাম, অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখে।

ও কি বলে?

কোন কিছু শেখবার কথা হলেই বলে, কি হবে ওসবের জন্যে পরিশ্রম ক'রে?

তাই নাকি?

এমনি ধরণের চিন্তা রুমির-ও।

প্রসেনজিৎ-এর মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল। এমিলি তার কৌতূহল

বুঝেও সেদিকে গেল না, অনেকটা স্বগত সংলাপের মত বলে যেতে লাগল, আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে তোমাদেরই দেশে জন্মেছেন এমন সব জ্ঞানীরা যাঁরা কিনা লব্ধ জ্ঞানকে কখনও পার্থিব প্রয়োজনে লাগান নি, আর সেই দেশেরই এই সব তরুণেরা কি নিদারুণ ভাবে বিপরীত ভাবনায় গড়ে উঠছে!

অবাক হবার কিছু নেই এমিলি পৃথিবীটা প্রয়োজনের ভিত্তিতেই চলে।

এমিলি বলল, সব সময় নয়।

কথাটা তুমিই একদিন ব'লেছিলে।

এমিলির মনে পড়ল কথাটা বলত কল্যাণ। সে বলত, বর্তমানে পৃথিবীটা একান্তভাবেই প্রয়োজনের ওপর নির্ভর ক'রে চলছে। প্রয়োজনই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ ক'রছে এখন। মানুষ প্রয়োজনের দাস হয়ে পড়েছে। — কথাটা মনে পড়ে এমিলি চুপ ক'রে রইল। তার মনে যেন সংশয় দেখা দিয়েছে, তাই কি? কল্যাণ-এর সঙ্গে দেখা হ'লে এমিলি প্রশ্ন ক'রত, এমিলি তাকে যে ভালবেসেছিল এটা কোন প্রয়োজনে লেগেছে? একথা ভেবে সে নিজেই যেন চমকে উঠল। এতদিন বাদে হঠাৎ এ কেন মনে হ'ল তার? কোনদিন তো এমনি ক'রে ভাবে নি সে — না না। সব অলীক কল্পনা। ভালবাসা নয় স্রেফ সহানুভূতি। নিজের মন বিশ্লেষণ ক'রে নিজেকে লুকোতে চেষ্টা ক'রল, ভালবাসা নয়, বিদেশী ছাত্র হিসেবে অসহায়তার দরুণ কিছুটা সহানুভূতি মাত্র পেয়েছিল কল্যাণ। একে কখনই ভালবাসা বলে না, কখনই নয়—জোর দিয়ে অস্বীকার ক'রতে চাইল এমিলি। কিন্তু অস্বীকার করার অনেক চেষ্টা ক'রেও সে যেন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। তাই সে অস্বস্তিকর চিন্তাটা মন থেকে সরাবার জন্যে জোর ক'রে বলল, সব সময় নয়। যদি আমি বলে থাকি ভুল বলেছি।

প্রসেনজিৎ এমিলির আকস্মিক অন্যমনস্কতা লক্ষ্য ক'রে বলল, কি ভাবলে এতক্ষণ?

ভাবলাম কথাটা কিভাবে বলেছিলাম। কিছু কিছু ঘটনা প্রয়োজনের জন্যেই ঘটে থাকে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই তবে সব নয়।

হ'তে পারে। তবে যাই বল না কেন রুমি আমার বোন হ'তে পারে কিন্তু আমি যেন দেখছি ওর সঙ্গে আমার কোনই মিল নেই।

ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে বারংবার মাথা নেড়ে প্রসেনজিৎ-এর কথা অস্বীকার ক'রতে চাইল এমিলি। মুখে বলল, তুমি ভুল বলছ। তোমার সঙ্গে তোমার বোনের অনেক মিল আছে। যার সঙ্গে তোমাদের কারও মিল নেই সে তোমার ভাই বিশ্বজিৎ।

ওকে আমরা কেউ বুঝতেই পারি না। ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে। ছাত্র হিসেবেও খুবই ভাল ছিল কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে ও নিজেকে নষ্ট ক'রে ফেলেছে। কথাবার্তা বললে ওকে বুঝতে চেষ্টা ক'রতাম, বলে না।

আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ওর ঘরে ঢুকে দেখি সারাদিন কি পড়ে ও। রাশি রাশি বই নিয়ে আসে আর নিয়ে যায়। আর সবচেয়ে যেটা বিস্ময়ের তা হ'ল ও সব সময়েই রাত্রে বেরোয়। বই নিয়েও যায় রাত্রে, নিয়েও আসে সন্ধ্যের পর। দিনে ও খুব কমই কোথাও যায়।

আশ্চর্য তো!

আরও আশ্চর্য এই যে ও কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না।

কি ব্যাপার কে জানে?

অথচ প্রশান্ত ব্যস্ততা তাকে যেন ঘিরে রেখেছে। কিসের যে ব্যস্ততা বুঝি না। একদিন জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম, কি এত কর তুমি? বলল, কিছুই না। কখন সখন পড়ি একটু —।

প্রসেনজিৎ একথার প্রত্যুত্তর ক'রল না। বিশ্বজিৎ-এর কথায় প্রসেনজিৎ-এর বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না বলেই এমিলিকে থামতে হ'ল। তার চুপ ক'রে থাকার অবসরে প্রসেনজিৎ বলল, তুমি যে সৌগতর কথা বলছিলে না, সৌগত হচ্ছে এ যুগের মানুষ। তার চিন্তাধারা সমসাময়িক পৃথিবীর সব দেশের মানুষের ভাবের সঙ্গেই মিলবে কিন্তু এদেশেরই পুরানো চিন্তার সঙ্গে মিলবে না।

এমিলি বুঝল প্রসেনজিৎ সৌগতকে প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন ক'রছে, করেও সে। কিন্তু এমিলির আদৌ ভাল লাগে না। কি জানি কেন তার মোটেই ভাল বলে মনে হয় না সৌগতকে। রুমির বন্ধু সে, কিন্তু কি রকম ভাবে যেন এমিলির দিকে তাকায়। ওর চোখের চাউনিকে এমিলির কেন যেন অবিশ্বাসী মনে হয়। অথচ ওর এই চোখের মধ্যে কি যে আছে এমিলি তা ব্যাখ্যা ক'রতেও পারে না। তবে যা আছে তা অস্বস্তির সঞ্চার করে তার মনে। কথাটা সে রুমিকেও বলতে পারে না, বোঝাতে পারে না প্রসেনজিৎকেও। অবশ্য কখনই সে প্রসেনজিৎকে স্পষ্ট ক'রে কিছু বলে নি বা নিজের অপছন্দের কথাও মুখ ফুটে বলে না কখনো। কারণ সে কখনই নিজেকে ওসব অপ্রিয় আলোচনার মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে চায় না। কখনও কাউকে ভাল না লাগলে সে তাকে ধীরে ধীরে এড়িয়ে যায়, বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করে না। কোনদিনই নয়। প্রসেনজিৎ যতই সৌগতকে সমর্থন করুক এমিলি তাকে এড়িয়েই চলে। সে লক্ষ্য ক'রেছে সৌগতকে এড়িয়ে চলে এ বাড়ীর আর একজন — সে বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিৎ যে সৌগতকে পছন্দ করে না তা রুমিও জানে, বলেছেও সে একবার এমিলিকে। সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। আমার কাকে ভাল লাগে সেটাই এখানে প্রশ্ন অন্য কার ভাল লাগে কি লাগে না ব্যাপারটা তুচ্ছ।

কথাটা শুনে এমিলি কল্যাণের কথা ভেবেছিল, কল্যাণ বলেছিল অন্যকথা। বলেছিল, জান এমিলি আমাদের দেশে বিয়ের একটা অন্য সৌন্দর্য ছিল। এখনও অনেকটাই আছে। পাত্র এবং পাত্রীর বাবা মা অনান্য আত্মীয়স্বজন

মিলে দেখে পছন্দ ক'রে বিয়ের ঠিক করে। সকলের পছন্দ হলে বিয়ে হয়। আমাদের বিয়েতে পাত্রপাত্রীর নিজস্ব ভূমিকা গৌণ অভিভাবকদের ভূমিকাই প্রধান হয়ে অনুষ্ঠানকে মনোরম ক'রে তোলে —। রুমির কথাটা দম্ভোক্তির মত শোনাতে সেই মুহূর্তে এমিলির ইচ্ছে ক'রল কল্যাণকে জিজ্ঞেস করে তার কথা কোথায় মিলছে ? সবই কি অতিরঞ্জিত ক'রে মিথ্যে বলেছিল কল্যাণ ? নিজের দেশকে বড় ক'রে দেখাবার জন্যে বলেছিল ? পরক্ষণেই মনে হ'ল, তা হ'তে পারে না, কল্যাণ বলেছিল শহরে দেশের পরিচয় নেই। শহর তো পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে তৈরী, আসল দেশ বলতে তো বোঝায় গ্রাম।

গ্রামে কখনও যেতে পারেনি এমিলি কিন্তু গ্রামে না গিয়েও এদেশের সমাজের কাঠামো যা সে দেখতে পাচ্ছে তাতে অবয়ব সম্পূর্ণ না মিললেও কল্যাণের কথার সত্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এ যেন অনেকটা কঙ্কালের মত, মাংস পচে খসে গেছে কিন্তু কাঠামো দিয়ে যাচ্ছে প্রাণীর পরিচয়।

এই কাঠামোতে রুমি কিন্তু মেলে না। তার কথা অভীপ্সা কোনটাই মেলে না। কিন্তু তাই বা ভাবে কেন, এমিলি নিজের সম্বন্ধেই ভাবল, মুখে রুমি যা-ই বলুক আসলে ব্যাপারটা এমিলি যেমন ভাবছে তেমন নয়, কারণ সৌগতকে পছন্দ এ বাড়ীর অনেকেই করে, প্রসেনজিৎ করে, তার মা করেন, করেন নিশ্চয়ই ওদের বাবা-ও, নইলে — ভাবনাটা ইচ্ছে করেই থামিয়ে দেয় এমিলি। অন্য কারও ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামানো তার খুব বেশী উচিত নয়। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও ঔৎসুক্য সে কোনভাবেই দমন ক'রতে পারে না। সকলের মনগুলোকেই তার জানতে ইচ্ছা করে। একটা বস্তুকেই কে কেমন ভাবে দ্যাখে এ এক দারুণ কৌতূহল তার, আর সেই কৌতূহলেই সে সৌগত সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ ক'রতে চেষ্টা করে। রুমি, সে বোঝে এদেশের অন্য মেয়েদের মতই পুরুষসঙ্গ বঞ্চিত। তার ফলে সৌগতকে কাছে পেয়ে একমাত্র পুরুষ হিসেবে না হয় বিনা নির্বাচনেই গ্রহণ ক'রল, কিন্তু কি জন্যে ওকে পছন্দ করেন তার মা ? প্রসেনজিতের কথা সে ধরে না, কারণ সে জানে পৃথিবীতে কোন বস্তু বা কোন মানুষের প্রতিই তার কোন বিদ্বেষ নেই, প্রসেনজিৎ এমনই একটা মানুষ যে তার মনের কাছে সবই ভাল। কোনকিছু সম্বন্ধেই সে বিশেষ মাথা ঘামায় না। কিছু নিয়েই বেশী ভাবতে চায় না। অতএব এই শিশুর মতকে বিশেষ গুরুত্ব দেবার অর্থ হয় না। কিন্তু সকলকে হিসেবের মধ্যে পেলেও একজনের মনের হিসেব মেলাতে কিছুতেই পারে না এমিলি, সে বিশ্বজিৎ। এবাড়ীর সূত্রে তার হিসেব ধরলে অঙ্ক মেলে না। বিপরীত দিক থেকে ক'রতে গেলে খেই হারিয়ে যায়। এমন কাউকে পায় না যে তাকে হদিশ দিতে পারে এই অঙ্কের। অথচ এই দুরূহ মনের দুর্গম রহস্য তাকে সমানে আকর্ষণ ক'রতে থাকে। তার সব সময়েই মনে হয় বিশ্বজিৎ যেন এবাড়ীতে বেমানান। যদিও এবাড়ীর ধর্মই এই — সবাই স্বতন্ত্র, নিজের

ছোট্ট ঘরের জগৎটিতে নিজেকে বন্দী ক'রে ফেলে সবাই বাড়ী ঢুকলেই। তেমনই করে বিশ্বজিৎ; অথচ এমিলির কেন যে তাকে স্বতন্ত্র মনে হয় নিজেই বুঝে উঠতে পারে না! তার মনে হয় সকলে আত্মকেন্দ্রিক, বিশ্বজিৎ বিচ্ছিন্ন। অন্য সবাই আত্মমগ্ন, বিশ্বজিৎ উদাসীন। তার ঔদাসীন্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বরং তার ঔদাসীন্য সম্পর্কেও উদাসীন আর সকলে। বাড়ীতে প্রত্যেকে যখন নিজের পছন্দমত খাবার ফরমায়েশ করে রাঁধুনীকে সে তখন নির্বাক। কোন খাবার কোনদিন খারাপ লাগলে আর সকলে যখন বকাবকি করে সে তখনও নির্বিকার। সব কথা বোঝে না এমিলি কিন্তু ব্যাপারগুলো সবই বোঝে।

আরও একটা জিনিষ এমিলি লক্ষ্য ক'রেছে এবাড়ীতে বিশ্বজিৎ সম্বন্ধে কেউ কোন কথা বলতে চায় না। রুমির সঙ্গে বিশ্বজিৎ প্রসঙ্গে আলোচনা ক'রতে চাইলে সে এড়িয়ে যায়। প্রসেনজিৎ স্পষ্টই বলে ওর প্রসঙ্গ বাদ দিতে। সুপ্রীতি দেবীর সঙ্গে এসব কথা তোলা হয়ে ওঠে না কখনই। তা ছাড়া সুপ্রীতি কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। বলতে পারে না এমিলিও। ছোট ছোট ক'রে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কথা বললে সুপ্রীতি বোঝেন, সেই রকমই বলে এমিলি। বাংলা শব্দ দু চারটে শুনে শুনে যা শিখে ফেলেছে তা সে ব্যবহার ক'রতে সাহস করে না। ঠিক মত বলতে পারবে এ বিশ্বাস কিছুতেই সঞ্চয় ক'রতে পারে না বলে একা একা নিজে নিজে কখনও উচ্চারণ ক'রতে চেষ্টা করে 'নমস্কার', 'মা এখন কি রান্না হবে' 'তুমি খুব ভাল' এমনি আরও কত শব্দ। একা একা নিরালায় উচ্চারণ করে শুদ্ধ উচ্চারণে পৌছানোর জন্যে। কিছু শব্দ ছোট্ট ফিতেয় রেকর্ড ক'রে রেখেছে রুমিকে ধরে, সেগুলোও বাজিয়ে শেখে চলতি শব্দগুলো। কিন্তু সুপ্রীতি দেবীর সঙ্গে কথা বলতে সাহস সে করে না। তার ইচ্ছা হয় বিশুদ্ধ উচ্চারণে সে পরিষ্কার ভাবেই কথা বলবে। আসলে লজ্জার জড়তা সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। রোজই আশা করে কাল থেকে বলবে, বলা আর হয়ে ওঠে না।

অবশেষে সে প্রসেনজিৎকে ধরে বসল, তুমি আমার সঙ্গে বাংলাতে কথা বলবে।

একটু হেসে প্রসেনজিৎ ইংরেজিতে জিজ্ঞেস ক'রল, যেমন বাংলা তুমি বলছ তেমনি ?

হাসিতে লজ্জা প্রকাশ হয়ে পড়ল এমিলির, যে সে ইংরেজিতেই বলছে। পরবর্তী প্রথম কথা সে বাংলাতে বলে ফেলল, না না, মানে আমি কথাটা ঠিকমত বলতে চাই।

আবার বিস্মিত হ'ল প্রসেনজিৎ, আরে! তুমি যে সত্যিই শিখে ফেলেছ দেখছি!

এর উত্তরে যে কি বলতে হয় এমিলি আর তা জানে না বলে কিছু বলতে

পারল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, আমি ভালভাবে বলতে চাই।

প্রসেনজিৎ বলল, পারবে। আস্তে আস্তেই পারবে।

এমিলি হাতের ইশারায় প্রসেনজিৎকে থামিয়ে 'আস্তে' শব্দটা খুব ধীরে উচ্চারণ ক'রে তার ইংরিজি তর্জমা ক'রে বলল, মানে স্লোলি—

হ্যাঁ, প্রসেনজিৎ-এর কথায় আপনা থেকেই ইংরিজি এসে গেল, আর কিছুদিন থাকতে থাকতে শিখে ফেলবে।

এমিলি এবার তার স্বভাষাতে বলল, কিছু মনে করো না, একটা কথা বলছি তোমাদের বাঙ্গালী চরিত্রে একটা বড় দোষ তোমরা নিজের ভাষাটা অন্য কাউকে শিখতে দাও না। অর্থাৎ সাহায্য কর না। কেউ চেষ্টা ক'রলেও তোমরা তার সঙ্গে সব সময় তারই ভাষা ব্যবহার ক'রে শিখতে দাও না তাকে। সবরকম মানুষের সঙ্গেই তোমরা তার নিজের ভাষা ব্যবহার ক'রতে চাও। ওখানে থাকতে কিন্তু আমার অন্য রকম মনে হত।

কি মনে হত প্রসেনজিৎ জানতে চাইল না। মানুষের চিন্তার ব্যাপারে তার উৎসাহ অত্যন্তই কম। চিন্তা মানুষের নিজস্ব অধিকার। সেখানে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। অন্যের প্রবেশাধিকার সেখানে প্রায়শই থাকে না। প্রসেনজিৎ কিন্তু প্রবেশ ক'রতেই চায় না। প্রবেশ ক'রতে চায় না এ বলে নয় যে তার নিজস্ব চিন্তার জগৎকে সে গোপন রাখতে চায়, সে চায় না অনেকটা এ জন্যেই যে তার মনের মধ্যে চিন্তা নামক ব্যাধিটির আনাগোনা অত্যন্তই কম। নিজের কর্মজগতের কোন সমস্যা ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে চায় না। তার ইচ্ছা — একটি নিশ্চিত নিরুপদ্রব শান্ত জীবন। অন্যের কোন বিষয়বস্তুর মধ্যে মন ঢুকিয়ে নিজের শান্তির অবিচ্ছিন্নতায় বিঘ্ন ঘটাতে সে গররাজী।

এমিলি তার বিপরীত। অনেক মানুষকে জানা এবং বোঝার মধ্যেই তার আনন্দ। সে খুঁজে পায় তার সুখ। মানুষের মনের দুর্ভেদ্য রহস্য উদ্ঘাটন ক'রতে পারলেই সে পায় পরমার্থ। এ দিক থেকে তার একমাত্র মিল ছিল কল্যাণের সঙ্গে। সে বলত, পর্বতের উচ্চতম চূড়া বল, কি সমুদ্রের গভীরতম তলদেশ বল কিংবা বল মহাজাগতিক কোন গ্রহ-নক্ষত্রের দুর্গমতা — আমি মনে করি সবচেয়ে দুর্গম মানুষের মন। একদিন না একদিন সব জায়গায় পৌঁছাবে মানুষ, শুধু পারবে না নিজের মনের গহনে কি আছে তা খুঁজে দেখতে। পৃথিবীর আয়ুষ্কাল পর্যন্ত মানষ এর অনুসন্ধান ক'রে যাবে — পাবে না। এমিলিরও সেই রকমই ধারণা। আর এই খুঁজে চলা সত্যিই সুন্দর। বুঝে উঠতে না পারা এবং পারা দুই-ই মধুর। এই যে কল্যাণ, যার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কেটেছে অনেক দীর্ঘ দিনরাত্রি, অনেক কথার আদান প্রদান হয়েছে যার সঙ্গে অগুণতি নিবিড় মুহূর্তে — তারই কি পাওয়া গেছে মনের পূর্ণ পরিচয়? যায় না, যাবে না। এই না পাওয়া এবং পেতে চাওয়া, এবং খুঁজে যাওয়া সবই

আনন্দময় এক পথের যাত্রা। তার হারিয়ে যাবার সময় থেকে এই প্রায় তিনটি বছরের হাজার খানেক দিনরাত্রি ধরে অসংখ্য প্রশ্ন সমুদ্রের তরঙ্গের মত জাগছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কল্যাণ থেকে গেছে সেই একই রকম অনুদ্ঘাটিত রহস্যের ঘনতিমির গভীরতায়। এমনিভাবে কোন মানুষকে হারিয়ে যেতে কোনদিন দেখে নি এমিলি। প্রথমে দুঃখ পেয়েছিল, শঙ্কিত হয়েছিল পরে সংবাদ পেয়ে হয়েছিল ক্ষুব্ধ। পরে দীর্ঘদিন চিন্তা ক'রে দেখেছিল সত্যিই কোন দোষ করেনি কল্যাণ। কোন অন্যায় সে করে নি। প্রথমে মনে হয়েছিল— কাপুরুষ পরে অনুধাবন ক'রেছিল কাপুরুষ সে কিছুতেই নয় বরং বীরত্ব বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে সে যথার্থই বীরপুরুষ। কারণ লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করে নি সে, ভোলেনি কর্তব্যের আহ্বান। তা ছাড়া সে তো প্রবঞ্চিত করে নি এমিলিকে— একদিনের জন্যেও করেনি মিথ্যাচার। সে ছিল সৎ — অনেক অনুমননে বুঝতে পেরেছে, সে ছিল সরল। প্রথম আলাপের কিছুদিনের পরও সে লক্ষ্য ক'রত কল্যান সহজ নয়। খুব কাছাকাছি আসে না সে। এ অভিজ্ঞতা এমিলির কাছে নতুন। আগে যে সব ছেলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল তারা সব অত্যন্তই গায়েপড়া। এমিলির মনে হ'ত ভারতের ছেলেরা বুঝি এই রকমই, লাজুক হয়। তার দেশের ছেলেরাই হয় গায়েপড়া। কিন্তু বান্ধবী লিজার কাছে সে জানল আদৌ তা নয়। চরিত্রে দু দেশের যৌবনে কিছু-মাত্র পার্থক্য নেই। লিজা অনেক জানাশোনা মেয়ের ভারতীয় বন্ধুদের গল্প বলে কথাটা প্রতিপন্ন করার পর একদিন কল্যাণকে এমিলি প্রশ্ন ক'রে বসল, আচ্ছা কল্যাণ, আমার সঙ্গে তুমি কি খুব অস্বস্তি অনুভব কর?

একথা কেন বলছ এমিলি? কল্যাণ জানতে চাইল।

তোমাকে দেখে মনে হয়। মনে হয় তুমি খুব স্বচ্ছন্দ বোধ ক'রছ না।

আমি অত্যন্তই দুঃখিত এমিলি। আমার ব্যবহার সেরকম হয়ে থাকলে আমি মাফ চাইছি। তোমার মত একজন মহিলার সঙ্গ অত্যন্তই প্রার্থিত এবং সৌভাগ্যেরও বটে।

কেন?

অল্প কিছুটা কারণ তুমি আয়নার সামনে দাঁড়ালে বুঝবে, বাকীটা আছে তোমার স্বভাবে, সেটা সেই বুঝবে যে তোমার সঙ্গে মেশবার সুযোগ পাবে।

কথাগুলো শুনে প্রগল্‌ভ হয়েছিল এমিলি, বলেছিল, তুমি ঠিক বলতে পারছ না ডিয়ার, আমার মধ্যে বোধহয় ঈশ্বর এমন গুণ দিয়েছেন যা কেবল আরশিরই আছে। আর তাতে তুমি আপনার প্রতিবিম্ব দেখে ভুল ক'রে সেটা আমার স্বরূপ বলে ভাবছ!

কল্যাণ বলল, তর্ক ক'রতে চাই না বলেই আমি চুপ ক'রছি, তোমার কথা বিশ্বাস ক'রে নয়। তর্কে বিশ্বাস খুব কম সময়েই বদলায় — আর যদি সে বিশ্বাস কোন সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর ক'রে করা হয় তাহ'লে তা কখনই বদলায়

না। আসলে আমি আমার মন দিয়ে যা বুঝি অকারণে তা ভ্রান্ত বলে মনে ক'রতে পারি না।

কিন্তু তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহ'লে তোমার ব্যবহার এত নির্দয় হত না। — আত্ম নিবেদনের সুরেই বলে ফেলল এমিলি।

খুব আন্তরিকভাবে কল্যাণ বলল, একথা ভেবোনা এমিলি। আসলে কি জান আমি আমাদের দেশের অতি দরিদ্র পরিবারের ছেলে। এক গণ্ডগ্রামে থাকি। বলতে পার এই শতাব্দীর সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় আমাদের কম। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের আদবকায়দাই ভালভাবে শিখে ওঠবার আগে তোমাদের দেশে চলে এসেছি।

তাই বুঝি এমনি সন্তর্পণে থাকতে হবে? আমি তো তোমার সঙ্গে এতদিন মিশছি কিন্তু তোমার মত সুসভ্য লোকও তো আমার জীবনে আর দেখিনি আমার তো মনে হয় আসল যে ভারতবর্ষ—যার সভ্যতা অতি প্রাচীন তুমি তারই যথার্থ প্রতিনিধি।

সেই বিশাল দেশের প্রতিনিধিত্ব করবার ক্ষমতা আমার নেই তবে আমাকে সব সময় মনে রাখতে হয় সেই অন্ধকার একখানা কুঁড়ে ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বেলে বসে আছেন আমার মা।

কী সুন্দর! এমিলি কল্যাণের কথা শুনে আনন্দে বলে উঠল। আরও বলল, গ্রাম খুবই সুন্দর! আমার গ্রাম খুব ভাল লাগে।

ভাল লাগতে পারে কিন্তু আমাদের সেই সব গ্রামের কথা তুমি ভাবতে পারছ না, পারবেও না।

যেখানে মানুষ থাকে সে জায়গা নিশ্চয়ই সুন্দর। মানুষ সব সুন্দর ক'রে নেয়। মানুষের জীবনটা সুন্দরের সাধনা।

একথার উত্তর দিতে পারেনি কল্যাণ। সে চুপ ক'রেছিল। এমিলির মনে আছে তার পরের অনেক ঘনিষ্ঠ সময়ের কথা-ও। অনেক সময়ই এমিলি লক্ষ্য ক'রেছে কল্যাণ সঙ্কুচিত। অনেক সময়ই সে দেখেছে কল্যাণ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা ক'রছে। বিশেষ ক'রে কল্যাণ নিজের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে চাইত না একেবারেই। দেখে শুনে এমিলির মনে কেমন সন্দেহ হয়েছিল, অনেকদিন অনেক ভেবেও বলতে পারেনি অবশেষে একদিন সকল দ্বিধা জয় ক'রে জিজ্ঞেস ক'রে ফেলেছিল, আচ্ছা কল্যাণ তোমার বাড়ীতে মা ছাড়া আর কে আছে?

আছেন মার গৃহদেবতা।

আর কেউ?

না।

তোমার বাবা নেই বুঝি?

না। বাবা যখন মারা যান তখন আমার বয়েস সতের। স্কুলের পরীক্ষায়

সেইবারই পাশ ক'রেছি আমি। তার কিছুদিন বাদেই বাবা মারা যান বিনা চিকিৎসাতে।

কি হয়েছিল?

জানি না। আমি শহরের কলেজে পড়তাম, থাকতাম হস্টেলে। পরীক্ষায় একটু ভাল নম্বর পেয়েছিলাম বলে পড়াশোনার কোন খরচ লাগত না। হস্টেলে যখন বাবার মৃত্যু সংবাদ এল, আমাকে তখন এক অধ্যাপকের কাছে দশটাকা চেয়ে নিয়ে বাড়ী যেতে হয়েছিল। বাবাকে দেখতে পাইনি।

দুঃখ প্রকাশ ক'রল এমিলি সমবেদনার সহানুভূতিতে।

কল্যাণ আবার বলেছিল, মার জন্য আমার বড় ভয়। এই দূর দেশে এসেছি মার ভালমন্দ কিছু দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের স্বার্থের জন্যে মায়ের দিকে তাকালাম না এটা সন্তান হিসেবে আমার অপরাধ। অন্য প্রাণীর সম্পর্ক শুধু জৈবিক, আর সেখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অথচ মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের ধর্ম পালন না করা ধর্মচ্যুত হওয়া নয় কি? অন্তত আমি তাই মনে করি।

ধর্মপালন তুমি কাকে বল কল্যাণ?

জন্মসূত্রে হিন্দু আমি কিন্তু মনে করি ধর্ম সম্পর্কে আমাদের চলতি ধারণা যা ধর্ম তা নয়। ধর্ম হচ্ছে বিবেকের নির্দেশ, ধর্ম হচ্ছে প্রাণীদের প্রতি প্রকৃতির নির্দেশ। সেইসব নির্দেশ পালন না করা অধর্ম। ধর্মশাস্ত্রগুলো বলে পাপী যদি ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে তবে সে অব্যাহতি পায়—আমি তা মানতে পারি না। আমার মনে হয় পাপের কোন ক্ষমা নেই। কারণ পাপ হ'ল বিবেক বিচ্যুতি প্রকৃতির নির্দেশ লঙ্ঘন।

বিবেকের নির্দেশ বলে ধ্রুব কি কিছু আছে?

বিবেককে সজাগ থাকতে দিলে তার নির্দেশ যা পাওয়া যায় তা সব সময়েই একই ধরণের, এবং তা প্রকৃতির বিধানেরই অনুরূপ। ধ্রুব নয় তাকে বলি কি ক'রে?

তুমি যাকে প্রচলিত অর্থে ধর্ম বলছ তা তো তোমার ওই প্রকৃতির বিধানেরই সামাজিক রূপমাত্র। যাকে তুমি প্রকৃতির বিধান বল ধর্ম তো তাকেই রক্ষা করে। ধর্ম হচ্ছে আচারণ বিধি।

রক্ষা করার কথা, অনেক সময়ই করে না।

তুমি কি ধর্মে বিশ্বাস কর না?

প্রচলিত অর্থে ধর্ম যাকে বলে তার প্রতি আমাব বিশ্বাস নেই, তবে তাই বলে ধর্মে অবিশ্বাস আমার নেই।

ঈশ্বর-এ বিশ্বাস কর নিশ্চয়ই?

ঈশ্বর অথবা ভূত দুটোরই অস্তিত্বে বিশ্বাস করা মানুষের অভ্যাস কিন্তু আমি ওদুটোয় বিশ্বাস করবার মত প্রামাণ্য কিছু এখনও পাইনি।

এই যে বিশাল পৃথিবী — তাই বা বলি কেন এই যে জগৎ সংসার কে এসব সৃষ্টি ক'রেছে ?

কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বোধহয় কিছু ভাবল কল্যাণ তারপর তার স্বাভাবিক স্বরের চেয়ে শান্তভাবে বলল, আমি একদম বুঝি না এমিলি, কোনসময় এই ব্রহ্মাণ্ডের কথা ভাবতে গেলে আস্তে আস্তে দিশা হারিয়ে অকূল ভাবনার মধ্যে এমন হাবুডুবু খেতে থাকি যে মনে হয় দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তখন তাড়াতাড়ি ভাবনাটাকে মন থেকে সরিয়ে দিই। এর সৃষ্টি আমার কাছে রহস্যময়।

কিন্তু একথা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে সমস্ত বস্তুরই যেমন সৃষ্টিকর্তা থাকে তেমনি এই বিশাল পৃথিবী এবং গ্রহরাজিরও একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন ?

এই রকম বস্তু সৃষ্টি করার সামর্থ যদি কারও থেকে থাকে তবে এও তো হতে পারে এক এক গ্রহ নক্ষত্র এক একজন সৃষ্টি ক'রেছেন, সমস্ত বিশ্ব-মণ্ডল অনেকের একক সৃষ্টির মিলিত ফল।

কথাটা শুনে এমিলিকে চিন্তিত হতে হয়েছিল। আজও সে প্রশ্নের উত্তর পায় নি তার মন। শুধু তার প্রশ্নগুলোই নয় কল্যাণ নিজেও তার মনের মধ্যে এক ঘন অন্ধকার সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। এমিলির মূল্য দেয়নি সে, কিন্তু অমর্যাদাও করে নি তার ভালবাসার। এরকম সুযোগে অন্য মানুষ যা করে থাকে, সেখানেই বিস্ময়কর ব্যতিক্রম দেখা গেছে কল্যাণের ব্যবহারে। তাই আজ কোনমতেই তাকে অভিযুক্ত ক'রতে পারে না এমিলি। বলতে পারে না তাকে কল্যাণ প্রবঞ্চিত ক'রেছে। শেষের দিকে কিছুদিন ধরে বিমর্ষ থাকত কল্যাণ। কথাবার্তা কমই বলত। অনেকদিন সন্ধ্যেবেলা এমিলি তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখেছে চুপচাপ সে শুয়ে আছে ঘরের মধ্যে। অনেক অনিচ্ছাতেই যেন সে বেরোত এমিলির সঙ্গে। এমিলি তাকে জিজ্ঞেস ক'রত, তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন ? কি হয়েছে বলত ?

মনটা ভাল লাগছেনা, সংক্ষিপ্তই জবাব ছিল কল্যাণের।

কেন ডারলিং, তোমার কি হয়েছে ? গভীর আন্তরিকতার গাঢ় স্বরে জানতে চেয়েছে এমিলি, আরও ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা ক'রেছে সহানুভূতির কবোষ্ণ আবেগে।

এমনি কেটেছে অনেক সন্ধ্যা, এমনি প্রশ্ন অনেকবার উচ্চারিত হয়েছে কিন্তু ফল হয়নি। কল্যাণের বিষণ্ণতার কারণ জানতে পারার আগেই গভীর রহস্যে তলিয়ে গেছে কল্যাণ, হঠাৎ দেশে ফেরার কারণ পর্যন্ত জানায় নি সে। কল্যাণ-এর মত মানুষের কাছে এ ধরণের ব্যবহার যে পাওয়া সম্ভব তা সে বিশ্বাস পর্যন্ত ক'রতে পারেনি। বসীর বলেছে, কল্যাণের তোমাকে এভাবে ঠকানো উচিত হয়নি।

শুধু বলে যাওয়াই নয়, সে যে ডেকে নেবে, নিয়ে যাবে তাকেও! যেখানে কল্যাণের দেশ মনে মনে সেই দেশকেই নিজের চিন্তা ক'রে যে প্রতীক্ষা ক'রে আছে এমিলি, কল্যাণ কি তা বোঝে না? জানে না সে? কত নিবিড় রাত্রে কি স্বপ্নজড়িত স্বরে এমিলি তার কণ্ঠলগ্না হয়ে বলে দেয় নি তোমার প্রিয় বাংলা আমার স্বপ্নের ভারত? কল্যাণের হৃদয়ে কি প্রবেশ করেনি সেই স্বপ্নের মর্মবাণী? আর যে যা-ই করুক কল্যাণ একাজ ক'রতে পারে না, এভাবে নিঃশব্দে তস্করের মত পালিয়ে যেতে কিছুতেই পারে না সে। এমিলি মিলিয়ে নিয়েছে, কল্যাণের কথাগুলো শুধুই ফাঁপানো ফোলানো বড় কথা ছিল না তার জীবনচর্যাতেও সেই কথাগুলো প্রতিমুহূর্তে ছিল প্রতিবিম্বিত। আসল মানুষই ছিল কল্যাণ, খাঁটি মানুষ। মিথ্যাচার নয়, শঠতা নয়, আপন বিবেকের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনুষ্যত্বে সে ভাস্বর। বসীর মিথ্যা বলছে। — না মিস্টার বসীর, এ অসম্ভব।

অসম্ভব! —বসীর-এর মুখে বিদ্রূপের বিদ্যুৎ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। — তুমি ওরকম ভাবতে পার তাতে ঘটনার কিছু আসে যায় না।

না না — মুখে দুহাত চাপা দিয়ে একরকম ছুটেই পালিয়েছিল সেদিন এমিলি। তারপর ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বাস। প্রথম দিকে বিক্ষুব্ধ হৃদয়াবেগ প্রচণ্ড ঘৃণায় পূর্ণ ক'রেছিল তার অন্তর, তারপর দিনে দিনে সে ঘৃণা কখন উবে গেছে, কখন নিঃশব্দে পরিবর্তন এসে গেছে বোঝে নি সে নিজেই। কল্যাণকে সে বুঝতে চেষ্টা ক'রেছে এবং সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে সে মিলিয়ে নিতে চেয়েছে তার হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া। তারপর শান্ত চিত্তে প্রতীক্ষা ক'রেছে নিশ্চয়ই সে একটা চিঠি দেবে —। সেই প্রতীক্ষা মনে নিয়ে সে কাটিয়েছে তার একাকীত্বের দীর্ঘ সময়। পায়নি। কোনই চিঠি পায় নি, না পেয়েছে তার কোন সংবাদ। তখন মনে মনে বড় কঠোর সত্যে উপলব্ধি ক'রেছে যে কল্যাণ সব সম্পর্ক মুছে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে গেছে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য ক'রেছে, কল্যাণ কোন স্মারক রেখে যায় নি। সে-ও সিদ্ধান্ত ক'রেছে কল্যাণকে ভুলে যাবে। মনে ক'রবে সবই মিথ্যা, কখনও ছিল না।

আর কল্যাণকে ভুলতে গিয়েই নিবিড় ক'রে নিতে চাইল বসীরকে। সে অনেকটা জোর ক'রেই। কারণ কি এক বৈপরীত্য সে লক্ষ্য ক'রেছিল বসীর-এর মধ্যে। সেটা এমনই যা দুর্লঙ্ঘ্য। আরও সে বুঝেছিল কল্যাণ প্রবাসে ছিল নিঃসঙ্গ। কারও সঙ্গে ছিল না বিশেষ সংযোগ, যেত না কোথাও। অনেকটা সেই কারণেই কিংবা অন্য কোন না জানা কারণে, এমিলি বুঝত, বসীর কল্যাণকে খুব একটা ভাল চোখে দেখে না। আর অনেকটা এই কারণেই বসীরকে তার প্রশ্রয় দেওয়া। তার মনে হয়েছিল বসীর হয়ত ঈর্ষান্বিত। অন্তত এমিলিকে শোনানো কথা থেকে এমিলির সে রকম মনে করার সঙ্গত কারণ ছিল। তাই বিদ্বিষ্টকে বন্ধু হিসেবে পেতে প্রথম

উত্তেজনায় ভাল লাগলেও পরে এমিলি দেখল আসল পার্থক্য দুজনের অন্যত্র। জীবনের গভীরে ঢুকতে গেলেই সে ব্যবধান স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। কল্যাণ যে সম্পর্কে ছিল একেবারেই উদাসীন সেই 'বাসনা'তেই পূর্ণ মানুষ বসীর। সে একান্তভাবে এবং নিবিড়ভাবেই চায় এমিলিকে কিন্তু চায় দেহসাহচর্য। দেশে তার স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সে স্ত্রী ক'রতে চায় এমিলিকে। তাতেই প্রথম প্রশ্ন ক'রেছিল এমিলি, সে কি ক'রে সম্ভব ?

কেন ! বসীর বিস্মিত, আমাদের ধর্মে তো একাধিক বিয়ে সম্ভব —

শান্ত এমিলি বলল, তা'হলে তোমাকে একথাও ভাবতে হবে যে আমারও তো একটা ধর্ম আছে —

আমার ধর্ম উদার। তুমি যখন আমায় বিয়ে ক'রবে তখন আমার ধর্মেই হবে তোমার নবজন্ম।

ধর্ম তো মানুষের বিবেক-চালিত নির্দেশ বসীর। ঈশ্বরের উপাসনা যেভাবেই করিনা কেন, আমার বিবেক এতে কখনই সম্মতি দেয় না যাতে অন্য একজন নারীর সম্পূর্ণ অধিকারে আমি অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করি। একজন নারীর যখন দুজন স্বামী থাকা অসঙ্গত তখন একজন স্বামীরও দুজন স্ত্রী থাকা সমান অসঙ্গত বলে আমার মনে হয়।

তুমি যদি সেই রকমই চাও তাহ'লে তাই হবে। এখনই আমি তালাক দিচ্ছি আমার গেঁয়ো বউকে —

কথাটা শুনেই এমিলির হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল, সে চুপ ক'রে রইল।

কিন্তু বসীর তখন প্রেমাবেগে এতই অধৈর্য যে তখনই জবাব না পেলে তার চলে না তাই আকুতি জানাল, বল ডার্লিং, তুমি একবার বললেই সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলব আমি। তুমি শুধু একটিবার রাজী হও।

অনুরোধ শুনে এমিলির অন্তর অকস্মাৎ ঘৃণায় ভরে উঠল। তবু সে নিজের মনোভাব ব্যক্ত না ক'রে চুপ ক'রে রইল। যা বলে বলুক বসীর যা বলে সুখ পায় পাক, এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর এগোনো অর্থহীন। কারণ দেশের স্ত্রীর কথা আগে কখনও বলে নি বসীর, বন্ধুত্বের সহজ সম্পর্কে নিজেই শুধু শুধু জট পাকিয়েছে। হয়ত সে জড়িয়ে পড়েছে নিজে, নয়ত তাকেই জড়াতে চাইছে। যাই হোক তার প্রস্তাবকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছুই ক'রতে পারল না এমিলি, তবে সেই ঘৃণার কথা প্রকাশ ক'রতে পারল না। পরিবর্তে বলল, আজ থাক। অন্যদিন কথা হবে।

অন্যদিন কেন, আজ কি বাধা ? — বসীর প্রশ্ন ক'রল আবেগ-মুগ্ধ কণ্ঠে।

এমিলি বলল, আমাকে ভাবতে দাও।

কলেজ থেকে বেরিয়ে কিছুটা দূর গেলেই ডাকঘর। সেখান থেকেই টেলিফোন ক'রল রুমি সৌগতর অফিসে। সৌগত নেই। কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করবার আগেই রিসিভার নামিয়ে রাখায় সে বেশ বিরক্ত হ'ল। অফিসের লোকগুলো ভারী অভদ্র। সাধারণ সৌজন্যবোধ পর্যন্ত নেই। মিস্টার দত্ত নেই — এইটুকুই কি যথেষ্ট ? নিজের চেয়ারে নেই, কি অফিসে নেই সেটুকু জেনে নেবার সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে হুট ক'রে রিসিভার নামিয়ে রাখা, এ কোন ভদ্রলোকে করে না। 'মোস্ট আনকালচার্ড' 'ব্রুট' — আপন মনেই কটূক্তি ক'রল রুমি। শুধু ইংরাজীতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে বলল, ইতর। — কলেজের ভেতরটাকে অনেকক্ষণ ধরেই বন্দীশালা মনে হচ্ছিল রুমির। অধ্যাপকদের অসার বক্তৃতাগুলো শুনতে শুনতে বারংবারই ক্লাসঘরের দেয়ালে — এই শিক্ষাব্যবস্থা বাতিল কর — প্রভৃতি লেখাগুলোর দিকে নজর পড়ছিল। রোজই চোখে পড়লেও অন্যদিনের দৃষ্টিতে একেবারেই গুরুত্বহীন লেখাগুলোর মূল্যমানে কিছু তারতম্য হচ্ছিল আজ। ক্লাশের সেরা ছাত্র স্বপন কি আর না বুঝেই কিছু লিখবে ? সত্যিই তো কি যে কচু পড়ায় প্রফেসারগুলো তা আর বলবার নয়। রোজই একঘেয়ে সব বস্তাপচা বক্তৃতা। অবশ্য স্বপনদের দল কি জন্যে এসব লিখেছে সে বোঝে না, বোঝবার জন্যে চেষ্টাও করে না। তবে আজ মনে হচ্ছে ওরা যা লিখেছে তা একেবারে অমূলক নয়। কি হবে এসব পড়াশোনা ক'রে ? তার চেয়ে অনেক ভাল গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়া, অথবা সিনেমা হলে গিয়ে বসে থাকা। আর সবচেয়ে ভাল হয় যদি পাওয়া যায় এখন সৌগতকে। সৌগতর সঙ্গ এমনই মাধুর্যময় যে সময়টা যে কোথা দিয়ে চলে যায় তার হিসেব রাখা যায় না। অকস্মাৎ বোঝা যায় অনেক রাত হয়ে গেল অথবা হঠাৎ খেয়াল হয় এত সময় কেটে গেল। যখন আরও লোকজন আশেপাশে থাকে তখন সে গল্প করে একা পেলেই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে গায়ের ওপর। তছনছ ক'রে ফেলে সমস্ত শরীরটাকে, সন্দেশ তৈরীর ছানার মত ক'রে ছানতে থাকে। কষ্ট হয় আবার সুখও কম হয় না। সুখের আবেশে কষ্টটা ভুল হয়ে যায়, সুখের স্মৃতিতে পরে আবার খুঁজে পেতে ইচ্ছে হয় সৌগতকে।

কলেজে বসে সৌগতকে ইচ্ছা ক'রছিল রুমি। সেই ইচ্ছা রূপায়িত করবার জন্যেই তাকে টেলিফোন করা। কিন্তু টেলিফোন না পেয়ে যা মুস্কিল হ'ল তা আর বলবার নয়। এখন কোথায় যাওয়া যায় কি করা যায় এই হ'ল সমস্যা। কলেজে ফিরে যাওয়া — তাও তো অসম্ভব। একা একা কোন সিনেমা হলে ঢুকে যাবে টিকিট কেটে, যা কোনদিন করে নি ? অথবা নেহাৎ ভবঘুরের মত রাস্তায় রাস্তায় ফ্যালফ্যাল ক'রে ঘুরে বেড়ানো — একথা

ভাবতেই পারল না। নাঃ, কলেজ থেকে বেরোনটাই ভুল হয়েছে। আর যদি বেরোতেই হ'ত তাহলে।গোপা কিংবা মঞ্জু কাউকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে হ'ত। কিন্তু তার যথেষ্টই অসুবিধে ছিল কারণ সৌগতকে পাওয়া গেলে তখন কি করে বিদায় ক'রত বন্ধুদের? অনেক ভেবেচিন্তেই একা টুক ক'রে সরে পড়া। তবে লাভের জায়গায় এখন লোকসানই দেখা যাচ্ছে। ডাকঘরের সামনেটাতেই বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রুমি, ভাবল। নাঃ কিছুই করবার নেই। এ সময় বাড়ী ফিরে গিয়ে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকা — তার চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক আর কিছুই নেই। অতএব এখন — কোথায় যে গেল সৌগত কে জানে! এমন বন্ধুও তো তার নেই যে তার বাড়ী যাবে — তবে? অফিসেরই কোন কাজে যদি বেরিয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই নিজের ঘরে ফিরবে সন্ধ্যার আগেই। আবার যদি নিজের ঘরে না গিয়ে তাদের বাড়ীতেই যায়? তাও যেতে পারে। তবু একবার দেখা-ই যাক সৌগতর একঘরের ফ্ল্যাটটায় গিয়ে। এমনও তো অনেক সময় হয়েছে যে অসময়েই তাকে পাওয়া গেছে ঘরের মধ্যে। যা খামখেয়ালী মানুষ হয়ত ফিরেই গেল নিজের ঘরে — তাই বরং যাওয়া যাক। যাবার সম্ভাবনা যে নেই তা জানা সত্ত্বেও যাওয়া। আশা যত ক্ষীণ তাতে তাকে আশা বলে না তবু এখন সেইটুকুকে সর্বস্ব করা ছাড়া আর উপায় কি?

ষোলকলা পূর্ণ হ'ল যখন রুমি দেখল লিফট বন্ধ। সাততলা বাড়ীর পাঁচতলায় ফ্ল্যাট নিয়েছে সৌগত। এতবড় কলকাতায় এত হাজার বাড়ী থাকতে আর ঘর পেল না পেল এই স্বর্গে! আজ যেন মনে হ'ল আগের দিন ভাল লাগা ফ্ল্যাটটা বড়ই অস্বস্তিকর, লিফট না চললে কি চলে? এই উঁচুতে কিভাবে ওঠা যায় এখন? পাঁচতলা পর্যন্ত উঠতে তো দম বেরিয়ে যাবে তারপর যদি উঠে দেখা যায় ফ্ল্যাট বন্ধ তবে তো আর কথাই নেই। রুমি ভাবল ফিরে যায়, আবার ভাবল এতদূর এসে ফিরে যাবার কোন অর্থই হয় না। এ জানলে এতদূর সে আসতই না। এসে যখন পড়েছে যতকষ্টই হোক একবার ওপরে উঠে দেখবে। তার আগে দেখতে চেষ্টা ক'রল দরজার ভেতরটায় যে নামের ফলক আছে সেখানে নিজের নামটা সৌগত টাঙ্গিয়েছে কিনা। টাঙ্গিয়ে থাকলে সে আছে কি নেই জানা যাবে। রুমি চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল — যতগুলো ফ্ল্যাট ততগুলো নামের ব্যবস্থা করা আছে। কতকগুলোতে কারও নাম নেই — ফ্ল্যাটগুলোও বোধহয় খালি। দুতলা, তিনতলা, চারতলা সব আলাদা সারি, বেশ ভালই ব্যবস্থা, পাঁচতলার সারিতে চোখ বোলাতে লাগল রুমি, — মালহোত্রা, অরোরা, যোশী, মহান্তি, পি, বচন সিং, যোগীন্দর অমরনাথ, খালি, খালি, একে একে সব নামগুলো পড়া হয়ে গেল — নেই, সৌগতর নাম কোনখানে নেই। নাম টাঙ্গায় নি সৌগত। ওই ওর আলসেমি। অবশ্য রুমি যতদূর জানে সৌগতর ছাপা কার্ড বা প্যাড কিছুই নেই, অনেকেই ক'রেছে কি প্যাড থেকে নামটা ছিঁড়ে বা একটা ভিজিটিং

কার্ড গুঁজে দিয়েছে। দু একজন এমনও আছে যারা টাইপ করা কাগজে নাম লিখে টাঙ্গিয়ে দিয়ে কাজ চালাচ্ছে! সে সব কিছুই করে নি সৌগত। কে আর তার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসছে — রুমি ভাবল, তাই বোধহয় করেনি কিছু, অথবা হয়ত তার এখানের ঠিকানা কাউকে দিতে চায় না। কিন্তু তার ফ্ল্যাট নম্বর 'সাঁইত্রিশ-বি'র বোর্ডটা ফাঁকা তার ইন-আউটের নির্দেশ অন্ধ চোখের মত অর্থহীন। রুমি নজর ক'রল সেখানটা 'ইন' হয়ে আছে — নামটা যেখানে নেই সেখানে 'ইন' বা 'আউট' সমান অনর্থক। এখন এই কোমরভাঙ্গা সিঁড়ি গোণা শেষ ক'রে কি লাভ হবে যদি সৌগত না-ই থাকে? থাক না থাক বাড়ীতে পৌঁছে ঘরটা না দেখে ফিরে যাবার কোন অর্থই হয় না।

তিনতলা পর্যন্ত উঠেই বসে পড়বার অবস্থা হয়ে গিয়েছিল রুমির। পাদুটো ধরে গিয়েছিল, তিনতলার চাতালটায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চারতলার দিকে উঠতে প্রতি পদক্ষেপেই মনে হচ্ছিল তার পা দুটো থেকে কিছুটা অংশ যেন বাদ পড়ে যাচ্ছে। পাঁচতলায় উঠতে দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম। অতি কষ্টে শ্বাস নিয়ে কোমর পর্যন্ত যন্ত্রণায় টনটন ক'রছে এমন অবস্থায় মনে হতে লাগল থাক আর সে উঠবে না, দরকার নেই ওপরে উঠে। তবু যখন মনে হ'ল আর তো মাত্র কটা সিঁড়ি তখন নেমে যাবার ইচ্ছে দমন ক'রেই সে সবটুকু সিঁড়ি উঠে এসে সিঁড়ির ওপরেই দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল। তার অনুভূত হচ্ছিল তার দুই পায়ের দুই উরুতে যা মাংস ছিল তা ছিঁড়ে রাস্তাতেই পড়ে গেছে। তার নিতম্বের ঠিক ওপরটায় কোমরের গ্রন্থি পর্যন্ত অংশে বিরাট এক কামড় বসিয়েছে একটি বাঘ বা আরও ভয়ঙ্কর কোন জন্তু! বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের নিদারুণ কষ্ট, যেন কালান্তকের পদধ্বনির শব্দ। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে হ'লেও দাঁড়িয়ে থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল রুমির, ইচ্ছে ক'রছিল কোনভাবে সৌগতর ঘরের দরজাটার সামনে পৌঁছোতে। হয়ত দেখবে বন্ধ দরজা, তার ওপারে শূন্যতার নৈঃশব্দ। কিন্তু এখন সমস্ত ছাপিয়ে উঠেছিল শরীরের ব্যাথা। রুমির শরীর চাইছিল সিঁড়ির ওপরকার এই চওড়া জায়গাটার ওপরেই শুয়ে পড়ে। এখন বেশ কিছুক্ষণ এইখানে এইভাবে শুয়ে থেকে শরীরে শক্তি এলে আবার উঠবে — যাবে। নিদেনপক্ষে বসে পড়তে চাইল তার শরীর — কোনটাই পারল না সে। কেবলমাত্র দেয়ালে ভর দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ধীরে ধীরে পা চালাল বারান্দার দিকে।

বাড়ীর অন্য সব ফ্ল্যাটগুলোর মতই দরজা বন্ধ 'সাঁইত্রিশের-বি'-রও। এ তো সে জেনেই এসেছিল, শারীরিক কষ্ট ছাড়া নৈরাশ্যের বিশেষ কিছু নেই। তবু দুবার টোকা দিল সে অকারণেই। প্রথম যেদিন এঘরে আসে রুমি এমনি সময়েই এসেছিল, সেদিন ছিল মঙ্গলবার, কাজের দিন, তবু সৌগত বলেছিল, তিনটের পর এসো আমি থাকব। আরও অনেকদিন এইরকম সময় ফোন ক'রেছিল রুমি একদিন পেয়েও গিয়েছিল। সেদিন টেলিফোনে সৌগত অবশ্য

আসতে নিষেধ করে ব'লেছিল, আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি, বিশেষ একটা কাজ আছে। আজও ফোন করার কথা মাথায় এসেছিল কিন্তু যেহেতু অন্য কোন কাজ নেই তাই এই আসা — ফিরে যাওয়াটাও সময় কাটানোতে সহায়ক হবে ভেবেই ফোন না ক'রে চলে আসা। ফিরে যেতে হবে ভেবেই এসেছে বলে ফিরতে কোন দুঃখ হবে না রুমির। কিন্তু হঠাৎ দরজাটা খুলে যেতেই সে যেন চমকে উঠল। চমকে উঠল ভেতর থেকে সৌগতও, প্রশ্ন ক'রল, তুমি হঠাৎ এ সময় ?

তোমার কাছে আসব তার জন্যে আবার সময় নির্দিষ্ট ক'রে আসতে হবে ?

ভেতরে এস — বলল সৌগত, কিন্তু রুমির কাণ এবং মন যদি সজাগ থাকত তবে সে বুঝত খুব আন্তরিকতার সঙ্গে সৌগত আহ্বান ক'রছে না। তা সে বুঝল না বলেই খুব উৎফুল্ল হয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সৌগত বলল, হঠাৎ কি মনে ক'রে ?

হাতের খাতা আর ব্যাগটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বিছানার ওপর সটান শুয়ে পড়ল রুমি। বলল, আগে আমাকে দম নিতে দাও তারপর কথা বলব। লিফট বন্ধ থাকাটা যে কি অন্যায় —

পাঁচতলা পর্যন্ত হেঁটে তুমি উঠলে কি ক'রে ?

কি ক'রে যে উঠলাম এখন নিজেই তা ভেবে পাচ্ছি না। দেখ না সমস্ত ব্যাথায় টনটন ক'রছে — বলে দুহাতে মালিশের ভঙ্গীতে নিজের কোমর দেখাল রুমি।

সৌগত সে কথার জবাব না দিয়ে টেলিফোন ক'রতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাকে বলছে রুমি বুঝল না শুধু শুনল সৌগত বলছে, হঠাৎ জরুরী দরকার পড়েছে বেরিয়ে যাচ্ছি, এক্ষুণি। না না এখনই যেতে হচ্ছে, জরুরী, এইমাত্র টেলিফোন এল। হ্যাঁ। সন্ধ্যের সময় ফোন ক'রে সব বলব, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। প্লীজ কিছু মনে ক'রো না।

রুমি বুঝতে পারল না কাকে টেলিফোন ক'রল সৌগত। হবে কাউকে, মাথা ঘামাল না রুমি। শুধু জিজ্ঞেস ক'রল, কি তুমি আবার বেরিয়ে যাবে নাকি ?

রিসিভার নামিয়ে ঘরের আলোটা নিভিয়ে এসে বসল সৌগত। দিনের বেলা আলো না জ্বাললেও চলে তবু আলো অকারণেই জ্বেলেছিল। বসেই একটা সিগারেট ধরাল নিজেকে সপ্রতিভ ক'রে তোলার জন্যে, তারপর বলল, এই দুপুরে হঠাৎ কি মনে ক'রে ? কলেজ যাও নি ?

তুমি অফিস যাও নি ?

গিয়েছিলাম, বাইরে একটা কাজ ছিল, বেরিয়েও যেতে ভাল লাগল না তাই চলে এলাম।

আনন্দে হঠাৎ পাশ ফিরল, রুমি বলল, তুমি যা মনে ক'রে অফিস পালালে আমি তাই মনে ক'রে কলেজ পালালাম — ভাল লাগছিল না।

তুমি কি ক'রে ভাবলে যে আমি এখন ঘরে থাকব ?

ওই তো মশাই একেই বলে টেলিপ্যাথি।

মোটেই একে টেলিপাথি বলে না।

তবে কে আমাকে বলে দিল বল ?

আন্দাজে তো কেউ এভাবে অফিসের সময় বাড়ীতে আসে না খুঁজতে ?

তবেই বোঝ।

বুঝতে পারছি না বলেই তো জানতে চাইছি।

একে বলে ভালবাসা, বুঝলে ?

তাই দেখছি। আমার আজ কিছুতেই কোনকাজে মন বসছিল না। কিছু কাজকর্ম দেখতে যাবার ছিল ঠাকুরপুকুরে, গাড়ীতে না গিয়ে ট্যাক্সিতে যাব ভাবলাম তো একজন কণ্ট্রাক্টর বলল তার গাড়ীতে যেতে। তা না গিয়ে তার সঙ্গে একটা ব্যবস্থা ক'রে চলে এলাম, বলে এলাম কাল সকালে রোদ এত চড়বার আগে গিয়ে দেখে আসব। বাবাঃ যা রোদ রাস্তায় পা দেওয়াই যায় না।

তাহ'লে বোঝ কি কষ্ট ক'রে আমি এসেছি —

তা আর অস্বীকার করি কি ক'রে ?

কি পরিমাণ ঘেমেছি দ্যাখ — বলে রুমি নিজের পিঠটা দেখাল। জামাটা ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। সৌগত জামার একটা বোতাম চোখের নিমেষে খুলে দিয়ে বলল, আমি দেখ কেমন খালি গায়ে বসে আছি তুমিও জামাটা খুলে ফেল, আরাম কর।

তোমরা কেমন খালি গায়ে থাকতে পার আমরা কি পারি তা ?

ঘরের মধ্যে দোষ কি ?

দোষ কিছু না, অভ্যেস নেই বলেই খারাপ লাগে।

অভ্যেস ক'রে নাও এই ভ্যাপসা গরম থেকে বাঁচবে। বলে নিজেই উদ্যোগী হয়ে খুলে দিল বাকী বোতামগুলো। পিঠটা আলগা হয়ে গেল। রুমি বলল, নিচের জামাটা খুলো -না, দোহাই তোমার। — বলেই উঠে পড়ল সে, ব্লাউজটা খুলে রেখে আরাম ক'রে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

ছিপছিপে শরীর রুমির। বেতের মত। অপ্রয়োজনীয় মাংস কোথাও নেই। বুকেও পরিমিত। জলির তুলনায় অনেক কম। কিন্তু জলির চেয়ে অনেক তাজা। জলির শরীর ভোগ ক'রতে পারা যায় সহজেই কিন্তু কেমন যেন বাসি হয়ে গেছে মনে হয়। এই ফ্ল্যাটে এই বিছানাতেই ঠিক এইভাবেই কতদিন এলিয়ে থেকেছে জলি, আজও থাকত এই অসময়ে রুমি না এসে পড়লে। বড়ই বিরক্তির কারণ হচ্ছিল রুমি হঠাৎ এসে রসভঙ্গ করার জন্যে কিন্তু এখন এমন সহজভাবে আত্মসমর্পণ করাতে সে বিরক্তি অনেকটা যেন কেটে যাচ্ছে। বরং নতুনের স্বাদ আকর্ষণ ক'রছে তাকে। রুমির একটা বিশেষ গুণ অহেতুক লজ্জা তার মধ্যে নেই। একবার একটা আনকোরা মেয়ে এসে

জুটেছিল। সারাক্ষণ গল্পগুজব ক'রল, রেস্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়া ক'রল বেশ সহজভাবেই, তারপর হোটেলের ঘরে ঢুকেই বাধাল মুস্কিল, কিছুতেই সহজ করা গেল না তাকে। বহুক্ষণ চেষ্টা ক'রে তার কাছ থেকে যা আদায় করা গেল সেটুকু অনেক সহজেই পাওয়া যায় রুমির কাছে। ওটুকুর জন্যে এত হাঙ্গামা করার কোন দরকারই ছিল না। তারপর থেকে সাবধান হয়েছে সৌগত নতুন স্বাদের লোভ করে না আর, বিশেষভাবে জানা সেই জলি, মিসেস রায় অথবা মিস বক্সীর যোগাড় করা মেয়েদের ওপরই নির্ভর করে থাকে। তবে এদের মধ্যে মিসেস রায় যতই ভালবাসার অভিনয় করুক যতই বলুক সৌগতকে যতটা দেয় তত সে কাউকেই দেয়নি, তার সমস্ত কিছুই যেন অত্যধিক পেশাদারী বলে মনে হয়। সেদিক দিয়ে বেশী ভাল লাগে জলিকে। জলি মুখে কোন অভিনয় করে না, কার্যক্ষেত্রে তার অভিনয় নিখুঁত। তাই বাসি শরীর নিয়েও আকর্ষণ করে জলি। সামান্য একটু - . হয়ে পড়েছিল সৌগত এইসব ভাবনার মধ্যে পড়ে। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ফেলল রুমির মুখোমুখি। রুমি আদৌ অস্বস্তি অনুভব না ক'রে বলল, সত্যি তোমরা যেসব সিগারেট খাও তার গন্ধ কি সুন্দর!

খাবে নাকি একটা? সৌগত জানতে চাইল।

না। খেতে ভাল লাগে না, ধোঁয়ার গন্ধটা ভাল লাগে, এমনিতে প্যাকেটে থাকলেও ভাল লাগে তার গন্ধ।

খেতে ভাল লাগে না কি ক'রে জানলে? খেয়ে দেখেছ কোন দিন?

স্কুলে পড়তে একবার খেয়েছিলাম মেয়েরা মিলে।

স্কুলে? কোন ক্লাসে পড়তে তখন?

ফাইনাল পরীক্ষার আগে।

সব মেয়ে মিলে খেয়েছিলে?

আমাদের সঙ্গে একটা মেয়ে পড়ত সংঘমিত্রা বোস। সে মাঝে মাঝে খেত। তারই পাল্লায় পড়ে খেয়েছিলাম আমরা পাঁচ ছ'জন।

সৌগত ঠাট্টা ক'রে বলল, সে তো অনেকদিন আগেকার কথা, তখন একরকম লেগেছিল এখন তো ভাল লাগতেও পারে?

না না ভাল লাগে না।

অর্থাৎ পরেও খেয়ে দেখেছে, সৌগত বুঝল। বলল, বেশ তবে কি খাবে বল? বিয়ার খাও। যদিও আমার ফ্রিজ নেই তবু তোমাকে ঠাণ্ডাবীয়ার খাওয়াতে পারব।

কি ক'রে খাওয়াবে?

আছে সে ব্যবস্থা। শুধু বলেই দ্যাখ না। আর যদি একটু উঠতে চাও —ব্ল্যাকডগ হুইস্কি ঘরেই আছে।

না বাবা হুইস্কি খাব না, বাড়ী ফিরতে হবে তো?

অল্প একটু খেলে কিছু হবে না একটু মৌজ ছাড়া। তাছাড়া তোমাদের তো আর বিধবার বাড়ী নয়—

তা অবশ্য নয় কিন্তু কি জান আমি বাপিকে যা বুঝেছি তাতে বাপি মেয়েদের ড্রিংক করাটা ঠিক পছন্দ করে না। অবশ্য কখনও মুখে কিছু না বললেও এটা বোঝা যায়।

যা-ই বল তোমার মা কিন্তু অনেক বেশী 'মর্ডানাইজড'— আধুনিক শব্দটার বদলে ইংরাজী ব্যবহার ক'রে সৌগত ভাবল নিজের বক্তব্যকে সে আর একটু বেশী জোরদার [illegible] পারল। রুমি অবশ্য নিজের কথার মধ্যে ছোট ইংরিজী শব্দ ব্যব[illegible] এমন ভাবেই অভ্যাস ক'রে ফেলেছে যে সেটা তার স্বাভাবিক ক[illegible] হয়। মা-র কথা উঠতে রুমি বলল, মা-ও ঠিক একই কারণে [illegible] করে।

আমাদের [illegible] কিছুতেই অভ্যস্ত, কারও কোন অভ্যাস অপছন্দও করে না কিন্তু [illegible] এমনই রক্ষণশীল যে ও বাড়ীতে থাকতে হ'লে হাঁপিয়ে উঠি। [illegible]র হয়েছে কিছুটা মা-র মত, আমার ভাই বলে বোঝাই যায় [illegible]

[illegible] এমনভাবে বলল কথাটা, যেন সে রীতিমত বিস্মিত হচ্ছে।

[illegible]বার সে বাবার উপযুক্ত ছেলে। আমি যখন মাল টেনে [illegible] নন্দনকাননে পৌঁছে গেছি, সে ছোকরা তখন হয়ত বাবার [illegible] দাঁড়িয়ে আছে হুকুম তামিল করার জন্যে।

তোমার ভাই তো তোমার বাবার ইণ্ডাস্ট্রি দেখাশোনা করে—

দেখাশোনা বাবা-ই করে, সে কাজে বাবা কাউকে বিশ্বাস ক'রবে না।

বিশ্বাস ক'রবে না কেন?

বাবার ধারণা সবাই ডুবিয়ে দেবে।

[illegible] না বাবা— স্বগতোক্তির মত স্বরে উচ্চারণ ক'রে রুমি পাশ ফিরে [illegible]। সৌগতর চোখের সামনে তার সুন্দর পিঠ, তাতে বিশ্রী ভাবে এঁটে আছে [illegible]সের ফিতেটা। দেখতে বড়ই বিসদৃশ। সৌগতর মনে হ'ল সৌন্দর্যের [illegible] অন্তত তার বক্ষবন্ধনীর হুকটা খুলে দেওয়া উচিত, যাতে অমন সুন্দর দেহটি অকারণ পোষাকের কলঙ্ক থেকে মুক্তি পায়। ভারী সুন্দর দেহ রুমির, কোনদিন এত ভাল ক'রে দেখা হয়ে ওঠেনি। যা এর আগে দেখতে পেয়েছে দেহের সে বড় কাংখিত অংশ হলেও তার শোভা থেকে এ স্বতন্ত্র। আজ সে অনুভব ক'রল দেহের প্রত্যেকটি অংশেরই আলাদা আকর্ষণ আছে। কিন্তু রুমির কাছে হঠাৎ ছোট হয়ে পড়তেও বাধছে তার, তাই নিজের ইচ্ছা গোপন রেখেই সে সিগারেট-এ মনঃসংযোগ ক'রল। রুমির ইচ্ছেটা বুঝতে পারছে না সে, হঠাৎ কেনই বা এল আর এক কথায় জামাটা খুলেই বা ফেলল কেন? তবে কি রুমিও তার কাছে এমন আকর্ষণে এসেছে যা সে বলতে পারছে না? দেখা-ই যাক,

অপেক্ষা করবে সৌগত, ততক্ষণ বসে থাকবে যতক্ষণ না স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত আসে রুমির কাছ থেকে। বরং একটু উত্তেজিত ক'রে তোলা যাক ওকে — মতলব ক'রে সে বলল, তুমি কি আমার দিকে পেছন ক'রে শুয়ে থাকবে বলে এখানে এলে ?

রুমি চুপচাপ পড়েছিল, কিন্তু ঠিক এ ধরণের কথার জন্যে প্রস্তুত ছিল না সে, বরং যে জন্যে প্রতীক্ষা ক'রছিল সে ঘটনা না ঘটায় সে বুঝেছিল কোথায় যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে সৌগতর মধ্যে। ওই দস্যুর মত সৌগত কেমন যেন তপস্বীর নির্লিপ্ততায় সরে আছে দূরে ; রুমি বুঝতে পারছে যে সে সিগারেট খাচ্ছে। একথাও অনুমান ক'রছে, নিশ্চয়ই সৌগত চেয়ে আছে তারই দিকে। কিন্তু কেন এই চেয়ে চেয়ে বসে থাকা ? হয়ত আঙুলের ফাঁকের মধ্যে ধরে রাখা সিগারেটটা যে-ই মুহূর্তে শেষ হবে অমনি সেই আঙুল বাঘের থাবা হয়ে লাফিয়ে পড়বে। সেই মুহূর্তটির জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে রুমি ; সে জানে এখন যতই সাধুর ভণ্ডামীতে নিজের দর বাড়াক সৌগত, বাঘ তাকে হতেই হবে।

বিলিতি আদবকায়দা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই স্বগতর মা-র। ছেলে বাড়ীতে থাকবে না, আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে থাকবে এ তাঁর কাছে অচিন্তনীয়। কিন্তু তাঁর কিছুই করণীয় রইল না যখন সৌগত সত্যিই এল না, ঠিক এল না তা নয় যেদিন খুশী আসে তবে আসে না বেশীরভাগ রাত্রেই। কোথায় থাকে কি করে কিছু বলে না। শুধু একদিন তাঁর অসাক্ষাতে নিজের আলমারী খুলে কিছু জামাপ্যান্ট নিয়ে যে সে চলে গেছে সেটাও তিনি জানতে পেরেছেন পরে, ঝি চাকরের মুখে। এ নিয়ে অনেক অভিযোগ অনুযোগ ক'রেছেন স্বামীকে বলেছেন, কি আশ্চর্য মানুষ গো তুমি, বাধা দেবে না ছেলেকে ? ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে আনবে না ?

শুভেন্দু তাতে বলেছে, ছেলে স্বাধীন জীবন চাইলে বাপ মা তাতে বাধা দিতে পারে এমন কোন আইন এ দেশে নেই।

ওসব আইন ফাইন আমি বুঝি না বাপু এ কি অনাসৃষ্টি ?

অনাসৃষ্টি কি হ'ল আমিও তো বুঝছি না তা —

বিয়ে থা হলে অনেক সময় ছেলেরা বউ-এর কুমন্ত্রণায় আলাদা হয়ে যা কিন্তু এ কি রকম ? আর তুমিও তাতে সায় দিচ্ছ।

এবার একটু বিরক্ত হ'ল শুভেন্দু, ভাল কথা তুমি বলছ। আমি আর সায় দিলাম কিসে ? বিলেত আমেরিকায় এটাই রেওয়াজ। ছেলে বড় হলে তার নিজের স্বাধীন আস্তানা খুঁজে নেয়। নিজের আলাদা জীবন তার গ'ড়ে ওঠে সেটাকে নিয়ে সে সেখানেই থাকতে চায়।

তা এটা তো বিলেত নয়—

কিন্তু এখানেও যে সেই জীবন আস্তে আস্তে চলে আসছে তুমি কি ক'রবে?

সে কি খালি আমাদের বেলাতেই আসছে? পাশের বাড়ীর গোয়েঙ্কাদের সব কজন ছেলে তো যে যার নিজের নিজের গাড়ীতে বউ নিয়ে সায়েবদের মতই বাইরে যাচ্ছে আবার রাত্রির হলেই ঘরে চলে আসছে। তুমিই তো বল ওদের অনেক ব্যবসা এখানে, কানপুরে, বোম্বাইতে। ওদের তো চলন বলন সব খাঁটি সায়েবদের মত, কই ওরা তো খোকনের মত ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে থাকছে না?

গোয়েঙ্কাদের ছেলেরা সবাই বছরে এক দুবার বিলেত আমেরিকা যায় আসে বটে বিলিতি জীবনধারা ওরা নিতে চায় না। মাড়োয়ারীরা বাইরে যত যা-ই করুক মনের গোপনে খুবই রক্ষণশীল। নিজেদের আচার আচরণ ওদের কখনই বদলায় না। তা তোমার ছেলে যদি বিলিতি জীবনযাত্রা পছন্দ করে আমি কি ক'রতে পারি?

শুভেন্দু যে কিছু ক'রতে পারে না একথা বুঝেও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি সৌগতর জননী। কাজেই একই প্রসঙ্গ বারংবার উত্থাপন ক'রেছেন তিনি। নিষ্ফলই ক'রেছেন। মায়ের মন মানে না বলেই ক'রেছেন। আজ সকালেই তাঁর মনে হ'ল গতকাল স্বগতকে দিয়ে সৌগতর অফিসে ফোন করিয়েও সৌগতকে পান নি অথচ আজ তার জন্ম দিন। জন্মদিনেও ছেলেকে বাড়ীতে পাওয়া যাবে না, সে আসবে না এ কেমন ব্যাপার! তাঁর বিশ্বাস খবর পেলে নিশ্চয়ই সে আসত। সুনুটা এমনই বোকা যে অফিসে খবরটা বলে পর্যন্ত রাখে নি যে অফিসে গেলেই যেন তাকে বাড়ীতে আসবার জন্যে খবর দেওয়া হয়। সুনুকে বলতে সে বলে দাদা বাড়ীতে থাকেনা একথা অফিসে বলতে তার লজ্জা করে! এ আবার কেমন লজ্জা? দাদা থাকে না তো তুই কি ক'রবি? তাছাড়া সে এমনই এক ছেলে যে কোথায় ঘর নিয়েছে তা পর্যন্ত কাউকে জানায় নি। কাল যদি অফিস না-ই গিয়ে থাকে আজও যদি না যায় তবে কি ক'রে তাকে খবর দেওয়া যাবে? এমন পাগল ছেলে যে জন্মদিনের কথাটা পর্যন্ত ভুলে বসে আছে! অফিসে আজ একবার টেলিফোন ক'রে দেখলে হ'ত আজ নিশ্চয়ই অফিসে এসেছে, বললে সন্ধ্যেবেলা বাড়ী চলে আসত। কিন্তু ফোনটা করানো যায় কাকে দিয়ে? সুনুতো সাফ বলে দিয়েছে দাদার অফিসে ফোন সে ক'রবে না। অফিসের ফোন নম্বর নিজেরও তো জানা নেই। অনেক ভেবে চিন্তে অফিসে শুভেন্দুকে ফোন করাই সাব্যস্ত ক'রলেন সৌগত-জননী।

টেলিফোনটা বেজে উঠতেই শুভেন্দু বুঝলে খুব জরুরী। কারণ বাদল সরকারের সঙ্গে কথা বলতে বসে অপারেটারকে বলে দেওয়াছিল খুব জরুরী কোন ফোন না এলে অন্য কাউকে লাইন দিতে। কিন্তু ফোন তুলে স্ত্রীর কথাগুলো শুনে মেজাজ বিগড়ে গেল শুভেন্দুর। সৌগতর অফিসে একটা ফোন ক'রে তার জন্মদিনটা মনে করিয়ে রাতে বাড়ী আসতে বলার জন্যে

নির্দেশ। রাবিশ। মনের বিরক্তি প্রকাশ না ক'রে, আচ্ছা দেখছি বলেই রিসিভার নামিয়ে রেখে সামনে টেবিলের অপর প্রান্তে বসা বাদলকে পুরানো কথার জের টেনে বলল, আপনার একটা কথা আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই বাদলবাবু যে বেতন বাড়িয়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বেতন বাড়িয়ে দিলে আপনি বাহবা পাবেন, কারখানার কর্মচারীরা ঘন্টা তিনেক ধরে হল্লা ক'রে আপনার জয়ধ্বনি দিয়ে কাজ কামাই ক'রবে। আমার যে ক্ষতি এখন হচ্ছে তখনও হতে থাকবে।

কেন? এখন অসন্তুষ্ট শ্রমিক দিয়ে পুরো কাজ পাচ্ছেন না, বেতন বাড়লে পাবেন। যুক্তি প্রয়োগ ক'রল বাদল সরকার।

শুভেন্দু নিজের হেলান চেয়ারসুদ্ধ সোজা হয়ে বসল, বলল, জাস্ট সো। এই কথাটাই আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইছিলাম বাদলবাবু। আপনি তো ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, বলতে কি ওদের দেবতা, অপদেবতাও বলতে পারেন, ঠাট্টা ক'রে কথাটা বলল শুভেন্দু, তারপরই বলল, আপনি তাহ'লে দায়িত্ব নিন, মিনিমাম প্রোডাকসনের গ্যারান্টি দিন। রাজী আছেন?

এটা আপনি কি বলছেন, কারখানা আপনার তার প্রোডাকসন দেখবার জন্যে প্রোডাকসন ম্যানেজার আছে, সুপারভাইজারেরা রয়েছে আমি কেন প্রোডাকসনের দায়িত্ব নেব? আমাদের তো সেটা দেখবার কথা নয়। আমরা দেখব লেবারদের সুখ সুবিধে।

সেজন্যেও তো ওয়েলফেয়ার অফিসার রয়েছে, সরকারের আলাদা দপ্তর রয়েছে, সেখানেই বা আপনার কি প্রয়োজন?

আপনারা সবসময়েই শ্রমিকদের বঞ্চিত করেন।

হ্যাঁ সেকথা অবশ্যই আপনাদের মার্কস সাহেব বলে গেছেন। কিন্তু তিনি কি একথা বলে গেছেন যে এইভাবে মাইনে বাড়ানোর আন্দোলন ক'রে গেলেই শ্রমিকদের চূড়ান্ত মঙ্গল করা হয়? আপনার দল তো এখন মার্কসবাদের পুরোধা কিন্তু আমাকে জবাব দিন এভাবে কোন সমস্যা মেটাবেন আপনারা? ধরুন এই বেতন বাড়ানোর আন্দোলন ক'রে ক'রে এমন একটা পর্যায়ে আমাদের নিয়ে এলেন যেখানে দাঁড়িয়ে পিছুহটার আর জায়গা নেই। অপারগ হয়ে শিল্প মালিকরা বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হ'ল তাদের কলকারখানা, তখন কি সেই সব কলকারখানা নিজেদের দায়িত্বে চালু রাখার নেতৃত্ব দিতে পারবেন আপনারা? যদি এই কংগ্রেসী পথেই সমাজতন্ত্রের কথা আপনারা ভেবে থাকেন মার্কস সাহেবের নামটা গায়ে জড়িয়ে তবে বলব আপনাদের সে ক্ষমতা নেই! থাকলে আপনারা এখনই সরকারী উদ্যোগগুলোকে লাভবান ক'রে তুলতে পারতেন।

যদিও এসব রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এভাবে আলোচনা করা অনুচিত তবু নেহাৎ আপনি বলেই বলছি, বড় বড় আমলাদের চুরির জন্যে সরকারী সংস্থাগুলোয় লোকসান যাচ্ছে। সরকারের ভুল পলিসির জন্যেও প্রকল্পগুলো সাকসেসফুল হচ্ছে না।

আপনারা তো নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করবার কথা ভাবেন অতএব একটা বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে এই সমস্যার মোকাবিলা করবার চেষ্টা আপনারা করেন না কেন? দেশে প্রকৃত পরিবর্তন আনতে হলে সর্বতোমুখী চিন্তাধারা প্রয়োজন। যাক গে কি কথা থেকে কি কথায় এসে পড়লাম। আপনাদের ভাবনা আপনারা ভাবুন এখন বলুন কিভাবে মুস্কিল আসান করা যায়।

আমাদের প্রস্তাব তো আমরা দিয়েছি। আপনি বলুন কবে আলোচনা ক'রবেন আমি সকলকে সঙ্গে নিয়ে আসব।

দেখুন মিষ্টার সরকার, আমি চাই আপনার নেতৃত্বও ঠিক থাক, আমার কাজও চলুক। এমন একটা রাস্তা বের করার দরকার। আমার বেলেঘাটার কারখানায়, আপনি খবর রাখেন কিনা জানি না, দু চারটে অল্প বয়সী ছোকরা আপনাদের ইউনিয়ন খুব একটা মানছে বলে মনে হয় না। আবার কংগ্রেসী মনোভাবাপন্নও তারা নয়।

ওরকম দুচারটে থাকে। ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই।

না মিস্টার সরকার। আপনি বোধহয় খবর রাখেন না একটি ছেলে আপনারই ইউনিয়নের খুব ভাল কর্মী ছিল যাকে একসময় আমরা ছাঁটাই করবার কথা ভেবেছিলাম, প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় আপনাদের অনুরোধে ছাঁটাই করিনি, সে-ই বোধহয় ব্যাপারটার নেতা —

ওসব কিছু নয় —

আপনি বোধহয় ভুল ক'রছেন মিস্টার সরকার, যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে তা আপনাদের অস্তিত্ব যতই পাথরের মত হোক, ফাটিয়ে ফেলবে।

বাদল সরকার ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চাইছিল নিজেদের গুরুত্ব বজায় রাখতে। কিন্তু শুভেন্দু বারবার কথাটার ওপরে জোর দেওয়াতে সে নিজের পদ্ধতি থেকে খানিকটা সরে গিয়ে বলল, ব্যাপারটা যে আমরা একদম না জানি তা নয়। ওখানে আমরা পরবর্তী ঘটনার জন্যে অপেক্ষা ক'রছি।

তবে ব্যাপারটা শুনুন, শুভেন্দু টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে গোপন কথা হিসেবে বলল, ওকে য়্যারেস্ট আমি যে কোনদিন করিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আইন যা তাতে ছাড়া পেয়ে যাবে। একমাত্র নকশালপন্থী হিসেবে প্রমাণ ক'রতে পারলে ওকে বেশ কিছুদিন দমদম বা আলিপুর জেলে রাখা যাবে। সেই প্রমাণ করানোর দায়িত্বটা আপনি নিতে পারেন কি না?

বাদল সরকার চুপ ক'রে রইল। সমূহ বিপদে দুই শত্রুও অনেক সময় একসঙ্গে চলে, সত্যিই বেলেঘাটার কারখানার অবস্থা খারাপ। ওখানকার কমরেডরা সাবধান ক'রে দিয়েছে প্রেসিডেন্ট যেন এখন কারখানায় না আসেন। এরকম চলতে থাকলে আস্তে আস্তে ওখান থেকে পার্টির ইনফ্লুয়েন্সই হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই প্রতিবিধান করবার যতগুলো পদ্ধতি মনে এসেছিল কোনটাই কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। বেলেঘাটা থানায় যেসব নিজেদের লোক আছে

তারা সিগনাল দিয়েই রেখেছে চান্স পেলেই ওসব এলিমেন্ট সাফ ক'রে দেওয়া হবে। কিন্তু তারা কবে সুযোগ পাবে তার ঠিক কি? তারা অপারেশান অর্ডার না পেলে তো আর কিছু ক'রতে পারবে না। শুভেন্দু দত্তর কথায় হঠাৎ যেন আলো জ্বলে উঠল। কোন রকমে গ্রেপ্তারটা যদি করিয়ে দেওয়া যায় তো বাকী কাজ থানার কমরেডরাই ক'রে ফেলবে। কাজেই এ সুযোগ ছাড়বার নয় তবু বাদল বলল, আমি এ নিয়ে আলোচনা ক'রে দেখি পরে আপনাকে জানাব।

কিন্তু আপনার কথা পেলে আমি এগোতে পারি —

এখনই আমি কথা দিতে পারছি না। তবে আপনি বুদ্ধিমান লোক নিশ্চয়ই এটা বোঝেন যে সম্ভব হলে সুযোগের অপব্যবহার কেউ ক'রবে না।

সেটা স্বাভাবিক বলেই না আপনাকে খবর দিয়ে এনেছি। নইলে আপনার মত একজন নেতাকে কি যখন তখন আসতে বলা যায়?

দরজা ঠেলে বেয়ারা কফির পাত্র নিয়ে ঢুকতেই শুভেন্দু বলল, নিন কফি খান। তবে কি জানেন, আমার মত এত ছোট একটা কারখানায় যখন শুনলাম ইউনিয়ন হয়েছে আর সেই ইউনিয়নে আপনার মত লোক সভাপতি তখন আমার যাত্রা আসরের সিংহাসনে সত্যিকারের রাজা এসে বসলে যেমন হয় তেমনি মনে হচ্ছিল।

বাদল একটু হেসে প্রশ্ন ক'রল, কি রকম?

দর্শকরা তখন সত্যিকারের রাজাকেও যাত্রাদলের সাজা রাজা বলে ভাবে, আমিও ভেবে উঠতে পাচ্ছিলাম না আমার কারখানার ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট আর আপনি একই ব্যক্তি কিনা। আমার ছোট ছেলে স্বগত আবার কলেজ জীবনে আপনাদের স্টুডেন্টস উইং-এর ভক্ত ছিল। সদস্যও নাকি ছিল। সে-ই খোঁজ খবর নিয়ে বলল, হ্যাঁ বেমালুম ঠিক। একই লোক। ওর আবার আপনাদের পার্টির ওপর খুব দরদ, শুনি নাকি ইলেকশন ফাণ্ডে চাঁদা-পত্তরও দেয় —

বাদল বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ দেয়। স্বগত একজন ভাল ডোনার।

তা হবে, ওটা ওর ব্যক্তিগত অভিরুচি। আমার ও নিয়ে কথা বলা উচিত নয়।

বাদল একথায় চুপ ক'রে রইল কারণ হাজার টাকা চাঁদা স্বগত ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দেয় অথবা তার বাবা জানেনা এ অবিশ্বাস্য। তার বিশ্বাস শুভেন্দুই ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবার জন্যে ওটা ছেলের নাম দিয়ে দেয়। আর স্বগত যে কোন সময় তাদের ছাত্র সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এতে অস্বাভাবিক কি থাকতে পারে? প্রতি বছরই তো হাজার হাজার ছাত্র তাতে যোগ দেয় আবার ছেড়ে দেয়, কজনই বা একাগ্রভাবে লেগে থাকে? থাকগে ওসব। তার হাত দিয়ে পার্টি-ফাণ্ডে যে মোটা টাকা জমা হচ্ছে এজন্যে ওপর মহলের কর্তারা তাকে যে বেশ খাতির ক'রে চলে এটা বাদল নিজেও বেশ ভাল বোঝে। তার হাতে যতগুলি ইউনিয়ন আছে সে তুলনায় সে অনেক বেশী টাকাই জমা দেয় দলের

তহবিলে। এজন্যে দু একজন ভাল পার্টি মেম্বার তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ ক'রলেও পার্টির নির্দেশে তাদেরকে এখনও বাদলের অনুগামী হয়েই দিন কাটাতে হচ্ছে। তা ছাড়া পার্টির যখন এখনকার মত সুদিন ছিল না তখন এই বাদল সরকারই তো রত্নদীপ ইণ্ডাসট্রিজ-এর মালিক প্রেমসুখ নোপানীর কাছ থেকে প্রয়োজন মতই টাকা ধার নিয়ে গিয়ে স্বল্প মেয়াদে ধার দিয়েছে বিনাসুদে। এবং সে টাকার অঙ্ক চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত হ'ত। তহবিলে নানা দিক থেকে চাঁদা এসে জমলে আবার ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হ'ত সে টাকা। কিন্তু দুদিনে এই সাময়িক সাহায্যই বা করে কে? সেইজন্যেই বাদল সরকারকে মূল্যবান কমরেড হিসেবে এবং একটা অঞ্চলের বিশিষ্ট নেতা হিসেবে ধরা হয়ে থাকে ওপর মহলে। বাদল সরকার সেদিকে সচেতন।

এবং অতসব হাঁড়ির খবর না জানলেও বাদল সরকার যে তাদের পার্টির একজন বিশেষ আস্থাভাজন নেতা এ বিষয়ে অবহিত শুভেন্দু দত্ত-ও। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে যে বাদল সরকার একজন প্রার্থী এবং তার মত চতুর লোক যে জিতবে এ বিষয়ে শুভেন্দু নিশ্চিত। শুধু তাই নয় শুভেন্দুর ধারণা বাদল জিতলে এবং তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে মন্ত্রীও সে হবে। এবম্বিধ কারণে বাদল শুভেন্দুর কাছে ভবিষ্যতের জন্যে একটা মূল্যবান সম্পদ। তাই সে বাদল-এর সঙ্গে কথা বলার সময় সব সময়েই তাকে তার যথার্থ অবস্থানের চেয়ে ওপরে তুলেই বলে, যেমন বলল, যা-ই বলুন মিস্টার সরকার অনেক রাজনীতিওয়ালার সঙ্গেই কথাবার্তা বলে তো দেখেছি তাদের ফাঁকি দেওয়া যায় কিন্তু আপনার সঙ্গে সে চেষ্টা ক'রে লাভ নেই বলেই বলছি, যত চুক্তিই দেন মানতে চেষ্টা ক'রব কিন্তু ওই ত্রিদিবকে পুর্নবহালের সর্তটি দেবেন না রাখতে পারব না।

বর্তমান লড়াই তো ওইটা নিয়েই—

ঠিক কি তাই? আমার তো মনে হয় দাবী রাখতে গিয়ে ত্রিদিব ম্যানেজারকে অশ্লীল ভাষায় কথা বলেছিল বলে তাকে বরখাস্ত করা হয়, আসলটা তো ওই দাবী।

শ্রমিকরা তো তা বলে না। তবে সত্যি বলতে কি ত্রিদিব সম্বন্ধে আমরাও বিশেষ উৎসুক নই। ও থাকলে আমরাও ইউনিয়ন কন্ট্রোলে রাখতে পারব না। কিন্তু তবু শ্রমিকদের দাবী আমাদের মানতেই হচ্ছে। সাধারণ কর্মীরা দাবী ক'রল বলেই না ওর ওপর থেকে বরখাস্ত প্রত্যাহারের দাবী ক'রছে ইউনিয়ন। তবে যা-ই বলেন ত্রিদিব একটু উগ্র হতে পারে তাই বলে অশ্লীল কথা বলতে পারে না।

তবে কি বলতে চান আমরা মিথ্যেবাদী?

আপনারা না হয়ে আপনার ম্যানেজারও তো হ'তে পারে?

ওই একই হ'ল।

তাহ'লে আমরা অনন্যোপায়।

কিন্তু ব্যাপারটা চিন্তা ক'রে দেখুন ত্রিদিব আপনাদের পার্টির মেম্বার নয়, ছিলও না। এখন যারা ত্রিদিবকে নিয়ে মাতামাতি ক'রছে তারাও আপনাদের অনুগত নয়। এরকম অবস্থায় ত্রিদিবকে পুনর্নিয়োগ করানোতে আপনাদের লাভ কি হচ্ছে ?

আমরা জানি আপনার কারখানার দুতিনজন মাত্র আছে যারা ইউনিয়নের ভাল কর্মী কিন্তু বিভ্রান্ত। কিন্তু এই সব ইসুতে সাধারণ শ্রমিক রাজনীতির চেয়ে বড় ক'রে দ্যাখে শ্রমিক ঐক্য। কাজেই এসব ক্ষেত্রে ওই ক'টি বিভ্রান্ত যুবক যাতে সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না ক'রতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ ক'রে যেতে হয়।

সেই কথা তো আমিও বলছি। বাকী ক'টাকে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছি তাহ'লেই তো আপনাদের ঝামেলা মিটে যাবে —

শুধু তাতে হবে না, বাদল পরামর্শ দেবার মত ক'রে বলল, শ্রমিকদের মাইনে কিছু বাড়াতেই হবে। তাতে আমরা ঘোষণা ক'রতে পারব ইউনিয়নের যে মূল সংগ্রাম তাতে জয় হয়েছে।

শুভেন্দু চেয়ারটাকে পেছনে হেলিয়ে আরাম ক'রে বসল, বলল, দেখুন মশাই আমরাও মানুষ, আপনাদের এইসব শব্দ ব্যবহার আমাদেরও বিরক্ত করে। আমার কারখানার কর্মীদের বেতন আমি বাড়িয়ে দিলাম এর মধ্যে আবার জয় পরাজয়ের কি হ'ল ?

আপনি কি অমনি দিলেন ? আদায় ক'রতে হ'ল না ? এই আদায়টা তো হ'ল সংগ্রামের মাধ্যমেই !

শুভেন্দু এই ধরণের কথায় বিরক্ত হয়, সেই বিরক্তি প্রকাশ হ'ল তার কথায়, এই ঘরটা যদি যুদ্ধক্ষেত্র হয় তাহ'লে আপনি গিয়ে যদি জয় ঘোষণা করেন তবু আপনার মিথ্যাচার করা হবে এইজন্যেই যে আপনার আমার মধ্যে যুদ্ধ তো হয়ই নি বরং যদি কিছু হয়ে থাকে তো তার বিপরীত কিছু।

আপনারা ব্যবসা ক'রতে গিয়ে যত মিথ্যার আশ্রয় নেন আপনাদের সঙ্গে সব সময় কাজকর্ম করাতে আমাদেরও তার কিছু হাওয়া লেগে যায়। দুনিয়াটা তো আর যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব নয় —

তা বটে, শুভেন্দু এ প্রসঙ্গ বন্ধ ক'রতে চাইল। তারপর অনেকটা আত্মসমর্পণের মত ক'রে বলল, চলুক চলুক, যে দেশে যে আচার —

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বাদল জানতে চাইল, এতভাল কফি আপনার অফিসে এলে পাওয়া যায় যা কোথাও দেখা যায় না, বিশেষ ক'রে কোন দোকানে—

হ্যাঁ কফিটা আমার বাড়ী থেকেই আসে, ফ্লাস্কে থাকে। সাধারণ সব দোকানে চা বা কফি কোনটাই খাবার মত নয়।

বাদল মনে মনে ভাবল, সুখ এদেরই আছে। মুখে বলল, ঠিকই বলেছেন কিন্তু সাধারণ সব লোককে তো ওই দোকানগুলোর চায়েই তেষ্টা মেটাতে হয়।

তাহয়। আমি একদমই পারি না। আগে তো কফি কোনদিনই খেতাম না, বাড়ীতে সকালে একবার চা খেতাম। বয়েস বাড়াতে এখন দিনে দুতিনবার হয়ে যায়। তবে না হলেও চলে।

তবে কেন বাড়ী থেকে আনার ব্যবস্থা?

আপনারা দুচারজন এলে অভ্যর্থনার আয়োজন তো রাখতে হবে?

বাদল সরকার আর কথা বলল না। বলবার কথা যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে সে মনে মনে অনুভব ক'রছিল, অথচ আসল কথাই সব বাকী। অর্ধেক কথা বলে বাকী আর শেষ ক'রল না শুভেন্দু দত্ত। কারণ দুর্বোধ্য, বাদল সরকার মনে মনে ভাবল, অতি ধূর্ত লোক এই শুভেন্দু দত্ত। বেলেঘাটার কারখানা অল্পটাকায় কিনেছিল সেই স্বাধীনতার বছর, হ্যাঁ বাদল স্বাধীনতার বছরই বলবে, কারণ তার পার্টি একসময় এ স্বাধীনতা মিথ্যে বলে আওয়াজ তুললেও পরবর্তী-কালে স্বাধীনতা সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হয়েছে, এবং সেইজন্যেই বাদল সেই দেশ-ভাগাভাগি ক'রে গদিনসীন হওয়ার সময়টাকে স্বাধীনতার সময়ই বলে। তা সেই দেশভাগাভাগির অনিশ্চিত এবং সশঙ্ক মুহূর্তগুলোর সুযোগে সামান্য কয়েক হাজার টাকায় আসলের এক দশমাংশ দামে কারখানাটা কিনে আধ তৈরী মালপত্তর শেষ ক'রে বিক্রি ক'রেই কেনার টাকা উঠিয়ে নিয়েছিল শুভেন্দু দত্ত। তারপর গত পঁচিশ বছরের স্বাধীনতায়, হ্যাঁ স্বীকার ক'রতেই হবে স্বাধীনতা, সেই কারখানার পরিধিই শুধু দশগুণ বাড়েনি আরও একটা সহায়ক কারখানা শুভেন্দু দত্তর গড়ে উঠেছে হাওড়ার ডোমজুর যাবার রাস্তায়। সেটা নাকি খুব আধুনিক ধরণের কারখানা। কি পরিমাণ চতুর হ'লে মানুষ এত ক'রতে পারে, বাদল সরকার তা অনুমান করে সহজেই। তাই বাদল মনে করে, এরকম লোকের যতটা খসানো যায়, মনে ক'রেই সে আসে, সংযোগ রাখে। তা ছাড়া এরা বড় চতুর লোক, পার্টির ওপর মহলে পর্যন্ত কি ক'রে যে প্রয়োজন মত প্রভাব বিস্তার ক'রে ফেলে তা বুঝে উঠতে পারে না বাদল, কাজেই সাপ মেরে লাঠিও আস্ত রাখার বুদ্ধি ক'রে সে চলতে চায়। অবশ্য একটা গুণ লোকটার আছে চুক্তি কখনই ভাঙ্গে না। পেটের কথা কাকপক্ষীকে জানতে দেয় না। সেইজন্যেই শুভেন্দুর সঙ্গে চুক্তি করা চলে।

বাদল সরকার মনে মনে স্থির ক'রে বলল, আপনাকে একটা কাজ ক'রতে হবে।

কি কাজ? জানতে চাইল শুভেন্দু।

আমাদের দুটো ছেলেকে কারখানা ছুটির পর কারখানায় ঢুকতে দিতে হবে। তারা কিছু পোস্টার মারবে। আর সে পোস্টার যে কারখানার কর্মীরা মারে নি এটা যেন কেউ জানতে না পারে।

শুভেন্দু পরিকল্পনাটা ঠিক না বুঝলেও কিছুটা আন্দাজ ক'রে নিল। সে বলল, কিন্তু দেখুন কারখানার মধ্যে একটা হাঙ্গামা হ'লে—

তা না হ'লে য়্যারেস্ট হবে কি ক'রে ? আপনি ম্যানেজারকে বলে রাখবেন এই পোস্টারে যারা উত্তেজিত হবে তাদের যেন হাতেনাতে পুলিশ য়্যারেস্ট করে। আর একটা কথা আমি জানি এই পোস্টার যদি কেউ ছেঁড়ে আমাদের কমরেডরাই তাদের বাধা দেবে, সে ক্ষেত্রেও আমাদের কর্মীদের পুলিশ প্রোটেকশানের ব্যবস্থা আপনাকে ক'রতে হবে।

সেজন্যে কোন চিন্তা ক'রবেন না।

আজ রাতেই তাহ'লে যাবে আমাদের ক্যাডাররা —

ঠিক আছে। এই নিন, বলে একটা দশটাকার নোটের বাণ্ডিল এগিয়ে দিয়ে শুভেন্দু বলল, আপনাদের ক্যাডারদের খরচ খরচা যা লাগে —

বাদল সরকার বলল, টাকাটা আপনি রেখে দিন। আমাদের ক্যাডাররা কংগ্রেস কর্মী নয়, তারা কোন টাকা নেয় না। তারা পার্টির কর্মী।

শুভেন্দু নিজেও সেকথা জানে, বুঝল বাদল সরকার এক হাজার টাকায় সন্তুষ্ট নয়। তাই সে বলল, কত রকম খরচ খরচা তো আছে, আপাততঃ রাখুন, বাকী যা লাগবে পরে দেওয়া যাবে।

থাক। প্রয়োজন হলে পরে নেওয়া যাবে, বাদল সরকার জানাল।

তবে একটা জিনিষ খেয়াল রাখবেন, আমার কারখানার পাশের বস্তিতে বিশে বলে যে গুণ্ডা ছিল ওদের, পুলিশ সেটাকে শেষ ক'রে দিয়েছে।

জানি। আরও অনেক শেষ হয়েছে এই ক'দিনে। এখনও অনেক বাকী। এ চলতে পারে না, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন আন্দোলন চলতে পারে না।

শুভেন্দু-এ কথার জবাব দিল না। রাজনীতির ব্যাপারী সে নয় বলেই চুপ ক'রে রইল।

পরের দিন সকাল প্রায় নটার সময়েই ম্যানেজারের টেলিফোন এল কারখানার মধ্যে মারামারি হচ্ছে। ইউনিয়ন কতগুলো পোস্টার লাগিয়েছিল দুতিনটে ছেলে সেগুলো ছিঁড়ে দেওয়ায় মারামারি লেগেছে, একদিকে প্রায় শ'খানেক আর একদিকে মাত্র ন'দশটি ছেলে। সবাই কারখানার কর্মী। শুভেন্দু বিস্মিত হবার মত ক'রে বলল, নিজেদের ইউনিয়নের পোস্টার নিজেরাই ছিঁড়েছে ?

তাই তো দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ইউনিয়ন ভেতরে ভেতরে ভাগ হয়ে গেছে — ম্যানেজার জবাব দিল, জানাল, কারখানার কাজ বন্ধ। কর্মীরা সব হৈ হল্লা ক'রছে অফিসের সামনে।

কি বলছে তারা ?

তারা ব্যবস্থা দাবী ক'রছে — নিরাপত্তা চায় —

যে ন'দশজন ছেলে মারামারি আরম্ভ করেছে তাদের নাম লিখে রাখুন। আর এক্ষুনি সমস্ত ঘটনার রিপোর্ট তৈরী করে টাইপ করিয়ে কারখানার গাড়ীতেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিন একটা কপি। আর যদি কোন কর্মী, যে মারামারির মধ্যে জড়িত নয় ছুটি চায়, ছুটি দিয়ে দিন। কেউ যদি আহত হয়ে থাকে

হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন, ফার্স্ট এড দেবেন না।

নিশাপতির মাথায় একটু চোট লেগেছে থামাতে গিয়ে —

থামাতে গিয়ে —স্কাউন্ড্রেল, মনে মনে উচ্চারণ ক'রল শুভেন্দু, রিসিভার নামিয়ে রাখল। ফোন ক'রল বেলেঘাটা থানায়। থানার লাইনে নয়, দারোগার ঘরের সরাসরি নম্বরে। অপরিচিত কণ্ঠস্বর পেয়ে জানতে চাইল, ও, সি, মিস্টার চৌধুরী আছেন?

আপনি স্যার কে বলছেন? বড় সাহেব এখনও আসেন নি। কোয়াটারে আছেন।

আমি শুভেন্দু দত্ত। আপনাদের এরিয়ার টেকনিক্রাফট থেকে বলছি। বিশেষ দরকার, এখনই খবরটা দিন তাঁর কোয়াটারে। বলবেন আমাকে ফোন ক'রতে, আমার অফিসে।

আবার একটা ফোন ক'রল শুভেন্দু, আমি শুভেন্দু দত্ত, জয়দেব বাবু তো? কি খবর মশাই, এইভাবেই চলবে না প্রতিবিধান হবে কিছু? হচ্ছে? কি হচ্ছে? এইভাবে কিছু লোককে জেলে পুরে রাখলেই মিটবে সমস্যা? আপনারা আরও ফোর্সফুল না হ'লে কিছুই কাজ হবে না। তা আপনি যে বলেছিলেন আমার ফ্যাক্টরীতে কংগ্রেস মাইণ্ডেড কিছু ওয়ার্কার আছে, তাদের নিয়ে যে ন্যাশানালিস্ট ইউনিয়ন ক'রবেন বলেছেন কি হ'ল তার? —সময় আর কবে হবে? এখন যত সব য়্যান্টিন্যাশানাল এ্যাক্টিভিটি চলছে তাই বন্ধ ক'রতে পারলেন না — মশাই আমার এত পেছুটান না থাকলে ঝাঁপিয়ে পড়তুম — দেশের এই অবস্থায় কংগ্রেস কর্মীদের কর্তব্য কি ঘরে বসে থাকা, না এই অবস্থার প্রতিকার করা? দেশ বাঁচবে কি ক'রে? — আরও কিছুক্ষণ ধরে প্রায় বক্তৃতা দিয়ে শুভেন্দু রিসিভার নামিয়ে ভাবল যতসব বাজে লোকের হাতে পড়েই কংগ্রেসের এই হাল। নইলে তাদের কালে কংগ্রেস-এর কি তীব্র বেগ! তাদের সময় বলতে শুভেন্দু প্রাকস্বাধীনতা যুগের কথা-ই ভাবে। সে সময়কার উদ্দীপনার কথা ভাবতে ভাল লাগে তার। সেই সময় ভাগ্নের পাল্লায় পড়ে একটিবার কংগ্রেস তহবিলে আট আনা পয়সা চাঁদা দিয়ে অনেকদিন ধরে মনে মনে অনেক আপশোষ ক'রেছিল শুভেন্দু, পরে আট আনার বিনিময়ে আট হাজারের গর্ব অনুভব সে এখনও ক'রে থাকে। মনে মনে নিজেকে এখনও একজন বিরাট কংগ্রেস সমর্থক ভাবে বর্তমানের চাঁদার জন্যে নয়, সেই আট আনার জন্যে। শুভেন্দু ভাবে সেদিনের সেই কংগ্রেসকর্মীরা থাকলে আজ কি দেশদ্রোহীরা এত বাড়াবাড়ি ক'রতে পারত? সেই রকম বন্যার তোড়ে এসব চ্যাংড়া ছোকরাদের কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত। আজ যত বাজে অকর্মণ্য লোক জুটে কংগ্রেস-এর আদর্শটাকে ডুবিয়ে দিল! মনে মনে অহেতুক আপশোষ ক'রতে থাকে শুভেন্দু। টেলিফোনটা বেজে ওঠে ঠিক সেই সময়েই। রিসিভার কাণে লাগিয়েই শুভেন্দু বলে, হ্যালো? বলছি। হ্যাঁ আমিই ফোন ক'রেছিলাম।

আমার কারখানায় আজ সকালেই একটা মারামারি হয়ে গেছে, বোধহয় এখনও হচ্ছে, কি অবস্থা আমি জানি না। ইউনিয়নের লোকদের সঙ্গে উগ্রপন্থীদের — হ্যাঁ। আমার মনে হয় আপনি ম্যানেজারের কাছেই সব নাম পেয়ে যাবেন। নাম আছে? ও হ্যাঁ, সে তো আপনি বলেছিলেন— ও আচ্ছা আচ্ছা, এবার তো প্রমাণ পেলেন? ঘটনাটা? আমি যতদূর শুনেছি — আজ সকালে হঠাৎ উগ্রপন্থীরা ইউনিয়নের ওপর চড়াও হয়। শুনলাম ইউনিয়নের মধ্যে নাকি মনোমালিন্য কয়েকদিন ধরেই চলছিল। পাঠাচ্ছে? হ্যাঁ ঠিক আছে — ওদিকে রিসিভার নামিয়ে রাখাতে শুভেন্দুও নামাল। যাক তাহলে চৌধুরী তাড়াতাড়িই য়্যাকশান নিয়েছে। একটা জিনিষ শুভেন্দুর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে পুলিশকে স্বাধীনতা দিলে সত্যি তারা খুব চটপট কাজ ক'রতে পারে। প্রথম দিকে তো মনে হচ্ছিল দেশে বুঝি আইন কানুন আর থাকবেই না কিন্তু কি তাড়াতাড়ি সব ঠাণ্ডা ক'রে আনল। চৌধুরী ঠিকই বলে, দুচারটে আসল বদমাশকে শেষ ক'রে দিতে পারলেই এলাকা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আসলে আমাদের হাত যদি বাঁধা থাকে তবে আমরা কি ক'রতে পারি? — চৌধুরীর একথাটা যে ঠিক তা আজই বেশ সুন্দরভাবে উপলব্ধি ক'রল শুভেন্দু। কারণ সেই যুক্তফ্রন্ট রাজত্বের সময় যখন দেশময় ইউনিয়নগুলো দৌরাত্ম আরম্ভ ক'রেছিল সেই ঢেউ লেগেছিল শুভেন্দুর কারখানাতেও কিন্তু এই চৌধুরী তখনও বড়বাবু থাকা সত্ত্বেও সাহায্য ক'রতে আসে নি। শুভেন্দু ভেবেছিল ইচ্ছে ক'রেই করেনি চৌধুরী, আজ বুঝল পারে নি। তবু এরা পারে, ইচ্ছে ক'রলেই পারে। চৌধুরী অবশ্য ইচ্ছে ক'রলে পারি বলে না, বলে হুকুম হলেই পারি। তবে একটা কথা শুভেন্দু কিছুতেই বুঝতে পারে না এই হুকুম কে দিল? শুভেন্দুর কারখানার পুরাণো কেরাণী উমেশবাবুর এক ছেলেকে নাকি রাত দুটোর সময় হঠাৎ এসে সেই যে পুলিশে নিয়ে গেল আজ এগার দিনের মধ্যে কোন খবর নেই। অথচ তাদের এলাকার থানা বলছে আমরা আনিনি, লালবাজার বলছে আমরা ওনামের কোন ছেলেকে গ্রেপ্তার তালিকায় পাচ্ছি না। — দোষ গুরুতর নিশ্চয় আছে নইলে পুলিশে এত গুরুত্ব দিয়ে নিয়ে যাবে কেন সকলের অলক্ষ্যে? সেজন্যে শুভেন্দুর কিছু বলবার নেই, তার শুধু ভাবনা এমন হুকুমটা কোত্থেকে এল? বুড়ো কেরাণীটা বলছে তার ছেলে ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না, অমন সবাই বলে থাকে। কোন চোর কি আর নিজেকে চোর বলে? সাধুই তো বলে নিজেকে সবাই —। তবে এসব বাজে চিন্তার সময় তার নেই প্রয়োজনও নেই বলে মাথা ঘামায় নি শুভেন্দু, তার কারখানার মধ্যে ঝামেলাটা না থাকলে এসব প্রয়োজনও ছিল না তার।

যাক এইবার সব ঠাণ্ডা হবে। ইউনিয়নও ঠাণ্ডা থাকবে এখন। বাদল সরকারের আবদার মাইনে বাড়াও। গড়ে পাঁচ টাকা বাড়ালে মাসের খরচ বাড়বে হাজার টাকা, তার জায়গায় কত আর দিতে হবে চৌধুরীকে বড় জোর পাঁচশ —

আর এই তালে ত্রিদিবটাকে ধরিয়ে দিতে পারলে ব্যস্ — এখন একবছর নিশ্চিন্তি। পয়সাই যখন নেবে চৌধুরী ওইটুকুও তখন ক'রবে। আসলে বদমাশ এই বাদল সরকার-রা যারা আদায় ক'রে দেব বলে নির্বোধ শ্রমিক-গুলোর পয়সায় খায়। এদিকে কোন লোককে বলবে না ঠিক ক'রে কাজ কর, খালি শেখাবে বল এই চাই ওই চাই। যেন চাইলেই হ'ল! সব পৈত্রিক সম্পত্তি জমা রেখেছে চাওয়ামাত্র দিয়ে দেওয়া হবে। যত সব নচ্ছার! এরা মানুষকে ভিখিরি ক'রে দিচ্ছে! কাজ ক'রে পয়সা নিতে শেখাচ্ছে না, চেয়ে নাও! চেয়ে পাবার নাম হ'ল দাবী আদায়!

স্বগত এসে ঘরে ঢুকতেই বাজে চিন্তায় ছেদ পড়ল শুভেন্দুর। আর স্বগত ঢুকেই বলল, আমার মাথায় হঠাৎ একটা কথা এল বাবা। আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না টোডিদের কারখানায় তো কোন গোলমাল কখনও হয় না! এই বাদল সরকারই তো ইউনিয়ন চালায় সেখানেও!

ওদের সঙ্গে নিশ্চয় কোন ব্যবস্থা আছে। শুভেন্দু মন্তব্য ক'রল।

স্বগত নিজের ভাবনার কথাই বলে চলল, আগে ভাবতাম ওদের বেতন বোধহয় ভাল। তা-ও তো শুনলাম নয়। ওদের কোন স্কেলই নেই!

এতবড় কারখানার কোন পে স্কেল নেই? এ হতেই পারে না।

আমি নীতিশবাবুকে খোঁজ নিতে বলেছিলাম। কাল উনি আমাকে সব খবর নিয়ে বললেন।

এবার একটু অবাক হ'ল শুভেন্দু দত্ত। নীতিশ বাবুর খবরে ভুল থাকে না। কোন বন্দোবস্ত আছে হয়ত টোডিদের সঙ্গে। মোটামুটি একটা বোঝাপড়ার ওপরে চলছিল তো এতদিন এখানেও, আজ হোক আর কালই হোক ভুগতে হবে টোডিদেরও। টোডি-মোদি বাদ যাবে না কেউ। শুধু তাই নয় এই যে হাওয়া পশ্চিম বাংলায় বইছে এ যাবে সারা দেশে। কোনও দিকের কোন কলকারখানা এই হাওয়া থেকে বাদ যাবে না। দেশটা যতক্ষণ উচ্ছন্নে না যাবে ততক্ষণ এই সুবিধে আদায়ের রাজনীতি বন্ধ হবে না। অতশত নিয়ে মাথা ঘামানোর দায় শুভেন্দুর নেই। তায় কারখানাটা নির্বিঘ্নে চললেই সে খুসী।

গাড়ীর শব্দে বোঝা গেল বাড়ীর সামনেই কেউ এসেছে। শুভেন্দু উৎকর্ণ হয়ে রইল। তার মনে হ'ল থানা থেকেই হয়ত এল কেউ। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে রইল কারও একটা আসবার জন্যে। অন্য কেউ হলে বাহাদুর আগে এসে খবর দেবে এই ব্যবস্থাই করা হয়েছে বছরখানেক ধরে। নইলে দারোয়ান বলে কোন বাড়তি খরচ অপ্রয়োজনীয় মনে হত শুভেন্দুর। চারিদিকের অবস্থা যখন খুবই খারাপ হয়ে উঠল, বেশ কয়েকজন 'পয়সাওয়ালা' লোকের মুণ্ডু গেল তখনই একজন দারোয়ান রাখাটা প্রয়োজনের পর্যায়ে পৌঁছাল। আর বন্দোবস্ত হ'ল যত পরিচিত লোকই হোক হট ক'রে কাউকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাহাদুর তাকে সামনে থামিয়ে এসে খবর দেবে, তারপর তার ভেতরে

আসা। তবে থানার বড়বাবু, বাদল সরকার প্রভৃতি কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলে রাখা হয়েছে তারা এলেই যেন ঢুকতে দেওয়া হয়। আর এই কাজ যাতে যেমনটি প্রয়োজন ঠিক তেমনি হয় সেজন্যে অনেক খুঁজে খুঁজে অনেক জানাশোনার মাধ্যমে নেপালী দারোয়ান রেখেছে শুভেন্দু। শুভেন্দুর অনুমান অর্ধেক মিলিয়ে বাহাদুর এসে জানাল ম্যানেজারবাবু এসেছেন।

ভালই হয়েছে, বাদল তার প্ল্যানটা কিভাবে ক'রেছে জানা যাবে। কিন্তু একটা জিনিষ বোঝা যাচ্ছে পুলিশ গিয়ে পেঁৗছবার আগেই নীতিশবাবু বেরিয়ে এসেছে। এটা তো খুব একটা বুদ্ধির কাজ হয় নি। ওর মত বুদ্ধিমান লোক তো এরকম নির্বুদ্ধিতা ক'রবে না। কিছু ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে, শুভেন্দু ভেবে নিল। বাহাদুরকে নির্দেশ দিল, ভেতরে আসতে বল।

নীতিশবাবু এসে ঢুকতেই শুভেন্দু জিজ্ঞাসা ক'রল, পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন?

পুলিশ বলেছে কারখানার ব্যাপারে কোর্ট অর্ডার না থাকলে তারা কিছু ক'রতে পারবে না, নীতিশবাবু জানাল।

থানা থেকে একথা জানাল বুঝি?

আমার মনে হয় ওরা এখন সব ঝামেলা এড়িয়ে যেতে চাইছে।

থানা থেকে যা-ই বলুক এখনই পুলিশ যাবে।

তাহ'লে তো আমাকে কারখানায় ফিরে যেতে হয়।

হ্যাঁ। আপনি বরং ওখানে থাকুন। হঠাৎ এই সকালবেলা কি নিয়ে ঝামেলাটা বাধল? আপনি আসার পরেই তো বেধেছে?

মারামারিটা আমি আসবার পরই হয়। গতকাল কারখানা ছুটি হয়ে যাবার পর ইউনিয়ন থেকে নাকি কতগুলো পোস্টার কারখানার দেয়ালে লাগানো হয়েছিল। আজ সকালে মেসিনম্যান বিনোদ সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে—

বিনোদ! নাম শুনে শুভেন্দু বিস্মিত হ'ল। বিনোদ কারখানার সেরা কর্মী—। তা ছাড়া একদিন সে সরকারী কারিগরী শিল্পালয়ের সেরা ছাত্র ছিল তার সমান দক্ষ কর্মী এই কারখানাতে আর নেই। ছেলেটি যে অত্যন্ত ভদ্র এবং শান্ত স্বভাবের! কাজেই ব্যাপারটায় বেশ বিস্মিত হতে হ'ল শুভেন্দুকে। তার নামটা আপনি মুখে এসে গেল শুভেন্দুর। নীতিশবাবু জানাল, হ্যাঁ সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় বিনোদ-এর মত শান্ত ছেলেও অসন্তুষ্ট হতে পারে এমনি সব পোস্টার লিখেছিল ওরা। সেগুলো যে কে লাগিয়েছে ইউনিয়নের পাণ্ডা তা বলতে পারছে না কিন্তু যেহেতু ইউনিয়নের নামে লেখা পোস্টার অতএব ছেঁড়াতে ওদের সম্মান নষ্ট হয়েছে এই ধারণাতেই মারামারিটা বেধে গেল।

আপনি কি পোস্টারগুলো দেখেছেন?

না। তবে সি, আই, এর কুকুর উগ্রপন্থীদের কালো হাত ভেঙে দাও — এমনি ধরণের আরও অনেক কথা লেখা ছিল বলে শুনেছি।

কিন্তু যা-ই হোক ব্যাপারটা খুবই গর্হিত হয়েছে। এ নিয়ে কতদূর যেতে হয় কে জানে? আজ কাজকর্মও তো বোধহয় কিচ্ছু হচ্ছে না?

না। মারামারি ইউনিয়নের কর্মকর্তারাই সুরু ক'রেছে এখন আবার তারাই দাবী ক'রছে নিরাপত্তা না থাকলে কাজ ক'রবে না। আগে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে হবে।

তা তো দিতেই হবে — শ্লেষের সুরে শুভেন্দু বলল, যে কারখানা মাইনে দেয় সেখানকার কাজের গ্যারান্টি আর দেবে না কেউ —

আমি কিন্তু একটা খবর পেয়েছি। আমাদের কারখানার এই ঝামেলার কারণ অন্য।

অন্য!

হ্যাঁ। জানুয়ারী মাসে বোকারোর যে অর্ডারের অর্ধেকটা আমরা পেয়েছি তার বাকী অর্ধেকটা পেয়েছে আগরওয়ালা। আগরওয়ালরা হচ্ছে টৌডিদের শ্বশুর।

প্রেমদাস-এর মেয়ের সঙ্গে রাজমোহন টৌডির বিয়ে হয়েছে, তাতে কি?

আগরওয়ালদের লিলুয়ার কারখানার ক্যাপাসিটি কম। অথচ ওরা সমস্ত অর্ডারটা নিতে চেষ্টা ক'রেছিল। যদি আমাদের সাপ্লাই সময়মত না হয় তাহ'লে বাকী অর্ডারটাও ওরা করিয়ে নিতে পারবে। সেই চেষ্টাতেই আছে। টৌডিদের দিয়ে বাদল সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে আমাদের কারখানায় নানারকম ঝামেলা বাধিয়ে দিচ্ছে।

বলেন কি? এর কোন প্রমাণ আছে?

এর কি প্রমাণ দেওয়া সম্ভব? তবে সনাতন আর শিবপূজন বলে যে দুজন মিস্ত্রি মার্চ মাসে আমাদের কাজে লেগেছে তারা আসলে আগরওয়ালার লোক।

আপনি এত খবর কোথায় পেলেন?

খবরগুলো অত্যন্তই প্রয়োজনীয়। সোর্স দেওয়ার অসুবিধে আছে। যদি প্রমাণ চান তবে এখন তা দিতে পারব না তবে কনস্পিরেসিটা আপনার জানা থাকলে ভবিষ্যৎ ঘটনা থেকে আপনিই প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

শুভেন্দু সম্পূর্ণ নতুন ঘটনার মধ্যে পড়ে নিমেষের জন্যে দিশেহারা হয়ে গেল। এরকম অভাবনীয় অবস্থার জন্যে আদৌ তৈরী ছিল না তার মন। শুধু তাই নয় এখনও সে বিশ্বাসই ক'রতে পারছে না যে ঘটনাটা সত্যি হতে পারে বা এমন চক্রান্ত সম্ভব! তাই সে যেন বারংবার নীতিশকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিশ্চিত হতে চাইল এ ঘটনা সত্যি কিনা কিন্তু একই কথা বারংবার জিজ্ঞেস ক'রতে মর্যাদায় বাধছিল তার। তাই পরিবর্তে সে প্রশ্ন ক'রল, ঘটনাটা যদি সত্যি হয় তবে এখন উপায় কি?

অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নীতিশ বলল, উপায় আমি কিছু পাইনি। আপনি ভাবুন আমিও ভেবেচিন্তে দেখি।

তবে ব্যাপার কি জানেন আন্দাজের ওপর নির্ভর ক'রে কোন কাজ করা

উচিত হবে না।

সামান্যক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নীতিশ বলল, আপনি স্যর স্বাভাবিকভাবেই মনে ক'রতে পারেন যে একথার ভিত্তি নেই কিন্তু যদি এটা সত্যি বলে মনে ক'রে কাজ করেন তাহ'লেই বোধহয় এই সমস্যা থেকে উৎরোনো সম্ভব হবে।

নীতিশবাবুর কথায় যে অনুমান বা কল্পনা খুব কমই থাকে একথা শুভেন্দু ভালভাবে জানে বলেই তার আশঙ্কা ঘনীভূত হল। এখন যা অবস্থা তাতে সনাতন আর শিবপূজনকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত, তা ক'রতে গেলে ইউনিয়ন গোলমাল করবে।

আচ্ছা বাদল সরকারের পার্টির ওপর মহলের নেতাদের ধরে —

কোন লাভ হবে না। তারা ইউনিয়ন থেকে সরকারকে সরিয়ে অন্যলোক দিতে পারবে না। ওদের পার্টি এ অঞ্চলে শ্রমিক সংগঠনের জন্যে সরকারের ওপরই নির্ভরশীল।

স্বগত কথাগুলো শুনছিল। এবার সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আবার একটা নতুন ঝামেলা আসায় সে বিরক্ত, মাঝ থেকে তাকেই যত ঝকমারী পোহাতে হবে। এখন আবার যত লোকের সঙ্গে গোপন সংযোগ ক'রতে হবে, সবই বাবা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। সারাদিন, এবং রাতে যতক্ষণ মানুষ চলাফেরা ক'রতে পারে তাকে দৌড়োতে হবে। এই বলবে এখানে যাও, ওখানে যাও, অমুককে এই কথা বলে জবাব নিয়ে এস, আলোচনা ক'রে এস ওই লোকের সঙ্গে। এসব ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না স্বগতর। দাদাটা চাকরী বাকরী ক'রছে, বেশ আছে। এত হ্যাপা পোহাতে হবে জানলে পড়াশোনাটা ক'রে রাখলেই ভাল ছিল, একটা যাহোক চাকরী জুটিয়ে নিয়ে আরামে থাকা যেত। ব্যবসার এসব ঝামেলা কি ভাল লাগে ? সব বন্ধুবান্ধব কেমন ফুর্তি করে দিন কাটায় আর দুনিয়ার ঝামেলা তার ঘাড়ে! ব্যবসা তো কমলেশ-এর বাবারও আছে কিন্তু তার পেছনে ক'মিনিট ঘোরে কমলেশ ? বরং বাবার গাড়ীটা ম্যানেজ ক'রে গুচ্ছের মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই মেয়ে-ফেয়ে ব্যাপার ভাল লাগে না স্বগতর। সে ভেবেই পায় না দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেয়েগুলোর সঙ্গে কি কথা বলে কমলেশ। একদিন কমলেশ-এর গাড়ীতে একটা মেয়ের পাশে বসে যেতে হয়েছিল স্বগতকে কিন্তু সেই মেয়েটার বগলের ঘামের গন্ধে বমি আসছিল। মেয়েটাকে মাঝখানে রেখে অপর পাশে বসে বেশ প্রফুল্লভাবেই গাড়ী চালাচ্ছিল কমলেশ, মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টাও ক'রছিল অথচ স্বগত সারা পথ বাইরের দিকে তাকিয়ে পথের ভিড় দেখতে দেখতে যাচ্ছিল আর পথ চলতি যুবতীদের দিকে চোখ পড়তেই তার মনে হচ্ছিল ওদের গায়েও বুঝি এমনি বোটকাগন্ধ। পাশে বসা মেয়েটির সাজগোজের তো খুবই বাহার, মুখের পাউডার, চোখের পাতায় রং, ঠোঁটের রঙের মূর্খ উগ্রতা, সব সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল মেয়েটা গাড়ীতে না থাকলেই পরিবেশটা সুস্থ

হ'ত। কখনও দৈবাৎ রুমালটা অকারণেই খুলে সামনে মেলে ধরছিল মেয়েটি খেলাচ্ছলে, সেই সময়েই যা একঝলক সুগন্ধ এসে তার অস্বস্তি দূর ক'রছিল। সে যাক, কমলেশ-এর মত অবসর পেলে সে ওর মত বোকামী ক'রত না কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যে দেখা ক'রতে পায় না সে অভাব ভাল ক'রে মিটিয়ে নিত। তবে হ্যাঁ, এইবার ক'রবে, সোজাভাবে যখন হবার নয় তখন বাঁকা-ভাবেই সে ক'রবে। এবার যখনই বাবা কোথাও পাঠাবে সে বলে কয়ে গাড়ীটা নিয়ে বেরোবে, আর বন্ধুদের তুলে নিয়ে চলে যাবে চৌরঙ্গী পার্কস্ট্রীটের কোন হোটেলে, সেখানে প্রাণভরে ভালমন্দ খেয়ে যতক্ষণ পারবে সময় কাটিয়ে তারপর সেখানে দেখা ক'রে বাড়ী আসবে। তাতে কাজ হলে হবে নইলে মাকে দিয়ে বলিয়ে দেবে অমন চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দিতে সে কিছুতেই পারবে না। স্বগত একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ আরাম ক'রে দুচার টান দিয়ে ফেলে দিয়ে ফের গিয়ে ঘরে ঢুকল। শুনল তার বাবা বলছে, আশ্চর্য! এমনি ক'রে একটা প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে যাবে আর ইউনিয়ন নেতারা তা দেখবে!

ওদের কি? প্রতিষ্ঠান নষ্ট হলে আপনার যাবে, নীতিশ বলল।

এতগুলো কর্মীও তো বেকার হবে?

তাতেই বা তাদের কি?

ওদের ক্ষতি নয়? এটা আপনি ঠিক বলছেন না। একটা ইউনিয়ন তো নষ্ট হয়ে যাবে, তাতে ওদের ক্ষতি হবে না?

এই পাইয়ে দেবার রাজনীতিতে ইউনিয়ন কখনও একচেটিয়া কারও হাতে থাকে না। যেমন যে দল বেশী পাইয়ে দিতে পারবে সেই দলের দিকেই লোক ছুটবে। কাজেই ইউনিয়ন ব্যবসায়ীদের কাছে ন্যায় অন্যায় মূল্যহীন। ওসব ওদের দেখতেও নেই।

দেখতে নেই মানে?

মানে দ্যাখে না। অবশ্য এটা আমাদেরই দেশে। মিস্টার দে সেদিন বলেছিলেন তিনি গত জুনে যখন জাপান গিয়েছিলেন দেখেছিলেন একটা বড় কারখানায় যারা কাজ ক'রছে সকলেরই বুকে ব্যাজ আঁটা। শুনেছিলেন যে ওটা নাকি ইউনিয়ন থেকে কি সব দাবী আদায়ের জন্যে দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ খুলে ফেলার জন্যে বহু অনুরোধ উপরোধ করছে কিন্তু দাবী না মেটা পর্যন্ত ইউনিয়ন ওই ব্যাজ খুলতে রাজী নয়। অথচ কাজ কর্ম ঠিক চলছে। প্রোডাকশন বন্ধ নেই।

সনাতন আর শিবপূজনকে তাহ'লে সাসপেণ্ড করুন।

ইউনিয়ন কি তাহ'লে ছাড়বে? তাতেও ঝামেলা বাধাবে। কি যুক্তিতেই বা সাসপেণ্ড করা যাবে বলুন? বরং আমাদের বিশ্বস্ত যে দু চারজন কর্মী আছে তাদের কাউকে ওদের সঙ্গে লাগিয়ে রাখা দরকার যাতে ওদের মতলব সময় মত ধরতে পারা যায়।

আশ্চর্য লোক এই সরকার! আমার সঙ্গে কথা বলে আমাকে যা পরামর্শ দিল তাতে মনে হয় ওর মত শুভানুধ্যায়ী আর কোন ইউনিয়ন নেতা হতেই পারে না!

নীতিশ একথার কোন জবাব দিল না। বাদল সরকারের ধূর্ততা যে শুভেন্দুকে হার মানাবে এতে সে আদৌ বিস্মিত নয়। শুভেন্দু দত্ত অতি ছোট্ট কেনাবেচার ব্যবসা থেকে এতবড় কারখানা গড়ে তুলেছে আর অন্যদিকে অতি সাধারণ একটা আধাভবঘুরে অবস্থা থেকে বাদল সরকার এসেছে এই রকম প্রতিপত্তিতে। কাজেই অনেক চাতুর্য দুজনের মধ্যেই আছে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু বাদল সরকারের লোভ তার এক্তিয়ারের চেয়ে তুলনায় অনেকই বেশী, তাই নোংরামী তাকে অনেকই ক'রতে হবে। মানুষ হিসেবে এই শুভেন্দু দত্তে আর বাদল সরকারে কোন তফাৎ নেই। ব্যবসায়ী দুজনেই, একজন প্রতক্ষ অন্যজন পরোক্ষে। নীতিশ এই দুই-এর মধ্যে প্রত্যক্ষ ব্যবসাটাকে দ্বিতীয়টির চেয়ে ভাল বলে মনে করে। তাছাড়া চলতি সময়ের এই আদর্শ বর্জিত রাজনীতি, সততা বর্জিত ব্যবসা, নিষ্ঠা বর্জিত শ্রম সবই সে অপছন্দ করে। ঘৃণা করে ধাপ্পাবাজীকে যা প্রতিমুহূর্তে নিজের ভাবমূর্তিকে খাটো করে যে কোন বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষের কাছে। আগে যখন বার্ড কোম্পানীতে চাকরী ক'রত একটা কারখানার বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে তখন নিজেকে এরকম নোংরামীর মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে হয়নি। কিন্তু প্রতিষ্ঠার লোভে এইখানে চাকরীতে এসে ম্যানেজার হয়ে মানুষের যে রূপ তার সামনে ফুটে উঠছে আর তাকেও প্রত্যহ যে সব ভূমিকা গ্রহণ ক'রতে হচ্ছে এই কারখানা চালাতে তার কোনটাই তার কাছে প্রীতিপ্রদ নয়, অথচ সে অবলীলাক্রমে সব ক'রে যাচ্ছে অত্যন্ত নিপুণভাবে! আরও আশ্চর্য এই যে নিজের কোন কাজই যেন আজকাল আর খারাপ বলে মনে হয় না, ভাল খারাপের পার্থক্য ক'রতে পারে কেবল অপরের কাজের বেলায়। অনেকদিন বাদ শুভেন্দুর সামনে বসে সে যেন আত্মসমীক্ষা ক'রতে পারল।

নীতিশকে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে দেখে শুভেন্দু বলল, কি করা যায় কিছু বলুন?

সমস্যাটা এতই জটিল যে আমি এত তাড়াতাড়ি এর কিছু সমাধান দিতে পারছি না। আমাকে একটু ভাবতে দিন।

ভাবুন। তবে অবস্থা যা বুঝছি তাতে অনেক বেশী সাবধানে থাকা দরকার।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নীতিশ বলল, এখন অনেক কিছুই হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। পোস্টার লাগানোর ব্যাপারে যারা বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে কারখানার পক্ষে তাদের অনেকেই মূল্যবান। তাদেরই মধ্যে আছে কারখানার কয়েকজন সেরা কর্মী। আগরওয়ালাদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা ক'রতে হলে ওরা অপরিহার্য।

আমি তা মনে করি না। সব কর্মীই বেতন নেয়। কাজেই সব কর্মীকে দিয়েই কাজ করিয়ে নিতে পারাটা আপনাদের দায়িত্ব।

নীতিশ জবাব দিল না। শুভেন্দু আর কি বলে শোনবার জন্যে চুপ ক'রে রইল। শুভেন্দু খুব দৃঢ় স্বরে বলল, যে যেমন কাজ ক'রবে তেমনি ফল তাকে ভোগ ক'রতে হবে আপনি বা আমি তাতে কি ক'রতে পারি? পুলিশ আইনে চলে, তারা কি করবে আপনিও জানেন না আমিও জানি না। আর পুলিশের কাজে মাথা গলানোও আমাদের অন্যায়।

নীতিশ মনে মনে প্রতিবাদ ক'রল শুভেন্দুর কথার, মুখে কিছু বলল না। পুলিশ আইনের নির্দেশমত চলবে এটাই সমাজের সর্ত, কিন্তু সে সর্ত খুব কম সময়েই পালিত হয় বলে তার অভিজ্ঞতা। বরং নিজের সুবিধামত কর্মকে আইনের রঙমাখানোর অবাধ ক্ষমতা পুলিশের আছে বলেই সমাজের অধিকাংশ বেআইনী কর্ম তাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই ঘটে থাকে। সব মানুষই জানে একথা, অথচ যাদের পক্ষে পুলিশ তার সহায়ক ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে যায় তারা সব সময়েই পুলিশের পক্ষে ওকালতি ক'রে তাদের গায়ের কাদা ধুয়ে দেবার চেষ্টা করে। তার ফলে ময়লা গেঞ্জির ওপর ফর্সা সার্ট পরে ঘুরে বেড়ানোর মত ক'রে কলঙ্ক ঢেকে ঘুরে বেড়াতে পারে এই অশান্তিবর্ধক বাহিনী। আজকাল সব মানুষই যেন তাই হয়ে গেছে — সবাই কমবেশী আত্মগোপন ক'রে চলাফেরা করে। এই চাকরী করার সর্তে যত কাজ তাকে ক'রতে হয় ছাত্রজীবনে কিংবা তারও আগে শৈশবে কি সে সব ভেবেছিল নীতিশ? কেউ ভাবে না, উন্নতির স্বার্থে সব মানুষকেই আত্মবিক্রয় ক'রতে হয় এই সমাজব্যবস্থার কাছে। তারপর অন্যরূপে আত্মপ্রকাশ এবং সেই রূপটিকেই স্বকীয়করণের মাধ্যমে অন্যজীবন। — সাপ খোলস ছাড়ে মানুষ খোলস পরে। জিততে হলে এইভাবেই চলতে হবে, আর, না জিতলে বাঁচার কোন অর্থই হয় না।

ক্ষণিকের জন্যে কি সব আবোল তাবোল ভাবছিল নীতিশ, এসবের কোন অর্থই হয় না। হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে সে উঠল, বলল, আমি তাহ'লে কারখানায় ফিরে যাই?

হ্যাঁ যান। —শুভেন্দু বলল, তারপর যেন পরামর্শ করার মত ক'রেই বলল, আমার তো মনে হয় পুলিশ যা ভাল মনে করে ক'রতে দেওয়াই ভাল।

নীতিশ উঠে দাঁড়াল। সে বুঝল এটা নির্দেশ। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও মানতে হবে। তবে চোখের ওপর একটা অন্যায় দেখেও চুপ ক'রে থাকতে হবে, এই আর কি! আসলে যাদের দোষ নেই তারাই সাব্যস্ত হবে অপরাধী! নীতিশ আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

শুভেন্দু চিন্তিত হয়ে পড়ল। নীতিশ-এর খবর নির্ভুল হয়। এই একটা অদ্ভুৎ দক্ষতা নীতিশ অর্জন ক'রেছে যা মাঝে মাঝে শুভেন্দুকেই বিস্মিত করে। কিন্তু খবর সংগ্রহে যত দক্ষতাই থাকুক নীতিশ-এর এখবর যাচাই না করা

ঠিক হবে না। তাকে নিজেকে এর সত্যাসত্য নিরূপণ ক'রতে হবে, তারপর কি করা যায় না যায় ভাবতে হবে। কিন্তু যদি ঘটনাটা সত্যি হয় তাহ'লেই বা করা যাবে কি? আগরওয়ালাদের পয়সার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়, তারওপর আছে টোডিরা। কিন্তু যে নোংরা মতলব আগরওয়ালারা ক'রেছে তাতে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে! সময়মত এই অর্ডারের মাল তৈরী ক'রতে না পারলে অর্ডার তো যাবেই উপরন্তু বহু টাকা দণ্ড দিতে হবে। সিকউরিটি হিসেবে জমা দেওয়া দেড় লক্ষ টাকা আর ফেরৎ পাওয়া যাবে না! তা ছাড়া গত তিন বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার এধরণের প্রায় কোন অর্ডারই পশ্চিম বাংলার কোন কারখানাকে দেয় নি। বেশ কতগুলো পুরোনো কারখানা তো তার ফলে উঠেই গেল। অতবড় কর্মবীর আলামোহন দাসের দেশবিখ্যাত কারখানাও শুকোতে শুকোতে আমচুর হয়ে গেছে —। অনেক কষ্টে অনেক কসরৎ ক'রে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এই অর্ডারটা যোগাড় করা গেছে, এটার কাজ না তুলতে পারলে সর্বনাশ অবধারিত। হতে কি দেবে? আসলে সব মানুষই বদলে গেছে। এতদিন তো প্রায় বসিয়ে টাকা দিয়ে এসেছি, এখন যেমনি কাজ পড়েছে অমনি পুরোনো কর্মীরা পর্যন্ত চাপ দিতে আরম্ভ করেছে মাইনে বাড়াও। ওরা পর্যন্ত একটু বুঝল না? মানুষ বড় বেইমান! সত্যি বেইমান! সেই মণ্ডল কোম্পানীর ছোট্ট কারখানাটা কেনার দিন থেকে যারা কাজ ক'রছে ওই গোলক, নিশাপতি, ইয়াকুব, শ্রীশ ওদের কি বিবেকে একটু বাধল না! যেদিন কামারশালার মত কারখানায় মণ্ডল কোম্পানীর চাকরী ক'রছিল মাইনে পাচ্ছিল কেউ একশ কেউ একশ পাঁচ, আর আজ পাচ্ছে সোয়া দুশোটাকা — দুগুণেরও বেশী! অথচ সেজন্য একটু কৃতজ্ঞতা নেই! আবার বলে কি মালিকের মূলধন বেড়েছে পঞ্চাশ গুণ! একেবারে হিসেব নিকেশ ক'রে রেখেছে সব! গুণে দেখেছেন! এই জন্যে তো কিচ্ছু হচ্ছে না দেশটার! এখন সব মানুষই পরশ্রী কাতর। নিজের ক্ষমতা কেউ যাচাই ক'রবে না অন্যে কিছু ক'রতে পারলেই চোখ টাটাবে! এতে ধ্বংস হবে না তো কি হবে? সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সব শেষ হয়ে যাবে, না খেয়ে মরবে সব লোক। অথচ আশ্চর্য ব্যবহার টোডিদের! এত যে শত্রুতা ক'রছে তলায় তলায় ওপরে কি একটু বোঝবার উপায় আছে! গজানন টোডি — আসল যে কর্তা এই সেদিন পর্যন্ত টেলিফোন ক'রে কত কথা! সামান্য একটা ছুতো নিয়ে টেলিফোনে এমনভাবে কথাবার্তা বলে গেল যে শুভেন্দুর মত আপন লোক এ সংসারে টোডিদের আর কেউ নেই! ওইরকম মনগলানো ব্যবহারের কথা মনে পড়লে সত্যি বিশ্বাস ক'রতেই ইচ্ছে করে না যে আগরওয়ালাদের পেছনে টোডিদের হাত আছে। গজাননবাবুকে যে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস ক'রবে তাও তো অসম্ভব। তার চেয়ে বোকামী আর কিছু হবে না। কোন সাহায্যই তাদের দিয়ে পাওয়া অসম্ভব। তবে কথা বলবে

সরাসরি বাদল সরকারের সঙ্গে? তাতে কি ফল হবে? তাকে কি বলা যাবে একথা? সেও বোধহয় বিপরীত ফল হবে। স্বীকার তো বাদল করবেই না, উপরন্তু বিগড়ে যেতে পারে, এখন যে ওপর ওপর সদ্ভাব আছে তাও না থাকতে পারে। কিন্তু না থাকলেই বা ক্ষতি কি? তাকে দিয়ে কোন লাভ যখন হবেই না তখন — পরক্ষণে মনে হ'ল লোকসান তো বেশী হতে পারে মরিয়া হয়ে লেগে যেতে পারে তো তার পেছনে? পুলিশ কতটুকু সাহায্যই বা আর ক'রতে পারবে? আজকাল আবার পুলিশের মধ্যে ওদের দলের সমর্থক রয়েছে ফলে ওদের বিরুদ্ধে আগেকার মত সাহায্য কিছুতেই পাওয়া যাবে না। এখন কি উপায়? শুভেন্দু ক্রমাগত ম্লান হয়ে পড়ল। পরামর্শ দেবার মত একজন লোকও এসময় সামনে থাকলে অনেকটা হাল্কা হওয়া যেত। মনে হচ্ছে একটা বিরাট বোমা কেউ যেন বুকের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, সেটা এমনই অদ্ভুৎ যে ক্রমাগত ভারী হচ্ছে।

সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনেকটা বিরক্ত হয়েই সরে গেল স্বগত। শুভেন্দু লক্ষ্য ক'রল, ভাবল, যাক। নেহাৎ কর্তব্যবোধের তাড়নায় যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটা। হয়ত ওকে দিয়ে কাজ করানো যায় কিন্তু ওকে সাহায্যকারী মনে করা যায় না, সে ওর মানসিকতার জন্যেই। এ অনেকটা ষাঁড়কে দিয়ে বলদের গাড়ী টানানোর মত হচ্ছে। অথচ একান্ত গোপন কাজে অন্য কাউকে বিশ্বাস করার চেয়ে ছেলেকেই পাঠাতে হয় তাই স্বগতকে কাজে লাগাতেই হয় তার মনের দিকে না চেয়ে। তবে ক'রবেই বা না কেন? কাজ না ক'রে বসে খেতে ভাল লাগে মানুষের? প্রশ্নগুলো পর পর মনের ওপর ভেসে ওঠে শুভেন্দুর। আজকাল এখানে সেখানে পথের ওপরে প্রায়ই চোখে পড়ে দাঁড়িয়ে গল্প ক'রছে অল্পবয়স্ক ছেলেরা। এমন শিথিল ভঙ্গীতে তারা সব দাঁড়িয়ে কথা বলে যে মনে হয় কারও কোন কাজ কর্ম নেই। এদের সকলেরই যে কাজের অভাব শুভেন্দু মনে করে না, তার মনে হয় কাজ করবার স্বভাবের অভাব। কাজ অনেকেরই হয়ত আছে ক'রতে চায় না। তার নিজের ছেলেদের ব্যাপারেই তো সেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সৌগত পড়াশোনা শিখল কিন্তু ব্যবসা পছন্দ ক'রল না, শুভেন্দু বোঝে সৌগত দায়িত্ব কম নিতে চায়। নিজের ব্যবসার দায়িত্ব তার অপছন্দ। চাকরীতে নিশ্চয়ই তার কম দায়িত্ব নিয়ে অথবা দায়িত্ব পালন না ক'রে চলে তাই সেখানেই রয়ে গেল সে। স্বগত লেখাপড়া অত শিখল না ভাল লাগাতে পারল না বলে, কিন্তু কাজে নিরুৎসাহ তারও সেই সমান। শুভেন্দু বুঝতে পারে না এরকম কেন হয়? কাজের উদ্যম থাকলে কাজ অনায়াসে জুটিয়ে নেওয়া যায়, কাজ তৈরী ক'রে নিতে পারে মানুষ, অথচ এই স্বগত কাজ থাকা সত্ত্বেও ক'রবে না। ওই যে যাদের সব রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প ক'রতে দেখা যায় তারাও সব এদেরই মত।

স্বগতর ব্যাপারে মনটা অন্য চিন্তায় চলে গিয়েছিল। টেলিফোন বেজে ওঠায় কেটে গেল সেই চিন্তাসূত্র।

অবনী বলল, আজ আপনার ইন্সপেকশন আছে, মনে আছে তো?

একটা নোট পড়ছিল সৌগত, চোখ তুলে জানতে চাইল, কাপানীর কাজ তো? ওর বেলেঘাটা সাইট ইন্সপেকশন আজ হবে না।

অবনী একটু বিস্মিত হ'ল। কাপানী ব্রাদার্স-এর কাজ সময়মত হবে না এটা ব্রিজমোহন কাপানী সহ্য ক'রবে কি? বৃহত্তম সাহেব ওয়ার্ধা থেকে সুরু ক'রে ঘনশ্যাম বেয়ারা পর্যন্ত এ অফিসের প্রত্যেক লোক ব্রিজমোহন-এর অর্থ পুষ্ট। প্রত্যেকের শরীরে ব্রিজমোহন-এর পয়সায় খাওয়া খাবারের পোষ্টাই আছে, প্রত্যেকের বউ ছেলেমেয়েদের গায়ে আছে ব্রিজমোহন-এর পয়সায় কেনা পোষাক। আর ওই কাপানী ব্রাদার্সের মদে কতদিন সৌগত নিজেই বেহুঁস হয়ে থেকেছে সে খেয়াল নেই? আজ কাজ হবে না বললেই হ'ল? ব্রিজমোহন কাপানী শুনবে? এ আর সুজয় ঘোষ নয়। সুজয় ঘোষ ঠিকেদারী করে সৌগত দত্তর উমেদারী ক'রে, কাপানী সকলকে তুষ্ট করে ঠিকই কিন্তু সবচেয়ে বড়কর্তার টিকিটি সে বেঁধে রেখে দিয়েছে। বড়কর্তার ফ্লাটের ইলেকট্রিকের বিল, মাসিক দুধের বিল, রান্নার গ্যাসের বিল, বাবুচির বেতন সবই মেটানো হয় কাপানীর অফিস থেকে। প্রমাণ নেই কিন্তু অবনী জানে। প্রমাণ অবনীর কাছে আছে। তাতে অবনীর যায় আসে না কিছু, বরং ওয়ার্ধার মত বড়কর্তা আছে বলেই দুচারপয়সা উপরি আয়ের ব্যবস্থা এখনও আছে, নইলে মুখার্জী সাহেব-এর মত কর্তার পাল্লায় পড়লেই হয়েছিল আর কি। তবে মিস্টার ওয়ার্ধার আগে যে বিষেণ সিং ছিল সে ব্যাটা আবার অন্যরকম। সব পয়সা নিজেই নেবে। আর অফিসের সকলকে দিয়ে চাপ দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে। অন্য কাউকে পয়সা পেতে দেবে না কিছুতেই। এই সব ভেবেচিন্তে অবনী আমতা আমতা ক'রে বলল, ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে না দাঁড়ায় —

অন্য রকম আর কি হবে, সৌগত জানতে চাইল।

না, বলছিলাম কি ওদের ব্যাপার তো জানেন —

সৌগত কোন জবাব দিল না। আসলে সে অবনীবাবুর কাছে একটু দর বাড়াতে চাইছিল। ব্রিজমোহন কাপানীর সঙ্গে তার যে গোপন চুক্তি সেটা যাতে এই ঘুঘু বড়বাবুটি না বুঝতে পারে তাই এই অভিনয়। কাপানীদের সম্পর্কে উপেক্ষা দেখিয়ে সে কাপানীদেরকে অন্য দশটা ঠিকাদারের স্তরেই রাখতে চায়। বিশেষ সংযোগটা যাতে কেউ বুঝতে না পারে। তাছাড়া ব্রিজমোহন কাপানী সম্বন্ধে বিশেষ সমীহের ভাবটা যে অমূলক এটাও তার প্রতিপাদ্য। সে

যে অন্য সকলের মত কাপানীকে সমীহ ক'রে চলে না এটাও এই কেরাণী-কূলের প্রধানটিকে বোঝাতে চায়।

কিন্তু অবনী কেরাণী অন্য কথা বুঝল। তার ধারণা হ'ল দরদস্তুরে বোধহয় মনে নি তাই এরকম বলছে দত্ত সাহেব। কিন্তু দরদস্তুরের কাজটা সে-ও তো ক'রে নিতে পারত তাকে বললে, কি দরকার ছিল অকারণ ঝামেলার রাস্তায় যাবার? সে যে দরদস্তুর ক'রে দেয় নি এমন তো নয়? কত নতুন ঠিকেদারের সঙ্গে দরদস্তুর ক'রে সে সাহেবদের খুশী ক'রে নিজের দুপয়সা রোজগার ক'রে ঠিকেদারদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। আপন অনুমানটিকে যাচাই ক'রে নেবার জন্যে সে বলল, যাই বলেন ব্রিজমোহন কাপানী বড্ড কৃপণ।

সৌগত ধরা দিল না, বলল, কৃপণ লোকে ব্যবসায় উন্নতি ক'রতে পারে না।

তা যা বলেছেন। তবে পয়সা কিন্তু কৃপণ লোকেরাই জমাতে পারে।

ঠিক কথা, সৌগত বলল, পরক্ষণেই হাল্কা স্বরে বলল, কাপানীকে কৃপণ বলছেন কেন? মালের দাম দেয় নি বুঝি? আপনার আর কতই বা লাগে, দিশিও চলে তো?

কি যে বলেন! — অবনী বলল, আজকাল দিশী মাল যা হয়েছে সে কি খাওয়া যায়? অবরে সবরে দুএকদিন একটু খাই — দিশী — বড় কষ্ট দেয় শরীরে।

কেন? সেদিন যে আপনাকে ওয়েলেসলীতে দেখলাম? — ঠাট্টা ক'রে মিথ্যে কথা বলল সৌগত অবনীকে পরীক্ষা করবার জন্যে।

কোনদিন বলুন তো?

সৌগত হেসে বলল, অত কি সময় তারিখ লিখে রেখেছি? পথ চলতে দেখলাম তাই বলছি। আপনি মনে হ'ল ঢুকছেন।

অবনী অস্বীকার ক'রতে পারল না, বলল, নিজের পয়সায় খেলে কোনদিন — কি আর রোজগার বোঝেনই তো। তারপর আবার পাঁচটা ছেলেমেয়েই পড়ে — সামলানোই দায়!

সৌগত মজা পেয়ে গেল, জানতে চাইল, পড়ে তো পাঁচটা আর পড়ে না ক'টা?

না ওই পাঁচটাই —।

তবে তো মশাই কাজ কম্মোও ভালই ক'রেছেন —

কি আর বুঝবেন, বিয়ে তো ক'রলেন না —

ক'রলে কি বুঝতাম?

অবনী তার বিশাল মুখে একটু লাজুক হাসি মাখিয়ে বলল, সে আর বলে কি বোঝাব? ঘরে স্ত্রী এলেই বুঝবেন।

সৌগত হাসতে হাসতেই বলল, হ্যাঁ সেইভয়েই তো মশাই ওসব এড়িয়ে আছি। ওসব না হয় পরে হবে আপাততঃ একটা ভাল দেখে টাটকা মেয়ে

জোগাড় ক'রতে বলুন তো আপনার চেলাদের। দেখবার মত একটা মেয়ে পাওয়া যায় না আপনি আবার বলেন বিয়ে ক'রলে বুঝব।

অবনী গদগদ হয়ে বলল, কি যে বলেন — আপনার মত বয়েস থাকলে একশটা মেয়ে জুটে যেত আপনি বলেন একটা।

সৌগতর হাসিতে এবার শব্দ হ'ল, বলল, কথা বলাটা আপনার মত জানতে হ'ত সেটাও বলুন ?

কিচ্ছু না কিচ্ছু না। এই মাগ্‌গীগণ্ডার দিনে মেয়েরাই তো ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাদের কালে ছিল যখন মেয়ে খুঁজতে হ'ত। এখন এক সন্ধ্যে ভরপেট খাওয়ালে অমন একশটা ভদ্দরঘরের মেয়ে গা ঘেঁষটে বসে থাকবে।

ব্যস ?

কত মেয়ে আছে বাপ বিয়ে দিতে পারবে না জানে, বিয়ের আশায় ছেলে ধরে বেড়ায়।

তারা তো মশাই বিয়ের জন্যে আসবে — সৌগত অজ্ঞের অভিনয়ে বলল।

অতটা অজ্ঞতা অবনীও বিশ্বাস ক'রতে রাজী হ'ল না। সে বিরক্ত হয়ে বলল, কে কেন আসবে আর কে তাকে দিয়ে কি ক'রবে সে আপনিও জানেন আমিও জানি। নইলে মশাই দেশভরে গর্ভস্রাবের কারখানা খুলত না।

সৌগত অবনীর কথা উপভোগ ক'রে খুব এক চোট হেসে বলল, বেশ বেশ বুঝলাম এবারে যান কাজ করুন গে।

কয়েক পা হেঁটে চলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে দাঁড়াল অবনী, অন্তরঙ্গ সুরে বলল, ভাগীরথী উদ্যোগ বলে নাম রেজিস্ট্রি তো হ'ল এবার একটা কাজ পাইয়ে দিন। কি বলি বলুন তো ?

কাজ নিতে বলুন। কাজ পাইয়ে দেবার মালিক কি আমরা ? টেণ্ডার দিয়ে যদি নিতে পারে তো নিক আমরা কি ক'রব।

লোকটা বড় নাছোড়বান্দা।

আচ্ছা ওর কি বলুন তো ? ও তো মালিক নয়, কমিশন-টন পায় নাকি ?

জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম, বলেছিলাম আপনি তো মশাই খগেন বোস আর ভাগীরথী উদ্যোগ-এর মালিক তো যতদূর জানি জগদীশ কুণ্ডু। আপনার এর মধ্যে স্বার্থটা কি ? কমিশন পাবেন কাজ ধরে দিলে ? —তা সে বললে, না মশাই কমিশন, মালিককে জবাব দেব কি ? একটা কাজও না পেলে এই যে রোজ যাতায়াত ক'রছি এর কি কৈফিয়ৎ দেব ?

ওর নাম খগেন বোস নাকি ?

তাই তো বলল।

আপনিও তো বোস ?

না মশাই আমি আদিত্য। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতার পরিচয় জানতে চান ?

কথাটা ঠাট্টা ক'রেই বলেছিল সৌগত, এবার আবার বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ আমারই ভুল হয়েছিল। আপনি তো আবার যশোরের জায়গীরদার সেই প্রতাপ আদিত্যের বংশধর।

কথাটা শুনে অবনী কেরাণী খুশি হয়। বেশ কিছুদিন আগে এই কথাটা সে নিজেই এই অফিসে ঘোষণা ক'রেছিল বেশ আড়ম্বর ক'রে। আর সেই আড়ম্বরের জের টেনে চলে এখনও তার সহকর্মীরা, বিদ্রূপ ক'রে বলে, বড়বাবু হলেন গিয়ে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের উত্তরপুরুষ—অন্য একজন তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বলে, সেটা তো দেখলেই বোঝা যায়। আবার কেউ কেউ আরও এগিয়ে বলে, যশোরের না রে, চিতোরের, রাণা প্রতাপ।

কখনও কখনও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ খুব প্রত্যক্ষ হয়ে পড়ে, তখন মনে মনে তাচ্ছিল্য ক'রে ওদের কথায় কাণ না দেবার ভাণ করে অবনী, আবার যখন আলোচনাটা খুব কমের ওপর দিয়ে গিয়ে থেমে যায় তখন বেশ নির্বিকার ভাবেই তা হজম করে অবনী আদিত্য। তবে যদি কখনও নতুন কোন লোকের কাছে তার সহকর্মীদের কেউ প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে বলে কথাটা সংবাদের মত ক'রে, সে বেশ আত্মপ্রসাদই লাভ করে এই ভেবে যে কথাটা অন্য একজন জানল তো — !

অবনীর এই দুর্বলতার কথা অফিসের বাঙ্গালী কর্মীদের সকলেই জানে, সৌগতও। আর সমপর্যায়ের কর্মী ছাড়া একমাত্র সৌগতই এ নিয়ে একটু আধটু হালকা ঠাট্টাতামাসা ক'রে থাকে। কিন্তু সৌগত তার ওপরওয়ালা, তার কথাকে বিদ্রূপ মনে করে না অবনী। সেই জন্যেই সে বলল, জায়গীরদার নয়, রাজা।

সৌগত টেবিলে কাগজপত্রের দিকে তাকিয়েছিল আগে থেকেই, মুখ নিচু ক'রেই সে হাসল। অবনীর প্রতিবাদের কোন জবাব দিল না এবং অবনীকে বিদায় করার জন্যে নিজের ফাইলে আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ ক'রল।

অতএব অবনীকে যেতেই হ'ল।

কিন্তু কাজ ক'রতে পারল না সৌগত বেশীক্ষণ। বিদেশী সেন্টের একঝলক সুগন্ধ তাকে বিশেষ কোন আগন্তুক সম্পর্কে সজাগ ক'রে তুলল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভাষণ শুনল, গুড আফটারনুন মিস্টার দাত্তা।

মুখ তুলে দেখল জুনিয়ার সাহানী অর্থাৎ ব্রিজমোহন-এর ভাই জগমোহন এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যরকম প্রসন্নতা ফুটে উঠল সৌগতর মুখে, নিজের মাতৃ-ভাষার বদলে জগমোহন-এর ভাষা নকল ক'রে হিন্দিতে বলল, আরে আসুন মিস্টার সাহানী। আপনার দেরী দেখে ভাবলাম আমাকে আজ ছুটি দিলেন। আজ আর যেতে হবে না।

জগমোহন জানাল, অনেক আগেই এসে পড়তাম পথে দেরী হয়ে গেল। মুস্কিল কি জানেন আমি নিজে যখন গাড়ী চালাই কোন জানাশোনা লোক

দেখলে লিফট না দিয়ে পারি না, এটা আমার অভ্যেস।

অপ্রয়োজনীয় একথার কোন উত্তর দিল না সৌগত। আর তার উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রেই জগমোহন বলতে লাগল, আমার এক বান্ধবী জুটে গেল পথে। দেখি সে যাচ্ছে, জানতে চাইলাম কোন দিকে, বলল, সিনেমায়। তা একলা কেন সিনেমায় যাবে, চল বরং একটু গল্প-সল্প করা যাক। বলতে চলে এল। তাই দেরী হয়ে গেল।

সৌগত ইঙ্গিতটা বুঝল। কোথা থেকে কোন বাজারের মেয়েছেলেকে সাতটাকার শুকনো চুক্তিতে নিয়ে হাজির ক'রেছে ব্যাটা। ওর জন্যে ওর বান্ধবীরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধরল আর উঠিয়ে নিয়ে এল। তুমি যদি ব্যাটা অমনি মুখে ছোপ পড়া একটা ছাপরা ঘরের মেয়েমানুষ উঠিয়ে নিয়ে এসে থাক তবে তুমিই শালা যাবে তাকে নিয়ে, আমি যাচ্ছি না। ঠাট্টা ক'রে সে বলল, তা বান্ধবী যখন জুটে গেছে তখন আর কি হবে আমাকে ঝামেলায় জড়িয়ে, তুমি যাও একটু স্ফুর্তি-টুর্তি করগে আমি ঝামেলা থেকে বাঁচি। —কথাগুলো খুবই অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে বলল সৌগত, যেন কতদিনের বন্ধুত্ব জগমোহনের সঙ্গে।

আমার স্ফুর্তি তো ওই 'ওয়ার্ক' সাইটেই আছে। আপনি ওখানে গেলেই আমার সবচেয়ে বেশী স্ফুর্তি হবে, জগমোহন জানাল, আপনার কোন অসুবিধে হবে না, আমিই নিয়ে যাব আবার যেখানে বলেন পৌঁছে দেব আপনাকে।

নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন হাতের ফাইলটা ভাঁজ ক'রল সৌগত। তারপর বলল, প্রোগ্রাম আছে বলেই যেতে হচ্ছে নইলে এখন আমার যাবার ইচ্ছে আদৌ ছিল না। তাছাড়া ব্যাপারটা খুব সরল নয়।

কিচ্ছু ঝামেলা নেই স্যর এতে, একেবারে সাফা, সাদা আছে।

হ্যাঁ সাদা তো আছেই। আমার কাছে খবর আছে পঞ্চাশটন সিমেন্ট আপনারা ওই কাজের থেকে সরিয়েছেন। অবশ্য এটা আনঅফিসিয়ালি আপনাকে জানালাম।

কি বলেন স্যর! এতবড় একটা মিথ্যে খবর আপনি কোথায় পেলেন? কিছু বদমাস লোক এসব বাজে কথা বলে।

কথাটা গায়ে মাখল না সৌগত। গায়ে মাখলে গালাগালিটা তাকেই তুলে নিতে হয়। অথচ সৌগত মনে মনে সাহানীদের শক্তি অনুমান ক'রে নিয়েই এই অপ্রত্যক্ষ গালাগালি গোয়েন্দা কাহিনীর নায়কের কাণের পাশ দিয়ে দুর্বৃত্তের গুলির মত চলে যেতে দিল। কিন্তু একথার রেশ এখানে থামিয়ে দিলে যেহেতু পরাজয় প্রত্যক্ষভাবে মেনে নিতে হয় তাই সে বলল, দেখুন মিস্টার সাহানী দুনিয়ার সবাই আপনার শত্রু নয়। তাহলে আপনার বেঁচে থাকা অসম্ভব হ'ত। অতএব সবাই আপনাদের নামে মিথ্যে বলবে এমন অনুমান যথার্থ নয়। আপনাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন লোকের মারফৎই

খবর এসেছে।

ওসব খবরের কোন 'বেস' নেই। জগমোহন প্রতিবাদ করল।

আছে কি নেই এনিয়ে তর্ক তুলতে চাই না। আপনারাই ভেবে দেখবেন। যদি তর্ক ওঠে এবং খোঁচাতে হয় তাহ'লে 'স্ট্যান্ড' ক'রতে পারবেন কিনা একটু চিন্তা ক'রবেন।

জগমোহনকে এবার থামতে হ'ল। আর এগোনো ঠিক নয়। লোকটি দারুন ধুরন্ধর। পয়সা খাবার জন্যে সব খবর সংগ্রহ ক'রে রাখে। এমন ভাবে চাপ রাখে যাতে ওর আয়ত্তে থাকতেই হয়। শয়তান। মনে মনে গালাগালি দিল জগমোহন। তবে একটা দিক ভাল যে কখনও ঝামেলা করে না, চাপ দিয়ে পয়সা আদায় ক'রে নেয় বটে কিন্তু সুবিধে সব রকমই দেয়। তবে আসলে লোকটা বোকা। চাপ দিয়ে যে বেশী আদায় ক'রবে তা করে না। আজকাল তো আরও সুবিধে হয়ে গেছে, কোন ভাল হোটেলে একরাত ভাল খানাপিনা আর শোবার জন্যে একটা মেয়েমানুষ, ব্যস। তবে মুস্কিল হচ্ছে এক মেয়েমানুষই দুবার চলবে না। এদেশে মেয়ের অভাব নেই এই যা নইলে এই রকম লোককে মেয়ে যোগাতে হয়রাণ হয়ে যেতে হ'ত। আসল শেয়ানা অফিসার ছিল খুরানা। পয়সার হিসেব এত বেশী বুঝত সে শালা যে সে কথা বলবার নয়। দিল্লির কাজে সে শালা একেবারে হয়রাণ ক'রে দিয়েছিল। একটা ইঁট যদি কোথাও কম লাগানো হয় তো সে তাও গণে রাখে, আধখানা ইঁটের দাম আদায় ক'রে নেবে নিজের ভাগ বলে।

সামনে ভুঁড়িটাকে দোলাতে দোলাতে অবনী এসে দাঁড়াল এক মুখ হেসে। সম্ভাষণ ক'রল, এই যে জগমোহন বাবু এসে গেছেন? তা ওদিকে তো কই দেখলাম না?

আগে সাহেব-এর কাজ সারি তারপর আপনার আদালতে হাজির হব। জগমোহন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না ক'রেও বলল।

অবনী আমতা আমতা ক'রে বলল, না মানে আমার সেই আগের হিসেবে একটু গোলমাল ছিল। আপনি ব্রিজমোহন সাহেবকে বলতে বলেছিলেন, উনি বললেন, আপনি যা ক'রে দেবেন তাই হবে। যা হোক আপনি যদি আমার ওদিকে আসেন তো ব্যাপারট্যার—

জগমোহন মনের মধ্যে অসন্তুষ্টি চেপে রেখে বলল, আজ নয়। পরে যখন আসব ক'রে দেব।

আর কথা বাড়াল না অবনী। সৌগতর টেবিলের ওপর থেকে একটা ফাইল বেছে নিয়ে বলল, আপনার কাজ হয়েছে? তাহ'লে ফাইলটা আমি নিয়ে যাই --

যান — গাম্ভীর্যে নিজেকে ঘিরে অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ ক'রে সৌগত বলল। এবং নিজে কাগজপত্রের মধ্যে চোখ গুঁজে রইল।

জগমোহন সিগারেট-প্যাকেট বের করে খুলে টেবিলে ঝুঁকে থাকা সৌগতর চোখের সামনে মেলে ধরল। বিদেশী সিগারেট। দামের দিকে কুলীন নিঃসন্দেহে, কিন্তু সৌগত ব্যবহার করে প্রায় দামে সমতুল্য হলেও দেশী। তার ভাল লাগে। সিগারেট-এর বেলা, সে মনে করে, দেশী জিনিষই উত্তম। তবু সে ভদ্রতা ক'রে একটা তুলে নিল। মুখ তুলে বলল, ধন্যবাদ। — তারপর নিজের পকেট থেকে যে গ্যাস লাইটার বের ক'রল সেটা বিদেশী।

জগমোহন সিগারেট খায় না, পকেটে রাখে। অন্য কাউকে সিগারেট এগিয়ে আপ্যায়ন ক'রতে হলে ভদ্রতা হিসেবে নিজেও ধরায় একটা। সেটা যত না টানে তত ধরে থাকে। অপর জনের সিগারেট ফুরিয়ে এলে নিজের হাতে ধরা আধপোড়া সিগারেটটা ফেলে দেয়। অন্যে মনে করে অর্ধেক সিগারেট ফেলে দেওয়াটা ওর বড়লোকী বিলাসিতা। আর ঠিক সেইভাবেই নিজেও একটা সিগারেট ধরালো জগমোহন। তারপর বেশ ভারিক্কী চালে বলল, জানেন মিস্টার দাত্তা কিছু লোক আছে যারা কোন কাজ ক'রতে না পারে তারা অন্যের বেশী সমালোচনা করে। যারা কাজের লোক হয় তারা কখনও অন্যের কথা বলে সময় নষ্ট করে না, নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

সৌগত কথাটায় সায় দিল কিন্তু হঠাৎ একথা যে জগমোহন কেন বলল তা ধরতে পারল না। খুব বেশী চেষ্টাও ক'রল না সেটা বোঝবার। ব্রিজমোহন সাহানীর চেয়ে অনেক কম বুদ্ধি ধরে এই জগমোহন কিন্তু বড়ভাইকে একেবারে নকল ক'রে চলে। ব্রিজমোহন মাঝে মাঝে এমনি ধরণের এক একটা দার্শনিক সুলভ কথা বলে যেটা প্রকৃতই তাৎপর্যপর্ণ, কিন্তু জগমোহন তাকে অনুকরণ ক'রতে গিয়ে অর্থহীন কথা অনেক সময়েই বলে ফেলে। সৌগত তা জানে বলেই ওই সব অপ্রয়োজনীয় কথা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। তাছাড়া এদের কাছে এইসব দার্শনিক কথা শুনে লাভই বা কি? শুনতে ভালও লাগে না। বরং চোরাই সিমেন্টের হিসেব নিয়ে টানাটানির কথাগুলোই এদের মুখে শুনতে বেশী ভাল লাগে সৌগতর। সাহানীদের মুখে দার্শনিক কথাবার্তা, তার প্রাক্তন সহকর্মী ব্যানার্জীর মদ খেয়ে ভাড়াটে মেয়েমানুষকে বগলে জড়িয়ে—জীবনটা অনিত্য। এর কোন মাইরী মানেই হয় না — বলার মত শুনতে লাগে। সেই ব্যানার্জীর কথাই মনে পড়ে। প্রথম যেবার ব্যানার্জীর সঙ্গে প্রোগ্রাম হয় সেই সন্ধ্যেটার কথা ভালই মনে আছে সৌগতর। সেদিন ছিল তখনকার নিয়মে 'ড্রাই ডে' — অর্থাৎ সমস্ত পানশালা বন্ধ, গোটা কলকাতার মদবিক্রির দোকানগুলো পর্যন্ত বন্ধ। কাজেই ম্যাডান স্ট্রীটে অনুপমার চারতলার ফ্ল্যাটেই আশ্রয় নিতে হয়েছিল তেষ্টার চোটে! সৌগতর সেখানে প্রথম পদক্ষেপ হলেও ব্যানার্জী ছিল পুরানো খদ্দের। দুচার গ্লাস পেটে পুরেই সে রাত্রে এমনই ভাব এসে গেল ব্যানার্জীর যে কাঁচুলী আঁটা অনুপমার সরু কোমরটা জড়িয়ে ধরে টেনে কোলের ওপর বসিয়েই আরম্ভ হয়ে গেল তার পরমবাণী, যাই বল

দত্ত জীবনটার কোন মানেই হয় না। পৃথিবীটা সত্যিই শূন্যের ওপর ঝুলছে। আমরা সব শূন্যে ঝুলছি। এই শালা ফসকে গেলাম তো গেলাম! কোথায় ফসকে যাব তার ঠিকানা নেই। একেবারে ফক্কা। তুমিই বল মাইরী অনুপমা, তোমার এই চাবুকের মত দেহখানা এর দাম এই বোতলের মালটুকুর চেয়ে বেশী কি? — কথাগুলো শুনতে বড়ই বিশ্রী লাগছিল সেদিন সৌগতর কিন্তু কিছু করবার ছিল না, প্রতিবাদও নয়। আজ আবার ঠিক সেই রকমই বাজে লাগল কিন্তু মুখ বন্ধ ক'রে বিস্বাদ ওষুদ গেলবার মত ক'রে শুনে চুপ ক'রে রইল সৌগত।

জগমোহন-এর খুবই বিশ্রী লাগছিল চুপচাপ বসে থাকতে। লোকটা হাতের কাগজপত্র গুছিয়ে যে উঠবে তার কোন লক্ষণ দেখাচ্ছে না। মনে হচ্ছে শুধুমাত্র সময় নষ্ট করবার জন্যেই কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া ক'রছে দত্ত। তাই সে আবার বলল, আজ সময় যা হয়েছে তাতে আমাদের সাইটে গেলে নিশ্চয়ই ফিরে এসে আর অফিস করবার সুযোগ থাকবে না?

হাতঘড়িটা দেখে সৌগত বলল, না। এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। তা আজই না গেলে নয়?

ওরেব্বাস — অনেকটা শুধু শব্দ ক'রে উঠল জগমোহন, বলল, আজ এটা এত জরুরী যে তা আর বলবার নয়। কাল সন্ধ্যার ফ্লাইটে বড়ভাই দিল্লী চলে যাবেন। তার আগে কাল সকালে মিস্টার ওয়ার্ধার সঙ্গে এখানকার কাজ চুকিয়ে যেতে চান।

সৌগত বলল, আচ্ছা আমি না থেকে এখানে যদি মিস্টার মুখার্জী থাকত তাহ'লে কি হ'ত?

নামটা শুনেই জগমোহন যেন আঁতকে উঠল, বলল, আরে বাপ! মুখার্জী সাহেব-এর নাম ক'রবেন না। মুখার্জী সাহেব দিল্লী গেছেন ভগবানকে বহুৎ ধন্যবাদ। আচ্ছা আমি বুঝি না কি ওঁর বেনিফিট! ওঁর মত লোক কি লাভ পায় এই সরকারী কাজে থেকে। উনি যদি আমাদের ফার্মে আসতেন তো এখান থেকে ওনাকে সরাবার জন্যে আমরা দুগুণা তনখা দিয়ে ওনাকে রাখতাম। ওসব লোক ভাল প্রাইভেট ফার্মের জন্যে।

রসিকতা করবার জন্যে সৌগত বলল, উনি তো আবার সামনের মাসে আসছেন।

না। কখনও নয়। ওনার তো আসবার কোন চান্স নেই। যদিই আসেন তো সে অনেকদিন বাদ। তাও অন্য পোস্টে, প্রমোশন দিয়ে আনতে হবে।

কেন?

কেন জানিনা। নইলে ঠিকাদাররা মরে যাবে।

এতদিন তো মরে নি?

তবে কি জানেন? মুখার্জী সাহেব মানুষ যতই সাধু হোন ওনার বদনাম হয়ে যাবে। কারণ ওনার আমলের চেয়ে এখন রেট কম পড়ছে। ওনার

আসলে ফাঁকিবাজী চলত না বলে ঠিকাদাররা কম রেট-এ কাজ নিত না। এখন দেখুন কত কম রেট-এ কাজ নিচ্ছে সবাই। সরকার কি দেখবে, কাগজ দেখবে। সরকার কাগজে দেখবে এখন কম রেট-এ কাজ হচ্ছে কাজেই এখনই এফিসিয়েন্টলি কাজ হচ্ছে। তাই না?

সৌগত এদের হিসেব নিকেশ দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। আরও শুনল জগমোহন বলছে, আলটিমেটলি দেখবেন মুখার্জী সাহেব-এর চেয়ে আপনি বেশী প্রমোশন পাবেন। এ আমার ফোরকাস্ট, মনে রাখবেন। ব্যাপারীদের ফোরকাস্টে ভুল হয় না।

এসব হিসেব বিশ্বাস ক'রতে না পারলেও মনে মনে বেশ খুশীই হল সৌগত। হিমন্ম মুখার্জী পদমর্যাদায় সৌগতর ওপরে বলেই নয়, অন্য কোন অজানা কারণে কেমন যেন ছোট মনে হয় নিজেকে মুখার্জী সাহেব-এর সামনা-সামনি ধরলে। হিমন্ম মুখার্জীর বাবা হেমেন মুখার্জী ছিলেন এককালের নামী স্থপতি — সিভিল ইনজিনীয়ার, কাকা হিমানীষ এখনও জীবিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, ঠাকুর্দা এমনই নামকরা ডাক্তার ছিলেন তাঁর সময়ে যে এখনও লোকে নাম করে। সৌগত এসব জানে, জানে বলে হয়ত ঈষৎ ঈর্ষা ক'রে থাকে কিন্তু সমীহ করে অন্য কোন কারণে, আর সে এমনই কারণ যা সে জানেও না বোঝেও না। তাই তাঁর অসাক্ষাতেও তাঁর প্রসঙ্গ উঠলে প্রত্যাক্ষ তাচ্ছিল্যে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু মনে মনে সে ভাবল এই বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোক যখন মুখার্জী সাহেব-এর সততার বিষয় জানে তখন কর্তৃপক্ষ কি আর জানবে না? নিশ্চয়ই জানে দিল্লির বড়কর্তারাও অতএব এই সাহানীর কথার কোন মানেই হয় না। কোনদিনই মুখার্জী সাহেব-এর ওপরে তাকে প্রমোশন দিয়ে দেবে এ চিন্তা একমাত্র বাতুলেই ক'রতে পারে। ব্যবসায়ীর হিসেব — ছোঃ। পরক্ষণেই মনে পড়ল মেহরার কথা। মুখার্জী সাহেবকে সরিয়েই দেওয়া হয়েছে নতুন দায়িত্ব দেওয়ার নাম ক'রে এবং সে সরানোটা হয়েছে এখানকার বড়কর্তার পরামর্শেই — হয়ত প্রয়োজনে। ঘটনা যখন এই তখন জগমোহন সাহানীর কথা ঠিক হতেই বা বাধা কি? বড়কর্তারা নিজেদের দরকারেই হয়ত মুখার্জী সাহেব-এরও ওপরে টেনে তুলবে তাকেই যার নাম সৌগত দত্ত, যাকে ঠিকাদাররা থেকে সুরু ক'রে অফিসের চাপড়াশীগুলো পর্যন্ত কেউই ভাল বলে না কিন্তু সবাই যাকে কাছে পেতে পছন্দ করে। আসলে এরা সব মুখার্জী সাহেবকে পছন্দ করে না বলেই মনে মনে এইসব ভাবে। তরুণ মিত্রের কথাটা প্রসঙ্গত মনে এল, বড় দুঃখ ক'রে বলেছিল, জানেন মিস্টার দত্ত, মিস্টার মুখার্জীর মত লোকেরা এযুগে অচল। ওঁদের চরিত্রে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা থাকে না। অথচ এখনকার দিনে মানিয়ে নিতে না পারলে কারুরই চলে না। ওভাবে ধরে থাকলে আমরা কেন এমন একজন কন্ট্রাকটরকে উনি আনতে পারবেন যে কাজ ক'রতে

পারবে? একটু আধটু ত্রুটি-বিচ্যুতি মেনে নিতেই হবে। টলারেন্স শব্দটার উৎপত্তি কি ইংরেজীতে শুধু শুধুই হয়েছে?

কথাগুলো নেশার মধ্যে হলেও বড় দামীই বলেছিল তরুণ মিত্র, এই দেখুন বাঘ সিংহ—এরা মানিয়ে নিতে পারল না পৃথিবী থেকে তো প্রায় বিলুপ্তই হয়ে গেল, মানুষ মানিয়ে নিতে পারল, ভরে গেল পৃথিবীতে। প্রকৃতির নিয়মই নিয়ম। এই আমাদের মত যারা মানিয়ে নিয়ে চলতে পারছি কষ্ট হলেও টিকে আছি আপনাদের ডিপার্টমেন্টে, যারা পারেনি পালিয়েছে।

সেদিন এসব বড় বড় কথা সহ্য হচ্ছিল না, ভালও লাগছিল না, নেহাৎ কাণে এসে ঢুকছে, বসে বসে শোনা ছাড়া কিছু করবার ছিল না তার। আজ সেই কথাগুলোই যেন মূল্যবান মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ঠিকই বলেছিল তরুণ মিত্র, যা বলেছিল তাতে যা ফল দাঁড়ায় আজ সাহানীর কথাও তাই। মিলে যাচ্ছে। আর মিলে যাচ্ছে ঘটনাও। মেহেরাও তো এমনি ইঙ্গিত দিয়েছিল। আসলে মুখার্জী সাহেব এটা বোঝেন না যে এই মেহেরা-সাহানী-রাও ফেল্‌না নয়। এদেরও বেশ শক্ত শক্ত খুঁটি আছে ওপরে। সেই খুঁটিতে পৌঁছানো মিস্টার মুখার্জীর পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হবে না। আত্মসম্মান এবং চাকরী দুটোই বজায় রাখতে হলে একটু মানিয়ে চলাই ভাল। এই সহজ কথাটা তাঁর মত বিচক্ষণ মানুষ যে কেন বোঝেন না সৌগতর কাছে তা ভাবনার অগম্য। তাছাড়া দুনিয়াই যখন লুটে নিতে বসেছে তখন ওঁর এরকম সততা দিয়ে কি হবে? বরং নিজের আখেরটা গুছিয়ে নেওয়া অনেক ভাল। চুরি যখন ব্যাটারা ক'রবেই তখন ভাগ না দিয়ে পালাতে দেব কেন? টাকার দরকার না থাকে নিয়ে দশটা কুকুর পোষ, নিজের ভাগ নেবে না কেন? যতদিন ক্ষমতা আছে ততদিনই সব, ওপরেই ওঠো আর নিচেই নামো হাতে ক্ষমতা না থাকলে কোন শালাই তোয়াক্কা ক'রবে না। কাজেই ক্ষমতা যতক্ষণ আছে যারা সেই ক্ষমতার প্রসাদ পেতে আসে তাদের সঙ্গে ঠিক কুকুরের মত ব্যবহার করাই উপযুক্ত। তাই বলে লোক বুঝে তো ব্যবহার ক'রতে হবে — মিত্র বা পরেশ চৌধুরীদের সঙ্গে যে রকম সে ব্যবহার কি সাহানীদের বা মেহরার সঙ্গে করা যায়?

কি মিস্টার দাত্তা চলুন —

জগমোহন সাহনীর আহ্বানে চমক ভাঙ্গল সৌগতর। খেয়াল হ'ল সামনে খোলা ফাইলের এক বর্ণও পড়া হয়নি। মনে হচ্ছে কোথায় যেন সে তলিয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি একটা সই ক'রে দিয়ে ফাইলটা বন্ধ ক'রে রেখে বলল, হ্যাঁ চলুন। আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখতে হ'ল খুবই দুঃখিত।

নেভার মাইণ্ড। জগমোহন বলল, ও কিছু নয়। আপনি ব্যস্ত আছেন। শুধু মহিলা একা বসে আছে গাড়ীতে — মনের মধ্যে কোন চিন্তা না হ'লেও জগমোহন একটি নারীর কথা বলে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা ক'রছিল সৌগতকে যাতে সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে।

কাগজপত্র মোটামুটি চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়াল সৌগত। বলল, চলুন যাই। আমি আসছি — বলে দপ্তরের দিকে চলে গেল। একটু বাদেই ঘুরে এসে বলল, যদি আপনাদের ওখানেই পাঁচটা বেজে যায় তাহলে আর অফিসে ফিরব না। আপনাদের সাইট ইন্সপেকশনে যাচ্ছি নোট রেখে গেলাম।

জগমোহন কোন কথা বলল না।

নিচে নেমে অনেকটা হেঁটে গিয়ে সৌগত দেখল সাহানীর গাড়ীটা একটু আড়ালেই রাখা আছে। সামনের সীটে একটি মেয়ে বসে আছে যাকে সুদর্শনাই বলতে হয়। চোখে মুখে উজ্জ্বলতাও আছে। মনে হয় ভদ্র ঘরেরই মেয়ে এবং রুচিসম্মত বটে। কাকে ব্যাটা সাহানী কি বলে ফাঁসিয়ে এনেছে কে জানে। ব্যাটাদের অসম্ভব তো কিছুই নেই —

গাড়ীর একদম সামনে পৌঁছে সৌগত দ্বিধায় পড়ল কোথায় বসবে। কিন্তু তার দ্বিধাকে নিমেষ মাত্র সময় না দিয়ে জগমোহন সামনের বাঁ দিকের দরজাটা খুলে বলল, আসুন মিস্টার দাত্তা বসুন।

মেয়েটিও কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে মাঝখানটায় সরে গেল। সৌগতর দ্বিধাও কেটে গেল নিমেষের মধ্যেই। গাড়ীর মধ্যে নিজেকে একটু সাবধানেই ছুঁড়ে দিল। জগমোহন ঘুরে গিয়ে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে অর্থাৎ মেয়েটি ডানপাশে বসে বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই-এ আমার বন্ধু, লালী মুখার্জী। খুব ম্যাগ্নাঁজিং গার্ল। আর ইনি মিস্টার দাত্তা, আমার বস্ — শেষের বিশেষণটুকু ঠাট্টা ক'রেই জুড়ল একটু হেসে।

লালী নামক মেয়েটি বেশ মধুরভাবে হেসে নমস্কার ক'রল হাতজোড় ক'রে। হাসিটি ভালই। তা লাগলেও সৌগত প্রতি নমস্কার না ক'রে নমস্কারটুকু গ্রহণ করল মাথাটা একটু নেড়ে।

তোমরা ব্যবসায়ীরা সব কথা সত্যি বলনা জগমোহন, কোন সময়েই কি সত্যি বল না? — পাল্টা ঠাট্টা ক'রল সৌগত।

কেন স্যার, কি মিথ্যে বললাম?

এই যে বললে তোমার নাকি ওপরওয়ালা আমি —

জগমোহন গাড়ী ছেড়েই রহস্যালাপ তুঙ্গে উঠিয়ে বলল, আমাদের একটা চলতি কথা আছে কখনও গাড়ী নৌকায় কখনও নৌকা গাড়ীতে — সেই রকমই ধরে নিন না। মিস মুখার্জী কি বল?

সমস্ত কথাবার্তা হিন্দিতে চলছে দেখে লালী হিন্দিতেই বলল, আমি তোমাদের যথার্থ সম্পর্ক জানি না, কি করে মতামত জানাব?

মত জানাতে হবে না, কখনও গাড়ী নৌকায়, আবার কখনও নৌকা গাড়ীতে ওঠে কিনা বল?

পরিস্থিতি এলে তো তা হয়ই।

অকারণে দুবার হর্ণ বাজিয়ে জগমোহন খুবই হ্লাদিত স্বরে বলল, জাস্ট

সো। এবার বলুন মিস্টার দাভা কি বলবেন ?

কিছুই বলব না। তোমরা দুজন আছ জিতবে তো নিশ্চয়ই —

জনে জেতে না পয়েন্টে জেতে। দশপাতা উত্তর লিখলে যা নম্বর ওঠে টু দি পয়েন্ট লিখলে নম্বর ওঠে তার চেয়ে বেশী।

মিস্টার দত্ত মনে হচ্ছে আর্গুমেন্টে হেরেই গেলেন—লালী বলল।

তা খুব খুশীর সঙ্গে। এ হারে একটা লাভ তো হ'ল !

কি লাভ ?

আপনার পরিচয়টা পাওয়া গেল।

মনে মনে একটু শিউরে উঠল লালী, মুখে জানতে চাইল, কি পরিচয় পেলেন ?

পেলাম আপনি খুবই বুদ্ধিসম্পন্না।

যাক। — যেন বড় ক'রে প্রশ্বাস নিল লালী, তারপর বাংলায় বলল, আমি ভয় পেয়েছিলাম।

কেন ? — সৌগতও নিজের ভাষাতে বলল।

কি দোষ বুঝিবা ক'রে ফেলেছি। কিন্তু আমার মত ডাকসাইটে বোকা মেয়ের মধ্যে যখন আপনি বুদ্ধি খুঁজে পেলেন তবেই বুঝছি খুব লাভ হয়েছে আপনার।

আমি একটু ইন্টারভেন ক'রছি মিস্টার দাভা, অনুগ্রহ ক'রে মার্জনা ক'রবেন, ইংরিজিতে বলল জগমোহন সাহানী, আপনারা বাংলাতেই কথা বলুন। বাংলা ভাষা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। খুব সুন্দর ভাষা। আমি বুঝতেও পারি। বলতে পারি না —।

জগমোহন-এর ব্যবসাদারী কথাগুলোকে সত্যি ভেবে মনে মনে খুবই খুশী হ'ল লালী মুখার্জী। সৌগতও কিছুটা। কিন্তু আসলে যে জগমোহন সৌগতকে লালীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠবার সুযোগটুকু মাত্র ক'রে দিল সেই সূক্ষ্ম কুট বুদ্ধিটা কেউ দেখতে পেল না।

সৌগত জানতে চাইল, মনে হচ্ছে আপনি পড়েন ?

হ্যাঁ।

কিছু যদি মনে না করেন জিজ্ঞেস ক'রতে পারি কি পড়েন ?

লালী একটু হেসে জানতে চাইল, আরও কিছু প্রশ্ন নিশ্চয়ই ক'রবেন ?

আপনি যদি অনিচ্ছুক হন তবে আর ক'রব না।

একটা দিনের কিছুক্ষণের আলাপ, বেশী জানলে মনেও থাকে না, অনেক সময় মন খারাপও লাগে হয়ত সব শুনলে। আমি ইন্দুবালা কলেজে পড়ি, এবছর বি, এ, পরীক্ষা দেব ভাবছি। — তারপর নিজে থেকেই জগমোহন-এর শেখানো কথাগুলো বলে গেল, ওর সঙ্গে গত বছর একই কলেজে পড়েছিলাম তাই বন্ধুত্ব হয়েছিল। আজ যাচ্ছিলাম সিনেমায় — ওর সঙ্গে দেখা, বলল চল, উঠে পড়লাম।

ভালই ক'রেছেন, সৌগত বলল। তবে একটা ভুল ভাঙ্গল সৌগতর, প্রথম

দেখে মেয়েটিকে সে একেবারে আনকোরা, ঘর থেকে বের ক'রে আনা মনে হয়েছিল এখন বুঝল তা নয় তবে সাহানীর জোগাড় করার তারিফ ক'রল সে মনে মনে। আর এটাও স্বীকার ক'রল যে সাহানী যাকে যোগাড় ক'রেছে সে মেয়েটি খুব সহজলভ্য নয় এবং অফিসের চিঠির মধ্যেও কনফিডেন্সিয়াল ছাপমারা খামের মধ্যেকার চিঠির মত। সাহানী যে যাকে-তাকে একটা ধরে নিয়ে আসে নি সে জন্যে খুশীই হ'ল সৌগত। অনেকদিন আগে একবার গল্প ক'রতে ক'রতে জগমোহন বলেছিল বহু বাঙ্গালী পরিবারে তার যাতায়াত আছে, ঘনিষ্ঠতা আছে। আজ চট্ ক'রে মনে পড়ে গেল সৌগতর — তাহ'লে সত্যিই আছে, তেমনি সব পরিবারে যাতায়াত আছে যেখানে ব্যবসার প্রয়োজনে মেয়ে সংগ্রহ সম্ভব। মহা ঘুঘু এই ছোকরাটি, ব্রিজমোহন-এর উপযুক্ত সহোদর এবং সহকর্মী। যা ব্রিজমোহন নিজে না পারে তা করে এই ছোকরা। অমনি কি আর এরা এত উন্নতি ক'রেছে।

অফিসে আজ মেজাজটা বিশেষ ভাল ছিল না সৌগতর কিন্তু এখন বেশ ভালই লাগছে তার। আপন মনে গাড়ী চালাচ্ছে জগমোহন কথাবার্তাগুলো শুনছে বলে মনেই হচ্ছে না, মেয়েটাও বেশ সুন্দর কথা বলতে পারে, বেশ পরিশীলিত রুচির মার্জিত কথাবার্তা, শুনতে ভাল লাগে, কথা বলতেও ভাল লাগছে মেয়েটির সঙ্গে। কিন্তু বলার কথা যেন ফুরিয়ে গেল অকস্মাৎ। মনটা কিছু বলার জন্যে উসখুস ক'রতে লাগল। নিদেনপক্ষে লালী কিছু বলুক — তাও কিছু বলছে না। তবে কি ওরও কথা ফুরিয়ে গেল? এত শীঘ্রি? সত্যিই তো কী বা বলা যায়? সামনের কাঁচের মধ্যে দিয়ে আকাশটাকে যা দেখা যাচ্ছে সেখানেও কোন বৈচিত্র্য নেই যে বলবে আকাশটা ম্যাটম্যাট ক'রছে কিংবা বলবে দিনটা যেন কেমন ঘোলাটে লাগছে আজ, কিছুই বলার উপায় নেই এমন কি পথে একটা দুর্ঘটনাও ঘটছে না যা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। যদিও সম্পর্কটা সম্পূর্ণই অর্থকরী তবু ঠিক অর্থকরী সম্পর্ক মনে হচ্ছে না, যেন জগমোহন-এর বলা সম্পর্কই সত্যি হয়ে বসে আছে মনের মধ্যে। কোন ক্ষেত্রে এরকম হলে খুশীই হয় সৌগত কারণ অর্থকরী নারীসঙ্গ প্রায় ক্ষেত্রেই এমন এক বেচাকেনার মত আজকাল তার কাছে মনে হয় যে কোন তৃপ্তি পায় না। একমাত্র রতি-কুশলা জলি ছাড়া চার্ম যাকে বলে তা আর কোন মেয়ের মধ্যেই পায় না সৌগত। কিন্তু জলি আবার হারিয়েছে তার দেহের মাদকতা, মেদ জমেছে শরীরের কোণে কোণে, ফলে শুধুমাত্র তার মনোহারিণী কলাকৌশলের মাধুর্যেই তার যা আকর্ষণ। সেটুকু আকর্ষণও কিন্তু আধা পেশাদার মেয়েদের মধ্যে নেই। যারা আসে নেহাৎই দায় সারতে যেন আসে, যেমনভাবে চাষী মেয়েরা বাজারে আসে সব্জী বিক্রি ক'রতে। সেদিক থেকে অন্তত লালীকে সাবলীল মনে হচ্ছে পরে কি হবে কে জানে। তবু যে মনের মধ্যে সত্যি প্রেমের আমেজ এসে যাচ্ছে সে জন্যে সৌগত খুবই প্রীত হয়ে উঠছিল।

কিছুক্ষণের কথাবার্তা এবং তারপরের নীরবতা জগমোহন লক্ষ্য ক'রল, সে তাই এই নীরবতা ভাঙ্গতে বলল, আপনারা কথা বলতে বলতে চুপ ক'রে গেলেন কেন?

সৌগত চট ক'রে বলল, কথা পাচ্ছি না।

সপ্রতিভভাবে জগমোহন বলল, এই জন্যেই সিনেমাতে গান লাগে। কথা বলতে বলতে একসময় কথা ফুরিয়ে যায় তখনই ফিল্মওয়ালারা একটা গান লাগিয়ে দেয়। ব্যস চলো ছবি আব পুরা দমে —

কথার চেয়ে জগমোহন-এর কথা বলার মধ্যে এমন হাল্কা মেজাজ ছিল যার জন্যে হাল্কা হয়ে গেল সৌগত আর লালী বলল, তুমি কি আমাদের দিয়ে ফিল্ম বানাতে চলেছ? ভালই হয় তা'হলে নায়িকা হয়ে যাব একবারেই।

নায়িকা যে হয় সে একবারেই হয়, জগমোহন বলল, এক্সট্রা থেকে নায়িকা বড় একটা হয় না! আমার বন্ধু জবীন যোশী তার তিন নম্বর ছবির জন্য নায়িকা খুঁজছিল —

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই লালী চট ক'রে বলে উঠল, বোম্বের পরিচালক জবীন যোশী? কথা না বলে সম্মতি জানাল জগমোহন তারপর বলে চলল, কলকাতা এসে কত দেখল পছন্দ হ'ল না, বোম্বেতে নয়, পুণা ইনস্টিটিউটের নয় শেষকালে দিল্লি গিয়ে এক কলেজের ছাত্রীকে দেখে তার মনে হ'ল, হ্যাঁ এ-ই নায়িকা হতে পারে। ব্যস মেয়েটি নায়িকা হয়ে গেল, তারই নাম প্রেমা কাউর।

প্রেমা কাউর! নামটা আপনিই লালীর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। প্রথম ছবিই দারুণ ভাল হয়েছে যে নায়িকার, তারই নাম প্রেমা কাউর — রাতা-রাতিই দেশখ্যাত যে মেয়েটি তার নাম প্রেমা কাউর। কাজেই সেই উজ্জ্বলতম তারকাটির এমনি আশ্চর্য উত্থানে বিস্মিত হয়ে গেল লালী। ছবির যে জগৎকে কত দুর্লভ কত দূরের বলে মনে হয় সেই জগতে যে এতই সহজে মানুষ ঢুকে তারকা হয়ে যেতে পারে এ যেন অবিশ্বাস্য মনে হয় তার কাছে।

জগমোহন লালীর বিস্ময় ধরে থমকে না দাঁড়িয়ে বলল, মিস্টার দাত্তা বলুন যার ভাগ্য সায় দেয় সে হঠাৎ স্টার হয় কিনা —

সৌগত বলল, সে তো আমাদের বেলাতেই দেখলাম। এবার তা'হলে গানের ব্যবস্থাটা ক'রে ছবির কাজ পুরো ক'রে দাও।

জগমোহন গাড়ীর ইলেকট্রিক্যাল হর্ণ দুবার বাজিয়ে বলল, ওটা স্যার আপনাদের কারও জানা থাকলে আমি খুব খুশীর সঙ্গে শুনতে থাকব।

কিছুটা চটুল হয়েও ছুটন্ত ঘোড়ার মুখের লাগামের মত টান পড়ল ভেতর থেকে। লালীর ওপর ভরসা হ'ল না পাছে সে সত্যিই এর মধ্যে গান জুড়ে দেয় তাই বলল, থাক। কারও জানা থাকলে সময়মত ভাল শ্রোতা পেলে সে শোনাবে। আমি গাইয়ে এবং শ্রোতা কোন হিসেবেই ভাল নই।

লালীও বেশ সংযতভাবেই বলল, আজকাল কেউই নিজে গায় না। প্লেব্যাক গাইয়ে ,চাই। রেকর্ড বাজে, এক্ষেত্রে টেপ রেকর্ডার হলেও চলত। কিছুই যখন নেই তখন ছবি বন্ধ থাক।

জগমোহন মনে মনে খুবই খুশী হচ্ছিল। লালীকে কন্ট্রাক্ট করার এই একটা গুণ। ও লোককে খুব মোহিত ক'রতে পারে। পয়সা একটু বেশী নেয় বটে কিন্তু কাজে 'একশ এক পারসেন্ট সাকসেসফুল'। পরীক্ষাটা সেবার স্টীল কর্পোরেশনের মিস্টার মদনকে তুষ্ট করার ব্যাপারেই বোঝা গিয়েছিল। এমনই চার্ম তাকে ক'রেছিল যে পরের দিন অফিসে অর্ডারটা যেন সে নেশার ঘোরেই সই করেছিল। শুধু তাই নয় পরের দিন টাকা নিতে গিয়ে লালীই খবর দিয়েছিল মদন নাকি সে আসবার সময় বারবার ঠিকানা চেয়েছিল তার। ঠিকানা লালী কাউকে দেয় না, এমন কি জগমোহন যে তার এতবড় একজন ঠিকাদার তাকেও নয়। অথচ কতবার কত ক্ষেত্রে জগমোহন বায়না ক'রেছে লালীকে, কত টাকা দিয়েছে পারিশ্রমিক হিসেবে। কিন্তু কায়দা বদলায় নি, সেই মিসেস ভায়নার বাড়ী ফোন ক'রে খবর দেবেন ঠিক সময়মত এসে যাব। তাই বলে রোজ খবর দিলে আসব না, মাসে দুটোর বেশী কাজ নেবেনা লালী মুখার্জী। ডবল টাকা দিলেও নয়। জগমোহন একবার তাকে না পেয়ে পরের বার দেখা হতে বলেছিল, সেদিন তুমি কন্ট্রাক্ট নিলে না কেন লালী ?

সে মাসে আমার দুটো কাজ করা হয়ে গিয়েছিল যে। জানিয়েছিল লালী।

এ তোমার কেমন কানুন বুঝি না। বেরোলে তো তোমারই রোজগার—

তা তো বটেই —

তবে কেন মাসের মধ্যে দুটোর বেশী কন্ট্রাক্ট নাও না ?

সে আপনি বুঝবেন না মিস্টার সাহানী। আপনাদের তো ব্যবসা, আরও কন্ট্রাক্ট মানে আরও লাভ, আমাদের আরও কন্ট্রাক্ট মানে আরও লোকসান।

সে কি!

পৃথিবীতে হিসেব বহুরকম মিস্টার সাহানী। এ হিসেবটা আপনাদের জানার বাইরে। অন্য কোনদিন, যদি সুযোগ আসে শিখে নেবেন —

শেষ কথাটা সেদিন বেসুরো ঠেকেছিল। তবু বেশী কিছু বলে নি জগমোহন। বেশী কথা বলে কি দরকার ? বিকিকিনির সম্পর্ক তার সঙ্গে — সওদা না বেচলে ক্রেতা কিনবে কি ক'রে ? অন্য মালের খোঁজেই তখন যেতে হবে, সে একটু নিরেস জিনিষ হলেও সরেস না পেলে তাই দিয়েই চালাতে হবে কাজ, আর তালে থাকতে হবে যখনই সুযোগ পাওয়া যাবে সরেসটি উঠিয়ে নিতে হবে ঝটিতি পয়সা ফেলে। এবার পেয়েছে। তাছাড়া এবার দরকারও ছিল, কারণ এই যে দত্ত এ ব্যাটা আবার অদ্ভুৎ, নিজের বড়লোকী দেখাবার জন্যে টাকা পয়সা নেবে না, সাহেব লোক সেরা সুরা নেবে সেরা সাকী নেবে। যা দেওয়া হবে তার মধ্যে ভেজাল চলবে না। স্কচ হুইস্কি

বারবার নেবে কিন্তু এক মেয়েমানুষ দুবার চলবে না। তবু এর সঙ্গে কাজ ক'রে সুখ আছে, লোকটা বেশী নিতে জানে না, অল্পে সন্তুষ্ট।

কিন্তু হঠাৎ যেন কথা ফুরিয়ে গেল। সবাই চুপচাপ। এ পরিবেশ বিশেষ স্বাস্থ্যকর নয় তাই জগমোহন সৌগতর মুখ খোলাতে চাইছিল, বলল, আপনি যে এরিয়ায় থাকেন বেশ ভাল পরিস্থিতি, আমাদের উত্তর কলকাতার অবস্থা বড় খারাপ। রোজ খুনখারাবি চলছে — আমরা আর থাকতে পারছি না দুএক দিনের মধ্যে ক্যামাক স্ট্রীটে উঠে আসছি।

ক্যামাক স্ট্রীটে কি ফ্ল্যাট নিলে? — সৌগত জানতে চাইল।

আকাশপরী-তে একটা ফ্ল্যাট আমাদের অনেকদিন কেনা আছে। এখন গেস্ট হাউস হিসেবে ব্যবহার হয়, আমাদেরই এবার থাকতে হবে।

তোমরা যে এলাকায় থাক ওদিকে তো কোন ঝামেলা নেই —

আমাদের বাড়ী তো সেন্ট্রাল এভেন্যু, পেছনেই থানা কিন্তু আজকাল কোন সেফটি নেই। গুণ্ডা লোকেরা হঠাৎ মেরে দিচ্ছে থানা কি ক'রবে?

লালী চট্ ক'রে বলল, গুণ্ডা কোথায়? নকশালরা তো মারছে —

সৌগত বলল, ওই একই হ'ল। ওটা একটা নাম খাড়া ক'রে নেওয়া। আসলে খুনখারাপি গুণ্ডাদেরই কাজ।

লালী বাদানুবাদে গেল না। লাভ নেই। যেসব লোক ওইসব নকশাল পন্থীদের খতমের নিশানা হবার পক্ষে উপযুক্ত তারা এই কথাই বলবে। আসামী শাস্তি পেলে বিচারককে সব সময়েই 'শালা' বলে। তার দরকার টাকা রোজগারের, খদ্দের যা ব'লে সন্তুষ্ট থাকে বলুক, অকারণ কথা কাটাকাটি ক'রে নিজের আখের নষ্ট ক'রে কি হবে? তাছাড়া পয়সা যখন মন ভুলিয়েই আয় ক'রতে হবে তখন তো বিরুদ্ধ কথা একেবারেই অচল। যতই মিথ্যা কানে আসুক, সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলুক খদ্দেরে সব শুনতে হবে, চুপ ক'রে যে শুনতে হবে তা নয় তেমন সময় হলে সায় দিতে হবে। উপায় নেই। যে ব্যবসায় মূলধন শূন্য সেখানে মনোরঞ্জন ছাড়া আর ব্যবস্থা নেই। তাদের বাড়ীর চারপাশের না খেতে পাওয়া, মধ্যবিত্ত হিসেবে আত্মপরিচয় দেওয়া দরিদ্র পরিবারগুলোর রোগা রোগা ছেলেগুলোকে এইসব ঘি-চকচকে হৃষ্টপুষ্ট পয়সাওয়ালা ভ্রষ্টাচারীগুলো যে কি ভয়ই পায় তা দেখে মনে মনে খুব একচোট হেসে নিল লালী। একচিলতে বিদ্রূপ মিশিয়ে বলল, ক্যামাক স্ট্রীট এলাকাটা খুব ভাল। ওদিকে এসব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই।

না এ এলাকাতে ঝামেলা যেদিন হবে সেদিন আর কলকাতার অস্তিত্বই থাকবে না — জগমোহন বলল।

সে কোনদিনই হবে না, বলল সৌগত। তারপরই বলল, এ খালি য়্যাডমিনি-স্ট্রেশনের শিথিলতার জন্যে হচ্ছে, নইলে এইসব গুণ্ডাবাজী কতদিন চলবে?

লালী সহ্য ক'রতে ক'রতেও মুখ ফস্কে ব'লে ফেলল, তবে কলকাতায়

গুণ্ডামীই হোক আর যাই হোক রাজধানী দিল্লির চেয়ে অনেক ভাল। এখানে সেখানকার মত মেয়েদের ওপর অত্যাচার নেই। এখানে মেয়েদের সম্মান নিজেরা না খোয়ালে খোয়ায় না।

জগমোহন সঙ্গে সঙ্গে বলল, তা ঠিক। — মনে মনে বলল, এখানে মেয়ে যে সহজলভ্যা।

সৌগত সেই কথাটা বলে ফেলল, এখানে দরকার পয়সার, পয়সা থাকলে মেয়ে অনেকই পাওয়া যায় বলে এখানকার গুণ্ডারা মেয়ে খোঁজে না পয়সা খোঁজে।

লালীর ইচ্ছে ক'রছিল অন্তত প্রলয়-এর সম্মানের জন্যে এই ইতর লোকটির গালে একটা থাপ্পড় মারে সমস্ত গায়ের জোরে। তাদের পাড়ার প্রলয় যদি গুণ্ডা হয় তবে এদেশে গুণ্ডা ছাড়া একজন মানুষ নেই। অমন ছেলেও বিশ্বাস করে সমাজের এই সব আগাছাগুলোকে খতম না ক'রলে মানুষ বাঁচবে না। তাই সে বিশ্বাস করে সাধারণ মানুষের শত্রু মুনাফাখোর কালোবাজারী শোষকদের খতম করাই নতুন সমাজ পত্তনের পথ। তাই বলে সে কি গুণ্ডা? বরং গুণ্ডা তারাই যারা মানুষের পরিবারকে উপোসী রেখে কড়ি দিয়ে কেনে নারীর সম্ভ্রম, যুবকের সত্যচেতনা, মানুষের মানবিক বৃত্তি। গুণ্ডা এরাই — তার দুপাশে যে দুজন তাকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে কয়েক ঘণ্টার জন্যে — একজন প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে অন্যজন। কিন্তু উপায় নেই। ইচ্ছাপূরণ সম্ভব নয়, নতুন সমাজে নতুন রকম ক্রীতদাস প্রথা চালু হয়ে গেছে। ক্রীতদাসীর কি সাধ্য তার ক্ষণকালের মালিককে ক'রবে অপমান? বরং এসব সত্য ভুলে, জীবন যে রকম চলছে তেমনিভাবে চালিয়ে যাওয়াই বেঁচে থাকার পথ। একটা চড় কোন প্রতিকার ক'রতে পারবে না এই শ্রেণী বিন্যাসের, প্রতিকল্প সৃষ্টি ক'রতে পারবে না এই সমাজ-ব্যবস্থার। কাজেই বশ্যতা স্বীকার করেই বাঁচতে হবে। শরীরটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে শরীরের বিক্রয় মূল্যে।

এইসব উল্টোপাল্টা ভাববার জন্যে নিজেরই কেমন বেসুরো ঠেকতে লাগল আজ। তাই কথাবার্তা যথাসম্ভব কম বলে বাকী সময়টুকু কাটিয়ে যেখানে সে এল সেটা অত্যন্তই রসাল এক ভোজনাগার। হোটেল। এর মধ্যে তাকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে জগমোহন-সৌগত একবার কিছুক্ষণের জন্যে নেমে গিয়েছিল নির্মিয়মান কতগুলো বিরাট বিরাট বাড়ীর সামনে। রাস্তায় সূর্যের অজস্র আলোক বিকিরণকে আড়াল ক'রে মাত্র দুটো সৌখিন দরজা ঘরের মধ্যে এনে দিয়েছে মাঝরাতের অন্ধকার। তারই মধ্যে হলুদ নীল সবুজ — কতগুলো তারার মধ্যে দিয়ে ক্ষীণ রেখায় সঞ্চারিত হচ্ছে তীব্র আলো। সেই তারার আলোয় একহাত দূরে থাকলে পরস্পরের মুখ দেখা-চেনা যায় না ভালভাবে। এখানে এসে ঢুকেই মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেল যেন। সত্যিই জায়গার একটা প্রভাব আছে, মনে মনে অনুভব ক'রল লালী। মানুষের মনও অনেকটা প্রকৃতির মত। সময়ে সময়েই পরিবর্তন আসে। কখনও ভারী থাকে কখনও

হয়ে ওঠে হাল্কা। পরিবেশই তাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

লালী এইভাবে ভাবছিল। কিন্তু আসল ঘটনা সে রকম না-ও হতে পারে। হয়ত এও হতে পারে যে দিনের আলোর উজ্জ্বলতা সহ্য ক'রতে পারছিল না লালী মুখার্জী, তাই ভাল লাগছিল না তার। তার নিজস্ব পরিবেশ তার মনের স্বকীয় সত্বাকে, আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয়, যে সত্বায় সে লালী মুখার্জী, দেয় না সূর্যোজ্জ্বল দিন। হয়ত তাই সে দিনের উন্মুক্ততাকে মেনে নিতে পারে না গহন মনের আচ্ছন্ন চেতনা থেকে, আপন বলে মনে ক'রতে পারে না আলোকিত প্রান্তরকে। তার অভিসার নিশীথের, আত্মপ্রকাশ গৃহকোণে — যেখানে তার আধিপত্য, তার আত্ম প্রবঞ্চিত দুঃখজর্জরিত বিজয়। তবু ক্রীতদাস জীবনের সেই মিথ্যা সুখ, ক্ষমতাদম্ভী ব্যাভিচারীর সেই যে মুহূর্তের আত্মনিবেদন, তার কাছে আত্মসমর্পণ, সেইটুকুই ওই গৃহকোণের অন্ধকারের অবদান। সেই কয়েকটি মুহূর্ত, যার কোন অস্তিত্বই বাইরের পৃথিবীতে থাকে না, সে তার নিজস্ব, তার সম্পদ, প্রবলের প্রবল অহমিকার বিরুদ্ধে তার আত্মদ্রোহী অহংকার। তাই এই অন্ধকার তার কাছে আলোর অধিক। তার মন এই নিজের জগৎ ফিরে পেয়ে তাই হ্লাদিত।

অন্ধকার ফুঁড়ে একজন মানুষ উঠে এল তাদের সামনে। কালো স্যুট তার শরীরকে গোপন করে রেখেছে যেন ওই অন্ধকারে, একেবারে সামনাসামনি আসতে দেখা গেল তার মুখ, বিনীত হাসি। আহ্বান জানাল, আসুন। এপাশে আসুন। প্রাইভেট সেক্টরে।

সমাদরকারীর পেছনে দু'পা এগিয়ে যেতেই যে প্রাইভেট সেক্টর পাওয়া গেল তা আর কিছু নয় একটু উঁচু জায়গা, একটা দেয়ালের আড়ালে। সাধারণ ঘরের থেকে তফাৎ মাত্র ওইটুকুই। সেখানে তিনটে মাত্র টেবিল, তিনটে দলে মোট বারজন বসতে পারে। আজ কেউ নেই।

ওরা তিনজন বসতেই সমাদরকারী সৌগতকে বলল, আপনাদের দর্শন পাইনা আজকাল —

হ্যাঁ, অনেকদিন আসতে পারিনি, সৌগত জানাল।

আজকাল দিন যা হয়েছে, এরকম অবস্থায় সিকি খদ্দেরও আসে না। এরকম হলে ব্যবসা তুলে দিতে হবে। বহু হোটেল বন্ধ হয়ে যাবে।

পরিচিত লোক পেয়ে মুখ খুলল সৌগত, বাস্তবিক দেশে যে একটা অ্যাড-মিনিস্ট্রেশন আছে তাই মনে হচ্ছে না।

তবে আগের চেয়ে অনেকটা কন্ট্রোল হয়েছে। মাস তিনেক আগে আমরা ব্যক্তিগতভাবে পুলিশ কমিশনার মিস্টার দাসকে আমাদের অ্যাসোসিয়েশানের পক্ষ থেকে যোগাযোগ ক'রেছিলাম, কাজ হয়েছে।

কি কাজ হয়েছে?

দেখছেন না পুলিশ কি রকম অ্যাকটিভ হয়ে উঠেছে? অবশ্য শুধু আমাদের জন্যেই হয় নি, কলকাতার বড় বড় সমস্ত মহল থেকেই খুব চাপ

হচ্ছে। নানা রকমের চাপ।

হলেই ভাল। সন্ধ্যে না হতেই চৌরঙ্গী ফাঁকা হয়ে যায়, যেন পরিত্যক্ত শহর। যে যার ঘরে ফিরে যেতে চায়।

আমাদের মত অ-আবাসিক হোটেলেরই হয়েছে মুস্কিল। যদি বাইরের অর্ডার না থাকত তাহ'লে এতদিন যা লোকসান হ'ত তার হিসেব রাখা যেত না। বসুন আমি একটু ঘুরে আসি। ততক্ষণ 'আইটেম সিলেক্ট' করুন — বলে হাতের খাবার তালিকাটা টেবিলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

জগমোহন বলল, এটা ত্রিলোক চাঁদ কাপুরের হোটেল না?

হ্যাঁ।

এই ভদ্রলোককে তো 'অমরাপুরী'তে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?

অমরাপুরী-ও তো কাপুরের।

গুড গড। আমার ধারণা ছিল অমরাপুরী অন্য কারও।

কেন?

অমরাপুরীর মত চালু হোটেলে বার-এর লাইসেন্স নেই দেখে।

ওটা সপরিবারে খাবার জন্যে — ওখানে সন্ধ্যের পর বহু রক্ষণশীল গুজরাটি মাড়োয়োরী ভদ্রলোক আসে। এই ভদ্রলোকের নাম যাশু প্যাটেল, আগে অমরাবতীর ম্যানেজার ছিল, এখানে অনেকদিন এসেছে।

একটু বাদেই যাশু প্যাটেল ফিরে এল, অর্ডার নিল, চলে গেল। সৌগত মনে মনে গর্বিত হ'ল সাধারণ ওয়েটাররা যে তার কাছে অর্ডার না নিয়ে ম্যানেজার নিজে তার অর্ডার নিচ্ছে এটা দেখাতে পেরে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খাদ্য এবং পানীয় এসে পৌঁছে গেল তিনজনেরই সামনে। সৌগত হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলল, আমি দুঃখিত মিস মুখার্জী, পানীয়ের ব্যাপারেও যে আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ থাকতে পারে সেটা আমার খেয়ালই হয় নি।

না না ঠিকই আছে। হুইস্কি ছাড়া আর কি বা আছে? ভাল ককটেল যদি জানা থাকে তো আলাদা কথা. নইলে আমার মনে হয় হুইস্কিই সবচেয়ে ভাল। লাইম-জিনে স্বাদটা ভাল হয় বটে কিন্তু আমার সহ্য হয় না।

জগমোহন বলল, আমার কিন্তু ব্রাণ্ডিই বেশী পছন্দ হয়।

ব্রাণ্ডি আর কত খাওয়া যায় — লালী বলল।

সৌগতর অত কথা বলবার সময় ছিল না, তার গ্লাসে হুইস্কির মধ্যে সামান্য একটু সোডা দিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল সে। জগমোহন সোডা ঢেলে গ্লাস পুরো ভর্তি ক'রে ফেলেছিল সেই সময়টুকুর মধ্যে। তিনজনে উঁচু ক'রে পরস্পরের গ্লাস ছুঁইয়ে নিয়ে চুমুক দিতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই শূন্য হয়ে গেল সৌগতর গ্লাস। আবার ভরল। আরও কিছুক্ষণ বাদে খালি হ'ল লালী মুখার্জীর। তারও ভরল সোডা আর হুইস্কিতে। জগমোহন কেবল

সেই প্রথম গ্লাসে দু এক চুমুক দিয়েই খাবারে আর কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে রইল। বিরাট এক চাকা মাংস কেটে মুখে পুরে সৌগত বলল, কি হে সাহানী, তোমার গ্লাস দেখছি ভর্তিই রয়ে গেল!

না···মানে আমি বেশী সহ্য ক'রতে পারি না। তাছাড়া আমাকে তো গাড়ী চালিয়ে যেতে হবে — সাহানী বলল।

সৌগত দরাজ হেসে বলল, এক পেগে-ই তুমি গাড়ী চালানোর জন্যে ভাবছ! এ যে আজকালকার কচিখোকাদের কথা হ'ল হে! আমি তো ভাবলাম একটা বোতলের তলার কাঁচ দেখা গেলে তুমি ওকথা ভাববে।

জগমোহন লজ্জা পাবার ভঙ্গীতে আবার নিজের গ্লাসে চুমুক দিল একবার।

জগমোহনকে আড়াল করবার জন্যে লালী বলল, সবার ক্ষমতা কি সমান হয় মিস্টার দত্ত?

ঠিক তাই — কৃতজ্ঞভাবে কথাগুলো বলে লালীর দিকে তাকাল জগমোহন, তার দৃষ্টিতে লালীকে পুরস্কৃত করার ভঙ্গী।

সৌগত তা লক্ষ্য ক'রে লালীকে বলল, প্রকৃত বন্ধুরা বন্ধুকে সব সময়েই বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে থাকে।

লালী একটু হাসল, বলল, অনেকে অনেক কিছুই সহ্য ক'রতে পারে না কিন্তু বন্ধুত্বের খাতিরে অসহ্যও সহ্য ক'রতে হয়। জীবনে চলতে গেলে যেমন অনেক কিছু মেনে নিতে হয় এ-ও তেমনি —

আমি কিন্তু তা মনে করি না মিস মুখার্জী। জীবনটা সব সময়েই বিপরীতের সমাহার। সব সময়েই দেখবেন আপনি যা না চান সেটাই পাচ্ছেন।

কথাটা লালীর মনে ধরল, সে খুব ধীরে স্বরে বলল, কথাটা ঠিকই বলেছেন। জীবনটা এই রকমই ট্র্যাজিক। বড় অদ্ভুৎ।

কথাটা এমন ভাবেই লালী বলল যে কোন মনযোগী শ্রোতা হ'লে তার মধ্যে অনেক গূঢ় রহস্যের আভাস পেত, কিন্তু সৌগত যা শোনে কাণ দিয়েই শোনে, মন দিয়ে শোনে না, তাই সে নিজের কথার তারিফে চমৎকৃতই হ'ল মাত্র, বলল, ঠিক বলিনি?

একেবারে ঠিক।

জগমোহন নিজের গ্লাসটুকু শেষ ক'রেই বলল, মিস্টার দাত্তা, আপনারা খাওয়া-দাওয়া করুন, আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই একটা খুব জরুরী কাজ আছে সেরে ফিরে আসছি। আমি না আসা পর্যন্ত উঠবেন না কিন্তু, আমি নিশ্চয়ই আসব, আগেই আসব।

সে কি? — লালী বিস্মিত হবার অভিনয় ক'রে বলল।

প্লাজ কিছু মনে ক'রো না। আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা বিশেষ কাজের কথা, না সারলে বড়ভাই রাগ ক'রবে। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি শীগ্রি ফিরে আসব, খুব যদি বেশী সময় লাগে তো এক ঘণ্টা — কথাগুলো বলে

সৌগতর অলক্ষ্যে লালীকে চোখ টিপে ইসারা ক'রে গেল।

জগমোহন চলে যেতে সৌগত বলল, ছোকরা একেবারেই বেরসিক। এই বয়সেই পয়সা জিনিষটাকে এমনভাবে চিনেছে —

লালী বলল, পৃথিবীতে অনেক রকম লোকই থাকে। একদল লোক পয়সাটাকেই জীবনের সর্বস্ব বলে মনে করে। অথচ পয়সা জিনিষটার প্রয়োজনটা যে কি তাই বোধহয় এরা বোঝে না।

এরকম পয়সা রোজগারের কি দাম আছে যে খেতে বসে সুখ নেই, ঘুমিয়ে শান্তি নেই —

এটা বোধহয় নেশা।

জানিনা — বলেই গ্লাসের শেষ পানীয়টুকু গলায় ঢেলে দিল সৌগত। তারপরই ওয়েটারকে বলল, হুইস্কি। ডবল।

লালী লক্ষ্য ক'রল সৌগতর প্লেটের খাবার ফুরিয়ে গেছে। জগমোহন-এর শেখানো নির্দেশ মনে পড়ল, বলল, কিছু খাবার দিতে বলুন।

বেয়ারাটা আসুক —।

এক ঘণ্টার আগেই জগমোহন যখন ফিরে এল সৌগত তখন প্রায় বেহুঁশ। লালীর একটা হাত চেপে ধরে বলছে, দুনিয়াতে এমন একটা মেয়ে দেখিনি যে ঠিক তোমার মত। তোমার মত মেয়ে পেলে তার পায়ের তলায় জীবন বিলিয়ে দেওয়া যায়। নেবে, নাও, বলে চেয়ারে বসে বসেই বুকটাকে এগিয়ে দেবার ভঙ্গী ক'রল সৌগত।

লালীরও মাত্রাটা বেশীই হয়ে গিয়েছিল, তবু সে হোটেল বলে আপ্রাণ চেষ্টায় সংযত রাখছিল নিজেকে, বলল, আপনার মত মানুষেরা পারে।

আবার আপনি বলছ! যেন শাসাল সৌগত, — বলছি না তুমি বলবে?

অবস্থা দেখে জগমোহন সাহানী সন্তুষ্ট হয়ে বলল, দাত্তা সাহেব, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই।

না যাব না।

চলুন, উঠুন, লালী বলল।

খবরদার।

লালীও ওখান থেকে উঠে যেতে চাইছিল, সৌগতর কানে কানে বলল, আমিও যাচ্ছি চলুন! মিঃ সাহানী পৌঁছে দিয়ে যাবে।

মাই ডার্লিং, লাভলি! যাবে? চল। — স্খলিত পায়ে উঠে দাঁড়াল সৌগত। বেয়ারার হাতে একগাদা টাকা গুঁজে দিয়ে জগমোহন সৌগতর কোমরটা ধরে তাকে হাঁটতে সাহায্য ক'রল। চলতে গিয়ে লালী দেখল তার নিজেরও পা টলছে।

'স্কাইল্যাণ্ড' হোটেল-এ ঘর ঠিক ক'রে রেখেছিল জগমোহন, হোটেলের

সামনে গাড়ী দাঁড় করানোতে সৌগত জানতে চাইল, এখানে কেন দাঁড়ালে ?

আজকের রাতটা 'স্কাইল্যাণ্ডে' থাকতে ভাল লাগবে বলে এখানেই আমাদের রুমে আপনার থাকবার ব্যবস্থা ক'রেছি —

আই ডু নট নীড, আমাকে আমার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দাও — ঠিকানাটা বলে দিল সৌগত।

এখানেই থাকতে পারতেন, অল য়্যারেঞ্জমেন্টস আর দেয়ার, জগমোহন আবার বলল।

ও থ্যাঙ্কস। আমি সেখানেই যেতে চাই — সমস্ত কথাগুলোই ইংরিজীতে বলল সৌগত। জগমোহন আর কথা বাড়াল না। গাড়ী ছাড়ল।

সৌগতর ফ্ল্যাট-বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে সৌগতকে নামতে সাহায্য ক'রল। লালীও নেমে দাঁড়িয়ে সৌগতর কোমরটা জড়িয়ে ধরে তার শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্যে নিজের শরীরে ভার বইতে চাইল। সৌগত নিজেও লালীর কোমরটা বেশ ভালভাবে জড়িয়ে ধরেছিল। লিফট-এর দরজা পর্যন্ত জগমোহন-এর সাহায্যে পৌঁছে সৌগত বলল, গুডনাইট।

লালী মুখার্জী আর সৌগতকে পেটের মধ্যে পুরে লিফট উঠে গেল।

আয়নায় ঘুরে ঘুরে নিজেকে দেখছিল এমিলি। এপাশ থেকে ওপাশ থেকে পেছন থেকে নানাভাবে দেখেও আশা মিটছিল না। ঠিক তৃপ্তি হচ্ছে না। কিছুতেই মনে হচ্ছে না ঠিক হয়েছে। এদিকটা একটু টেনে দিচ্ছে তো ওদিকটা উঠে যাচ্ছে, ওদিকটা আবার টেনে দিচ্ছে তো এদিকটা সরে যাচ্ছে। মনের মত আর হচ্ছে না। এতদিন ধরে শাড়ী পরা শিখেও জড়তা কাটতে চাইছে না, অস্বস্তিও যাচ্ছে না। অথচ শাড়ীপরা দেখতে যে কি সুন্দর লাগে! সেদিন রাস্তায় চলতে সেই যে একটা কালো বউকে ঘোমটা দিয়ে চলতে দেখেছিল এমিলি, তাকে যে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! এমিলির ইচ্ছে ঠিক অমনিভাবে শাড়ী পরবে, যাতে অমনি দেখতে লাগে। বউটার গায়ের রঙ কালো ছিল, কল্যাণের মত। প্রথমেই তাই কল্যাণের কথা মনে পড়েগিয়েছিল এমিলির। কল্যাণও তার দেশের গল্প ক'রতে গিয়ে এমনি সব কালোবউ-এর গল্প বলত যারা সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালে ঘরে, বাড়ীর সদর দরজায়। শুনতে খুবই ভাল লাগত এমিলির। ভাল লাগার অন্য একটা কারণও ছিল, নিজের দেশের গ্রামের গল্প বেশ সুন্দরভাবে বলত কল্যাণ। তার গল্পবলার ভঙ্গীটি ছিল খুবই সুন্দর। কিন্তু এদেশে এসে

অবধি কল্যাণের কথার মিলই সে খুঁজে পাচ্ছে না। এখানে যাদের দেখছে তাদের মধ্যে কল্যাণের কথার মত একজনও নেই। এখানে তো সবাই যেন সেই আমেরিকার জীবনযাত্রাকেই একটু হেরফের ক'রে চালিয়ে যাচ্ছে। রুমিকে একদিন জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, জান, তোমাদের দেশ সম্বন্ধে আমি যা শুনেছিলাম এখানে এসে তার কিছু দেখছি না, কেন বলতো ?

কি দেখছ ? — রুমি প্রতিপ্রশ্ন ক'রেছিল।

দেখছি এ তো আমাদের দেশেরই মত। তোমাদের পোষাক পরিচ্ছদ খাওয়া-দাওয়া আদব কায়দা সবই প্রায় এক।

ভালই তো।

ভাল কি মন্দ সে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে আমি যা শুনেছিলাম কিছুরই মিল নেই।

কি শুনেছিলে ?

সে কথা তোমাকে এত সহজে বোঝাতে পারব না।

রুমি কথাটায় গুরুত্ব না দিয়ে বলেছিল, তাহ'লে যারা তোমাকে বলেছে, সব ভুল বলেছে।

ভুল! এমিলি উচ্চারণ ক'রেছিল, একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, এখন তাই মনে হচ্ছে বটে তবে ভুল হতে পারে না। কারণ সে-ও বলেছিল 'আমাদের দেশের জীবনচর্যাতেও খুব দ্রুত পরিবর্তন চলছে। তবু গ্রামের দিকে, আসল দেশে আমাদের আসল জীবনযাত্রা এখনও প্রায় তেমনি অব্যাহত।'

প্রতিবাদ করেছিল রুমি, সবাই যে ঠিক জানবে, ঠিক দেখতে পাবে তারই বা কি কথা আছে ?

সে জানে, নিজের অগোচরেই বলে ফেলেছিল এমিলি, আমি যার কাছে শুনেছি সে এদেশের আত্মার স্বরূপ। এদেশের মাটির গাছে যেমন এদেশেরই ফুল ফোটে সে-ও তেমনি।

বাবাঃ তুমি যে এতবড় কথা বলছ, কে সে ? — রুমি বলেছিল চপল রসিকতার সহযোগে।

সে এক অদ্ভুৎ মানুষ। একদিন তার কথা তোমাকে বলব।

আজই বল না ?

হঠাৎ সেই মুহর্তেই আচ্ছন্নতা ছিঁড়ে গিয়েছিল এমিলির, আত্মস্থ হয়েছিল, বলেছিল, অন্যদিন বলব আজ নয়।

রুমি চট ক'রে প্রশ্ন ক'রে ফেলেছিল, দাদা জানে ?

প্রশ্নটা শুনেই হাসি এসেছিল সমস্ত মুখ জুড়ে, গভীর প্রশান্তিতে ভরে গিয়েছিল অন্তরলোক, বলেছিল, যার কাছে শুনেছি সে যে নির্ভুল তার প্রমাণ এইমাত্র পেয়ে গেলাম। বাইরে পরিবর্তন যতই আসুক না কেন অন্তরে তোমরা তোমাদের দেশেরই মেয়ে।এদেশের মেয়েদের সম্বন্ধে সে যা বলেছিল তুমি প্রমাণ ক'রে দিলে

তা অভ্রান্ত।

কি রকম ?

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এমিলি রুমির প্রথম প্রশ্নের জবাবেই ফিরে গিয়েছিল, বলেছিল, তোমার দাদা নিশ্চয়ই জানে। কারণ আমার কাছে তার একটা ছবি আছে আমি একদিন দেখিয়েছিলাম সেন-কে।

বল কি ?

হেসে এমিলি জানিয়েছিল এটা তোমাদের যেমন অসম্ভব তেমনি সম্ভব আমাদের দেশে।

কেন ?

তা তো বলতে পারব না রুমি, হয়ত সেই মানুষটার সঙ্গে দেখা হলে সে বলতে পারত কারণ প্রগাঢ় ভালবাসায় যে নিজের দেশকে জেনেছে অন্যের দেশকেও জানা তার পক্ষেই সম্ভব। কাজেই সে-ই একমাত্র এইসব তুলনামূলক বিচারে কার্য কারণ নির্ণয় ক'রতে পারে।

রুমি অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি। এমিলিই বলেছিল, একটা কথা সত্যিই বুঝছি মানুষ তার বাহ্যিক চর্চায় আপাত পরিবর্তন আনতে পারে কিন্তু ভেতরে তার পরিবর্তন হওয়া যুগান্তরের অধ্যাবসায় সাপেক্ষ।

কথাগুলো ক্রমাগত দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল বলেই রুমি চুপ ক'রেছিল। এমিলির এইসব কথার তত্ত্ব উপলব্ধি তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। সে তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে পরিত্রাণ চেয়ে বলেছিল, এই না তুমি বল সব সময় বাংলায় কথা বলতে, তুমি নিজেও সব সময় বাংলা বলবে বলেছিল ? নইলে তুমি তাড়াতাড়ি শিখবে কি ক'রে ?

সঙ্গে সঙ্গে এমিলি নতুন শেখা বাংলায় বলেছিল, এইসব কথা আমি বাংলা ভাষাতে বলতে পারব না। আমি যে বাংলা ভাষা এখনও বলতে শিখি নাই —

'শিখি নাই' বলবে না, 'শিখি নি' বলতে হবে।

এমিলি আস্তে আস্তে উচ্চারণ ক'রল, শি-খি-নি।

কল্যাণ বলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য সেটা প্রকৃতিদত্ত। এর পরিবর্তন অভিপ্রেত নয় সম্ভবও নয়, কাজেই আমার কৃষ্টি নিয়ে আমাকে গড়ে উঠতে হবে, মার্টিনকে বড় হতে হবে তার নিজের ধারাতেই। দুজনের সহগমন সম্ভব, একীভূত হওয়া সম্ভব নয়। রক্ষণশীল চিন্তাধারার মানুষ সে, তার মতে বলে নারী এবং পুরুষ, পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্ট, কোনদিনই এই দুই পরস্পর বিপরীত সমপর্যায়ে যেতে পারে না।

এমিলি কিছুতেই কল্যাণের সঙ্গে সায় দিতে পারে নি। তার মনে হয় দুই বিপরীতের মিলনেই যেমন সৃষ্টি সম্ভব হয় তেমনি দুই ভিন্ন মানসিকতার সংযোগেই জন্ম হয় নতুন এক মননশীলতার। দুই এবং তিন দু'টোকে যখন

গুণ করা হয় ফল হয় ছয়। সংখ্যা দুটোই পৃথক কিন্তু যখন গুণ করা হয় তখন এই দুই সংখ্যা একই স্তরে উন্নীত হয় — দুটোই হয় পরস্পরের গুণিতক। কল্যাণ নিশ্চয়ই প্রতিযুক্তি খাড়া ক'রতে পারত, সে পারে। মানতে ইচ্ছে না হ'লেও তার যুক্তিগুলো শুনতে হয়, কারণ সে বলতে জানে, দেখতেও জানে। তার চোখে সুন্দর সুন্দর হয়, তার চোখে আলো হয় আলো। চোখে দ্যাখে সকলেই কল্যাণ চোখের দেখার পরেও দ্যাখে, সে দ্যাখে মনের আতশী কাচে। তাই বাইরের আপাত দৃশ্যের অভ্যন্তরে অনেক সময় হয়ত অন্য দৃশ্য থাকে, সে অনেক গভীরে। কল্যাণ তা দ্যাখে। দেখায়। যাকে দেখায় সে-ও তখন কল্যাণের চোখ পায়। যেমন কাল বিকালে রাসবিহারী এভেন্যুর এনামেল করা মুখের কেতাদুরস্ত ভীড়ের মধ্যে সেই সুদেহা কালো বউটির ঘোমটা ঢাকা রূপটি সব সৌন্দর্য ছাপিয়ে উঠেছিল সে শুধু কল্যাণের চোখের আলোরই প্রতিচ্ছায়ে। শাড়ী তো রুমি-ও পরে, পরে অনেকেই কিন্তু সেই বউটিকে যেমন দেখাচ্ছিল তেমনটি তো আর কাউকেই দেখায় না। কি ভাবে পরেছিল? নিশ্চয়ই অন্য কোনভাবে, এমন ভাবে যা রুমি জানে না। এমিলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল নিজেকে আর চেষ্টা ক'রতে লাগল সেইভাবেই শাড়ী পরবার।

শাড়ী পরতে একটু অস্বস্তি হলেও পরতে শিখে বেশ তৃপ্তি পেয়েছে এমিলি। নিজের পোষাক পরে নিজেকে কেমন বেমানান মনে হ'ত এদের মধ্যে। অনেকটা বেআব্রু মনে হ'ত, লজ্জাও ক'রত একটু। সেই লজ্জা থেকে বেঁচেছে এমিলি। এবাড়ীতে অনেকটাই মিশে গেছে বলে সে মনে ক'রতে পারে। বরং রুমির পোষাক মাঝে মাঝে তাকে বিস্মিত করে। কি সব অদ্ভুৎ জামা আর প্যান্ট সে পরে। সেই পরে আবার কোন কোন দিন রাস্তাতেও বেরোয়। প্রসেনজিৎকে একদিন মুখ ফসকে জিজ্ঞেসও ক'রে ফেলেছিল এমিলি, প্রসেনজিৎ কথাটাকে হালকাভাবে ধরে রুমিকে বলেছিল, রুমি এটা কি পোসাক এমিলি জিজ্ঞেস ক'রছে।

এটা 'গহরী' ছবিতে টোনিয়া রাঠোর পরেছিল।

ব্যাপারটা এমিলির বোঝবার কথা নয়, প্রসেনজিৎ-এরও নয়। তবু প্রসেনজিৎ পথ চলতে 'গহরী' নামের বোম্বাই ছায়াছবির বিজ্ঞাপন দেখে কিছুটা জ্ঞানসম্পন্ন বলেই সে বলল, ও।

এমিলি শুধু ভদ্রতা ক'রে বলল, বাঃ নতুন ধরণের মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ। টোনিয়া হচ্ছে স্টাইল আর্টিস্ট। টোনিয়া-স্টাইল সব সময়েই নতুন হবে। তিন বছর টোনিয়া নায়িকা হয়েছে, এর মধ্যে কেউ তাকে স্টাইলে হারাতে পারে নি।

আসল কথাগুলো এতক্ষণে বোধগম্য হ'ল এমিলির।

এটা তো তোমাদের বাঙ্গালী পোষাক নয়? — এমিলি জানতে চাইল।

প্রসেনজিৎ জবাব দিল, কোন দেশেরই নয়। মগজের পোষাক। স্রেফ একজনের মগজ থেকে এর উৎপত্তি।

শাড়ীর মত এমন সুন্দর পোষাক থাকতে রুমি যে কেন ওই সব অদ্ভুৎ পোষাক পরে এমিলি বুঝতে পারে না। শাড়ী কিনতে দোকানে গিয়ে এত সুন্দর সুন্দর নক্সা আর রঙের বাহার দেখেছে এমিলি যা অভিভূত হবার মত। নানা রকম শাড়ী তৈরী ক'রতে পারে এখানকার মানুষেরা।

দরজায় কয়েকটা টোকা পড়তে এমিলি সেখানে দাঁড়িয়েই বলল, ভেতরে এস।

এল রুমি। ঢুকেই বলল, কি ক'রছ ?

নিজের হাত দিয়ে শাড়ীটাকে দেখিয়ে বাংলায় বলল, কাপড়টাকে ভাল ক'রে পরছি।

রুমি বেশ একমুখ হেসে বলল, ঠিকই তো আছে, আবার ঠিক ক'রে পরছ ?

ভাল হচ্ছে না।

আবার কি ভাল হবে ?

মুখে একটা হতাশাব্যঞ্জক শব্দ ক'রল এমিলি। সে যে বোঝাতে পারছে না এটা সেই শব্দে স্পষ্ট হ'ল। তারপর কাপড় পরায় বিরতি দিয়ে বলল, তোমরা গুরুজনদের কিভাবে প্রণাম কর আমাকে একটু শিখিয়ে দেবে ?

ওমা! প্রণাম আবার কি ভাবে ক'রব ? জোড়হাত ক'রে করি। রুমি জানাল। মাঝে মাঝে এমিলি এমন সব উদ্ভট প্রশ্ন ক'রে বসে যে শুনেই রুমি অবাক হয়ে যায় উত্তরও সঠিক দিতে পারে না।

তার উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারে না এমিলিও। রুমি হাত জোড়া ক'রে দেখানোতে এমিলি বলল, এতো সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার নমস্কার। প্রণাম কিভাবে কর ?

এবার বিস্ময় আরও বাড়ল। প্রণামই হোক বা নমস্কারই হোক এই একটাই শিখেছে রুমি কখনও সখনও দরকার হলে এটাই ক'রে থাকে। বাবাকে ড্যাডি এবং মাকে মাম্মি বলে ডাকার অভ্যেস ওদের আজন্ম। প্রণাম করার অভ্যাসটা কোনদিনই হয়নি, প্রয়োজনও হয় নি। বরং সকালে উঠে বাবাকে ইংরিজি কায়দায় সুপ্রভাত জানানো এবং রাত্রে খাবার টেবিল ছেড়ে যাবার সময় বিদায়ী শুভরাত্রি জানানোর অভ্যাসটাই সুপ্রীতি যথেষ্ট কৃষ্টিমানতা মনে ক'রে অভ্যাস করিয়ে রেখেছে। মা-সুপ্রীতির জানার কল্যাণে কন্যা রুমি এবং ছেলেরা সকলে এটাই শিখেছে। কিন্তু প্রসেনজিৎ আর বিশ্বজিৎ অপ্রয়োজনীয়বোধে সে সব ছেড়ে দিয়েছে, রুমি ধরে রেখেছে প্রয়োজনে প্রয়োগের জন্যে। এর বাইরে, ব্যবহারিক কিছু শিক্ষার সুযোগ তার আসেনি বলেই এমিলিকে সন্তুষ্ট করা তার অসাধ্য।

এমিলি তা বুঝল কিনা সে-ই জানে তবে সে দুই হাঁটু মুড়ে বসে উবু হয়ে মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে উঠে বলল, এইভাবে না গুরুজনদের প্রণাম ক'রতে হয় ?

তোমাকে কে বলল ? — বিস্মিত রুমির জিজ্ঞাসা।

ঠিক হচ্ছে কিনা বল না?

আমি জানি না।

সে কি? তুমি আমাকে ঠিক বলছ না। তুমি আমাকে অনেক কিছু শেখাতে চাও না।

আমি তোমাকে শেখাই না? তোমাকে বাংলা শেখালাম, শাড়ীপরা শেখালাম —

রুমির গলাটা জড়িয়ে ধরল এমিলি, বলল, না না আমি তোমাকে ঠাট্টা ক'রছি। সত্যিই তুমি অনেক ক'রেছ।

রুমি বলল, আমি যতটা জানি তোমাকে শিখিয়েছি। তুমি যেরকম প্রণাম করা দেখাচ্ছ আমরা কখনও কাউকে ওরকম ক'রে প্রণাম ক'রতে দেখিনি। হতে পারে এটাই নিয়ম।

বিশ্বজিৎ বলতে পারবে?

বিশ্বজিৎ-এর কথায় রুমি কোন উচ্চবাচ্য ক'রল না।

এমিলিই আবার জিজ্ঞাসা ক'রল, আচ্ছা বলত ও আমার সঙ্গে কথা বলে না কেন?

কার সঙ্গেই বা বলে? রুমি প্রতিপ্রশ্ন করল।

কেন?

আমি কি ক'রে বলব, ওকেই একদিন জিজ্ঞেস ক'রো।

তুমি একদিন ওকে জিজ্ঞেস ক'রে বল না?

ঠোঁট ওলটালো রুমি, ভাবখানা এই যেন তার বয়েই গেছে। তারপর বলল, ওর মনের মধ্যে যে কি আছে কেউ বোঝে না। অথচ দাদা দ্যাখ কি রকম সাদা সরল —।

তোমার দাদা খুবই সহজ মানুষ। কিন্তু সব মানুষ সহজ হয় না। বেশীর ভাগই সহজ নয়। কম লোককেই বোঝা যায়।

কেন বাবা, আমাকে বোঝা যায় না? মাম্মিকে না? ড্যাডিকে না?

এমিলি সব এড়িয়ে গিয়ে বলল, তোমার ভালবাসার মানুষটাকে কিন্তু নয়।

ও মাই পুয়োর সোল! সৌগত খুবই সরল মানুষ। শিশুর মত সরল। ও যে কি সরল তোমাকে কি বলব!

এমিলি রুমির কথাবার্তা শুনে বেশ মজা পেল, ঠাট্টা ক'রেই বলল, দুএকটা কথা বলই না!

খুব খুশি হ'ল রুমি এমিলির এই প্রশ্নে। শিশুর মত আবেগে বলে উঠল, ছোট ছেলের ক্ষিধে পেলে যেমন সে যখন তখন স্থান কাল না বুঝেই কান্না সুরু করে, সৌগতও তেমনি।

কাঁদে বুঝি?

ওমা! কাঁদবে কেন?

তবে ?

ওই হ'ল আর কি যখন তখন যা তা আবদার —

এমিলি কি বুঝল সে-ই জানে, তবে কথা বাড়াল না। মেয়েটার জন্যে একদিন তার দুঃখ হ'ত, আজ অনুকম্পা হ'ল। কি জানি তার কিছুতেই ভাল লাগে না সৌগতকে। বিশ্বাসই হয় না। সৌগতর দিকে তাকালে ওর মুখমণ্ডলে প্রথমেই ফুটে থাকতে দেখে অবিশ্বাস আর স্বার্থপরতা। একা থাকলে ওর দিকে তাকাতেই কেমন ভয় লাগে। নিজের দেখায় কোন ভুল হয়ে যাচ্ছে কিনা বোঝবার জন্যে সমস্ত মানুষের মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখে, বোঝবার চেষ্টা করে এদেশের মানুষের ওটাই স্বাভাবিক মুখ কিনা ? তাই বা হবে কেন, আবার ভাবে সে, প্রসেনজিৎ-এর প্রশান্ত মুখমণ্ডল, কল্যাণের গভীর কালো নির্মল মুখচ্ছবি, বিশ্বজিৎ-এর চিন্তিত উদাস চেহারা — আরও যাদের মুখ চোখে পড়ে সকলের মধ্যে একটা আনুষঙ্গ আছে, এদের কারও সঙ্গেই সৌগতর মুখের ভাব মেলে না, অথচ আশ্চর্য হয়ে সৌগতকে বুঝতে চেষ্টা করে, পারে না। সৌগতর ভেতরে যে কি আছে দেখতে পায় না সে, সৌগতকে চিনতে পারে না। যে ভাবটা তার মুখের ওপর উঁকি দেয় সেটুকু দেখেই তাকে ভয় পায়, এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে।

সৌগত আবার তেমনি বিশেষ চেষ্টা করে এমিলির সঙ্গে মিশতে। সে উপযাচক হয়েই কথা বলে, আলাপ জমায়। বলে, ওখানে গেলে ভাল একটা কাজ পাওয়া যাবে ?

সবাই তো পায়। জবাব এমিলির খুবই সংক্ষিপ্ত।

তোমার কাকা তো ব্যবসায়ী। ও঺র তো অনেক জানাশোনা, ও঺কে দিয়ে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না ?

যাচ্ছে কে ?

ধর আমিই যদি যাই —

তুমি যদি যাও এমনিই পেয়ে যাবে। ওখানে যার যেমন যোগ্যতা কাজ তেমনি পায়।

এখান থেকে ব্যবস্থা ক'রে তো যেতে হবে ?

শুধু শুধু কি হবে ওখানে গিয়ে ? নিজের দেশে বেশ সুন্দরই তো আছ ? —

কথার মধ্যে প্রসেনজিৎ ঢুকে পড়ে বলেছিল, বেশ তো আছ এখানে। দুঃখটা কিসের ? এখানেই তো বেশ সুন্দর চাকরী পেয়ে গেছ !

দূর দূর ! এখানে আর আমেরিকায় ! এখানে জীবন আছে ? — সৌগত এমিলির সঙ্গে কথাবার্তা সব সময়ে ইংরিজিতেই বলে। ফলে আলোচনা ইংরিজিতেই হচ্ছিল, কেবল একটি কথা সে বাংলাতে বলল, একটা বাড়ীর মধ্যে ওটা শোবার ঘর আর এ দেশটা পায়খানা।

কথাটা এমিলি বুঝতে পারল, বাংলাতেই জবাব দিল একটু শক্ত ভাষায়,

যে লোক নিজের দেশকে শ্রদ্ধা ক'রতে না পারে অন্যদেশকে শ্রদ্ধা সে ক'রতেই পারে না। — পরের কথাটি নিজের ভাষাতে বলল, প্রত্যেক মানুষের নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত।

হাওয়া প্রতিকুল দেখে সৌগত তার কথার পাল গুটিয়ে নিল। প্রসেনজিৎ শান্ত স্বরে মধ্যস্থের মত বলল, আজকাল অবশ্য পৃথিবীটাই একটা দেশ হয়ে যাচ্ছে। সভ্যতার এই চূড়ান্ত পর্যায়ে যেখানে চাঁদে পৌঁছে গেছে মানুষ, সেখানে পৃথিবীর দুই প্রান্তে দূরত্ব আর তেমন কিছুই নয়।

তোমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা সমস্ত নারীকেই মায়ের মত জ্ঞান করবার কথা বলেছেন বলে কি নিজের মা আর অপরের মায়ের পার্থক্য ঘুচে গেছে? ঈশ্বর বৈচিত্রের জন্যেই একই পৃথিবীর মধ্যে এত দেশ এত রকম মানুষ সৃষ্টি ক'রেছেন। এই প্রাকৃতিক পার্থক্য যতদিন থাকবে ততদিন একই পৃথিবী বহু দেশে ভাগ হয়ে থাকবে।

একটু সময় পেয়ে জবাব ভেবে নিয়ে সৌগত বলল, প্রসেন-দা তুমি যা-ই বলনা কেন এদেশ-এর পরিবেশ খারাপ হয়ে গেছে। যে হারে রোজ খুন জখম হচ্ছে তাতে এদেশে মানুষ বাস করা অসম্ভব।

এমিলি সৌগতর যুক্তি শুনল, অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ল তার। এমনি একটা কথাই সে কল্যাণকে বলেছিল, দেশে ফিরে গিয়ে কি হবে কল্যাণ? মানুষ যেখানে থাকে সেটাই তো তার দেশ! এখানে যে কাজ তুমি ক'রছ আমি তো জানি তোমার দেশে ফিরে গিয়ে সে রকম কাজ তুমি পাবে না। অনেকেই পায় না।

আমি জানি এমিলি, বলেছিল কল্যাণ, আমাদের দেশে কাজের সুযোগ এ দেশের মত নেই। কাজের পরিবেশও এদেশের মত ভাল নয়। কিন্তু সে তো আমার দেশ! এই ধর না আমার এই ঘরের চেয়ে মিস্টার ফোর্ড-এর বাড়ী অনেক ভাল। তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়ে আমি কি মিস্টার ফোর্ডের বাড়ীতেই থেকে যাব? বরং আমার কাজ হবে ফিরে এসে আমার ঘরখানাকে সাধ্যমত চেষ্টায় মিস্টার ফোর্ড-এর বাড়ীর মত ক'রে সাজিয়ে তোলা।

তুমি একলা কি ক'রবে?

সাধনাতেই মানুষ যা কিছু গড়ে তোলে। এই যে তোমরা জীবনের জন্যে এত সুন্দর বন্দোবস্ত ক'রেছ, এত আয়োজন ক'রেছ, এ কি একদিনেই হয়েছে? কি দীর্ঘদিনের সাধনাতে এটা সম্ভব হয়েছে বল তো? দূর সেই ইংলণ্ড থেকে কি দুর্গম পথের কত বাধা কাটিয়ে তোমরা এসে এখানে গড়ে তুলেছ এই নতুন স্বর্গ, অথচ আমরা দীর্ঘকাল পরাধীনতার অন্ধকারে আত্মগ্লানিতে থেকে হারিয়েছি আমাদের ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি — এক কথায় সব। আমাদের লুঠ ক'রেছে পাঠান, তুর্ক, মঙ্গোল। আমাদের ধর্মনাশ ক'রেছে আক্রমণকারীর বর্বরতা। তা ছাড়া আত্মসমাহিত অধ্যাত্মমার্গী জাতি হিসেবে আমাদের প্রতিরোধও ছিল

অত্যন্তই দুর্বল। বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে অজ্ঞতা চিরদিনই আমাদের অপরিসীম। তাই কোন আক্রমণই আমরা প্রতিহত ক'রতে পারি নি। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ইংরেজ আমাদের শাসন ক'রলেও পরোক্ষে আমাদের অসীম উপকার ক'রেছে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে।

এমনি অনেক সব কথাই বলেছিল কল্যাণ! এই দেশেরই কল্যাণ। আর আজ সৌগত যা বলছে তার সঙ্গে কি দুস্তর ব্যবধান সে সব কথার। এমিলির খুবই ইচ্ছে করে একবার কল্যাণকে এদের সামনে এনে দাঁড় করাতে। দেখাতে। কিন্তু এদের কি দেখাবে, সে নিজেই এখনও সন্ধান পেল না কল্যাণ কোথায়? এই বিশাল দেশে কোথায় কি ভাবে আছে কে জানে? সব চেয়ে যা দুঃখের তা হ'ল ওর গ্রামের ঠিকানা একবার পেয়েছিল এমিলি কিন্তু অপ্রয়োজনীয় ক'রে কোথায় যে রেখেছিল পরে আর খুঁজে পায় নি। কল্যাণ গল্প ক'রেছিল পশ্চিমবাংলার এমনই এক গ্রামে তার বাড়ী যেখান থেকে সব চেয়ে কাছের রেল স্টেশন সাতাশ মাইল দূর। স্টেশনের নাম এমিলির অজ্ঞাত। এমিলির ইচ্ছে করে স্টেশনে স্টেশনে খোঁজ নেয়, প্রত্যেক স্টেশনের সাতাশ মাইল দূরের গ্রামগুলো ঘুরে দেখে সেখানে কোন কল্যাণ জানা আছে কিনা, থাকলে সে কেমন আছে। কল্যাণের মা সেখানে থাকেন, কল্যাণকে পাওয়া সেখানে যাবেই। এখন সে বাংলা ভাষাও শিখে গেছে কাজেই কল্যাণের মায়ের সঙ্গে কথাও বলতে পারবে মন খুলে। কল্যাণের সেই বাংলা গানটি মনে পড়ে যার ইংরজী তর্জমা ক'রে বারংবার শোনাতো কল্যাণ, 'ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, আমার যে দেশেতে জন্ম যেন সেই দেশেতেই মরি'। এতই চমৎকার সুর ছিল গানটির যে এখনও সেই সুর কাণে বাজে। এখানে এসেই ভেবেছিল আসল গানটা কখনও রেডিওতে বাজলেই তার টেপরেকর্ডারে রেকর্ড ক'রে নেবে, তা হয়ই না কি আর করা যাবে! রুমিকে একদিন এই অর্থের কোন গান সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রেছিল হদিশ পায় নি। আসলে গানটির বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলেছিল কিন্তু গানের কলিগুলো না শুনে কিছুই বুঝতে পারে নি রুমি। সাহায্য করতেও পারেনি এমিলিকে।

রুমি সেদিন বোঝেনি তার জ্ঞানের অভাবে, আজ রুমির কথা এমিলি বুঝল না অনেকটা ইচ্ছে করেই; হয়ত বুঝতে চাইলই না। প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাইল সে। কোন মানুষের নিন্দার কথা উঠলে এমনিতেই সে চুপ ক'রে যায় তারওপর আবার রুমির বাগদত্ত ব্যক্তির প্রসঙ্গে কথা সৌজন্যের খাতিরেই তো না বলা উচিত। কাজেই অন্য কথা পাড়ল এমিলি, বলল, মিস্টার ঘোষ যাঁর নতুন বাড়ীতে পার্টি দেওয়া হচ্ছে, এটা তো শুনলাম গৃহপ্রবেশ-এর অনুষ্ঠান — ?

হ্যাঁ। — রুমি জবাব দিল।

আমি তো কিছুই জানি না, তুমি আমাকে একটু শিখিয়ে দাও আমাকে কি ক'রতে হবে।

কিছু না স্রেফ যাবে খাবে চলে আসবে।

ও নো! তুমি প্লীজ একটু শিখিয়ে দাও — আমি যে গৃহপ্রবেশের নিয়ম কানুন কিছু জানি না।

যারা যাবে তাদের জন্যে কোনই নিয়মকানুন নেই — তবে দাদাও বলছিল যে মিস্টার ঘোষ হঠাৎ কেন নেমন্তন্ন ক'রলেন কে জানে? অতি বড় কতগুলো কোম্পানীর ডিরেক্টার মিস্টার ঘোষ-এর সঙ্গে দাদার আলাপ কেবল নাকি ওই মিস্টার মালুর মেয়ের বিয়ের পার্টিতে। তার আগে কোন চেনা-শোনাই ছিল না।

ব্যাপারটা এমিলির কাছে কোন রোমহর্ষক কাহিনী শোনবার মত। তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে রইল উত্তেজনায়। আসলে তার পক্ষে জানা ছিল না কি রকম পরিচয়ে নেমন্তন্ন করা হয় আর সম্পর্ক কতটা দূর হলে নেমন্তন্ন করা যায় না। তাই সে রুমির কথামত জানতে চাইল, তাহ'লে মিস্টার ঘোষ-এর নেমন্তন্ন না নিলেই তো হ'ত। জানিয়ে দিলেই হ'ত আমরা ওই সন্ধ্যায় যেতে পারছিনা, দুঃখিত।

জানিনা কি ব্যাপার। দাদাই জানে।

দরজায় টোকা পড়তেই এমিলি ঘরে ঢোকবার আহ্বান জানাল। এল প্রসেনজিৎ। ঢুকেই বলল, আরে রুমি! কি ব্যাপার বল তো আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাব সেটা নিশ্চয়ই নিরাপদ এলাকা?

কেন বলত? — রুমি জানতে চাইল।

আসবার সময় সৌগতর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাস্তায়, পার্টির কথা শুনে বলল আজকাল সন্ধ্যের দিকে পার্টিতে না যাওয়া উচিত। কোনদিকে কখন গোলমাল বেধে যাচ্ছে তার ঠিক কি?

এমিলি কথাটা শুনে একবার রুমি আর একবার প্রসেনজিৎ-এর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বাড়ীতে ইংরিজি খবরের কাগজ রোজই আসে তাতে সত্যিই রোজ ডজন ডজন খুন হবার খবর থাকে, কোথাও ব্যবসায়ী মরছে, কোথাও পুলিশ মরছে, কোথাও নকশালপন্থী যুবক মরছে গুলিতে। কিন্তু এর ভেতরকার ব্যাপারটা কেউই বোঝাতে পারে না তাকে। সে-ও ঠিক কাগজ পড়ে বুঝতে পারে না কিচ্ছু। মাঝে মাঝে তার মনে প্রশ্ন জাগে কারা এই নকশালপন্থী, কি চায় তারা, কেনই বা তারা পুলিশকে পেলে মারে আর পুলিশই বা কেন মারে তাদের দেখতে পেলেই?

প্রসেনজিৎ আবার বলল, রুমি একটা কাজ কর, বিশ্বজিৎকে একবার ডাক। ওর তো বোধহয় ধারণা আছে কোন দিক দিয়ে গেলে ঠিক হবে।

এমিলি চট ক'রে বলল, আমি ডাকছি।

এমিলি বেরিয়ে গেল, রুমিকে ঘন ঘন মাথা নাড়তে দেখে প্রসেনজিৎ জিজ্ঞেস ক'রল কি হ'ল?

আমার মনে হয় ছোটদা আসবে না।

কেন ?

নিজের অনুমান গোপন করে রুমি বলল, তা জানি না তবে মনে হয় আসবে না।

কারণ তো একটা থাকবে ?

ওর কোন কাজের কারণ কেউ বোঝে না।

দেখাই যাক না আসে কি না।

এবাড়ীর সকলের থেকে ও নিজেকে দূরে রাখতে চায়।

সেটা আমিও দেখছি বটে, কিছু হয়েছিল বাড়ীতে ?

না। পড়াশোনা ও তো চিরদিনই বেশী করে কিন্তু আস্তে আস্তে কেমন যেন হয়ে গেল।

এমিলির ইচ্ছে ছিল বিশ্বজিৎ-এর ঘরে সোজা ঢুকে পড়বে তাকে কিছু জানতে না দিয়ে। একটু চমকে দেবে তাকে। কিন্তু হ'ল না। দরজা বন্ধ। খিল দেওয়া। টোকা দিতেই খুলে গেল। বিশ্বজিৎ। সে বেশ আশ্চর্যই হয়েছে ইংরিজিতেই জানতে চাইল, কি ব্যাপার ?

এমিলি বলল বাংলায়, আপনার দাদা একবার দেখা পেতে চান। — একটু ঘাবড়ে গিয়েই সে অত ক'রে শেখা কথা সব ভুল ব'লে ফেলল।

এবার বিশ্বজিৎ বিস্মিত হ'ল আরও। কোনদিন এত সামনে থেকে এভাবে তাকিয়ে দেখেনি এমিলিকে। কিন্তু হয়েছে কি ? তার মার চেয়ে বেশী সিঁদুর, শাড়ী — বাংলা ভাষা। সব কিছু মিলিয়ে একটা রহস্যময় ব্যাপার সে যেন লক্ষ্য ক'রছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে আমেরিকার মানুষ হলেই তাকে অবিশ্বাস এসে যায়। মনে পড়ে ভিয়েৎনাম, কোরিয়া, পেন্টাগণ, সি,আই,এ। অবশ্য এটাই আমেরিকানদের বিশেষত্ব। বিশেষত্ব স্পাইদের, তারা একেবারে মিশে যায়। যেখানে থাকে সেখানে লাউডগা সাপের মত মিশে থেকে খবরাখবর জোগাড় করে, পাচার করে। অসংখ্য ইউনিট সি,আই,এর খবর জোগাড় করারও, কোন দেশের পরিস্থিতি লক্ষ্য করার ইউনিটও নিশ্চয়াই আছে। এই মহিলাটি নিশ্চয়ই সেই ইউনিটের। ভালমানুষ দাদাটির কাঁধে ভর ক'রে এদেশে চলে এসেছে, এসেছে এখানকার বৈপ্লবিক পরিস্থিতি আর কার্যপদ্ধতি লক্ষ্য করবার জন্যে। দারুণ সেয়ানা হয় এই সব লোক। ব্যাপারটা অনেকদিন ধরেই আঁচ ক'রেছিল বিশ্বজিৎ তাই এমিলি অনেকবার গায়ে পড়ে আলাপ করবার চেষ্টা ক'রলেও সে নিজেই বাধা দিয়ে আটকে রেখেছে ওকে দরজার বাইরে। ঘরে ঢুকতে দেয়নি। আজ যেহেতু দাদা ডাকছে তাই আর এড়ানো গেল না কিন্তু বিশ্বজিৎ-এর মনে হ'ল সে প্রসেনজিৎ-এর ঘরে গেলেই এমিলি তার ঘরে ঢুকে পড়বে, তাই সে বলল, তুমি চল আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। — কথাগুলো

বিশ্বজিৎ ইংরিজিতেই বলল এমিলিকে নিরুৎসাহ করার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু এমিলির মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হ'ল। বিশ্বজিৎ-এর সঙ্গে কথা বলতে পাবার সুযোগটুকু পরম আগ্রহে সে কাজে লাগাতে চাইল, ইংরিজিতে বলল, তুমি তো অনেক পড়াশোনা কর, আমাকে একটু সাহায্য কর না। দুচারটে বই দিলে আমিও একটু পড়াশোনা ক'রতে পারি!

বিশ্বজিৎ-এর সন্দেহ আরও দৃঢ় হ'ল। সে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে এ মেয়েটি সি,আই,এ-র এজেন্ট না হয়ে যায় না। এবং সে তার পেছনেই লেগেছে। সে তাই বলল, আমি নিজের পড়ার বই ছাড়া আর কিছুই পড়ি না।

এমিলি বুঝল যে কথাটা আদৌ সত্যি নয়। সে নিজে দেখেছে গাদাগাদা বই নিয়ে বিশ্বজিৎ আসে আবার কখনও নিয়ে বেরিয়ে যায়। তবু যেহেতু সে অস্বীকার ক'রছে তাই তার সহানুভূতি উদ্রেগ করার ইচ্ছায় বলল, তোমাদের দেশে তো মেয়েদের যথেষ্ঠ কাজ নেই তাই সময় কাটানোর খুব অসুবিধে হয়।

বিশ্বজিৎ চুপ ক'রে রইল।

এমিলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলল, আচ্ছা তুমি কি আমাকে সাহায্য ক'রতে পার?

কি বিষয়ে?

শুনেছি তোমাদের গ্রামগুলোতে মেয়েরা খুব কাজ করে, ধান থেকে চাল তৈরী, আরও অনেক রকম কাজ সারাদিন ধরে করে তারা। তুমি কোন গ্রামের মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে পার?

আবার সেই একই রহস্যের আভাস। সেই যে গ্রাম দিয়ে সহর ঘেরার কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে সেই জন্যেই গ্রামে যেতে চায়। গোপন তদন্তের মতলব। কিন্তু বড়ই বোকার মত ধরা পড়ে যাচ্ছে মেয়েটা। একাজে আরও বেশী চাতুর্য দরকার। মনে মনেই কথাগুলো ভাবতে লাগল বিশ্বজিৎ। ওসব পুরাণো চালাকি দিয়ে কাজ হাসিল করার দিন ভারতবর্ষে ছিল সতেরশো সাতান্ন সালে। নিজেকে আড়াল ক'রে রাখবার মতলবে বিশ্বজিৎ বলল, আমার কোন গ্রাম জানা নেই। কোন গ্রামকে আমি চিনিও না।

আচ্ছা বলতে পার গ্রামগুলো এখান থেকে কতদুর?

কোন গ্রামের কথা বলছ? এদেশে তো অনেক গ্রাম আছে —

কোন গ্রামের নামই এমিলি জানে না। শুধু একটা নাম জানে মেদিনীপুর। কল্যাণ জানার বাড়ী। ঠিকানা জানা নেই। স্মৃতি থেকে শুধু ওই নামটুকু সে জানাল, মেদিনীপুর।

বিশ্বজিৎ-এর পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট মনে হ'ল, সে ধরে নিল মেদিনীপুর জেলার ডেবরা গোপীবল্লভপুরের যে বিপ্লবী আন্দোলন চলেছে তারই গোপন তথ্য সংগ্রহ ক'রতে এসেছে এমিলি। সে আর একবার বিস্মিত হ'ল আমেরিকার সেইসব সংস্থাগুলোর ক্ষমতা দেখে। এরই মধ্যে সেই দূরতম পৃথিবী থেকে এজেন্ট পর্যন্ত পাঠিয়ে দিল। সে পৌঁছাতে চায় একেবারে কেন্দ্র বিন্দুতে। কে

জানে হয়ত শ্রীকাকুলামে এতদিনে কেউ পৌঁছেই গেছে। এমনিভাবেই এরা নষ্ট ক'রেছে ডোমিনিকান রিপাবলিকের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ধ্বংস ক'রেছে বলিভিয়ার গণসংগ্রাম, হত্যা ক'রেছে কঙ্গোর বিপ্লবী আত্মা প্যাট্রিস লুমুম্বাকে। এই তৎপরতা দিয়েই সারা পৃথিবীর বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে উৎপাটিত করে ওরা। তা হোক তবু ওরা বারংবার মারও খেয়েছে। ভিয়েৎনামে আর কোরিয়ায় ওরা কুকুরের মত কেঁদেছে। এখানেও তাই হবে। ভারতবর্ষের মাটিতেও ওদের মেনে নিতে হবে চূড়ান্ত পরাজয়। এই ভাবনা তার মাথার মধ্যে ঘুরে গেল কয়েক নিমেষেই। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সে বলল, মেদিনীপুর তো একটা বিরাট জেলা। অনেক গ্রাম আছে সেখানে —

ব্যাপারটা যে এই রকমই সেকথাও আন্দাজ ছিল এমিলির। তবু বন্যার স্রোতে কুটো ধরবার মত সে বলেছিল মেদিনীপুরের নামটা! বিশ্বজিৎ-এর কথা শুনে বলল, মেদিনীপুর জেলাটা এখান থেকে কতদূর?

অনেক দূর।

কিভাবে যেতে হয়?

হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে।

কিছুই মাথায় ঢুকল না এমিলির। কোথায় হাওড়া স্টেশন আর কোন দিকেই বা মেদিনীপুর তার কোন হদিশ সে পেল না। চুপ ক'রে রইল। অল্পক্ষণ পরেই বলল, কদিন সেনকে বলছি কোনও একটা গ্রামে নিয়ে চল সে পারছে না। বেচারী কোন গ্রাম চেনে না।

বিশ্বজিৎ ভাবল জানতে চাইবে, এত জায়গা থাকতে তোমার হঠাৎ গ্রাম দেখবার এত ইচ্ছে হ'ল কেন? — বলল না। থাক। কি হবে জানতে চেয়ে। বরং বেশী কথা না বলাই ভাল। দাদা ডাকছে তার সঙ্গে দেখাটুকু ক'রে এলেই হ'ল। তাই বলল, চল যাই দাদা কি বলছে শুনি।

হঠাৎ যেন ভুলে যাওয়া কথা মনে এল এমিলির, বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চল।

বিশ্বজিৎ ঘরে ঢুকতে রুমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল যেন অচেনা কেউ ঘরে এসেছে। বিশ্বজিৎ ঢুকেই জানতে চাইল, তুমি কি আমাকে ডাকছিলে?

প্রসেনজিৎ যেন তাকে ডেকে অন্যায় ক'রেছে এমনিভাবে বলল, হ্যাঁ। বোস।

বিশ্বজিৎ বসতেই প্রসেনজিৎ বলল, মিস্টার ডি, এন, ঘোষকে জানা আছে?

কোন ডি, এন, ঘোষ?

হেরম্যান ক্লার্ক কোম্পানী গ্রুপের ডিরেক্টর?

না। আমি কি ক'রে চিনব?

থাকগে যাক। ভদ্রলোক আজ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ীতে পার্টি দিচ্ছেন। এই হ'ল ঠিকানা। — চিঠিটা দেখাল প্রসেনজিৎ।

দেখে বিশ্বজিৎ জিজ্ঞেস ক'রল, তা কি হয়েছে?

পথে সৌগতর সঙ্গে দেখা। সে বলল, আজকাল কোন রাস্তা নিরাপদ নয়। কাজেই —

না বেরোতে বলেছে, এই তো?

হ্যাঁ। সেটা এখন কি ক'রে হয় বল তো? আমি অত জানি না, নেমন্তন্ন নিয়ে নিয়েছি — এখন না যাওয়াটা কি ক'রে হয়?

সৌগত একজন একনম্বর প্রতিক্রিয়াশীল, অত্যন্ত বিক্ষুব্ধভাবে ইংরিজিতে কথাগুলো বলল বিশ্বজিৎ, তারপর বাংলাতেই বলল, ওর কথা শুনলে সব মানুষ পাগল হয়ে যাবে। তুমি নির্ভাবনায় যাও। কোথাও কোন গণ্ডগোল দেখবে না। তা ছাড়া ওসব এলাকা একদম ঠাণ্ডা।

কথাটা এতই তীব্র ছিল যে এমিলি শুনেই রুমির দিকে তাকাল দেখল সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার বিশ্বজিৎ-এর দিকে দেখে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল। ওই চাহনিতেই সে প্রতিবাদ ক'রল বিশ্বজিৎ-এর মন্তব্যের। বিশ্বজিৎ সে দিকে লক্ষ্যমাত্র ক'রল না।

প্রসেনজিৎ বলল, কথাটা সত্যি যে কাগজে রোজই খুন গ্রেপ্তার পুলিশের গুলি ক'রে মারার খবর পড়ছি বটে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার সামনে কিছু দেখিনি। অফিসেও সবাই যেন ভয় পেয়ে আছে কিন্তু আমি তো বুঝছি না এই ভয় পাবার কি কারণ।

যারা ভয় পাচ্ছে আর ভয় ছড়াচ্ছে তাদের ভয়ের কোন কারণই নেই। আসলে এরা হচ্ছে সেইসব বুর্জোয়া কালোবাজারীর এজেন্ট যাদের ভয় পাবার কথা।

প্রসেনজিৎ বোকার মত বিশ্বজিৎ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুই বুঝছে না সে। এই দীর্ঘদিন বাদে দেশে ফিরে অনেক কিছুই দুর্বোধ্য ঠেকছে তার কাছে। আর কেমন যেন বাধোবাধো লাগছে তার। মনে হচ্ছে তার আর সকলের মাঝখানে একটা সূক্ষ্ম জালের আড়াল রয়েছে যা চোখে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু অনুভব করা যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তের ব্যবহারে। এই কতগুলো বছরের দূরত্বে শুধু যে বিশ্বজিৎ-এর সঙ্গে তার ব্যবধান বেড়ে গেছে তাই নয়, গড়ে উঠেছে এক সংকোচের প্রাচীর যা স্বাভাবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে আড়াল ক'রে রয়েছে। প্রসেনজিৎ অদ্ভুৎভাবে লক্ষ্য ক'রছে বিশ্বজিৎ-এর মুখের ভাষা কেমন বদলে গেছে। কি যে সব সে বলছে তার অনেকটাই বোঝে না প্রসেনজিৎ। কিন্তু বুঝছে না বলে যে সহজভাবে জিজ্ঞেস ক'রবে তাও সংকোচ হচ্ছে। আরও একটা গভীর পরিবর্তন সে দেখছে এবার এসে, যে সৌগতর সঙ্গে তার সম্পর্কের সম্পূর্ণ বদল হয়েছে। যে সৌগত এককালে তার বন্ধু ছিল তাকে ও একদম সহ্যই ক'রতে পারে না।

সে জিনিষটা লক্ষ্য ক'রছিল এমিলিও। এবং সেজন্য বিশ্বজিৎ-এর সঙ্গে বেশ কিছুটা মানসিক নৈকট্যও সে অনুভব ক'রছিল। সে চাইছিল বিশ্বজিৎ

এঘরে অনেকক্ষণ থাকুক, অনেকক্ষণ এই কথাবার্তা চলুক যাতে ওর সম্পর্ক স্বাভাবিক পর্যায়ে আসে। অনেকক্ষণ কথাবার্তা চললে নিশ্চয়ই এমন সব প্রসঙ্গ এসে পড়বে যাতে সে নিজেও অংশ গ্রহণ ক'রতে পারবে। আসলে খাসা ছেলে এই বিশ্বজিৎ। চেহারা সুন্দর, মুখশ্রী শান্ত ও পবিত্র। কল্যাণ যে রকম গল্প ক'রত সত্যিই সে রকম। স্নেহ করবার মত ভাই এই বিশ্বজিৎ। বারংবার ইচ্ছে করে ওকে ভালবাসতে, পারা যায় না, নিজেকে কেন সে আড়াল ক'রে রাখে, এমিলি বোঝে না। অথচ কি ক'রে যে এই আড়াল সরিয়ে মেলামেশার অবাধ প্রাঙ্গন খুলে দেওয়া যায় এমিলি তা জানে না। কি পেলে বা কি বললে যে বিশ্বজিৎ খুশী হবে এমিলি ভেবে পায় না। কল্যাণ গল্প বলত, আমাদের দেশে ভাই-এর সঙ্গে ভাই-এর সম্পর্ক একই সঙ্গে বন্ধুর মত আবার পিতার মত — ভালবাসার এবং শ্রদ্ধার। সেখানে ছোট ভাই বড় ভাই-এর সামনে সিগারেট পর্যন্ত খায় না। অথচ দুইভাই হয়ত একইসঙ্গে খেলে, গান গায়, গল্প তো করেই। কিন্তু কই বিশবজিৎ-প্রসেনজিৎকে প্রাণ খুলে মেলামেশা ক'রতে তো সে দেখছে না। কখনই দেখছে না দুজনে বেশ গল্প ক'রছে। বরং কখনও কথা বললে সসংকোচে কথা বলে, বিশবজিৎ যদি বা স্বাভাবিক ভাবে বলে প্রসেনজিৎ বলে যেন কত ভেবেচিন্তে।

কথাটা প্রসেনজিৎ নিজেও উপলব্ধি ক'রেছে। সকলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই কেমন যেন আটকে যাচ্ছে তার, বাধো বাধো ঠেকছে সে বুঝেছে। কার সঙ্গে কেমন ভাবে কথা বললে যে ঠিক হবে সে ঠিক বুঝতে পারছে না, কাকে কোন কথাটা বলা উচিত হবে না তাও ঠিক ক'রতে পারছে না সে। এমন কি মা বাবার সঙ্গেও কি ভাবে কথা বলা উচিত হবে সে যেন ভুলেই গেছে। সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে অতীতের একাত্মতার সুর কেটে গিয়ে। মায়ের সঙ্গে ব্যবহারের যতটা হার্দিক, তার চেয়ে ঢের বেশী এসে পড়ছে সৌজন্য। কিন্তু প্রসেনজিৎ ভাবছে যে সে এ অবস্থা কাটিয়ে উঠবে। মাঝের এই কতগুলো বছরের ব্যবধানে সবাই যেন কেমন বড় হয়ে গেছে, বদলেও গেছে। বিশবজিৎকে খুঁজে পাওয়া যায় না আজকের বিশবজিৎ-এর মধ্যে, ছোট্ট রুমিও আজ একজন মহিলাতে রূপান্তরিত। একজনও আর আগের মত নেই। ঠাকুমা অনেক বেশী বুড়ো হয়ে গেছেন, অনেকটা অচলও। নিজের জায়গাতেই থাকেন। সেখানে বসেই ডাকাডাকি করেন ঝিকে বা চাকরকে দিয়ে। দেশে ফিরে থেকে রোজই শুনতে শুনতে একদিন ঠাকুমাকে দেখতে গিয়েছিল প্রসেনজিৎ, একমাত্র ঠাকুমাই পুরোনো সুরে কথা বললেন, কি দাদু বিলিতি বউ নিয়ে এলি দেখালিনি ?

ঘরেই তো আছে দেখনি কি আর ? প্রসেনজিৎ জবাব দিয়েছিল। ঠাকুমা বলেছিলেন, দেখবই বা কি, তোর দাদু কত ছেলেকে মানুষ ক'রল আমাকে তো আর ইংরিজিটা শেখাল না আমি তো কথাই বলতে পারব না তোর পরীর সঙ্গে —

তাতে কি দেখতে তো পাবে, বলেই প্রসেনজিৎ চলে এসেছিল, কথা বাড়ায়

নি। শুধু ওই একজনই যা স্বাভাবিক ভাবে কথা বলেছে, আর কেউ নয়। এমন কি মা পর্যন্ত নয়। যদিও মা চিরদিনই ওই রকম তবু মা-র প্রথম দিনের ব্যবহারই কেমন যেন ঠেকেছিল যার জন্যে মনে হচ্ছিল বেশ একটা ব্যবধান তৈরী হয়ে গেছে। তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই প্রসেনজিৎ-এর মনে হয়েছে দেশে না ফিরলেই ভাল ছিল। সে নিজে ইচ্ছে ক'রে ফেরেও নি। ফিরিয়েছে এমিলি। বিয়ের একটাই সর্ত ছিল প্রসেনজিৎ ভারতবর্ষে ফিরে যাবে, সেখানেই থাকবে। প্রবাসী বন্ধুরা এধরণের সর্তে অবাক হয়েছিল, বিশেষ ক'রে সে সর্ত আবার একজন মার্কিনী মেয়ের। বোস্টনে, নিউইয়র্কে, বা ওয়াশিংটনে যে সব বন্ধু থাকে তারা তো ভাবতেই পারে নি যে একজন মার্কিনী মেয়ে এ সর্ত করতে পারে, কেবল ফিলাডেলফিয়ার দুজন বন্ধুকে সে বোঝাতে পেরেছিল যে তা সম্ভব। এখানকার মধ্যে সৌগতকে তার ভাল লাগে ওই একটাই কারণে যে ছেলেটা খুব বাস্তববাদী। একমাত্র সে-ই বারবার বলে যে সুযোগ পেলে কোন মানুষেরই এদেশে থাকা উচিত নয়। সে অকপটে স্বীকার করে এদেশের তুলনায় ওদেশ স্বর্গ। অথচ এই কথাটা এমিলিকে হাজার চেষ্টা ক'রেও বোঝাতে পারেনি প্রসেনজিৎ এবং এখনও পারে না বলে সে চেষ্টাই ছেড়ে দিয়েছে। কি ক'রে যে ওর এক অদ্ভুৎ ধারণা হয়েছে ভারতবর্ষ এক সুন্দর দেশ, কে জানে। কোন এক ভদ্রলোক নাকি নিজের দেশ সম্বন্ধে কি সব বলেছে যার জন্যে ভারতবর্ষ দেখার আগ্রহ প্রসেনজিৎ কিছুতেই দমাতে পারেনি। আর এ দেখা শুধু দেখা-ই নয়, জানা। এমিলি জানতে চায় ভারতবর্ষকে, তবে সুবিধে এই যে ভারতবর্ষ বলতে সে শুধু বাংলাদেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি আর বাংলাদেশের গ্রামের পট-ভূমিকাটুকুই বোঝে, তার বাইরে নয়। সে জানলে আবার বিপদ ছিল। দেশ দেশ গ্রাম গ্রাম ঘুরতে চাইত। এমনিতেই বাংলাদেশের গ্রামে যাবার জন্যে প্রায় পাগল ক'রে তুলেছে তার ওপর আবার সারা ভারত যোগ দিলে অবস্থা যা হ'ত সে আর ভাবতেই পারে না প্রসেনজিৎ। তবে এসব সত্ত্বেও এমিলিকে ভাল লাগে তার একটা বিশেষ গুণের জন্যে। এমিলি ভালবাসতে জানে। যাকে ভালবাসে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসে। যা কিছু ভালবাসে প্রকৃত-পক্ষেই ভালবাসে। এই ভালবাসতে পারার মত মন প্রকৃতি এমিলিকে দিয়েছে বলেই এমিলির একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে যা তাকে অন্য অনেকের থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে। অথচ এমিলির আকর্ষণ ওইটুকুই। তার মত এবং তার চেয়ে সুন্দরী অনেকই আছে, অহরহই দেখা যায় কিন্তু তার মত মন খুঁজে বড় একটা পাওয়া যায় না, অন্তত প্রসেনজিৎ পায় নি। তার জীবনের প্রথম মেয়ে সুসানকে মনে পড়ে প্রসেনজিৎ-এর। প্রথম ডেট্-এর বিকেলটাকেও মনে আছে বেশ স্পষ্ট। সে কি কম্প্র-বক্ষের দ্রুত-স্পন্দিত অভিজ্ঞতা। কি শংকা, কি দ্বিধা, কি দ্বন্দ। আর কি উজ্জ্বলতা সুসান-এর। প্রজাপতির মত, না ফড়িং-এর মত সেই সুসানও ছিল চঞ্চলা, লাস্যময়ী। ঝড়ের বেগ তার শরীরে। তখন প্রথম

যৌবন প্রসেনজিৎ-এর, সুসান সেখানে নতুন আলোর মত। সে এক এমন আলো যাতে মনের রঙ বদলে যায়, সেই রঙের প্রক্ষেপে অন্যরকম দেখায় নিজেকেও। সে দেখা প্রসেনজিৎ দেখেছিল, আবার একবার দেখেছিল এমিলির মনের আলোয়। প্রথমা সুসান প্রক্ষিপ্ত কিন্তু এমিলির স্নিগ্ধতা প্রলিপ্ত। এমিলি নিবিড় কিন্তু কিছু তার গায়ে লেপে থাকে না। সব কিছু তাকে স্পর্শ করে মাত্র তাতে প্রলিপ্ত থাকে না। সে-ও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রসেনজিৎ-এর। বসীর-এর সঙ্গে আশ্চর্য মেলামেশা একসময় সে নিজে চোখে দেখেছিল, আর সত্যি বলতে কি সেই সময়ই তার সঙ্গে আলাপ কিন্তু অবলীলায় বসীরের সঙ্গ ছাড়ল এমিলি, সেই প্রসঙ্গে তৎকালীন বন্ধু প্রসেনজিৎকে বলেছিল, জান সেন, আমার একান্ত ইচ্ছে কোন ভারতীয় ছেলেকে বিয়ে করি।

সেদিনের প্রসেনজিৎ জবাব দিয়েছিল, ভালই তো। আমরা ভারতীয় ছাত্ররা তো জানি তুমি বসীরকেই বিয়ে ক'রবে। অবশ্য বসীর পূর্বপাকিস্থানের মানুষ —

তা হোক। ভৌগোলিক অর্থে আমি ভারতবর্ষ যাকে দেখি পাকিস্থানও তার মধ্যে পড়ে। রাজনৈতিক সীমারেখা যাই হোক পাকিস্থানও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষেরই অঙ্গ।

তবে তো মিটেই গেল —

মিটতে পারত। কিন্তু মিটবে না।

সে আবার কি?

কিছুক্ষণ চুপ ক'রেছিল এমিলি, তারপর বলেছিল, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসেনজিৎ এমিলির মনোভাব দেখে বুঝেছিল সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটে গেছে তাদের অজ্ঞাতে। সেটা শোনবার জন্যে সে প্রতীক্ষিত রইল। এমিলি বলল, খুব ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া ব্যাপারটা কাউকে বলা আমি সমীচীন মনে করি না।

সে তো নিশ্চয়ই। এটা যখন ব্যক্তিগত ব্যাপার তখন এটা সেভাবে দেখাই উচিত। আমি এর মধ্যে ঔৎসুক্য দেখানোর জন্যে দুঃখিত।

তোমার দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই সেন। এ প্রসঙ্গ তো আমিই তুলেছি।

প্রসেনজিৎ একথার কোন প্রত্যুত্তর দেয় নি। কিছু অবকাশের পর এমিলিই যেন নিজের মনকে হাল্কা করার জন্যে বলেছিল, তুমিই বলতো ধর্মের জন্যে মানুষ না মানুষের জন্যে ধর্ম?

এধরণের প্রশ্নের সামনে পড়ে নভেম্বরের ঠাণ্ডাটা ডিসেম্বরের মনে হয়েছিল প্রসেনজিৎ-এর, সে কেবল ওভারকোটের কলার ভালভাবে বন্ধ করবার প্রয়াস পেয়েছিল। তারপর অকপটে স্বীকার ক'রেছিল, ব্যাপারটা আমি জানিনা।

হয়ত একটু হতাশ হয়েছিল এমিলি কিন্তু তার স্বভাব অনুযায়ী সেটা

চাপা ছিল, শান্তভাবেই বলেছিল, আমার কাছে ধর্মটা এমন কিছু জিনিষ নয়। ধর্ম মানুষের আচরণের মানদণ্ড মাত্র। এবং সেখানেই তার প্রয়োজনীয়তা। তুমি কিছু বলতে পার ?

একশবার। — প্রসেনজিৎ হঠাৎ যেন বলে ফেলেছিল। আর অকস্মাৎই যেন চৈতন্যের উন্মেষ ঘটেছিল তার মধ্যে, তার ফলেই বলেছিল, ধর্ম সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই। আর না থাকাতে কোন অসুবিধেও দেখি না। আমি আমার কর্তব্য করি খাই দাই ঘুমাই। যদি আমার কখনও প্রয়োজন হয় তাহলে নিশ্চয়ই ধর্মের কথা ভাবব।

ঠিক তাই। ঈশ্বরের জন্যে ধর্মের প্রয়োজন আছে কি ?

কি জানি —

নেই। আমি দেখছি তোমাদের দেশের একটি ছাত্র যা ভাবত আমার ভাবনাও ঠিক তাই। অথচ সে ছিল হিন্দু আর আমি খ্রীষ্টান পিতামাতার সন্তান। তাঁর ঈশ্বর ভাবনার সঙ্গে যখনই দেখলাম আমার ভাবনার কোন তফাৎ নেই তখনই বুঝলাম ঈশ্বরের উপাসনায় ধর্মের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী নয়।

সায় দিতে পারে নি, বুঝতে চেষ্টা ক'রেছিল প্রসেনজিৎ।

এমিলিই নিজের মনে বলে গিয়েছিল, জীবন যেমন সহজ সত্য ঈশ্বরও তেমনি। আমরা কেউই ঈশ্বরের বাইরে নই। এই স্বীকৃতি এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ছাড়া যখন আর কিছুই করবার নেই তখন ধর্মের ব্যবধান নেহাৎই অমূলক মূর্খামী নয় কি ?

এইসব আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুতে ক্রমাগত জড়িয়ে পড়ায় মনে মনে বড়ই অধৈর্য হয়ে পড়েছিল প্রসেনজিৎ। শেষকালে কি এখানেই একটা ধর্ম বিষয়ক আলোচনা সভা খুলবে এমিলি ? এমন সন্ধ্যেটা কোথায় গল্পগুজব ক'রে আমোদে কাটাবে তা নয় এমিলি কি না আরম্ভ করল ধর্মতত্ত্ব। কি বললে যে এমিলি থামবে সেটাই যখন প্রসেনজিৎ-এর একমাত্র ভাবনা ঠিক সেই সময়েই এমিলি বলল, এই ব্যাপারে গভীর পার্থক্য দেখলাম আমার আর নসীর-এর মধ্যে।

যাক তবু ব্যাপারটা শ্রুতিরোচক হ'ল, তাই আকর্ষকও। প্রসেনজিৎ-এর ঝিমিয়ে পড়া মন আবার উৎসুক হ'ল। সে ঔৎসুক্য প্রকাশ হয়ে পড়ল তার মুখ দিয়ে, কি রকম ?

এমিলি শান্তভাবেই বলল, একদিন শুনলাম দেশে তার স্ত্রী আছে। শুনে তাকে সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন ক'রতেই সে বলল, আছে, তাতে কোন অসুবিধে নেই কারণ তার ধর্মে একাধিক স্ত্রী বিধিসম্মত। কথাটা আমার ভাল লাগল না আমি বললাম একসময় পৃথিবীতে এক নারীর বহু স্বামী বিধিসম্মত ছিল কিন্তু সভ্যতা আমাদের সে প্রথা বর্জন ক'রতে শিখিয়েছে এবং এও শিখিয়েছে যে এক পুরুষেরও একাধিক স্ত্রী অসঙ্গত। সে আমাকে বিয়ে করবার জন্যে এতই ব্যাগ্র ছিল যে সঙ্গে সঙ্গে বলল, তোমার জন্যে সব তুচ্ছ

এমিলি। আমি তাকে তালাক দেব। — শুনে আমার যে কি পরিমাণ ঘৃণা হ'ল তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না সেন। আমি বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। একটি মহিলার সঙ্গসুখের লোভে যে অনায়াসে নিজের স্ত্রীকে বর্জন ক'রতে পারে সে মানুষ কাউকেই গ্রহণ ক'রতে পারে না। তা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে সে অধার্মিক।

এই পর্যন্ত বলে চুপ ক'রেছিল এমিলি। অনেকক্ষণ পর বলেছিল, মানুষের ধর্ম তার নিজের কাছে। আমি যা সত্য বলে জানি এবং মানি, যদি আমি সেই মতই চলি তবে সেটাই আমার ধর্ম। আমি বিশ্বাস করি কনফুসিয়াসের সেই মহত্তম উক্তি, তুমি অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার কখনই করো না যা তুমি অন্যের কাছে আশা কর না। আমার সংসার সম্বন্ধে আমারও যেমন ইচ্ছা আর একজন মেয়েরও ইচ্ছা ঠিক অনুরূপ। কাজেই একজনের ইচ্ছা আকাংখাকে হত্যা ক'রে কখনই আমি সুস্থ সংসার গড়তে পারি না।

প্রসেনজিৎ এমিলির বিচক্ষণতায় অভিভূত হয়েছিল সেদিন। অনেকদিনের মেলামেশা, হাসিঠাট্টা গল্পগুজব সত্ত্বেও যে পরিচয় জানা যায় নি এদিন পেয়েছিল সেই আসল পরিচয়। যে বয়সে গভীরতা বিশেষ থাকে না এবং গভীরতার স্বরূপও উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না প্রায় সেই রকমই বয়স এমিলির, তবু প্রসেনজিৎ-এর মনে হয়েছিল এমিলি বিশেষ এক আলোয় আলোকিত মেয়ে। অন্তরের এই আলোর জন্যে অন্য এক দীপ্তিময় সৌন্দর্য আছে তার। সেই সৌন্দর্য কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করা যায়, যে করে সে ভাগ্যবান। নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়েছিল প্রসেনজিৎ-এর। এতদিনের আলাপে প্রসেনজিৎ একটা বিশেষত্ব এমিলির প্রত্যক্ষ ক'রেছিল সে হচ্ছে তার হাঁসের মত একটি বিশেষ গুণ। হাঁস যেমন সারাদিন জলের ওপর থেকে উঠলেও তার পাখায় জল লেগে থাকে না তেমনি এমিলিরও, অত ছেলের সঙ্গে তার অমন স্বচ্ছন্দ মেলামেশা কিন্তু সব সময় সকলের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে যা ব্যবহারে বুঝতে দেয় না। মন দিয়ে ওকে ছুঁয়ে দেখা যায়, হাত দিয়ে নয়। এদেশে এরকম মেয়ে দুর্লভ বলে ধারণা হয়েছে প্রসেনজিৎ-এর, বরং আজকের যুবসমাজে বিপরীতটাই অধিক সচল।

এমিলি যখন বসীর সম্বন্ধে আলোচনা ক'রছিল এত অনায়াসে এবং সহজভাবে সে কথাগুলো বলেছিল যে আর একদফা বিস্মিত হতে হয়েছিল প্রসেনজিৎকে। জীবনের এমন একটা যোগ বিয়োগের ঘটনাকে এমন সহজভাবে নিতে পারা সম্ভব এ তার ধারণার অতীত। যে রকম একটা বিচ্ছেদ মানুষের সমস্ত জীবনধারাকে ওলটপালট ক'রে দেয়, জীবনের গতি ক'রে দেয় রুদ্ধ তেমনি এক সদ্য বিচ্ছেদ-এর কথা কি সহজভাবেই না বলে যাচ্ছে এমিলি! তবে কি মেয়েটার মন বলে কিছু নেই! শুধুই কি মানুষের সঙ্গে খেলা করে মেয়েটা! লোককে বোকা বানিয়ে মজা ক'রে। তাই যদি হ'ত তাহ'লে

অন্তর্দৃষ্টি এত স্বচ্ছ আর গভীর তো হ'ত না। তবে কি ওর চরিত্রে হৃদয়াবেগ বলে কিছু নেই? অনেক প্রশ্ন অনেক সংশয় সেদিন এসেছিল প্রসেনজিৎ-এর মনে। অনেকদিন ধরেই অনেকভাবে ভেবেছিল তার কথা। এবং সে প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি ক'রত এক আশ্চর্য সত্তার মানুষ এমিলি, যাকে প্রতিমুহূর্ত মনে পড়ে, সব কাজের মধ্যেও যে উঁকি মারে লুকোচুরি খেলার মত।

অবশ্য সেদিন আরও একটু বলেছিল এমিলি, একবার ভেবেছিলাম বসীরকে প্রশ্ন করি, বলছ তো তোমাদের ধর্ম একাধিক স্ত্রী বিধিসম্মত বলে, তোমার ধর্ম কি বলে? করিনি। কি হবে এ জিজ্ঞাসায়। মানুষের বিবেকই তার ধর্ম। যার বিবেক নেই তার ধর্মও নেই। তুমি কি তোমার স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকার অধিকার মেনে নিতে পার?

প্রসেনজিৎ শুধু একটা প্রশ্নই ক'রেছিল, তুমি কি বিবাহ বিচ্ছেদের পক্ষপাতী নও?

যেখানে সেটা অবশ্যম্ভাবী সেখানে পক্ষপাতী না হবার কোন কারণ নেই।

কি হ'লে অবশ্যম্ভাবী হবে?

যখন বোঝা যাবে দুজনে একসঙ্গে চলা একান্তভাবেই অসম্ভব তখনই আলাদা হবার কথা ভাবতে হবে। দুজনেই যখন অনুভব ক'রবে যে মানসিক মিল আর নেই বিচ্ছেদ তখন অপরিহার্য।

আমি তোমার সঙ্গে একমত এমিলি। — অকারণেই প্রসেনজিৎ বলেছিল। আসলে এমিলির মত তার ভাল লেগেছিল। আর সেই মতৈক্য ঘোষণা ক'রে যেন তৃপ্তি পেয়েছিল সে।

বিশ্বজিৎ সামনে চুপচাপ বসে, বেশ নির্বিকার। অস্বস্তিতে ভুগছে প্রসেনজিৎ। কিছু একটা কথা বলবার জন্যে তার মন আঁকুপাঁকু ক'রছে। কোনও কথা না বলতে পারবার অস্বস্তিতে কষ্ট পাচ্ছে এমিলিও। আসলে যে কথা বলতে পারে, অনেক কথাই বলতে পারে, সে আশ্চর্য রকম নির্বাক। বিদেশ থেকে কেউ এলে লোকে তো সে দেশের কথা জিজ্ঞেস করে, কতকিছু জানতে চায়, সেরকম কোন লক্ষণ সে দেখাচ্ছে না। অনেকক্ষণ উসখুস ক'রে প্রসেনজিৎ-ই বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিস্টার ঘোষ কেন হঠাৎ আমাকে নেমন্তন্ন ক'রে বসলেন।

প্রসেনজিৎ বলল, বড়লোকদের খেয়াল হয়ত। নয়ত তুমি গেলেই বুঝতে পারবে —

তা অবশ্য পারব —

তবে আর অত ভাবছ কেন, বাবার গাড়ীটা নিয়ে চলে যাও।

হঠাৎ রুমির মনে হ'ল এভাবে চুপ ক'রে থেকে বিশ্বজিৎ-এর কাছে সে হেরে যাচ্ছে। নিজের আধিপত্য খর্ব হতে দিলে ভবিষ্যতে সৌগতকে আরও

খারাপ কথা বলতে থাকবে বিশ্বজিৎ। কাজেই সে অকস্মাৎ কথার মধ্যে নেমে পড়ল, আচ্ছা দাদা, তোমাদের কোম্পানী তোমাকে গাড়ী দেবে বলছিলে যে, কবে দেবে?

হয়ে এসেছে, মাসখানেকের মধ্যেই পেয়ে যাব।

এইসব প্রাইভেট কোম্পানীতে কাজ ক'রলে অনেক সুবিধে। এই তুমি একবছর হতে না হতেই কেমন গাড়ী পেয়ে গেলে কোম্পানী থেকে —

কিন্তু আমার যা মনে হচ্ছে তাতে এ কোম্পানীতে আর চাকরী করা যাবে না।

কেন?

আমি যখন ঢুকেছিলাম তখন মালিকগোষ্ঠী ছিল য়ুরোপীয়, মাস চারেক হ'ল মিস্টার মালুয়া তাদের শেয়ারের অর্ধেকের বেশী কিনে নিয়েছে। আর আশ্চর্যরকম অদলবদল আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর মিস্টার সেনকেও বোধহয় এইবার চলে যেতে হবে। সেদিন হঠাৎ জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার দাশগুপ্তকে ডেকে নিয়ে ছাড়িয়ে দিল। দেখছি যা বেশী বেতনের সকলের ওপরেই ছাঁটাই আসবে।

সে কি! তোমাদেরও ছাঁটাই ক'রবে নাকি?

না। ওপরওয়ালাদের কয়েকজনকে ক'রবে বলে মনে হচ্ছে। আমি এদের ব্যবসার কায়দা বুঝি না। এরা ব্যবসা পরিচালনার কোন নিয়মকানুন মানে না অথচ ব্যবসা তো সমস্ত এরাই চালাচ্ছে!

বিশ্বজিৎ বলল, এদেশে এই রকমই। এদেশের বুর্জোয়াদের চরিত্র আসল বুর্জোয়াদের থেকে অনেক নিকৃষ্ট। এদেশে কেউ ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে না, পয়সা রোজগারের যন্ত্র বসায়।

প্রসেনজিৎ এই ক'মাসে নিজের কোম্পানীতে যা পরিবর্তন দেখছে এবং প্রায় এক বছরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামো যা দেখছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজিৎ-এর কথাটা তার মনে ধরল। সে শুধু বলল, এদেশে গবেষণার কাজে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ কিছুই করে না, ক'রলে কারিগরী বিষয়ে অনেক উন্নতি সম্ভব হ'ত।

গবেষণার বিষয়ে কিছু করে না এটা ঠিক নয়। আর কিছুদিন থাকলে তুমি লক্ষ্য ক'রতে পারবে যে নকলের কাজে গবেষণা এবং উদ্যম দুটোই এ দেশের ব্যবসায়ীদের প্রচুর আছে। অন্য দেশের কোন উদ্ভাবন নকল ক'রতেই আমরা ব্যস্ত — নতুন কিছু করার চিন্তা করে কি লাভ? বেশ তো চলে যাচ্ছে।

এমিলি এবং প্রসেনজিৎ কেউই কথাগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রতে পারল না। এর মধ্যে প্রসেনজিৎ কিছুটা বুঝেছিল তার এই স্বল্পকালীন দেখা-শোনায় কিন্তু এমিলির সে অভিজ্ঞতা হবার কোন সুযোগ ছিল না। তবু বিশ্বজিৎ-এর এই কথাগুলোকে তার স্বদেশনিন্দা বলে মনে হচ্ছিল না। সৌগতর

কথাগুলো শুনতে যেমন খারাপ লাগে বিশ্বজিৎ-এর কথা সেরকম লাগছিল না। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে বললেও বিশ্বজিৎ-এর কথাগুলোর মধ্যে এমন আন্তরিকতা ছিল যা থেকে মনে হ'তে পারে প্রতিকারে অপারগ এক সত্যসন্ধিৎসুর কণ্ঠস্বর সে শুনছে। হঠাৎ তার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল, বিশ্বজিৎকে সে বলল, তোমার মত ছেলে এখানে না পড়ে থেকে যদি বিদেশে চলে যায় অনেক বড় হ'তে পারবে, চল না আমাদের দেশে, যাবে?

তীব্রভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এমিলির দিকে তাকাল বিশ্বজিৎ, অবশ্য সে দৃষ্টিতে বেশ কিছু পরিমাণ সন্দেহ ছিল মেশানো। তবু সে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ক'রল আমাদের দেশের সব মানুষকে জায়গা দেবার মত অবস্থা তোমাদের আছে?

এই প্রশ্নে একটু হকচকিয়ে গেল এমিলি, ঈষৎ হেসে বলল, দেশের সব মানুষ তো তোমার মত নয়? এ হচ্ছে তোমার কথা —

তুমি তো মনে ক'রছ আমি ভাল এবং আমি উন্নতি ক'রতে পারব। যদি তাই হয়, আর সব ভাল-রাই যদি নিজের উন্নতি ক'রতে দেশ ছেড়ে যায় তা'হলে দেশের উন্নতিটা হবে কি ক'রে? দেশ তাহ'লে এমনই পড়ে থাকবে? যত চোর জোচ্চোর লুটেরা এরাই রাজত্ব ক'রে যাবে দেশের অসংখ্য সাধারণ ভদ্র মানুষের ওপরে? শোষণ বঞ্চনা এভাবেই চলতে থাকবে?

কথাটা বলেই আত্মসম্বরণ ক'রতে চাইল বিশ্বজিৎ নিজের ভুল ধরতে পেরে, এত কথা বলে ফেলা উচিৎ হয়নি। আর শুনে চমকে উঠল এমিলি এ যেন আর এক অতি পরিচিত কথার প্রতিধ্বনি! নিমেষের জন্যে তার মনে হ'ল, অত্যন্ত প্রিয় স্বরে কথাগুলো বলে চলেছে প্রিয়তম কেউ। এ কি সেই স্বর! সেই স্বপ্নের শব্দের মত কথাগুলো — সেই সুরই তো ধ্বনিত হচ্ছে — স্পন্দিত হচ্ছে সেই বাণী! একদিন সে-ও বলেছিল, দেশেই আমাকে ফিরতে হবে এমিলি। তোমাদের এই সুন্দর রম্যভূমি ছেড়ে ফিরে যেতে হবে অনুন্নতির অন্ধকারছায়াচ্ছন্ন আমার সংকটাপন্ন দেশে, আমাকে চেষ্টা ক'রতে হবে তোমাদের কাছ থেকে পাওয়া উন্নততর শিক্ষা সেখানের নতুন মানুষদের মধ্যে ছিটিয়ে দেবার। — ধীরে ধীরে এমিলি বুঝল পার্থক্য আছে, সেই সুর আর এই সুর ভিন্ন। কখনও নিজের দেশের কোন অবস্থার নিন্দা করে নি সে, বিক্ষোভ জানায় নি কখনও, অনুন্নত বা দীন অবস্থা সে স্বীকার ক'রেছে কিন্তু অন্য সুরে, যেন সমস্ত গ্লানি এবং পরাজয় প্রশান্তির সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল কল্যাণ, আর বিশ্বজিৎ বোধহয় বয়সে তরুণ বলেই বিক্ষুব্ধ, তীব্র, রুষ্ট।

বিশ্বজিৎ-এর কথাগুলো শুনে প্রসেনজিৎ বলল, বাস্তবিকই কিছু কিছু কাজ খুব খারাপ চলছে।

রুমি সবই শুনছিল বসে বসে, তার ইচ্ছে হ'ল বিশ্বজিৎ-এর কথাগুলোর মধ্যে নেমে পড়ে, বলে, যা হচ্ছে তা হচ্ছে তাতে কার কি? নিজেরটা সামলাও। — বলল না, কোন কথাই বলল না সে। এরকম আলোচনা এবাড়ীতে আগে

কখনও হয়নি তাই সে একটু আশ্চর্যই হচ্ছিল বিশ্বজিৎ-এর কথাগুলো শুনে। এরকম কথা এবাড়ীর কেউ বলতে পারে তা-ও তার অচিন্তনীয়। এবাড়ীর সকলেই দেশতত্ত্ব রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আলোচনা একবারেই এড়িয়ে চলে। সুপ্রীতি মার্কিনী ডিজাইনের বই আনাতেন পোষাক-আষাকের জন্যে, ঘর সাজানোর জন্যে, সারাদেশে যতরকম ফ্যাশানের বই পাওয়া যায় সবই জোগাড় করা এবং সে ব্যবস্থা জীইয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছে রুমি নিজে। তাছাড়া রুমি নিজে যেটা সংযুক্ত ক'রেছে সেটা হচ্ছে বোম্বাই থেকে বেরোনো কিছু চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্র পত্রিকা। পরীক্ষিৎ নিজে অবসর সময় শুধু সংবাদপত্র পড়েন। দিল্লী মাদ্রাজ বোম্বাই কলকাতায় যত বড় বড় দৈনিক কাগজ বেরোয় সবই পড়েন তিনি সন্ধ্যের পর বসে। এ পরিবারের যা কিছু আলোচনা তার সময় একমাত্র খাবার টেবিল। সেও রাত্রে। দিনের খাওয়া যে যার প্রয়োজন মত সারে, রাতের খাবার প্রায় একসঙ্গেই হয়। ইদানীং বিশ্বজিৎ থাকে না, কোনদিন থাকলেও যোগ দেয় না। চুপ ক'রে থাকে, শোনে। তাই তার কথা শোনা যায় না, আজ শুনে বিস্মিত হ'ল রুমি।

বিশ্বজিৎ নিজে কথাগুলো বলেই ভুল বুঝেছিল, সে তাই চাপা দেবার জন্যে বলল, কি হবে ওসব আলোচনায়। আমাদের এই চার দেওয়ালের আলোচনায় কি লাভ ? — তারপর তাড়াতাড়ি বলল, তোমরা বেরিয়ে পড় শুধু শুধু দেরী ক'রে কি হবে ?

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ঘুরে আসাই ভাল, রুমি মাকে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করতো বাবা কোথাও বেরোবেন কিনা, নইলে গাড়ীটা যদি পাওয়া যায় —

ভাদ্রমাসের গুমোট গরমে হঠাৎ একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বইলে যেমন লাগে তেমনি অনুভূতি হ'ল রুমির, সে ত্বরিত বলল, আমি এখনই বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। বাবা তো এসময় কখনও বেরোয় না, বেরোলেও বাবা ট্যাক্সি ক'রে যাবে'খন। — বলেই অতি উৎসাহে বেরিয়ে গেল রুমি।

প্রসেনজিৎ পৌঁছাতেই অভ্যর্থনা ক'রলেন মিস্টার ঘোষ নিজে। করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে ইংরিজীতে বললেন, আপনাদের পেয়ে খুবই খুশী হলাম। পাশেই মিসেস ঘোষ ছিলেন, আলাপ আগেরবারই হয়েছিল তাই মিসেস ঘোষ এমিলিকে জিজ্ঞেস ক'রলেন, কেমন আছেন ?

সকলকে বিস্মিত ক'রে এবং বিস্মিত করার জন্যেই এমিলি মিসেস ঘোষের ইংরিজি জিজ্ঞাসার উত্তরে বাংলায় বলল, ভাল। শুধু তাই নয় বাড়ীতে পা দিয়েই মিস্টার এবং মিসেস ঘোষ-এর প্রতি হাতজোড় ক'রে নমস্কার জানিয়েছিল সে। চমৎকৃত হবার ভাব ক'রে জেল্লাদার পোষাক-পরা প্রৌঢ়া মিসেস ঘোষ ইংরিজিতেই বললেন, বাঃ বেশ বাংলা শিখেছেন দেখছি ?

প্রসেনজিৎও ইংরিজিতে জবাব দিল, হ্যাঁ। যা চেষ্টা তাতে যে কোন

জিনিষই খুব কম সময়ে শিখে নেওয়া সম্ভব।

মিসেস ঘোষ-এর সিঁথিতে সামান্য একটু সিঁদুরের ছোঁয়া, সে তুলনায় এমিলির সিঁথি লাল টকটক ক'রছে যা তার ঘোমটার সামনে দিয়েও স্পষ্ট, মিস্টার ঘোষ-এর নজরে এল। ভালই লাগল তাঁর। আমেরিকার মানুষগুলো নারীপুরুষ নির্বিশেষে পরখ-প্রিয়। জীবনের সান্নিধ্যে যা কিছু পাওয়া যায় পরখ ক'রে দেখতে ভালবাসে। অমনি কি পৃথিবীময় ব্যবসা ক'রে বেড়াচ্ছে ওরা? এ মেয়েটিও মার্কিন বলেই এত তাড়াতাড়ি বাঙ্গালী হয়ে যাবার চেষ্টায় মেতে উঠেছে। এ-ও একরকম বিলাস। ওদের জীবন প্রাণপ্রাচুর্যে ভর্তি, ভাল লাগে। ভাল লাগে বলেই একমাত্র ছেলে পার্থকে স্কুল ছাড়বার পরই পাঠিয়ে দিয়েছেন ওয়াশিংটন — যাও পড়াশোনা শেখ গিয়ে।

দুচারটে কথা বলতেই এসে পড়লেন আর একজন। ব্যস্ত হয়ে মিস্টার ঘোষ দু'পা এগিয়ে যেতেই প্রসেনজিৎ বুঝল ইনি বিশেষ ধরণের অতিথি। মিসেস ঘোষ-এর আপ্যায়ণ ভঙ্গী দেখে প্রসেনজিৎ অনুমানকে সিদ্ধান্তে বদলে নিল। শোনা গেল মিস্টার ঘোষ বেশ জোরে ডাকলেন, আকবর!

একজন উর্দিপরা বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই মিস্টার ঘোষ বললেন, আহুজা সা'ব।

অভ্যর্থনায় বিশেষভাবে ট্রেনিং পাওয়া বেয়ারাটি বিনয়ে বিগলিত হয়ে সেলাম ক'রল আগন্তুককে। আহুজা সাহেব-এর যে কোন একটা হুকুম পেলে সে ধন্য হয়ে যাবে এমনি ভাব ক'রে আলাদীনের দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে রইল আহুজা-র পেছনটিতে। সামান্য দূরত্ব রেখে আহুজার পেছনে চলতে লাগল আদেশ-এর অপেক্ষায়।

প্রসেনজিৎ ভেবেছিল মিস্টার ঘোষ আহুজার সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই আলাপ করিবে দেবেন, কিন্তু মিস্টার ঘোষ আহুজার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এমনই অন্যমনস্ক হয়ে চলতে লাগলেন যে আলাপ করিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা তার সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত বললেন না। মিসেস ঘোষ কেবল ইংরিজিতে বললেন, আসুন।

বাইরে থেকে নতুন ডিজাইনের বাড়ীটার সম্পূর্ণ ভেতর দিকে ঢুকতে লাগল প্রসেনজিৎ। খুবই সামান্য একফালি জমিতে সামান্য কয়েকটা ফুলের গাছ ছাড়া সমস্ত জমির ওপর ইমারত গড়ে তোলা হয়েছে। ঘরগুলো এদেশের বর্তমান ঘরের তুলনায় অত্যন্তই বড়। তাদের বাড়ীর দুখানা ঘরের সমান এদের এক একটা ঘর। দোতলাতেও ঠিক একই রকম। দোতলার সামনের দিকে অনেকটা জায়গা রাখা আছে ছাদের মত। সেখানেই আয়োজন হয়েছে সকলের বসবার। সেখানে আরও কয়েকজোড়া অতিথি আগে থেকেই জমায়েত হয়ে আছে, মিস্টার ঘোষ আহুজাকে বোঝালেন, মিসেস-এর ইচ্ছা ছিল ওপরটা খোলা থাক আমিই প্যাণ্ডেল বাঁধতে বললাম।

মিস্টার আহুজা স্মিত হেসে বললেন, মিসেস ঘোষ অনেক বেশী রোমান্টিক।

স্ত্রীর প্রশংসার সুযোগ পেয়ে মিস্টার ঘোষ বললেন, হ্যাঁ তা ঠিক। আমরা যত হিসেব করে পা ফেলি রোমান্টিক মানুষেরা তা করেন না।

আহুজা হেসে মিসেস ঘোষকে চোখের ইশারা ক'রে বললেন, রোমান্টিকরা সুন্দর।

আহুজার রহস্যালাপে মিসেস ঘোষের পড়তি প্রৌঢ়ত্বেও রঙ লাগল। সলজ্জ ভাবে বললেন, ধন্যবাদ।

মিসেস আহুজা প্রথম কথা বললেন, কলকাতার জলে বাতাসে রোমান্টিকতা। এইজন্যেই কলকাতাকে এত ভাললাগে আমার। আর মাঝে মাঝেই কলকাতায় চলে আসি।

মিস্টার ঘোষ ওঁকে খুশী করবার জন্যে বললেন, আপনার মত মানুষের চোখে ধরা পড়ে বলেই কলকাতা রোমান্টিক।

যাই হোক কলকাতার হাওয়া বাতাসই যেন অন্যরকম। বোম্বে যাই, দিল্লী যাই, সব জায়গাতেই জৌলুস বেশী কিন্তু কলকাতা জৌলুস কম থাকলেও অনেক বেশী ভাল লাগে আমার।

মিসেস ঘোষ চট ক'রে বললেন, আমেদাবাদ কি রকম? আমার কখনও যাওয়া হয়নি ওদিকে —

আসুন না একবার! বেড়াতে আসুন! আহ্বান জানালেন মিস্টার আহুজা।

মিসেস ঘোষ বললেন, ইচ্ছে রইল। মিস্টার ঘোষ তো আগামী মাসে টোকিও চলে যাচ্ছেন, ফিরে আসুন তারপর দেখা যাবে।

কথা বলতে বলতে অতিথি সমাবেশ এর মধ্যে এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন চট ক'রে উঠে এসে হাত বাড়িয়ে দিল, কেমন আছেন মিস্টার আহুজা। খুব খুশী হলাম দেখা পেয়ে।

ওঃহো, কণ্ঠভরা উচ্ছ্বাস ছুঁড়ে দিয়ে আহুজা বললেন, কতদিন বাদে দেখা হ'ল মিস্টার সহায়। কেমন আছেন?

সুন্দর। আপনার নতুন কাগজকলের কতদূর? শেয়ার ছাড়ছেন কবে?

অল্প কিছু দেরী আছে। আপনি কি উৎসুক?

বলব। গ্রাণ্ডে উঠেছেন?

ইন্টারন্যাশনাল —

ও ফাইন। কাল সকাল নটার সময় কথা বলব।

খুব আনন্দের হবে। মিস্টার উইলিয়ম এর কি খবর?

ভাল আছেন। উনি দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন।

ওঁর বদলে কে রিপ্রেজেন্ট ক'রবে?

খুব নীচু স্বরে সহায় বলল, ইউ, কে, বডি শেয়ার ছেড়ে দেবে।

তাই নাকি! কে নিচ্ছে?

কাল কথা বলব। আমার ইচ্ছা আপনি নিন নইলে আমরা যাদের চাইনা—

অল রাইট। — এবার হাত বাড়ালেন আহুজা নিজে। অর্থাৎ আজকের মত কথা এখানেই শেষ। সহায়ের সঙ্গে করমর্দন ক'রে ডানদিকের ব্যক্তির দিকে হাত বাড়ালেন, মিস্টার রঙ্গনাথন! কেমন আছ?

ভাল নয়। কলকাতার অফিস তুলে নিয়ে যাচ্ছি। রঙ্গনাথন জানান।

কোথায়?

বোম্বাই।

কেন?

এখানে যা রাজনৈতিক অবস্থা — কাজ চালানো অসম্ভব।

আহুজা অর্থপূর্ণভাবে হাসলেন, খুব নিচুস্বরে বললেন, কোথায় পালিয়ে বাঁচবে? এখানে কমিউনিস্টরা ওখানে অন্য একদল।

কিন্তু এই পশ্চিমবাংলার চেয়ে মহারাষ্ট্রের অবস্থা অনেক ভাল।

ভাল অন্যদিক দিয়ে। এখানে ডাঃ বিধান রায়ের পর কোন উপযুক্ত মন্ত্রী সভা আসেনি, ওদিকে প্রশাসন অনেকটা উন্নত ধরণের যার ফলে গভর্ণমেন্ট শিল্প স্থাপনের জন্যে কতগুলো সর্ত এমন দিয়ে রেখেছে যাতে গভর্ণমেন্ট আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রছে বোঝা যায়। অবশ্য আমরাও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা কম করি না।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই — কথার সপক্ষে রঙ্গনাথন প্রবলভাবে মাথা নাড়লেন, আরও বললেন, মহারাষ্ট্রই এখন সবচেয়ে বেশী ট্যাক্স দেয়।

ঠিক তাই, আহুজা বললেন বেশ জোরের সঙ্গে।

এদিকে সরকারের সহযোগিতার কোন ইচ্ছাই নেই। তার ওপর আছে অফিসারদের অকারণ ভয়, কোন সিদ্ধান্ত নিতে এত বেশী দেরী করে যে কোন নতুন প্রোগ্রাম নেওয়া যায় না।

এটা ঠিক বলেছ। এই কথাটা আমাকে মিস্টার ব্যানার্জীও বলছিল। ইস্টল্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস কলকাতা ইউনিটে কতগুলো রদবদল ক'রতে চেয়েছিল যাতে এখানকার ইউনিট চাঙ্গা হ'ত। তা অনুমতি পেল না বলে যা কিছু প্রোগ্রাম এখানে ছিল সব কোলাভাতে চালু ক'রে দিল। ওখানে অনুমতি পেতে কয়েক সপ্তাহ মাত্র সময় লাগল।

আচ্ছা কে, সি, কি এখন বোম্বেতেই আছে?

হ্যাঁ। পরশুদিন বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আঠার তারিখে ও ব্যাংকক যাবে ওদের কোম্পানীর কনফারেন্সে।

কে, সি, নাকি ইস্টল্যাণ্ড এর চেয়ারম্যান হচ্ছে?

আমারও কাণে এসেছে তবে আমি বলব হলে ঠিকই হবে। এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টরদের মধ্যে কে, সি, ব্যানার্জী সিনিয়রমোস্ট শুধু নয়, আমার মনে হয় সবচেয়ে যোগ্যদের মধ্যে ও একজন।

রঙ্গনাথন মুখে কিছু বলল না শুধু মাথা নেড়ে সায় দিল।

আহুজা চট ক'রে প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলেন, এখানকার রাজনৈতিক অবস্থা কি বদলাবে না, কি মনে করেন?

রঙ্গনাথন জবাব দিলেন, রাজনৈতিক অবস্থা নিশ্চয়ই বদলাবে কিন্তু এখানকার লোকগুলো আয়ব্যয়-এর সমতা রেখে চলতে জানে না, ফলে যে রাজনৈতিক দলই আসুক ইণ্ডাস্ট্রির ওপর থেকে শ্রমিকদের চাপ কমবে না।

ওদের কথার মধ্যে এসে দাঁড়ালেন অন্য এক ভদ্রলোক, রঙ্গনাথন আলাপ করিয়ে দিলেন, মিস্টার বনোয়ারীলাল ঝাবর, প্রেসিডেন্ট ইণ্ডিয়ান জুটমিল ওনারস য়্যাসোসিয়েশান আর ইনি মিস্টার পি, বি, আহুজা।

আহুজার বাড়ানো হাতের সঙ্গে করমর্দন ক'রতে ক'রতে বনোয়ারীলাল বললেন, আমি আপনাকে ভালভাবেই জানি। কোনদিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। এবং এই দেখা হয়ে যাবার জন্যে মিস্টার ঘোষকে ধন্যবাদ।

আহুজা চারপাশে চেয়ে দেখলেন মিস্টার ঘোষ কোথাও নেই। তাঁকে অতিথিদের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে তিনি বোধহয় অভ্যর্থনার কাজে চলে গেছেন। তাঁকে না দেখেও আহুজা বললেন, মিস্টার ঘোষকে আমি আরও বেশী ধন্যবাদ দেব আমাকে এমন একটা অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সুযোগ ক'রে দিয়েছেন বলে।

ও নিশ্চয়ই তিনি সকলেরই ধন্যবাদ পাবেন, জানালেন বনোয়ারীলাল।

রঙ্গনাথন কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন, মিস্টার ঝাবর এখন জুট কিং।

বিনয়ে হাতদুটো জোড়া ক'রে বনোয়ারীলাল বললেন, এ মিস্টার রঙ্গনাথন, আপনার এটা বলা উচিত নয়।

রঙ্গনাথন হেসে বললেন, আমি ছাড়াও সবাই বলে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি লেসলী ব্রান্টগ্রুপের মিলগুলো আপনি কেনার পর পাটশিল্পে আপনার প্রোডাকসন প্রায় অর্ধেক।

আহুজা পাটশিল্পের বিস্তারিত খবর এত ভাল জানেন না। শুনে তিনি খুশীর সুরে বললেন, বাঃ এটা খুবই সুন্দর তো! পাট আমাদের দেশের সোনা এবং আপনি সেই সোনার খনির অর্ধেক অংশীদার -- হাল্কাভাবে মন খুলে হাসলেন আহুজা। তাঁর সেই অমায়িক হাসির জবাবে বনোয়ারীলাল বেশ তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, মিস্টার রঙ্গনাথন সব সময় বেশীই বলে থাকেন।

আহুজা খুব আস্তে ঠাট্টা ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলেন, ব্যক্তিগত আয়করের বেলাতেও কি?

কথাটা এমনভাবেই আহুজা বললেন যে শ্রোতাদুজন উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠলেন। রঙ্গনাথন-এর সঙ্গে আহুজার আলাপ দীর্ঘ দিনের। সেই সুবাদে দুজনে অন্তরঙ্গ আলাপ করেন, রঙ্গনাথন বললেন, ঝাবর সাহেব দেখছেন তো স্টীলের মধ্যে কি রকম সরসতা থাকে?

কথাগুলো সবই ইংরিজীতে হচ্ছে, প্রসেনজিৎ এমিলির কাণেও আসছিল। প্রসেনজিৎ অবাক হয়ে গিয়েছিল আহুজাকে দেখে। দেশের সবচেয়ে বড় শিল্পপতি আহুজা — এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম মোটর কারখানা, দেশের অর্ধেক স্টীল উৎপাদন যাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, এতবড় দেশের প্রধান শিল্পপতি হিসেবে যিনি গণ্য, যাঁর নাম সে আমেরিকায় বসেও বহুবার শুনেছে এই সেই ব্যক্তি। আহুজা গ্রুপ অফ ইণ্ডাস্ট্রিতে কি নেই। মিস্টার ঘোষ-এর তাহলে খুবই প্রভাব। কথাবার্তার ছিটেফোঁটা যা কাণে আসছে তাতে শোনা যাচ্ছে আগন্তুকরা সবাই বড় বড় শিল্পপতি। এর মধ্যে তার নিজেকে বড়ই দীন মনে হচ্ছে। তার চেয়ে বেশী বেমানান লাগছে। একজন লোকও নেই যার সঙ্গে সে কথা বলতে পারে বা আলাপ ক'রতে পারে। তার বাঁ দিকে কোণের দিকটায় বসে দুজন ভদ্রলোক মাড়োয়ারী ভাষায় অনর্গল কথা বলে চলেছে। ভাষার একবর্ণ বুঝছে না প্রসেনজিৎ। এই দুজন ছাড়া আর সকলেই কথা বলছে ইংরাজিতে। আগন্তুকদের চেহারা পোষাক-আষাক দেখে বোঝবার উপায় নেই কে কোন প্রদেশের মানুষ। একান্ত আলাপ না শুনলে এই দুজনকেও বোঝা যেত না। অবশ্য বোঝবার কোন প্রয়োজনও ছিল না, তবু নেহাৎ নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবার জন্যেই এই সব অপ্রয়োজনীয় অলস চিন্তা মনে আসছে তার। এমিলিও বেশ অস্বস্তি অনুভব ক'রছে তা সে বুঝতেই পারছে কিন্তু কিছু করবার নেই। ঘোষ দম্পতি চলে গেলেন কারও সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে গেলেন না বাধ্য হয়েই মুখ বুঁজে বসে থাকতে হচ্ছে তাদের। ওপাশে আহুজাকে ধরেছে তখন অন্য একজন, বলছে, বিদেশী অর্ডার যা পেয়েছেন তাতে তো নিজেদের দেশের সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে —

আহুজা হেসে বললেন, ওতো আমি শিখে গেছি! আমাদের দেশের পক্ষে এটা কোন সমস্যাই নয়। এন্তার উৎপাদন বাড়িয়ে যাব, জিনিষ ভাল খারাপ যা হয় হোক রপ্তানী করব। যে সব গাড়ী বাতিল হয়ে ফিরে আসবে সেগুলোই দেশের বাজারে বিক্রি ক'রব! — কথাগুলো বলে নিজের রসিকতায় নিজেই খুব হাসলেন আহুজা, তারপর জিজ্ঞেস ক'রলেন, কি পলিসিটা ঠিক শিখিনি?

কার কাছে শিখলেন?

কেন আপনাদেরই কারও কাছে —

পাশ থেকে একজন বলে উঠলেন, ওসব পাখার বেলায় চলে, গাড়ীর বেলায় চলবে না আহুজা সাহেব। — বলে ভদ্রলোক নিজে অন্য সকলের সঙ্গেই হেসে উঠলেন।

পাখার বেলায় যে চলবে এটা আগে কি কেউ জানত? একজন বুদ্ধি ক'রে ক'রল তবেই না বোঝা গেল যে এটা একটা কাজের মত কাজ? — আহুজা সমস্ত ক্ষণটা রসিকতা ক'রে হাসতে হাসতে কথা বললেন। তার পরক্ষণেই

আগের বক্তাকে বললেন, হ্যালো মিস্টার ব্যাংকার, কেমন আছেন ?

ভালো, জবাব দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আপনি কেমন ?

খুব ভাল, হাসলেন আহুজা।

অনেকদিন বাদে কলকাতা এলেন —

হ্যাঁ। হয়ে ওঠে না। তাছাড়া আমার তো পাট নেই, কলকাতায় কাজ কর্মও দেন না কি ক'রব এসে ?

হাসির কথা বললেন বটে। আপনাকে কাজকর্ম দিতে হবে। আপনি কলকাতায় ইণ্ডাস্ট্রি ক'রবেন না তার কি হবে ?

রঙ্গনাথন বললেন, হাসির কথাই তো হচ্ছে মিস্টার বোস। উনি বরাবরই হাসির কথা বলে চলেছেন।

অনেকদিন বাদ কলকাতা এলাম, সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেল এমন একটা শান্ত পরিবেশে, হাসির কথাগুলো এখানে ছাড়া আর বলব কোথায় বলুন তো ?

মিসেস আহুজা কিন্তু একদম চুপচাপ —

উনি বোধহয় ওঁর জাহাজগুলোর কথা ভাবছেন — আহুজা ঠাট্টা ক'রলেন। কটাক্ষ ক'রলেন শ্রীমতী আহুজাকে — যিনি একটা জাহাজ কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য।

শ্রীমতী আহুজা স্বামীর কথার জবাব বেশ গুছিয়েই দিলেন, বেতন পাওয়া ডিরেক্টর আমি। তোমাদের জাহাজগুলোর কথা দিনরাত ভাবতে আমার বয়েই গেছে।

নিজের রসিকতার যোগ্য জবাব পেয়ে বেশ একচোট হাসলেন আহুজা, রঙ্গনাথনও হেসে বললেন, লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেক্টরদের দিনরাত ভাবতে নেই, প্রাইভেট কোম্পানীর ডিরেক্টরদের সেটা ক'রতে হ'তে পারে —

বসে বসে এইসব খুচরো রসিকতার ভাঙ্গা ভাঙ্গা টুকরো শুনছিল প্রসেনজিৎ। কিন্তু এভাবে বসে থাকতে আদৌ ভাল লাগছিল না তার। মিস্টার ঘোষও একতলায় চলে গেছেন, একজন লোক নেই চেনাশোনা। মিস্টার মালুর বাড়ীর বিয়ের পার্টিতে যখন মিস্টার ঘোষের সঙ্গে আলাপ, প্রসেনজিৎ আশা করছিল, এখানেও মিস্টার মালু নিশ্চয়ই আসবে। এখন তার মনে হচ্ছিল অন্তত মালু এসে গেলেও হ'ত, দুএকটা কথা বলা যেত। এ এক নিদারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা হয়েছে। এরকম হবে জানলে আগেই একটা অজুহাত দেখিয়ে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ক'রত। তাছাড়া নিজেকে কেমন হীন মনে হচ্ছে এখানে, অথচ ফিলাডেলফিয়াতে অনেক নিমন্ত্রণে অনেকবার গিয়েছে প্রসেনজিৎ কোথাও এমন অস্বস্তি হয়নি। বিশেষ ক'রে আজ মনে পড়ছে এমিলির কাকার এক পার্টির কথা, সেখানে যারা নিমন্ত্রিত ছিল প্রায় সবাই ব্যবসায়ী সমাজের কিন্তু এত অসুবিধে হয়নি সেখানে মেলামেশা ক'রতে। সবাই সকলের

সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক, তাই অপরিচিতের সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা সেখানে সকলেরই দেখেছিল সে রাত্রে। অবশ্য, প্রসেনজিৎ মনে মনে আরও ভাবল, সেইসব পার্টি যদি শুধু রকফেলার, ফোর্ড বা ওইরকম লোকেদের হ'ত তাহ'লে কি এইরকমই অস্বস্তি হ'ত না সেখানেও? আসলে এখানে আসাই অন্যায় হয়েছে তার। এদের মধ্যে নিজেকে যে কি পরিমাণ বেমানান লাগছে তা সে নিজেই অনুমান ক'রতে পারছে এখন। মাঝে মাঝে বেয়ারাগুলো ঘুরে ঘুরে পানীয় সরবরাহ ক'রছে, জিজ্ঞেস ক'রছে কে কি পছন্দ ক'রবেন, সেটাই যেন একটু হালকা ক'রছে তার মনের অস্বস্তিকর বোঝা।

এরই মধ্যে এলেন ঘোষ। বেশ একটু হন্তদন্ত হয়েই এলেন, বললেন, ব্যস, সবাই এসে প'ড়েছে। যা দিনকাল পড়েছে তাতেই একটু চিন্তায় পড়েছিলাম—

প্রসেনজিৎ একটু দম ফেলল ঘোষ আসাতে। কথা বলতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, বলল, শুনেছি বটে কাগজেও পড়ছি অবস্থা খুবই খারাপ, সকলের মুখে আলোচনাতেও এই একই কথা শুনছি যে সময় খুব খারাপ কিন্তু আমার চোখে তো —

চোখে দেখতে চান? মিস্টার ঘোষ জিজ্ঞেস ক'রলেন।

না ঠিক চাই না, মানে বলছিলাম কি —

ভগবানের কাছে একটাই জিজ্ঞাসা আমার, আর কতদিন এইসব দেখতে হবে। এইরকম অরাজকতা বন্ধ হবে কবে —

কি ব্যাপার আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

না বোঝাই ভাল। ইমমর‍্যাল — সব অসৎ হয়ে গেছে। আপনি যদি একটা লোক সঙ্গে না পান তা'হলে প্রশাসন চালাবেন কি ক'রে? সরকারী তরফে অত্যন্ত বেশী যা হয়েছে তা হচ্ছে দুর্নীতি। এরকম হলে একটা দেশ কখনও চলতে পারে?

প্রসেনজিৎ এই প্রায় একবছরে এমন কোনও কাজে পড়েনি যাতে এসব বিষয়ে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়, কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই সে এই দুর্নীতি পরায়ণতার কথা শুনছে। শুনে শুনে যতটা বোঝার সেই ভিত্তিতে সে সায় দিল ডি, এন, ঘোষের কথায়, বলল, তাতো ঠিকই। সাধারণ মানুষের মধ্যে সততা না থাকলে, সরকারী বিভাগগুলো দুর্নীতিগ্রস্থ হ'লে, দেশ দুর্বল হয়ে পড়বে এতো স্বাভাবিক!

ডি, এন, ঘোষ যাঁর এককালে নাম ছিল দীননাথ ঘোষ বললেন, সরকারী ব্যবস্থাই সব ত্রুটিপূর্ণ। এই দেখুন না যদি একশ টাকা রোজগার হয় তো তার পঁচাশী টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। তাহ'লে আমাদের এই খাটাখাটনির দাম পনের টাকা? তা বলুন খাজনা দপ্তরের খাজাঞ্চিখানা ভরবার জন্যে কার দিনরাত খেটে মরতে ইচ্ছে ক'রবে?

এখানে করভার সত্যিই খুব বেশী — প্রসেনজিৎ নিজেও সেকথা উপলব্ধি

ক'রছে বলে সহজেই স্বীকার ক'রল।

সত্যিকথা বলতে কি এই সব কারণে এখন আমরা ঝামেলা কমিয়ে ফেলতে চাই। আমরা এই পলিসি বদলানোর জন্যেই নুট ওয়ালেস কোম্পানী বিক্রি ক'রে দিচ্ছি। মিস্টার মালুর সঙ্গে কথাবার্তা চলছে।

সাঙ্গানারিয়া মালু গ্রুপে — প্রসেনজিৎ ভাবল, বলল, বহু কোম্পানী তো ওঁদের। এই তো সেদিন তিনটে জুট মিল ওঁরা কিনলেন — আচ্ছা যে সমস্যা আপনাদের ওঁদেরও তো সেই একই সমস্যা। তবু —

ডি, এন, ঘোষ খুব সহজভাবে বললেন, ওঁরা এসব সমস্যার সমাধান ক'রতে পেরেছেন তাই ওঁদের পক্ষে এখন কাজ বাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, আমরা পারিনি।

প্রসেনজিৎ কোন কথা বলল না। ঘোষ-এর কথা শুনে সে সত্যিই বিস্মিত হচ্ছে। সে যখন চাকরী নিয়ে কলকাতা এল তখন মিস্টার মালু তাদের কোম্পানীর একজন পরিচালক মাত্র। অথচ মাস তিনেক বাদেই সে সবিস্ময়ে একদিন দেখল মালু মিস্টার স্টিফেন কারপেনটার-এর বদলে ম্যানেজিং ডিরেক্টার হয়ে গেল। কারপেন্টার চলে গেল বিলেত। আর মিস্টার সেন যিনি তাকে চাকরীতে নিয়োগ ক'রে এনেছিলেন আমেরিকা থেকে, তিনি রয়ে গেলেন একজন সাধারণ ডিরেক্টার হয়েই। অফিসে জোর গুজব আরও কিছু শেয়ার সাহেবরা বিক্রি ক'রে দিলেই মিস্টার সেনও হয়ত কোম্পানী ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন। কারণ সাঙ্গানারিয়া-মালুরা অতীতে যে সব কোম্পানী কিনেছেন কোথাও একজিকিউটিভ ডিরেক্টর রাখেন নি। প্রসেনজিৎ অবাক হচ্ছে এই ভেবে যে এত দ্রুত ওরা এগোচ্ছে কি ক'রে? কোন সমস্যার কি এমন সমাধান ক'রেছে ওরা যাতে ঝড়ের বেগে একের পর এক এত বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো কোটরগত ক'রে ফেলছে?

কিছুক্ষণ কথাবার্তায় অনেক কিছু জানতে পারল প্রসেনজিৎ। সে জানল মালু নাকি তার ওপর বিশেষ আস্থাবান। ডি, এন, ঘোষ এমনও আভাস দিলেন হয়ত প্রসেনজিৎকে বেশ ভাল রকম প্রমোশনও দেওয়া হবে। ঘোষ আশা ক'রছেন ওঁদের কোম্পানী কেনার ব্যাপারে মালু কারিগরী অভিজ্ঞতার জন্যে তার মতামতের ওপর অনেকটা নির্ভর ক'রবেন। মিস্টার ঘোষ প্রত্যক্ষ ক'রে কিছু না বললেও আশা প্রকাশ ক'রলেন প্রসেনজিৎ নিশ্চয়ই এমনভাবে মত প্রকাশ ক'রবে যাতে তাঁরা ন্যায্য দাম পেতে পারেন।

বাড়ী ফিরতে প্রসেনজিৎ দেখল পথ একবারে জনহীন। কোথাও দৈবাৎ একটা গাড়ী যদি ছুটছে তো ছুটছে, নইলে সারাটা পথ এমনই নিঃশব্দ আর দুপাশের বাড়ীগুলো এমনই নিঝুম যে তার মনে হচ্ছে তারা বুঝি এক মৃত নগরীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। অথচ দিনের কলকাতা কি আশ্চর্যরকম জনাকীর্ণ! এই নির্জন পথই হয়ত দিনের বেলা চলমান মানুষে হয়ে ওঠে জনস্রোত। আরও একটু আগে ফেরা উচিত ছিল। খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতেই সাড়ে আটটা

বেজে গেল। এখন মনে হচ্ছে যেন নিশুতি রাত। অথচ ছেলেবেলার কলকাতার কথা তার যা মনে আছে সেখানে তো বারটাতেও রাত হ'ত না। সে দেশ যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, এই কয়েকটা বছরের ব্যবধানে অনেকই পরিবর্তন হয়েছে কলকাতার। ডালহৌসী এলাকার কয়েকটা পুরানো বাড়ীর বদলে সেখানে উঠেছে উঁচু উঁচু কতগুলো বিশাল বাড়ী, চৌরঙ্গীর রাস্তাটারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ময়দানের অনেকটা সবুজ কাটা গেছে দেখে প্রথম দিনই কষ্ট হয়েছিল প্রসেনজিৎ-এর। ময়দানের সামনে দিয়ে আসতে আসতে পরীক্ষামূলক বস্তুবিজ্ঞানের অধ্যাপক পিটার প্লেসিঙ্গারের কথাটা তার মনে পড়েছিল, তিনি বলেছিলেন, আমরা ইঁট পাথর সাজিয়ে প্রকৃতির দ্বার রুদ্ধ ক'রতে পারি কিন্তু এমনি উদার প্রকৃতিকে গড়তে পারি না, সৃষ্টি ক'রতে পারি না উদার সবুজ শ্যামল প্রান্তর। কারণ প্রয়োজন আমাদের তা ক'রতে দেয় না।

এমিলির নামে টেলিগ্রাম। বাড়ীর ঝি সারদা পিয়নের কাছ থেকে এনে সুপ্রীতিকে দিতেই তিনি পড়ে বুঝলেন এমিলির টেলিগ্রাম ওটা। তাই বললেন, ওটা মেমসাহেবকে দাও — সুপ্রীতি বাড়ীর চাকরবাকরদের যখন কোন নির্দেশ দেন তখন এমিলির বেলায় মেমসাহেব কথাটাই ব্যবহার ক'রে থাকেন। যেন তার কোন নাম নেই, সংসারে কোন পরিচয় নেই —। এসব সুপ্রীতির নিজস্ব ভঙ্গী। আরও কতকগুলো বিশিষ্টতা তাঁর আছে, যার সঙ্গে যখন কথা বলেন তার ভাষাই অনুকরণ করবার চেষ্টা করেন। যেমন সারদার সঙ্গে কথা বলতে হিন্দি বললেও বাবুর্চি সুলতান-এর সঙ্গে কথা বলবার সময় সেই হিন্দি উর্দুর পথ ধরে। উনি মনে করেন উর্দু হচ্ছে, কিন্তু সে ভাষা শুনে প্রকাশ্যে পারে না বলে মনে মনে হাসে সুলতান নিজেও। অথচ বিশ্বজিৎ-এর বাংলা নির্দেশ স্বচ্ছন্দেই বুঝতে পারে সুলতান, জবাবটাও সে বাংলাইতেই দিতে চেষ্টা করে। তৃতীয় যে আছে সে গঙ্গাধর, বাড়ী উড়িষ্যায়। বাংলার সহোদরা প্রদেশবাসী গঙ্গাধর আবাল্য বঙ্গবাসী, তাই সে এ ভাষাটা ভালই জানে, শুদ্ধভাবেই বলে কিন্তু নিজে অসুস্থ ওড়িয়া ভাষার ব্যবহারে তাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবেন তবু তাকে তাঁর ভাষা ব্যবহার করবার সুযোগ দেবেন না। এটা তাঁর এক ধরণের গরিমা, চাপা অহমিকার নির্বুদ্ধিতা। এবং সেই নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ ক'রে এমিলিকে পর্যন্ত বাংলাভাষা বলতে দেন না, যতটুকু পারেন ইংরিজিই বলেন তার সঙ্গে। সারদারকে দিয়ে টেলিগ্রামটা পাঠাবার পরই গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস ক'রলেন, কোন সুসংবাদ আছে কি?

সুপ্রীতিকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে এমিলি বলল, আমার কাকা ভারতবর্ষে আসছেন।

তাই নাকি? কবে?

আগামী মাসের আঠাশ তারিখে। প্রথম দিল্লীতে আসবেন।

এখানে এলেন না কেন?

কি জানি?

কোন কাজে আসছেন কিনা জানিয়েছেন?

না।

এলে নিশ্চয়ই এখানেও আসবেন?

আমি তো আশাকরি নিশ্চয়ই আসবেন এখানে। আমার কাকার অনেক-দিনের ইচ্ছে এখানে আসার। কাকা বলেন, প্রকৃত শান্তির দেশ ভারতবর্ষ। তাঁর ধারণা কোন মানুষ যদি জীবনের দৈনন্দিন ঝঞ্ঝাটে বিব্রত হয়ে মুক্তি চায়, তাহ'লে ভারতবর্ষে বসবাস ক'রতে পারে, শান্তি পাবে।

আগে কি কখনও উনি এখানে এসেছেন?

হাসল এমিলি, বলল, মনে মনে।

তাহ'লে ওঁর পক্ষে প্রথমে এখানে এসে পৌঁছান ভাল ছিল।

আজ একটা তার ক'রে দিই, বলে দিই প্রথমে কলকাতায় এস।

হ্যাঁ, তাই ক'রে দাও। — বলে সুপ্রীতি আর দাঁড়ালেন না, নিজের ঘরে চলে গেলেন। এমিলিও বেরিয়ে পড়ল রুমির উদ্দেশ্যে। রুমিকে খবরটা না দিলে তার ভাল লাগছেনা। এমন একটা সুন্দর খবর — ইচ্ছে ক'রছে ছুটতে, দৌড়ে গিয়ে রুমিকে জড়িয়ে ধরতে। কি যে ক'রবে এমিলি ভেবেই পাচ্ছে না। প্রায় ছুটেই সে পৌঁছাল রুমির ঘরে। তাকে দেখেই রুমি জিজ্ঞেস ক'রল, কি হ'ল অত ছুটছ কেন?

হাতের টেলিগ্রামটা রুমির দিকে এগিয়ে দিয়ে বাংলাতেই বলল, আমার কাকা শ্রীমান উইলিয়াম হ্যারল্ড স্ট্রঘাণ আসছেন।

রুমি এমিলির সঙ্গে যোগ দিয়ে বলল, খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু শ্রীমান হবে না, শ্রীযুক্ত হবে। বলেছিনা শ্রীমান হয় ছোট ছেলেদের বেলায়। কনিষ্ঠের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে।

'কনিষ্ঠ' কনিষ্ঠ কি যেন হ'ল? — মুখ কাচুমাচু ক'রে জিজ্ঞেস ক'রল এমিলি।

ভুলে গেলে? যে সম্পর্কে ছোট তাকে বলে কনিষ্ঠ।

ও, ঠিক ঠিক। — মনে পড়ায় হেসে ফেলল এমিলি। তারপর 'শ্রীযুক্ত' শব্দটা উচ্চারণ করবার চেষ্টা ক'রল বেশ কয়েকবার। কিন্তু কিছুতেই 'যুক্তটা' ঠিক হচ্ছে না দেখে হতাশ হবার ভঙ্গীতে বলল, হেল্পলেস।

টেলিগ্রামটা পড়ে রুমি বলল, দিল্লী পৌঁছাবার তারিখ তো জানিয়েছেন

তোমার কাকা, কলকাতায় কবে আসবেন জানান নি তো ?

না। মা বললেন একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিতে, প্রথমে এখানে আসন।

ভালই তো বলেছে।

তোমার কাকাকে তুমি খুবই ভালবাস তাই না ?

তুমি আমার কাকাকে দেখ নি, ভালবাসার মতই মানুষ তিনি।

তোমার কাকা বিয়ে করেন নি কেন ?

আমি কি ক'রে জানব ? তবে শুনেছি উনি অল্প বয়েসে কখনও এক জায়গায় থাকেন নি। খুব কম দিনই এক জায়গায় থাকতেন। হয়ত হবে এই জন্যেই ঘর বাঁধা হয়নি।

এখন ওঁর বয়েস কত হবে ?

সাতষট্টি চলছে।

তোমাদের দেশে তো শুনেছি এরকম বয়েসেও বিয়ে হয়।

এমিলি হেসে বলল, আমি কি কাকাকে বিয়ের পরামর্শ দেব ?

রুমি বলল, তা কেন দেবে তিনি ইচ্ছে ক'রলে ক'রতেও তো পারেন —

তা তো নিশ্চয়ই পারেন, কিন্তু তেমন কোন পরিকল্পনা তো এখনও দেখছি না। বরং সত্যি কথা বলতে কি কাকার মনোভাব অনেকটা তোমাদের দেশের সাধুদের মত। ইদানীং সংসারে থাকতে চান না। অনেকদিন ধরেই বলছিলেন আমার বিয়ে হয়ে গেলে উনি পৃথিবী ভ্রমণে বেরোবেন।

এই বয়েসে ? ওঁর ব্যবসা কে দেখবে ?

ওঁর ব্যবসায় অংশীদার আছেন। তিনিও খুব ভাল মানুষ।

বাঃ বেশ তো।

আমাদের বাড়ী ডেলায়ার নদীর অপর পারে — বেশ কিছুটা দূরের গ্রামে। কাকার হঠাৎ কোনদিন খেয়াল হলে সেখানে চলে যান। বাবার সঙ্গে ছিপ ফেলে সারাদিন মাছ ধরেন।

তুমি তো তোমার কাকার কাছেই থাকতে — নিজেদের বাড়ীতে যেতে না ?

খুব কম যেতাম।

তোমার কাকা যখন যেতেন ?

কখনও হয়ত তাঁর সঙ্গে যেতাম, বেশীর ভাগ সময় যেতাম না।

কি ক'রতে ?

নিজের পড়াশোনা নইলে ধর বন্ধুদের সঙ্গে বেড়ালাম।

তুমি যে বলছিলে তোমার পুরুষ বন্ধুদের গল্প বলবে একদিন —

কি গল্প বলব বল ? বলবার মত গল্প আছে কোথায় ?

তোমার সেই বন্ধুটির গল্প যার কাছে তুমি আমাদের দেশের কথা জেনেছিলে—

এমিলি কাকার তার পেয়ে খুবই খুশী ছিল, সে রুমির গালটিপে দিয়ে বলল, তুমি এত দুষ্টু মেয়ে সব মনে ক'রে রাখ।

কি করি বল, তুমি যেহেতু নিজে থেকে কিছু বলবে না, আমাকে মনে ক'রে রাখতেই হয়।

এমিলি জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে রইল।

আবার তাকে খোঁচাল রুমি, দাদার সঙ্গে তোমার আলাপ হ'ল কি ক'রে?

আমিই আলাপ ক'রেছিলাম।

কি ক'রে?

একদিন তোমার দাদা আমার কাকার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিল, কাকা সেদিন বাড়ী ছিলেন না অথচ তোমার দাদার সঙ্গে দেখার হবার কথা ছিল শুনলাম। তাই বললাম আপনি বসুন উনি নিশ্চয়ই এখন ফিরবেন। তোমার দাদা একা একা ব'সে ছিল ব'লে আমি কথাবার্তা বলে তাকে সঙ্গ দিতে লাগলাম। কাকা সেদিন অল্পক্ষণ বাদেই এলেন কিন্তু আমি তোমার দাদাকে আমন্ত্রণ জানালাম আর একদিন আসবার জন্যে। সে এল। একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রল সে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ইন-এ। সেদিন অনেক কথাবার্তা হ'ল আমাদের। অনেক মত বিনিময়। ইনডিপেণ্ডেন্স স্কোয়ারের পূব দিকে পুরানো ক্রাইস্ট চার্চে কবরখানা আছে। জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগে, সেখানেও গেলাম একদিন দুজনে। — এই পর্যন্ত বেশ রসিয়ে বলেই হুস ক'র বলল, এমনি ক'রেই আলাপ হ'ল আর কি —

বাঃ এই পর্যন্তই?

তবে আর কি?

আচ্ছা আমাদের কথা দাদা বলত না?

অনেকদিন বলেছে।

কার কথা বেশী বলত?

একথার জবাব না দিয়ে শুধু একটু হাসল এমিলি। সত্যিকথা বলা তার পক্ষে অসুবিধেজনক, কারণ সে বুঝতে পারছে সত্যি কথাটা অপ্রিয় হবে। কারও কথাই বিশেষ বলত না প্রসেনজিৎ। দুএকদিন বলেছিল দেশে কে আছে না আছে তবে তাদের জন্যে যে মমত্ববোধ তা তার কথা থেকে কখনই বোঝা যেত না। অথচ সেই গভীর মমত্ব দেখা যেত কল্যাণের মনে। কথায় কথায় মায়ের কথা বলত সে, বলত, আমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তাহ'লে আমিই হতাম পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোক। — বাস্তবিক কল্যাণের সঙ্গে যেন কারও তুলনাই হয় না, যেমন মানসিকতা তেমনি ঔদার্য তার চরিত্রে, ওই কবরখানায় কল্যাণ-এর সঙ্গে অনেক ক'দিন গেছে এমিলি, কল্যাণ নিজেও খুব ভালবাসত। একদিন সে বলেছিল, একটা জিনিষ ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব ভাল লাগে, তোমাদের এই কবর দেওয়া। আমাদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয় কিন্তু এই যে তোমরা ক'বর দাও, তার ওপর সুন্দর সুন্দর বাক্য রচনা ক'রে বেদী বানিয়ে রাখ এতে মনে হয় সব কিছু ফুরিয়ে নিঃশেষ

হয়ে যায় নি, এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে, ওই বুঝি ওখানে গেলেই পাওয়া যাবে সেই প্রিয়জনের সান্নিধ্য।

এমিলিকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে রুমি বলল, কথা বলছ না যে?

কি বলব?

আমার কথাটার জবাব দাও?

আবার একটু হাসল এমিলি, হালকাভাবেই বলল, তুমি আমার একটা কথার জবাব দেবে? ঠিক জবাব?

কেন দেব না?

এমিলি কয়েক সেকেণ্ড থেমে রইল, তারপর বলল, তুমি তো খুবই ভাল বাস মিস্টার দত্তকে?

হঠাৎ একথা?

বিয়েও নিশ্চয়ই ক'রতে চাও?

তুমি তো আগেই বলেছ আমার কথার জবাব দেবে?

রুমি বলল, তুমি সব জেনে শুনে চালাকি ক'রছ?

আচ্ছা মিস্টার দত্তর সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই কথাবার্তা হয়েছে?

তোমার সঙ্গে দাদার বুঝি হয়নি?

এমিলি সে কথার ধার দিয়েও গেল না, বলল, ধর এটা যদি শুধুমাত্র তোমার মনে মনে চাওয়ার ব্যাপার হ'ত অর্থাৎ ধর যদি শুধু তোমার মনের ইচ্ছা হ'ত ওকে বিয়ে করা ওর সঙ্গে জীবন যোগ করা, আর ও যদি তোমাকে কোন কথা না বলে তোমায় ছেড়ে চলে যেত —

কিসব বকছ পাগলের মত? — এমিলির কথা রুমির ভাল লাগছিল না বলে সে ওই কথা বন্ধ করবার জন্যেই বলল।

এমিলি সঙ্গে সঙ্গেই বলল, ব্যাপারটা তুমি ব্যক্তিগতভাবে ধ'রো না, আমি অন্য একটা কারণে তোমাকে বলছি। যে কারণে বলছি তাও তোমাকে বলব, তুমি শুধু আমার কথার জবাব দিয়ে যাও।

রুমি সব শুনে বলল, কেউ ভালবাসলে কখনও এমনিভাবে ছেড়ে যেতে পারে?

কিছুটা সময় চুপ ক'রে থেকে এমিলি বলল, পারে। অধিকতর ভালবাসার জন্যে পারে।

কি জানি, রুমি বলল, তোমাদের দেশে বুঝি সবই অদ্ভুৎ।

মানুষের মন দেশকাল অনুসারে আলাদা হয় না রুমি। পরিবেশ বদল হ'লে কিছুটা বদল হ'লেও একই মানসিকতা সারা পৃথিবীময়।

রুমি চুপ ক'রে রইল। এমিলি মাঝে মাঝেই এমন সব কথাবার্তা বলে যার সঙ্গে কলেজের অধ্যাপকদের বক্তৃতার তুলনা চলে কেবলমাত্র। এইসব কথাবার্তা সহ্য হয় না রুমির। বাড়ীতে বসেও যদি কলেজের

অধ্যাপিকার নীরস তত্ত্বকথা শুনতে হয় তাহলে আর কলেজ কি দোষ ক'রল ? আজকালকার দিনে কোন ছেলেমেয়েই ওইসব একঘেয়ে ভাষণ শুনতে পছন্দ করে না। বন্দনা, সোমা, জয়া তো একটা ক্লাসেও মন দিয়ে শোনে না। কোথায় থেকে কোন বন্ধুর বিয়ের ফটো, কোন আত্মীয়ের বিয়ের ফটো, কে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল তার ফটো জুটিয়ে নিয়ে আসে তাই নিয়ে আলোচনা চলে সব সময়। যেদিন সেসব না থাকে সেদিনকার জন্যে সিনেমার গল্প আছে, নায়কদের রূপের কথা আছে। মঞ্জুলাটা একটু অন্যরকম। চলচ্চিত্রের নায়কদের সম্বন্ধে তার উৎসাহ খুব বেশী নয়, সোমা-বন্দনার আরও অনেক আলোচনাকেও সে এড়িয়ে যায় অশ্লীল মনে করে, থামতেও বলে ওদের কিন্তু অধ্যাপকদের অসার বক্তৃতা সে-ও যে খুব একটা শোনে তাও নয়। সে নিয়ে আসে বই, দুনিয়ার গল্পের বই জোগাড় ক'রে নিয়ে আসা আর আপন মনে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ার জায়গা হচ্ছে ক্লাস ঘর।

এমিলি আগে বুঝত না, আজকাল বোঝে কোন বিষয়বস্তুতেই আটকে থাকবার মন রুমির নয়। অত্যন্ত হালকাভাবে উড়ে চলা তার পছন্দ। সহজ কথাবার্তা, সহজ আচার-আচরণ, সহজ দৃশ্য, সবকিছু মিলিয়ে সহজ জীবনযাত্রায় সে অভ্যস্ত। কিন্তু সামান্য গভীরতাও তার অগম্য হলে কি ক'রে কথা বলা যায় তার সঙ্গে ? তাই এমিলি চুপ ক'রে গেল।

আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে রুমি বলল, যাক গে, ওসব ছাড়। এখন বল কি বলছিলে ?

কিন্তু পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে যেতে আর ভাল লাগল না এমিলির। সে তাই বলল, বলছিলাম তোমাদের এখানকার গ্রামগুলো দেখবার বড়ই ইচ্ছে করে, কি করে দেখি বলত ? তোমার দাদাকে বললে বলে চিনি না।

সত্যিই তো। কি ক'রে চিনবে ? আমরা কেউই চিনি না। আমরাই কি কোনদিন গ্রামে গিয়েছি ? জীবনে কোনদিন গ্রাম কাকে বলে দেখিনি। আমি যখন খুব ছোট তখন ড্যাডি ডি, এম ছিলেন। তখন নাকি উনি এক দুবার গ্রামে গিয়েছিলেন, সেই স্মৃতি মনে ক'রে এখনও বলেন গ্রামগুলো বড় বীভৎস।

কেন ? — বিস্ময় ফুটে বেরোল এমিলির মুখ দিয়ে।

তা জানি না —

আমি কিন্তু শুনেছি তোমাদের গ্রাম বড় সুন্দর। সেখানে জীবন অন্য রকম, শান্ত, সুশৃঙ্খল, জমাটবাঁধা —

তুমি কোথায় এসব আজগুবি কথা শুনেছ আমি জানি না, তবে আমরা যা জানি তা তোমার জানার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আমি তো আর নিজে দেখিনি, তোমাদের দেশেরই একজন গ্রামের মানুষের কাছে শুনেছি।

গ্রামের মানুষ। সে তো চাষাভুষো হয়।

কি হয়?

চাষী। কৃষক।

হ্যাঁ হ্যাঁ। সে-ও ছিল এক কৃষক পরিবারের ছেলে। তার বাবা নিজেই জমি চাষ ক'রতেন। তারা খুব গরীব।

তা সে আমেরিকায় গেল কি ক'রে?

খুব মেধাবী ছাত্র ছিল, ফাউণ্ডেশানের টাকায় গিয়েছিল।

তারপর?

তারপর একদিন পড়াশোনা শেষ ক'রে ফিরে এল নিজে রদেশে .—।

কোথায় তার দেশ?

শুনেছি মেদিনীপুর —

মেদিনীপুর তো একটা জেলা।

জেলা কি?

ইংরিজিতে বুঝিয়ে দিল রুমি, ডিস্ট্রিক্ট।

ও মাই গড।

গ্রামের নাম কি?

তা তো জানি না।

কি বলত ছেলেটি?

এমিলি নিজেকে সংযত ক'রল। থামল। বলল, তারই কাছে তোমাদের দেশের গল্প শুনতাম তোমাদের ভাষার গান শুনতাম আবার সেই গানের সে ইংরিজি অনুবাদ ক'রে বোঝাত আমাকে।

সে বুঝি তোমাকে খুব ভালবাসত?

আমার সঙ্গে তার ছিল বন্ধুত্ব, সে ভালবাসত তার দেশকে।

দেশকে! — ঠোঁট ওলটালো রুমি অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রতে, তারপর বলল, দেশকে ভালবাসা! সে আবার কি? — বলেই সে নিচু স্বরে বলল, জান ছোটদারও অমনি সব অদ্ভুৎ চিন্তা আছে। জান এবাড়ীর অনেক জিনিষ সে খায় না বাবাকে লোকে দেয় বলে —

বিশ্বজিৎ-এর প্রসঙ্গ উঠতেই এমিলি অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠল, জানতে চাইল, কি বললে? খায় না কি রকম?

তুমি তো জান বাবা বড় চাকরী করে বলে অনেক লোক অনেক জিনিষ বাবাকে পাঠায়। ছোটদা সেসব কিছু খায় না, ব্যবহার করে না, বলে ওসব ঘুষ।

তাই নাকি!

ওসব এক রকম পাগলামী।

এমিলি প্রত্যুত্তর ক'রল না। আর এক রহস্যে জড়িয়ে পড়ল সে। এতদিন বিশ্বজিৎকে বুঝতে পারত না, এখন আবার আর এক কথা শুনে ঘুলিয়ে

উঠল সব জানা এবং ধারণা। অচিন্তনীয় এক কথা শোনাল রুমি। বিশ্বজিৎ — এ যে সে ভাবতেও পারছে না। হ'তেও পারে। পৃথিবী এমন একটা জায়গা এখানে অবিশ্বাস কিছুই করা যায় না। আর বিশ্বজিৎ-এর মত মানুষদের পক্ষে বেশী সম্ভব এই জন্যে যে এরা স্বাভাবিক নয়, আর দশজন মানুষ যারা চারপাশে নিয়ত ঘুরছে ফিরছে বা এই বাড়ীরই আর যে সব মানুষগুলো আছে তাদের কারও সঙ্গে মিল নেই বিশ্বজিৎ-এর। বিশ্বজিৎ একা এবং স্বতন্ত্র এটা প্রথম দিন থেকেই সে বুঝতে পারছে। তবে সেই স্বাতন্ত্র্য যে কি বা একাকীত্ব যে কেন সেটাই বুদ্ধিগোচর হচ্ছে না তার এতদিনেও। যে জীবন কারও কাছেই প্রার্থিত হতে পারে না তেমনি এক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন বিশ্বজিৎ কেন যে করে তাও এমিলির দুর্জ্ঞেয়। তবে যদি রুমির কথা সত্যি হয় যদি বিশ্বজিৎ সত্যিই মনে করে তার বাবার মধ্যে অসততা কিছু আছে তা'হলে তার পক্ষে এ সংসারের মধ্যে থাকা তো এর বেশী স্বচ্ছন্দভাবে অসম্ভব। এ মানসিকতা বেশীদিন থাকলে একদিন সুযোগমত হয়ত সে এবাড়ী থেকে চলেও যাবে। কিন্তু রুমি একে দেশকে ভালবাসা বলল কেন? আসলে দেশকে ভালবাসা দেখেনি রুমি। সে যদি কল্যাণকে দেখত, যদি শুনত তার কথাগুলো তাহলে বুঝত মাতৃভূমির প্রতি মমত্ব কি জিনিষ, তার প্রতি কর্তব্য কি কঠোর হতে পারে মানুষের জীবনে। একদিন সে বলেছিল, জান আমাদের দেশের মহত্তম নেতা ভারতবর্ষের নাম যাঁর কাছে মন্ত্রের মত ছিল তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুনের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গেলেন জানা গেল না। এ যুগের রাজনৈতিক কর্মীদের আর কেউ তাঁর মত হৃদয় নিয়ে দেশের স্বার্থে নিজেকে বিসর্জন দেয় নি। বড় বড় ধরন্ধরেরা রাজনৈতিক নেতা সেজে যখন নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে সেই সময় একা তিনি বিদেশে। রণাঙ্গনে স্বদেশীয় সৈনিক খুঁজে বেড়াচ্ছেন —

কে তিনি, জানতে চেয়েছিল এমিলি।

কল্যাণ জানিয়েছিল, তাঁর নাম সুভাষ চন্দ্র বসু। --- তারপর অনেক কথা বলেছিল তাঁর প্রসঙ্গে, বলতে বলতে এক সময় মনে হচ্ছিল কল্যাণ যেন নিজেরই মনের কথা সব বলে যাচ্ছে। আজ রুমি দেশকে ভালবাসার কথা তোলাতে সেদিনকার কথাগুলো মনে হ'তে লাগল এমিলির। সে বলল, তোমরা ভালবাসা বলতে কি বোঝাও আমি জানি না। তবে কল্যাণ যা বলত তা সে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস ক'রত। কাজেই আমি বুঝতাম সে তার দেশকে ভালবাসে। সে যে কতসব অদ্ভুৎ গান শোনাতো তোমাদের দেশের সে সব গান কই একদিনও তো রেডিওতে শুনতে পাই না! শুনলে রেকর্ড ক'রে নিতাম।

তখন কর নি কেন? রুমি জানতে চাইল।

তখন তো ভাবি নি।

কি ভাব নি?

এবার মনের ভাব গোপন ক'রল এমিলি, বলল, কোনদিনই ভাবি নি যে এ দেশে আসব, এদেশে বাস ক'রব এখানেই হবে আমার জীবনের বাসভূমি মরণের আশ্রয়।

রুমি এরপর কি বলবে ভাবল। কি বলা যায়? আরও কি টানাটানি ক'রবে কল্যাণকে নিয়ে? আর একটু টানাটানি ক'রলেই সব বেরিয়ে পড়বে। আমেরিকার মেয়েদের কাছে দু দশটা ছেলের সঙ্গে রাতকাটানো তো নেহাৎই মামুলি ব্যাপার। সে জায়গায় একটা ছেলের সঙ্গে কি হয়েছিল তা বলে ফেলতেই বা কি এমন আটকাবে এমিলির! না, থাক। আর একদিন জিজ্ঞাসা করা যাবে, তার চেয়ে বরং দাদার কাছেই জানা যাবে সে এসব ব্যাপারে কোন খোঁজখবর রাখে কি না। যা আপনভোলা লোক কিছু খেয়ালই থাকে না। একবার সুযোগ সুবিধে মত দাদার কাণে তুলতে হবে কথাটা।

কথাটা অন্যভাবে তুলল রুমি, প্রসেনজিৎকে বলল, বৌদি যে গ্রাম দেখব গ্রাম দেখব ক'রে পাগল ক'রে তুলল। কি দেখবে গ্রামে?

প্রসেনজিৎ সামান্য হেসে বলল, কি জানি? আমাদের দেশের গ্রাম নাকি খুব সুন্দর।

ওখানকার গ্রাম তুমি দেখেছ তো?

দেখেছি। ওখানকার গ্রামগুলো খুবই সুন্দর। ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক, শহর যারা যেমন সাজাবে গ্রামও তারা তেমনি সাজাবে তো? আসলে ওখানকার মানুষই আমাদের দেশের লোকেদের চেয়ে উন্নত স্তরের।

তবে কি দেখবে বলত?

মানুষ কি শুধু পাহাড়ের ওপরই উঠে দ্যাখে? সমুদ্রের তলায়ও তো দ্যাখে ডুব দিয়ে? আসলে যাদের মনে কৌতূহল বেশী সবকিছুই তারা দেখতে চায়।

কৌতূহলের কারণ থাকে।

সমস্ত কিছুরই কারণ একটা থাকে। তবে কারণ অনেক সময়ই মানুষ তৈরী করে। কারণ যে কোন একটা তৈরী ক'রে নেওয়া যায়, দেখানোও যায়।

সে তো ঠিকই। কিন্তু আমি বুঝছি না যে এতকিছু থাকতে গ্রাম দেখবারই বা এত আগ্রহ কেন?

আবার হাসল প্রসেনজিৎ, বলল, কি জানি।

প্রসেনজিৎ-এর নিস্পৃহতা দেখে বেশ দমে গেল রুমি, কিভাবে যে প্রসঙ্গটা তোলা যায় সে ভেবেই পেল না। অথচ ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথা না বললে বুঝতেও পারছে না দাদা জানে কিনা। ওর দৃঢ় ধারণা প্রসেনজিৎ জানে না। প্রসেনজিৎ-এর অগোচরে তার ভালমানুষীর সুযোগ

নিয়ে এমিলি নিজের কার্যসিদ্ধি ক'রে যাচ্ছে। অমন শান্ত মুখশ্রী হলে কি হবে মেয়েটা আসলে বদমায়েস।

রুমি চুপ ক'রে আছে দেখে প্রসেনজিৎ বলল, মুস্কিল হয়েছে এই যে আমি তো কোন গ্রাম চিনিও না আর গ্রামে আমার কোন জানাশোনা লোকও নেই যে ওকে দু একটা গ্রাম দেখিয়ে দিই।

আবার কোন গ্রাম ও দেখতে চায় সেটা দ্যাখ —

কোন গ্রামই ও চেনেনা ও আবার দেখতে চাইবে কোনটা ?

তবু যদি কোন গ্রামের নাম ওর মনের মধ্যে থাকে ?

নেই। থাকলে আমি জানতে পারতাম। আসলে হয়েছে কি মেদিনীপুরের কল্যাণ জানা বলে এক ভদ্রলোক আর আমারই বন্ধুস্থানীয় বসীর এরা দুজনে মিলে নিজের দেশের প্রশস্তি গেয়ে এদেশটাকে স্বর্গ রাজ্য ক'রে তুলেছে এমিলির কাছে।

প্রসেনজিৎ-এর কথা শুনে রুমি বেশ দমে গেল। তার ধারণা ছিল প্রসেনজিৎ নিশ্চয়ই জানবে না এমিলির মনের গোপন কথাগুলো এবং কথাগুলো সুবিধেমত জানিয়ে বেশ চমক লাগাবে প্রসেনজিৎ-এর। কিন্তু হ'ল না। প্রসেনজিৎ উদার প্রশান্ততায় যা বলল তা রুমির নিজের জ্ঞানেরও বেশী। তাই রুমি বেশ কিছুটা হতাশ হ'লেও আত্মমর্যাদা রক্ষার অভিপ্রায়ে ব্যাগ্র হয়ে উঠল, বলল, ওদের কাছে শুনেই বৌদি এত ব্যস্ত হয়েছে ?

ওরা ওই রকমই। কিছু একটা মাথায় ঢুকল তো হ'ল। দ্যাখ না চাঁদে গিয়ে পৌঁছাবে মাথায় এল তো ঠিক পৌঁছোল। কোথায় না যাচ্ছে ওরা ? পৃথিবীতে পাহাড়ের জঙ্গলের দুর্গম কোন জায়গা যেতে ছাড়ে নি, সমুদ্রের তলায় তলায় ঘুরে বেড়ানো তো এখন ওদের অবকাশ মাত্র, আমাদের এপাড়া ওপাড়া যাওয়ার মত। এখন দৌড়োতে চাইছে গ্রহে গ্রহান্তরে।

রুমি ছেলেবেলায় একবার বক্সিং লড়াই দেখতে গিয়েছিল বাবার সঙ্গে। প্রচণ্ড বিক্রমে একজন এগিয়ে আসতেই অপরজন কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাকে ছিটকে ফেলে দিল মাটিতে। কিন্তু চোখের পলকে সে আবার মাটি থেকে উঠে যেই মারতে চেষ্টা ক'রল অমনি এমন এক ঘুষি সেই দ্বিতীয়জন আবার তাকে কষাল যে এবার একবারে চিৎপাৎ হয়ে পড়ে আর উঠতেই পারল না সেই প্রথম লোকটি। নিজেও ঠিক তেমনি অবস্থা উপলব্ধি ক'রল রুমি। প্রসেনজিৎ এবার তাকে নকআউট ক'রে দিয়েছে। এখন সে যে কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

যার সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল সে-ই তাকে এসে বাঁচাল শেষ পর্যন্ত। এমিলি এসেই রুমিকে তার দাদার সঙ্গে কথা বলতে দেখে প্রসন্ন হাসির আলোয় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, তোমাকে একটা জিনিস শোনাই। বলেই সে তার টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিতে রুমি শুনল ধ্যানে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা গানটার সুর বাজছে। এমিলি বলল, এই গানটা খুঁজছিলাম। আচ্ছা আমি আশ্চর্য হয়ে যাই তোমাদের

এমন সুন্দর সব গান রেডিওতে কখনই হয় না কেন ?

রুমি বলল, রেডিও প্রোগ্রামের কথা বাদ দাও। আজকাল একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। তা তুমি এই সুরটা কোথা থেকে তুললে ?

জবাব দিল প্রসেনজিৎ, আমরা যখন যাচ্ছিলাম একটা ব্যাণ্ড পার্টি এই গানটা বাজাতে বাজাতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস টেপরেকর্ডারটা সঙ্গে ছিল তাই এমিলি তার প্রিয় সুরটা খুঁজে নিতে পারল —

ও ভারী সুন্দর — এমিলি বলল।

প্রসেনজিৎ ঠাট্টা ক'রে বলল, আমার হয়েছে ঝঞ্ঝাট। বেড়াতে বেরোলেই টেপরেকর্ডার আর ক্যামেরা আমার ঘাড়ে চড়িয়ে দেবে।

মিথ্যে ব'লো না প্লীজ! ক্যামেরা আমি আমার হাতব্যাগেই নিয়ে নিই —

দুঃখিত, হেসে প্রসেনজিৎ বলল।

কখন কি দরকার হবে কে বলতে পারে বল ? — এমিলি সালিশ মানল রুমিকে।

রুমি তার জবাবে একটু ব্যঙ্গ ক'রল তাকে সূক্ষ্মভাবে, ছবি তো মনেও রাখতে পার —

মনে রাখলে তো আর দেখাতে পারব না কাউকে —

তা-ও পারা যায়।

রুমির কথা এমিলি আদৌ ব্যঙ্গবিদ্রূপ বলে ধরল না, সহজভাবেই নিল, বলল, মনের ছবি দেখাতে পারা যায় তবে সে ক্ষমতা আমার নেই শিল্পীদের আছে।

তাহলে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরতেই হবে আর কি উপায়, বলেই সমর্থন পাবার আশায় রুমির দিকে তাকাল প্রসেনজিৎ, কথাগুলোও তার দিকেই বলল।

রুমি বলল, কলকাতার রাস্তায় তোলবার মত ছবি কি আর থাকতে পা.র ?

মানুষ আগে যা দ্যাখে নি এখন দেখছে তাই তো নতুন ? নতুন কিছু দেখলেই তো মানুষ ছবি তুলে রাখতে চায় ?

হ্যাঁ, তা চায়।

আসলে মানুষ তার বিস্ময়কে ধরে রাখতে চায়। আমার চোখ তো কলকাতার চোখ, কিন্তু সাত বছর ধরে অনবরত যা দেখেছি সেই অভ্যস্ত চোখে কলকাতার বহু কিছু দেখছি নতুন। এমিলির আমেরিকার চোখে নিশ্চয়ই আরও নতুন লাগবে ? যেমন ধর এই ভিখিরি, এই নর্দমা থেকে ভাত খুঁটে খাওয়া, পথের ওপর মানুষ মরে পড়ে থাকা — এ সবই বিস্ময়কর নতুন।

বাস্তবিক বড় দুঃখজনক। সেদিন মড়া পোড়ানোর ওখানে গিয়েছিলাম, শ্মশান শব্দটা ভুলে গিয়েছিল এমিলি, রুমিই বলল, শ্মশানে গিয়েছিলে ? ক্যাওড়াতলা ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে দেখলাম কতগুলো মানুষ কি বীভৎস, মৃতদেহগুলোর

চেয়ে শীর্ণ জীর্ণ চামড়াঢাকা হাড়ের মানুষ। আসবার সময় দেখলাম ফুটপাতের ওপর অমনি একটা মানুষ মরে পড়ে আছে। শুধু কতগুলো মাছি এসে লোকটার মুখটা ঢেকে ফেলছে। কি দুঃখজনক বলত?

ওরকম কত মরছে রোজ কলকাতাতে — রুমি বলল, তারপর জিজ্ঞেস ক'রল, এসব ছবি তুলে তুমি কি ক'রবে?

কিছুই ক'রব না। কারণ আমি কিছু ক'রতে পারবও না।

তবে?

তবে কি জান আমিও তো একজন মানুষ — মানুষের এই অবস্থা দেখে—

ছবিগুলো শুধু অস্বস্তির কারণ হবে। ভাল কোন দৃশ্য বা ভাল কোন ফুলের ছবি তুলে রাখলে তবু মাঝে মাঝে দেখে আনন্দ পাওয়া যাবে —

প্রসেনজিৎ বলল, ওই যে বললাম, আশ্চর্য লাগে বলে তোলা।

হ্যাঁ ঠিক তাই। এমন আশ্চর্য অবস্থা জীবনে কখনও দেখিনি।

তোমাদের দেশে ভিখিরি নেই?

তোমরা ভিখিরি বলতে যা বোঝ তা কোথাও নেই।

প্রসেনজিৎ বলল, এখানে বড় অদ্ভুৎ এই যে মানুষের প্রতি মানুষের কোন সহানুভূতি নেই। তার ফলে কিছু মানুষের অবস্থা এখানে পথের কুকুরগুলোর চেয়ে খারাপ। দেখলে কষ্ট হয়। সত্যি বলতে কি আমার নিজেরই কেমন লজ্জা-লজ্জা করে।

রুমি মনে ক'রল এ কথা নেহাৎই বৌদির মন যোগানো জন্যে। নিজের লজ্জার কি আছে? দাদাটা এক মেম বিয়ে ক'রে এমন বৌমুখো হয়ে গেছে যে মাঝে মাঝে বড় বিরক্তি আসে রুমির। বৌদির হয়ে কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে এমনই বোকার মত ব্যবহার করে যে অত্যন্তই বিসদৃশ লাগে চোখে, ন্যাকামী মনে হয়! আসলে নিজের বোঝবার বুদ্ধির অভাবেই প্রসেনজিৎ-এর নরম মানসিকতার মল্যায়ণ ক'রতে পারে না রুমি। আসলে এ এক ধরণের ঈর্ষা পরায়ণতা। তার ধারণা এমিলি যা চায় ঠিক তাই করে প্রসেনজিৎ। এতে নিজের অজান্তেই এমিলির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে সে।

প্রসেনজিৎ রুমির প্রতি এতই স্নেহপ্রবণ যে সে রুমিকে ঠিক সেই সাত বছর আগেকার কিশোরী বলেই মনে করে। তার কথাগুলোকে সে কখনই পরিণত মানুষের উক্তি মনে ক'রতে পারে না। তার ফলে তার কথার যথার্থ অর্থ, যা অন্য প্রতিক্রিয়া ক'রতে পারত, তা না ধরে সরল অর্থে ধরে স্বচ্ছন্দ আনন্দে লঘুভাবে উড়িয়ে দেয় নিখিলের বায়ুতরঙ্গে। দর্শকের চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা প্রক্ষিপ্ত হয়ে যেমন দৃশ্যগত বস্তুর বিচার হয় চেতনার সান্নিধ্যে, তেমনি নিজের মানসিক সারল্যের প্রতিবিম্বে প্রসেনজিতের সমভাবী হয়ে থাকে রুমিও।

কিন্তু রুমির মানসিকতা সেখানে নেই বিদেশ যাবার সময় যেখানে তাকে

ছেড়ে গিয়েছিল প্রসেনজিৎ। কথাটা সে উপলব্ধি ক'রল আর একটু পরেই। সমস্ত আলোচনাটা নিজের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে বুঝেই রুমি হঠাৎ বলল, আচ্ছা দাদা এখানকার চেয়ে আমেরিকায় রিসার্চের কাজ তো নিশ্চয়ই ভাল হয়, তাই না।

বোধহয় তুলনাই হয় না, প্রসেনজিৎ মন্তব্য ক'রল।

ছোটদা যদি রিসার্চই ক'রবে তা'হলে ওকে আমেরিকাতেই যেতে বলছ না কেন ?

আমি তো কয়েকবারই লিখেছিলাম তাতে কোন জবাব দেয় নি। মাকে লিখেছিলাম, মার কাছ থেকেও সঠিক উত্তর পাইনি। এখানে ফিরে একদিন বললাম, তাতে বলল এখানেই বেশ ভাল কাজকর্ম হচ্ছে।

আজকাল তো এখানে যাচ্ছেতাই অবস্থা। আমাদের কলেজের একটা মেয়েকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। কিছুতেই ছাড়ছে না।

হ্যাঁ, এখানে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি সবই তো প্রায় বন্ধ।

আমাদের কলেজটাই যা চলছে। আর মাড়োয়ারীদের স্কুল-কলেজগুলো অবশ্য চলছে। ওগুলো বন্ধ হয় নি। জান দাদা, আমাদের ক্লাসে একটা মেয়ে আছে নকসাল করে।

নকসাল করে মানে ?

মানে নকসালপন্থী রাজনীতি করে। তাকে একদিন বললাম মাড়োয়ারী স্কুল-কলেজগুলোয় কোন ঝামেলা নেই কেন, তাতে সে বলল ওসব স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নকসাল পন্থায় উদ্বুদ্ধ করা যায় নি, সেইজন্যে ওসব জায়গায় কর্মী নেই।

সে তো স্বাভাবিক, প্রসেনজিৎ তার বিবেচনামত বলল, ওসব জায়গায় তো সব পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলেরা পড়ে, তাদের মধ্যে কম্যুনিস্ট মতবাদ ঢুকবে কি ক'রে ?

বাবা বলে আগেকার দিনে যেমন সাহেবদের স্কুল-কলেজ ছিল তেমনি হয়েছে এখন মাড়োয়ারীদের স্কুল-কলেজগুলো।

সে সব তো ইংরেজী স্কুল ছিল।

এখনকারগুলো হিন্দি স্কুল। বাবা বেশ বলে, হাসতে হাসতে রুমি বলল, বাবা বলে এরপর যারা ভাল স্কুলে ছেলে পড়াতে চাইবে সব হিন্দি মিডিয়ামে পড়তে পাঠাতে হবে।

এমিলি এসব কথায় কোন উৎসাহ পাচ্ছিল না, তাছাড়া কেক তৈরী ক'রতে ক'রতে রান্নাঘর থেকে চলে এসেছিল সে, সেই কাজটাই শেষ ক'রতে গেল।

সুপ্রীতি নিজে রান্নাঘরে বড় একটা যান না। দৈনন্দিন রান্না যা প্রয়োজন বাবুর্চিকে ডেকে সকাল বেলাতেই নির্দেশ দিয়ে রাখেন, তাকে সাহায্য করে রান্নাঘরের ঝি সরলা। মোটামুটিভাবে সরলাই হচ্ছে সারাদিনের জন্যে বাবুর্চি আর সুপ্রীতির মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম। তা ছাড়াও একটা কাজ সরলা করে — বাড়ীর কোণে বারান্দাঘেরা ঘরে পড়ে থাকা বৃদ্ধার রান্না। বাংলা ভাষাটা ভাল ক'রে বলবার মত শেখবার পর এমিলি আবিষ্কার ক'রেছে বৃদ্ধা প্রসেনজিৎ-এর বাবার মা। কল্যাণ-এর বলা এক রূপকথার-খনি। দুপুরবেলার নিভৃতিতে নিঃশব্দে গিয়ে সে যেদিন প্রথম হাজির হয়েছে তাঁর কাছে তার আগেই জেনেছে তাঁর পরিচয়। তাই তাঁর ঘরের দরজা পেরিয়েই মাটিতে উপুড় হয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রেছে বৃদ্ধাকে, তিনি তখন মগ্ন ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়। সরু ফ্রেমের চশমাটা চোখে দিয়ে পড়ছিলেন, — পুত্রদারাদিতে আসক্তি ত্যাগ, পুত্রাদির সুখদুঃখাদিতে আপনাকে সুখী বা দুঃখী না করা, ইষ্ট ও অনিষ্ট এই উভয়ের লাভে সর্বদা সমচিত্ততা, সর্বভূতে সমদৃষ্টি দ্বারা অব্যভিচারিণীভক্তি, চিত্তপ্রসাদকর নির্জন স্থানপ্রিয়তা ও সাধারণ লোক-সমাজে বিরাগ. অধ্যাত্মজ্ঞানের নিত্যত্ব — এই কুড়িটি বিষয় ব্যতীত সকলই অজ্ঞান —। পাঠের শেষ দিকটা গোলমাল হয়ে গেল ঘরে কেউ একটা ঢোকায়। চেয়ে দেখল এমিলি প্রণাম ক'রছে। আগেও অনেকবার এসেছে মেয়েটি, দূর থেকে দেখে জোড় হাত ক'রে নমস্কার ক'রে চলে গেছে — ভারী সুন্দর মেয়েটি। খুবই ভাল লাগে তাঁর। খাঁটি মেম, গায়ের রঙে সে দেশের প্রলেপ এখনও মোছেনি কিন্তু এরই মধ্যে কেমন শাড়ী পরে সিঁদুরের টিপ পরে সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে দুর্গা প্রতিমার মত সেজেছে। মাথায় লম্বা, রুমি-টুমির চেয়ে লম্বা, একটু বেশীই লম্বা হয়ত বা, যাকে বলে ঢ্যাঙ্গা মেয়ে, কিন্তু তবু এতটুকু বেমানান মনে হয় না। মুস্কিল এই যে কথা বলতে পারে না, তাই মিশতেও পারে না। ওর ভাষা যারা বলতে পারে সেই রুমির সঙ্গে, বৌমার সঙ্গে দিব্যি কথা বলে। তা আজকে হঠাৎ চৌকাঠ পার হয়ে এল কেন? এভাবে প্রণামই বা ক'রছে কেন? এভাবে প্রণাম তো আজকাল আর কেউ করে না। এ তো উঠেই গেছে। আজকাল প্রণাম করারই চল নেই তায় আবার গড় হয়ে। গড় হয়ে প্রণাম করা ছিল তাঁদের কালে, ছেলেবেলায়। মনে আছে বিয়ে হয়ে এসেছিলেন যখন এইভাবেই প্রণাম ক'রেছিলেন শ্বাশুড়ীকে কাঁচা মাটির উঠোনে মাথা ঠেকিয়ে, মাথা ঠেকিয়ে প্রতি পায়ে। শুধু তিনিই নন পরীক্ষিতের বাবা-ও একই ভাবে প্রণাম ক'রেছিলেন মা-কে, বাবাকে, এখন প্রত্যেকের কথা মনে নেই সব গুরুজনকে। তবে একটা কথা মনে আছে গ্রামের এক রাঙাপিসিমা ছিলেন তাঁকেও প্রণাম ক'রেছিলেন সেদিন। সে কি আজ! দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল দিনগুলো, বছরগুলো। সে প্রায় — হিসেব ক'রে দেখলেন ঠাকুমা — ষাট বছরের বেশীই হবে, তখন তাঁর বয়েস ছিল চোদ্দ।

আজকাল তো সে সব প্রণাম নেই। প্রণামই নেই। বৎসরান্তে একবার প্রণাম ক'রতে আসে পরীক্ষিৎ — বিজয়ায়। ছেলেমেয়েরাও আসে। সবশেষে আসে বৌমা, সুপ্রীতি। তবে সেই বাৎসরিক প্রণামেও কারও আন্তরিকতা থাকে না, প্রথা রাখতে আসা। একমাত্র পরীক্ষিৎকে মনে হয় ঠিক নিয়ম রাখতে নয়, কর্তব্য ক'রতেই এসেছে। একটু তফাৎ থাকে। কিন্তু আজ এই মেয়েটা — ওদের দেশের কোন পালাপার্বনের দিন নাকি আজ? নাকি আজ কোন বিশেষ দিন? হয়ত বা বিয়ের দিন হবে? ওদের দেশে নাকি বিয়ের দিনটাকে খুব গুরুত্ব দেয় পরীক্ষিৎ-এর বাবাই সব দেশ-বিদেশের গল্প বলে শোনাতেন তাই শোনা। তবে ওদেশে যে এমনি ক'রে প্রণাম করে তা তো কখনও শোনেন নি! বরং শুনেছেন ওদেশের লোকেরা দেখা হলে হ্যাণ্ডসেক না কি যেন করে। সে যাই করুক আর দিন তিথি আজ যা-ই হোক মেয়েটা যখন এরকম ক'রে প্রণাম ক'রছে তখন আশীর্বাদও তো ক'রতে হয়। হাত নেড়ে কাছে ডাকতেই দু'পা এগিয়ে তাঁর হাতের নাগালের মধ্যে এল মেয়েটি। অমনি তার চিবুক ছুঁয়ে হাতটা মুখে ঠেকালেন ঠাকুমা, অস্ফুট স্বরে বললেন, বেঁচে থাক দিদি, রাজেশ্বরী হও, দীর্ঘজীবী হও।

সব শব্দের সঙ্গে ভালভাবে পরিচয় হয় নি এখনও, অধিকাংশই জানা নেই তাই কথাগুলো সব বুঝল না এমিলি কিন্তু শব্দগুলোয় অথবা বলার মধ্যে অথবা ঠাকুমার সংস্পর্শে কি অদ্ভুত এক মাদকতা ছিল যা তাকে শিহরিত ক'রল। সে কল্যাণের কাছ থেকে জেনেছিল, এ দেশের বৃদ্ধাদের ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার থাকে, সব সময় স্পর্শ পছন্দ করেন না, তাই সন্তর্পণে দূর থেকে প্রণাম ক'রছিল সে, কিন্তু ঠাকুমা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে স্পর্শ করায় তার সারা শরীর রোমাঞ্চিত এবং মন পুলকিত হল নিমেষেই। সে সঙ্গে সঙ্গে দুই পায়ে প্রণাম ক'রল। বৃদ্ধাও এমিলির মাথাটি নিজের কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন তার মাথায়। তারপর পরম বিস্ময়ে শুনলেন তাঁর কোল থেকে মাথা তুলে এমিলি বলছে, আপনি তো আমাদের দিদিমা।

ঠাকুমা, সংশোধন ক'রে দিয়ে বৃদ্ধা বললেন, ওই হ'ল। ঠাকুমা-দিদিমা প্রায় একই। বাবার মা হয় ঠাকুরমা, মায়ের মা দিদিমা।

এমিলি বলল, আমি আপনাকে অনেকদিন দেখি। কথা বলতে জানি না —

এই তো বেশ জান —

এখন জানি আগে জানি না।

পরমানন্দে হাসলেন ঠাকুমা, বললেন, আগে জানতে না। এখন তো খুব সুন্দর শিখেছ। আমাকে তোমার ভাষাটা — আর কবে শিখব? এখন যে দেশে যেতে হবে সেই দেশের ভাষা শিখতে হবে —

কোথায় ঠাকুমা? এমিলি বুঝতে না পেরে জানতে চাইল।

ঠাকুমা ওপরের দিকে হাত তুলে দেখালেন, বললেন, স্বর্গে।

সর্গে — শব্দটা উচ্চারণ করবার চেষ্টা ক'রল এমিলি, অর্থ বুঝল না।

ঠাকুমা সেটা বুঝে বললেন, ভগবানের কাছে।

ও — হেভেন — স্বর্গ বোঝবার আনন্দে এমিলি বলে উঠল। স্বর্গ শব্দটা মনে মনে বার কয়েক আউড়ে নিল, অর্থটাও।

কি ভাষা ঠাকুমা ?

সে-দেশের ভাষা। কিন্তু কি যে সেই ভাষা সেটাই তো জানি না। বৃথাকাজে জনম গেল মা কিছুই শিখতে পারলাম না।

যে দেশ অজানা তার ভাষা কি ক'রে জানা যাবে ঠাকুমা ?

অজানা তো নয় মা — শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম সেই তো স্বর্গ। অখণ্ড স্বর্গ।

'শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম' 'অখণ্ড স্বর্গ' প্রভৃতি শব্দগুলো একেবারেই অপরিচিত হওয়ায় এমিলি সেগুলোর বিন্দুমাত্র বুঝল না। কিন্তু না বুঝলেও সে তাঁর কথায় সায় দেবার ভঙ্গীতে ওপরে নিচে ঈষৎ মাথা নাড়তে লাগল। তবু তার মুখ দেখে অসহায়তা স্পষ্ট হচ্ছিল। তাই ঠাকুমা বললেন, তোমাদের দেশে যে কি বলে তা তো জানি না দিদি —

কাকে যে কি বলে কিসের কথা যে ঠাকুমা বলছেন কিছুই ধরতে পারল না এমিলি। তার বোঝা এবং জবাব দেওয়া সবই আন্দাজে চলতে লাগল।

ঠাকুমাও বোধহয় সেটা উপলব্ধি ক'রছিলেন তাই আসঙ্গবি সংলাপের মাঝখানে তিনি খাপছাড়া ভাবেই বললেন, তোমার দাদু তো নেই, তিনি থাকলে তোমার খুব সুবিধে হ'ত। খুব পণ্ডিত ছিলেন তিনি। তোমাদের ভাষা খুব ভালভাবে জানতেন। সব ছেলে ইংরিজি শিখতে আসত। সারাদিনই তিনি পড়াতেন আর নিজে পড়তেন। তিনি ছিলেন হেডমাস্টার। সারাজীবন শুধু ছেলে মানুষ ক'রেছেন। আমারও খুব ভাল ছিল, নিজের ছেলে তো বড় হয়ে শহরে পড়তে চলে এল কিন্তু যতদিন উনি ছিলেন নিত্য নতুন ছোট ছোট ছেলেতে ভর্তি থাকত আমাদের বাড়ী।

এমিলি লক্ষ্য ক'রল স্মৃতিকথা বলতে বলতে বৃদ্ধা খুব হ্লাদিতা হয়ে উঠছেন। তারও সেই স্মৃতিচারণ শুনতে বেশ ভাল লাগছিল, তাই সে ঠাকুমাকে উস্কে দিল, আপনি কি সহরে থাকতেন না ঠাকুমা ?

না দিদু তোমার দাদু যদুপুরের ইস্কুলে মাস্টারী ক'রতেন। বর্ধমান জেলার অনেক ভেতরে সেই যদুপুর। এখন কেমন হয়েছে জানিনা আমরা যখন ছিলাম তখন সাতক্রোশের মধ্যে ওই একটাই ছিল ইস্কুল। দূরের গাঁয়ের ছেলেরা এক হাঁটু ধুলো মেখে, মুখ গড়িয়ে ঘাম ঝরছে, স্কুলে আসত। স্কুলের সঙ্গেই ছিল আমাদের ঘর। আমি জানলায় দাঁড়িয়েই সব দেখতে পেতাম। কোন ছেলে খুব জোরে কাঁদলেও শুনতে পেতাম। গ্রীষ্মকালেই বেশী কষ্ট হ'ত ছেলেদের, তোমার দাদু কিছুতেই ছুটি দিতে চাইতেন না, আমি চোত মাস থেকেই খালি বলতাম ছুটি দিয়ে দাও। ছেলেগুলো এতদূর থেকে আসে দেখে

আমার কষ্ট হয়। তোমার দাদু বলতেন, তোমাকে তো তাও ইস্কুলে আসতে হচ্ছে না, তা হ'লে তো দেখছি একদিনও আসতে না। লেখাপড়া শিখতে হলে কষ্ট ক'রতে হয়। ছুটিই দিয়ে দেব তো পড়াটা হবে কবে? — এক এক দিন বলতেন, তুমি মাস্টার হ'লেই তো ইস্কুলটা খুব চলত দেখছি। আমি তার উত্তরে বলতাম, না চললে না চলত তাই বলে এইসব ছোট ছোট ছেলের কষ্ট চোখে দেখা যায় না। — কর্তা আবার বলতেন, এখন কষ্ট মনে মনে হচ্ছে পরে এটাই সুখের হবে। এখন কষ্ট না ক'রলে পরে যে কষ্টে পড়তে হবে —!

দাদু ছাত্রদের খুব ভালবাসতেন? — এমিলি ঠাকুমার কথাগুলো মনযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস ক'রল।

ঠাকুমা স্মৃতিচারণ ক'রতে খুব আনন্দ পাচ্ছিলেন। সেই আনন্দ তাঁর মনের মধ্যে কলস্বনা স্রোতস্বিনীর মত অলক্ষ্যে বইছিল। এমিলি যথাসময়ে উপযুক্ত প্রশ্ন করায় বিবধিত আনন্দে বললেন, খুবই ভালবাসতেন। নিজের ছেলের সঙ্গে ছাত্রদের আলাদা ক'রে দেখতেন না। কোন খারাপ ছেলে ইস্কুলে থাকলে সে যেসব কাজ ক'রত তার জন্যে বাড়ীতে ফিরেও বারবার সেইসব কথা বলতেন, যেন নিজেই অনুতাপ ক'রছেন। ওঁর দুঃখ দেখে কি বলব আমারই খারাপ লাগত। বলতাম, তোমার এত চিন্তা করবার কি আছে? — শুনতেন না। আর সেই এক কথা রোজ শুনতে শুনতে আমার কাণ ব্যাথা হয়ে যেত।

এমিলির ভারি মজা লাগছিল কথাগুলো শুনতে। সে জানতে চাইল, শেষকালে কি ক'রতেন?

ছেলেটিকে যদি নিতান্তই বসে আনতে না পারতেন তাহ'লে তার বাবাকে ডেকে এনে বলেদিতেন, তোমার ছেলেকে ইস্কুল থেকে নিয়ে যাও, ওর পড়াশোনা হবার নয়।

নিয়ে যেত? — এমিলি জানতে চাইল।

তখনকার দিনে যেত। এক কথাতেই নিয়ে যেত। দুএকজন একটু অনুরোধ উপরোধ ক'রত কিন্তু ওঁর কথা অমান্য কেউ ক'রত না।

আপনাদের বাড়ীটা খুব সুন্দর ছিল, তাই না?

না মা। বাড়ী ছিল না। একখানা ঘর, এমনি ইঁটের দেয়াল, মাথার ওপরে ছাদ ছিল না খড়ের চাল ছিল।

খড় কি ঠাকুমা?

ঠাকুমা মুস্কিলে পড়লেন। 'খড়' বোঝাবেন কি ক'রে? চারপাশে তাকাতে লাগলেন তারপর ভাবলেন ঘর ঝাঁট দেওয়ার ঝাঁটাটা দিয়ে বোঝাবেন খড় কি জিনিষ। কিন্তু তাও হ'ল না। ঝাঁটা এ ঘরে নেই। যাই হোক উপায়ন্তর না দেখে বললেন, সে তুমি না দেখলে তো বুঝতে পারবে না দিদিভাই — সে একরকম ঘাসের মত গাছ যা দিয়ে ঘর ছাওয়া হয়।

এমিলি বুঝবে কি তার কাছে 'ছাওয়া' ব্যাপারটা। আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠল মনের মধ্যে জিনিষগুলো বোঝবার গভীর আকুতি অথচ বোঝা যাচ্ছে না এই দুই-এর টানাপোড়েনে মন উচাটন হয়ে রইল। সেই অস্বস্তিকর অনুভূতিকে চাপা দেবার জন্যে এমিলি জানতে চাইল, সেই ঘরের সঙ্গে বাগান ছিল? নানা রকম ফলের বাগান?

. ঘরের সঙ্গে বেশ খানিকটা জায়গা ছিল। দুটো আমের গাছ, একটা জাম গাছ, কলা গাছ — মনে করার চেণ্টা ক'রে বলতে লাগলেন ঠাকুমা। শেষে বললেন, হ্যাঁ অনেকগুলো গাছ ছিল। তোমার ঠাকুর্দা তো সময় পেতেন না আমিই গাছপালা লাগাতাম। গ্রামেরই একটা ছেলে ইস্কুলে কাজ ক'রত, খুব ভাল ছেলেটি, আমাকে মা বলে ডাকত আর আমি গাছপালা ভালবাসি দেখে কোথায় কোথায় থেকে সব নানারকম গাছের চারা এনে দিত।

এখনও তো সেইসব গাছ আছে?

থাকবে তো নিশ্চয়ই।

আচ্ছা ঠাকুমা অনেক পাখি আসত সেইসব গাছে?

তা তো আসতই। আমাদের ঘরের গায়েই একটা তালগাছ ছিল, তাতে থাকত বাবুই। অনেক বাবুই-এর বাসা ছিল তাতে, সারি সারি ঝুলত। মাঝে মাঝে সেইসব বাসার ওপরে বসেই ঝুলত দুএকটা বাবুই। পরীক্ষিৎ ছোট ছিল, ঢিল ছুঁড়ত। ওর বাবার চোখে পড়তে একদিন ওকে ডেকে নিয়ে কি যে বোঝালেন জানি না, জীবনে আর কোনদিন ওই ছেলেকে ঢিল ছুঁড়তে দেখি নি।

এত সব মজাদার কথা একসঙ্গে ঠাকুমা বলে যেতে লাগলেন যে এমিলির মনে প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন ভাবের সঞ্চার হতে লাগল। ফলে তার চোখে মুখে ফুটে উঠতে লাগল নানারকম অভিব্যক্তি। আজকের এই গম্ভীর মানুষ পরীক্ষিৎ-এর ছেলেবেলা যেমন মজাদার ঠিক তেমনি মজাদার বাবুই নামক পাখি। সে কোনটার কথা যে জিজ্ঞেস ক'রবে ভেবে উঠতে পারল না। তবে বাবুই পাখি যে কি রকম সেটা জানা বিশেষ দরকার। আবার অমন জাঁদরেল মানুষের ছেলেবেলার ঢিল ছোঁড়ার ব্যাপারটাকেও গুরুত্ব না দিয়ে পারা যায় না। যাইহোক অবশেষে পাখিকেই গুরুত্ব দিয়ে জানতে চাইল, কি যে পাখি বলছেন ঠাকুমা সে কি রকম?

ওমা! তুমি বাবুই পাখি জান না? তোমাদের দেশে নেই বুঝি? ঠাকুমা অবাক হলেন।

আসলে বাবুই নামটা সমস্যা ছিল না পাখিটা যে কিরকম সেটা জানতে পারাই ছিল সমস্যা। সেটা জানতে পারলেই না বুঝবে ওদের দেশে সে পাখি আছে কি নেই। কিন্তু ঠাকুমার পক্ষেই বা বোঝানো কি ভাবে সম্ভব? সম্ভব যে নয় তাও বুঝেছিল এমিলি কিন্তু মনটা বোঝার জন্যে আকুলি বিকুলি ক'রছিল বলেই ভেতরে ভেতরে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল সে খুব বেশী পরিমাণে।

তাই ঠাকুমার কথার জবাবে অসহায়ভাবে দুহাত নেড়ে সে বলল, আমি জানি না ঠাকুমা। সে পাখি কি রকম আমি বুঝি না।

তখন ঠাকুমা নিরুপায় হয়ে বোঝাতে চেষ্টা ক'রলেন, খুব ছোট পাখি। — হাতের পাঁচটা আঙুলের সাহায্যে বোঝাতে চাইলেন সেটা কত ছোট। কিন্তু শুধু বোঝালেই তো হবে না, তাই বললেন, ওই যে চড়াই পাখি দ্যাখ না? ওই রকমই দেখতে, রঙটা একটু যা আলাদা।

ঠাকুমার বর্ণনা শুনে বাবুই বোঝার ব্যর্থ চেষ্টায় ইস্তফা দিয়ে এমিলি জানতে চাইল, সেই সুন্দর বাসা এখনও আছে ঠাকুমা?

কি জানি দিদি, সে তো অনেকদিনের কথা, তবে আছে নিশ্চয়ই নইলে কোথায় আর যাবে?

আমাকে একবার দেখাবেন ঠাকুমা?—শিশুর মত আবেদন জানাল এমিলি।

তোমাকে? — ঠাকুমা স্নিগ্ধ হেসে জানতে চাইলেন, তারপর বললেন, কি ক'রে দেখাব দিদু?

কেন চলুন না একদিন। সেন-কে বলব আমাদের নিয়ে যাবে?

সেখানে কি দেখবে বোন? কিচ্ছু নেই সেখানে, যাকে বলে অজ গাঁ। নির্বাসন।

'অজ গাঁ' এবং 'নির্বাসন' —দুটোর একটাও বুঝল না এমিলি, শুধু জিজ্ঞেস করল সেখানে গাছ নেই, ঘন সবুজ গাছ? পাখি নেই, নানা রঙের পাখি? ওই যে কি পাখি বললেন তাদের বাসা নেই 'টাল' গাছে?

সে সব তো আছেই। কিন্তু তাতে দেখবার কি আছে?

আচ্ছা ঠাকুমা ওখানে মেয়েরা সব পুকুরে স্নান করে? সন্ধ্যেবেলা প্রদীপ জ্বেলে দেয় দরজায়?

মেমবউ-এর কথা শুনে খুবই পুলকিত হলেন ঠাকুমা। জানতে চাইলেন, এত কথা তুমি জানলে কি ক'রে?

আমি সব জানি ঠাকুমা — স্বপ্নে দেখা দৃশ্যের মত বলে যেতে লাগল এমিলি, ছোট ছোট মাটির বাড়ী আছে সব। মাঝখানে ফাঁকা চারপাশে ঘর। বাড়ীর সবাই ঘরগুলোয় থাকে — মা বাবা বোন ভাই বউরা ছেলেমেয়েরা —

ওমা! স্বগতোক্তির মত ঠাকুমা বললেন, তুমি কি কখনও গ্রামের বাড়ী দেখেছ?

না ঠাকুমা। দেখতে খুব ইচ্ছে করে।

তবে এত কথা জানলে কি ক'রে?

এদেশের ছেলেরা যারা আমাদের দেশে থাকে, তারাই গল্প করে।

ঠাকুমা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, এদেশের ছেলেরা শুনে তিনি বললেন, দেশের ছেলেরা আজকাল গ্রামে কেউ যেতেই চায় না। পরীক্ষিৎ কলকাতাতেই হস্টেলে থেকে কলেজে পড়ত, বাড়ীতে গেলেই কেবল পালাই পালাই ক'রত

একটা দিনও থাকতে চাইত না। একবার ওর এক বন্ধু গিয়েছিল গ্রামে, সারাটা দিন বেশ এখানে সেখানে ঘুরল বেড়ালো, পুকুরের ধারে বসে সারা বিকেল মাছ ধরল এক ছাত্রের ছিপ দিয়ে, কিন্তু সন্ধ্যে হতে যে-ই না শিয়ালের ডাক শোনা আর ছেলে নড়ে বসবে না। চারিদিকে অন্ধকার কিছুতেই ঘরের বাইরে সে পা দেবে না। জীবনে কোনদিন কলকাতার বাইরে পা দেয়নি যে ছেলে তার অবস্থা তো ওরকম হবেই। কত বুঝিয়ে সুঝিয়ে অনেক কষ্টে সে রাতে তো তাকে ঘুম পাড়ালাম, সকালে উঠেই ছেলে বলে, চলে যাব। সেই যে চলে আসবার ঝোঁক ধরল আর রাখা গেল না। পরীক্ষিৎ কত বলল আর একটা দিন থাকতে কিছুতেই রাজী হ'ল না ছেলেটি। শেষকালে সেই দিনই তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে এল পরীক্ষিৎ। এই তো সব গ্রাম দেখা আজকালকার ছেলেদের।

ঠাকুমার গল্পটা উপভোগ ক'রল এমিলি। খুব একচোট হাসল। তারপর জানতে চাইল, শেয়াল কেমন ডাকে ঠাকুমা? খুবই জোরে ডাকে, ভয় পাবার মত?

আগে খুবই ডাকত, মনে হ'ত ডাকতে ডাকতে ঘরের পাশে জানালার ধারে চলে এসেছে। শেষের দিকে আর অত শোনা যেত না। শেয়াল যেন দেশ থেকে চলে গেল সব। হয়ত মরেই গেল।

কেন ঠাকুমা, মরে গেল কেন? —এমিলি দুঃখিত কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রল।

মানুষ বেড়ে যাচ্ছে জন্তু জানোয়াররা আর কোথায় থাকবে বল? আমার বাপের বাড়ী যে গ্রামে ছিল আমাদের সেই গ্রামে নদীর ধারে ছিল নলখাগড়ার বন। নদীর ধার ধরে বরাবর ঘন বন ছিল। গ্রামের পাশেও একটা পড়ো গ্রাম ছিল মধুপুর বলে, সেখানে ছিল ঘন জঙ্গল। সেই সব বন জঙ্গলে বড় বড় দাঁতাল শুয়োর, ছোট বাঘ প্রচুর থাকত। শুয়োরগুলো তো দিনের বেলাই ঘুরে বেড়াত রাস্তার ধারে ধারে আর প্রত্যেক রাতেই বাঘ এসে কারো গরু কারো ছাগল কারো কুকুর ধরে নিয়ে গিয়ে ঝোপে ঝাড়ে বসে খেয়ে ফেলত।

ঠাকুমার গল্পে সভীতি বিস্ময় এমন এক রোমাঞ্চকর পুলকের সঞ্চার করছিল যার জন্যে চোখের গোলক বড় হয়ে গেল। গল্প শুনতে শুনতে সে শুধু উচ্চারণ ক'রল, বাঘ! টাইগার! আপনি দেখেছেন?

খুব ছোট বেলায় তো বিয়ে হয়েগিয়েছিল আমার, তখন আমার বয়েস চোদ্দ বছর। বাঘ আমি দেখিনি তবে রোজই শুনতাম বাবা বা দাদারা বাড়ী এসে বলতেন আজ কমোর পাড়ায় বাঘ এসে একটা বাছুর নিয়ে গেছে, একদিন শুনলাম খুদু ভট্‌চাযের কালো গরুটা নিয়ে গেছে বাঘ, পরের দিন খুঁজে মরা গরুটাকে পাওয়া গেছে গ্রামের বাইরে শেরপুরের ঝোপের মধ্যে।

তখন কি হ'ত?

কি আর হবে? মরা গরুর চামড়া অনেক সময় গিয়ে ছাড়িয়ে আনত কান্ত মুচি। অনেক সময় বাঘের ভয়ে সে-ও যেত না। বাঘ অবসর মত এসে বসে বসে গরুর হাড় মাংস চিবোত।

মানুষ মারত না বাঘে ?

না। ওসব বাঘ মানুষ-খাওয়া নয়। মানুষ খেকো বাঘ ওদিকে ছিল না।

আপনাদের বাবার গ্রামে সেইসব বাঘ এখনও আছে ঠাকুমা ?

আমি তো অনেক দিন সেখানে যাইনি গত চল্লিশ বছর। তবে শুনেছি সেসব জঙ্গল আর নেই। জঙ্গল না থাকলে জন্তু জানোয়ারই বা কোথায় থাকবে ?

যাননি কেন ? আমার তো এরকম গ্রাম থাকলে আমি যেতাম।

কোথায় যাব আর কার কাছেই বা যাব ? আমার দুই দাদার একজন তো অল্প বয়সেই সাধু হয়ে কোথায় চলে গেছেন কেউ জানে না, আর এক দাদার ছেলেরা কেউ আর গ্রামে নেই। একজন দিল্লীতে আছে অন্যজন আছে শিলিগুড়ি।

গ্রামে কে আছে ?

আমাদের আর কেউ নেই।

সব কি বাঘের জন্যে চলে গেছে ?

ঠাকুমা প্রীত হাসি মিশিয়ে বললেন, না না। আমাদের গ্রাম তো পাকিস্থান হয়ে গেল, তাই সব চলে আসতে হয়েছিল ঘর বাড়ী ছেড়ে। এখন আবার বাংলাদেশ হয়ে গেছে।

বাংলাদেশ হয়ে গেছে শুনেই এমিলির মনে পড়ল বসীর-এর নাম। বসীর বলত তার বাড়ী পূর্ববাংলা। একদিন একজন বলেছিল পূর্বপাকিস্থান, সঙ্গে সঙ্গে বসীর বলেছিল, আমি পূর্ববাংলা বলতেই বেশী ভালবাসি। তারপর হঠাৎ একদিন নতুন ইতিহাসের আনন্দে বসীর বন্ধুবান্ধব সকলকে ডেকে খুব খাইয়ে বলল, গতকাল থেকে আমার দেশের নাম বাংলাদেশ। এবার একবার দেশে যেতে হবে।

কল্যাণের সঙ্গে একটা বিষয়ে খুব মিল ছিল বসীরের, সে দেশপ্রেম। তবে স্বতন্ত্র ধরণের দেশপ্রেম দুজনের। বসীরের দেশপ্রেম ঝাঁজাল, উগ্র, পৌরুষময় কিন্তু কল্যাণের প্রেম নেহাৎই কাব্যিক হৃদয়ের অনুভূতি, মমত্ববোধ, আদুরে ছেলের মাতৃ-অনুরাগের মত। কল্যাণের নিশ্চেষ্ট ভালবাসা — আর ভালবাসার জন্যে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে থাকা মাত্র। অবশ্য কল্যাণের চরিত্রই ছিল অমনি, শান্ত-সমাহিত-লালিত্যময়। কোন উচ্ছলতা এবং উজ্জ্বলতা কোথাও ছিল না তার। নদীর মত প্রশান্ত সে, পাহাড়ের মত গম্ভীর — গভীরতা সমুদ্রের মত। কাজেই তার প্রেম আবেগশূন্য, প্রণয় সম্ভাষণশূন্য, হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বাসশূন্য।

বসীর থেকে কল্যাণ আবার কল্যাণ থেকে বসীর এবং বসীর থেকে বাংলাদেশ-এ চিন্তাটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এমিলির সব গুলিয়ে গেল। যে বাংলাদেশে বসীরের বাড়ী সেখানেই বাড়ী ছিল ঠাকুমারও। তবে ঠাকুর্দার ? এমিলি জানতে চাইল, ঠাকুর্দার সঙ্গে যে গ্রামে থাকতেন সে গ্রামও বাংলাদেশে ?

না সেটা তো বর্ধমানে।

বাংলাদেশ বা বর্ধমান কোনটা সম্বন্ধেই কোন ধারণা এমিলির নেই বলে সে চুপ করে রইল। তারপরই জিজ্ঞেস ক'রল, তবে?

ঠাকুমা এমিলির প্রশ্ন আন্দাজ ক'রে বললেন, তোমার দাদুর আসল দেশ ছিল আমাদের গ্রামের কাছেই। বর্ধমানে মাস্টারী ক'রতেন, দেশে আর কোনদিন যান নি। আমিও যাইনি। তখনকার দিনে বর্ধমানের গ্রাম থেকে পূর্ববাংলার গ্রামে যাওয়া অনেক ঝামেলার ব্যাপার ছিল বলেই যাওয়া আর হয়ে উঠত না। তা ছাড়া তোমার দাদুর প্রাণ ছিল ওই ইস্কুল। একবেলা না খেয়ে থাকতে পারতেন একদিন ইস্কুলে না গিয়ে থাকতে পারতেন না। কাজেই ইস্কুল ছেড়ে কোথাও যাবার কথা সারাজীবনেও ভাবেন নি তিনি।

আপনি?

আমি আলাদা ক'রে কি ভাবব মা? রাজনন্দিনী সীতা তিনিই যদি রাজ্য ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে বনবাসী হতে পারেন তো আমাদের মত সাধারণ মেয়ে স্বামীর সঙ্গ ছেড়ে কোন স্বর্গে যেতে চাইবে? — বলেই ঠাকুমা হাতের কাছ থেকে রামায়ণখানা খুলে নিয়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন, এই দেখ সীতা বনবাসে যাবার সময় বলছেন, স্বামীর সঙ্গে বাস করবার সময় বনই আমার কাছে অযোধ্যা বলে মনে হবে। স্বামীর সঙ্গই স্বর্গ, স্বামী যদি না থাকেন তবে রাজসভাও নরকতুল্য।

ঠাকুমা রামায়ণ থেকে সীতার বনবাসকালীন বক্তব্যটুকু পড়েই বইটা মুড়ে রাখলেন। এমিলির পক্ষে ওই ব্যাঞ্জনাই যথেষ্ট ছিল। তার কথার জবাব পেয়ে সে বলল, ঠাকুমা এক কবি সত্যিই বলেছিলেন 'ইস্ট ইজ ইস্ট এণ্ড ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট, নেভার দি টুইন শ্যাল মিট।'

ইংরিজি শুনে ঠাকুমা বললেন, আমি তোমাদের ইংরিজি যে কিছুই বুঝি না দিদি —

ওঃহো ভুল সংশোধন করার মত এমিলি বলল, আমি দুঃখিত। আমি বলছিলাম এদেশের মেয়েদের সঙ্গে কি দারুণ তফাৎ আমাদের দেশের! এ পার্থক্য কোনদিনই দূর হবে না!

কেন মা, মানুষ সব দেশেই বোধহয় এক। এই যে তুমি দেশ ঘর বাপ মা ছেড়ে এলে এও কি সীতার দেশত্যাগ হ'ল না?

এমিলি মনে মনে ভেবে বলল, না ঠাকুমা। এক নয়। সীতার যে আদর্শ যে জীবনধারা সে আমাদের দেশের মেয়েরা পাবে না, তা পেতে পারে এই দেশের মেয়েরাই যাদের মধ্যে আছে সেই মহান নারীর উত্তরাধিকার। আমার কাকা আছেন, তিনি খুব ভাল জানেন, তিনি একদিন এদেশ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে গিয়ে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের মানুষ ত্যাগে অভ্যস্ত। আমাদের যেমন ঐশ্বর্যে বৃহত্ব আছে ওদের তেমনি আছে ত্যাগের মহত্ত্ব।

তোমার কাকা কি করেন?

তাঁর ব্যবসা আছে।

তিনি কি এদেশে কখনও ছিলেন?

না। এইবার আসবেন।

তাহ'লে এত জানলেন কি ক'রে?

এদেশ সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান তাঁর। তাঁর একমাত্র সখ ভারতবর্ষ আর দূর প্রাচ্য সম্বন্ধে পড়াশোনা করা। অফিসের পর তাঁর পড়াশোনা করা ছাড়া আর কিছু কাজ নেই। তাঁর কাছে ইংরিজি রামায়ণ মহাভারত গীতা সব আছে।

ওসব বই তোমাদের দেশেও পাওয়া যায়?

হ্যাঁ ঠাকুমা। বই-ই তো পৃথিবীর সবদেশের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে।

কথাটির তাৎপর্য ঠাকুমা কি বুঝলেন তিনিই জানেন, চুপ ক'রে রইলেন। হয়ত তাঁর আর কথা বলতে ভাল লাগছিল না, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা পাঠে বাধা পড়ে গিয়েছিল সেটাই হয়ত খোঁচা দিচ্ছিল মনে। যে কারণেই হোক তাঁর এই চুপ করাতেই এমিলি বলল, আমি এখন যাই ঠাকুমা। অন্য সময় আসব।

অন্যসময় মানে এই দুপুরবেলা — যেদিন বাড়ী না থেকেছে রুমি বা যেদিন রুমির সঙ্গ শ্রেয় মনে হয়নি সেইসব নিভৃত দুপুরে ঠাকুমার ঘরে গিয়ে বসেছে এমিলি। নানারকম গল্প শুনেছে সে। রূপকথা শোনবার মানসিকতা অনেক বছর আগে পেছনে ফেলে এসেছে বলেই নিছক রূপকথার গল্প না হলেও সেইসব গল্পেও এমিলি পেত রূপকথার স্বাদ। ধর্মগ্রন্থ থেকে পাওয়া অদ্ভুৎ, অবিশ্বাস্য, রূপকাশ্রিত গল্পগুলোকে সরল ভক্তিতে বিশ্বাস ক'রে মনের মধ্যে ধরে রেখেছিলেন একান্ত গোপনে, এমিলির মত শ্রোতা পেয়ে সেই সব গল্পই পরিবেশন ক'রতেন ঠাকুমা পরম আনন্দে। কখনও বিস্ময়ে কখনও বিশ্বাসে কখনও শুধুমাত্র ঠাকুমাকে তৃপ্তিদেবার জন্যেই গল্পগুলো শুনেছে এমিলি। তারই ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট প্রশ্নে জেনে নিয়েছে গ্রামের জীবন কি ছিল আগে। খাঁটি দেশ যাকে কল্যাণ বলত তা নাকি গ্রাম। সেখানেই নাকি মানুষ নির্ভেজাল, ঠাকুমাও তেমনি কথাই বলেন। তবে ঠাকুমার কথায় গ্রামের প্রতি মমত্বের প্রকাশ কোনদিন দেখেনি এমিলি। ঠাকুমার গ্রাম বর্ণনার মধ্যে অনেক নিবিড় সূক্ষ্মতার পরিচয় থাকে কিন্তু তাতে থাকে না কল্যাণের মত অনুরাগের বর্ণময়তা। হয়ত তাঁর দীর্ঘ ব্যবহারে জীর্ণ, রঙ জ্বলে যাওয়া মনের জন্যেই অমন নীরস বর্ণনা অথবা ঠাকুমার মনে কোনদিনই সে ধরণের ভাবাবেগ ছিল না যাতে কোন সাধারণ বস্তুকে অসামান্য মনে হয় তবু তাঁর কথার মধ্যে তাঁর অজান্তেই এমিলির মনে এসে বাজত এক প্রেমিকের স্মার্ত আবেগ — সে আবেগে দোয়েল দোয়েল থাকত না হ'ত এক স্বপ্নের পাখি, ফিঙে পেত ভাললাগার রঙ।

তবে এক বিষয়ে কল্যাণের সঙ্গে ঠাকুমার মিল বড় গভীর। কল্যাণের

মতই কোমল ভালবাসা ঠাকুমার। একদিন হঠাৎ একটা ছোট্ট কাঁচের শিশি থেকে একটুখানি অদ্ভুৎ খাবার বের ক'রে বললেন, একটু খেয়ে দ্যাখ দিদু!

এমিলি দেখল ঠাকুমার তিনটে আঙুলে ধরা আছে জীবনে কোনদিন না দেখা ছোট ছোট শুকনো ফলের মত কি একটু জিনিষ। খেতে কেমন ভেবে বড় দ্বিধায় পড়ল এমিলি, কিন্তু ঠাকুমার কথায় হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল। ঠাকুমা বললেন, এ তুমি কোনদিন খাওনি। একে বলে কুলের আচার।

'কুলের আচার' কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করবার চেণ্টা ক'রল এমিলি। দেখতে লাগল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ততক্ষণে ঠাকুমা বলতে সুরু ক'রেছেন, সেদিন বাজার থেকে প্রভাকে দিয়ে একটু কুল আনিয়েছিলাম তাই দিয়ে আচার তৈরী ক'রেছি। অনেকদিন অভ্যেস নেই তো — তাছাড়া এখানে রোদে দেওয়ারও বড় অসুবিধে। কেমন হয়েছে কিছুই জানিনা। খেয়ে দ্যাখ তো।

ঠাকুমার আগ্রহে এমিলি কুলের আচারে জিবটা ঠেকাল। আস্বাদন করবার চেণ্টা ক'রতেই একটা অপরিচিত মিলিত স্বাদ তার স্পর্শেন্দ্রিয়কে মৃদু আঘাত ক'রল। প্রথম মুহূর্তেই সে সংযত হয়ে আবার একবার জিবটা ঠেকাল। ঝাল। মিণ্টি। টক। তিনটে স্বাদকে সে এবার পৃথকভাবে চিনতে পারল। সবটুকুকে মুখের মধ্যে ফেলতে ভরসা পাচ্ছিল না যদি শেষ কালে মুখ থেকে বের ক'রে ফেলতে হয়! তাহ'লে বড়ই দুঃখের হবে, লজ্জায় পড়বেন ঠাকুমা, অথবা কিছু মনে ক'রবেন। কাজেই তাকে খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তার পক্ষে প্রতিকূল স্বাদ কিছু থাকে তো সেটুকু রপ্ত ক'রে নিতে হচ্ছিল। প্রথম স্পর্শেই যে ঝালটুকু লেগেছিল পরে আর তা তেমন বোঝা গেল না, ঝাল খুব সামান্যই দিয়েছিলেন ঠাকুমা, নামমাত্র। এমিলি দুচারবার চাখাতে ঠাকুমা খুশী হয়ে জিজ্ঞেস ক'রলেন, কেমন লাগছে দিদু?

এমিলি বলল, ভাল। — সত্যিই নেহাৎ মন্দ লাগছিল না। নতুন ধরণের জিনিষই বটে। এরকম স্বাদের খাদ্য জীবনে কোনদিনই খায়নি সে। টক আর মিণ্টির প্রাধান্য, না শুকনো না জোলো —

এমনিভাবেই এক একদিন প্রকাশ পেত ঠাকুমার ভালবাসা। সাধ্য ছিল না তাঁর, স্বামীর কাছ থেকে পেয়ে সামান্য যে কয়েকটা টাকা তাঁর সঞ্চয় হয়েছিল বিগত কয়েক বছরে তা খরচ করার বিশেষ সুযোগ আসে নি বলেই সেই ব্যাঙের আধুলি তাঁর সঞ্চিত। তাই থেকে দু দশ পয়সা খরচ ক'রে নাতবৌ-এর জন্যে আয়োজন করা তাঁর। সে আয়োজনও আবার সুপ্রীতিকে লুকিয়ে। কারণ এসব আচার-টাচার এবাড়ীতে চলে না, করবার রেওয়াজ নেই। সুপ্রীতির ধারণা ওসব এরকম পরিবারে বেমানান। আর ঠাকুমা বোঝেন তিনি নিজেও এ পরিবারে বেমানান। তাই তাঁর সারাজীবনের সাংসারিক আচরণের অভ্যাস-গুলোকে তিনি সযত্নে চাপা দিয়ে নিজেকে সংগোপনে রাখেন এই সংসারের একান্তে। বড়ি দেওয়া, আচার তৈরী, নানারকম শুক্তোরান্না প্রভৃতি যে কাড-

গুলোকে সারাজীবন গর্বের বলে ভেবে এসেছেন, যাতে পেয়েছেন আত্মতৃপ্তি, সেই কাজগুলোই অনেক ইচ্ছে হলেও ক'রতে পারেন না। এমিলিকে দেখে, বিশেষ ক'রে তার শিশুর মত সরলতার জন্যে, ঠাকুমার স্নেহবৃত্তি এমিলিকে ঘিরে একান্ত আপনার ভঙ্গীতে ফুটে উঠতে চায়। তখনই নিজের ভাললাগার ছন্দে কিছু আয়োজন ক'রতে চান তার জন্যে। সে আয়োজন ক'রতে হয় খুবই সন্তর্পণে — এ বাড়ীর মর্যাদা অটুট রেখে।

এমিলি অতটা বোঝে না তবু এটা ধরতে পারে যে ঠাকুমার স্নেহ তার প্রতি যেভাবে প্রকাশ পায় সে প্রকাশের সন্ধান রুমি রাখে না। ওর ইচ্ছে হয় রুমিও এই অকৃপণ অজস্র স্নেহের ভাগ পাক, তাই একদিন বলে, জান ঠাকুমা আজ আমাকে একটা কি যেন — কি যেন নাম বললেন — ও কিছুতেই মনে আসছে না — খেতে দিয়েছিলেন। কি যে সুন্দর কি বলব।

ঠাকুমা আবার কি খেতে দেবে? রুমি বিশ্বাসই ক'রতে পারে না।

আ-য়্যাম ভেরি সরি রুমি, খুব দুঃখিত নামটা মনে ক'রতে পারি না, তুমি চল না ঠাকুমা তোমাকেও দেবেন। খুব ভাল লাগবে —

এমিলির শিশুর মত উৎসাহও প্রভাবিত ক'রতে পারে না রুমিকে। সে বলে, ঠাকুমা কোথায় পেল?

তৈরী ক'রেছেন তো।

তৈরী ক'রেছে। কি তৈরী ক'রতে গেল?

আমি নামটা কিছুতেই মনে ক'রতে পারছি না।

আর একদিন তো বলেছিলে তোমাকে কুলের আচার দিয়েছিল — খুব উপেক্ষার সুরেই রুমি বলল।

এমিলির মনে পড়ল একদিন নয় অনেকদিনই কুলের আচার দিয়েছেন ঠাকুমা, প্রথম দিনই খালি রুমির কাছে গল্প ক'রেছিল এমিলি, তাতে রুমি উপদেশ দিয়েছিল ওসব খেয়ো না, পেট খারাপ ক'রবে। এমিলি তার পরেও অনেকদিন খেয়েছে কিন্তু পেট খারাপ করে নি। তাই রুমির কথাটা কেমন বেসুরো বেজেছিল এমিলির। তার মনে হয়েছিল ঠাকুমার সঙ্গে এবাড়ীর সকলের সূক্ষ্ম অথচ অনতিক্রম্য মানসিক ব্যবধান আছে যার জন্যে প্রাণভরা স্নেহ দেবার পাত্র পাচ্ছেন না ঠাকুমা আর রুমি-রাও পারছে না তা গ্রহণ ক'রতে। কল্যাণের কথাও প্রসঙ্গত মনে এসেছিল, কল্যাণ যে স্নেহের কথা বলত সত্যিই সে স্নেহ আছে কিন্তু স্নেহাস্পদ যে ব্যক্তিত্ব সেই স্নেহ লাভ ক'রতে পারে সেই ব্যক্তিত্ব লুপ্ত আজ। কল্যাণ দু চারজনই আছে কিংবা হয়ত একজনই এদেশে। কল্যাণের সঙ্গে তুলনা ক'রলে রুমির বা প্রসেনজিৎ-বিশ্বজিৎ-এর জন্যে অনুকম্পা হয় এমিলির, কারণ কল্যাণ যে সম্পদে সুখী সে সম্পদ সম্বন্ধে অন্ধ এরা। এদের পায়ের ঠোক্করে হীরকপিণ্ড ছিটকে সরে যায় দূরে।

কিন্তু কেন? কল্যাণ যা বলত প্রায় সবই তো মিলছে, তবে কেন সুর মিলছে না এ-দেশের মানুষের? এই কলকাতাকেই তো কল্যাণ বলত তাদের সহর, বলত প্রাণময় মনোময় সহর! এখানকার মানুষই তো কল্যাণের সেই সব গল্পে বলা মানুষ! তবে কেন কিছু মিল কিছু গরমিলে সমস্তই গোলমাল ক'রে দিতে চাইছে? কল্যাণ একটা গানের কথায় বলত ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথাও গেলে নাকি কেউ পাবে না। কিন্তু কি এমন বিশেষত্ব আছে ভায়ের মায়ের স্নেহে সে তো বুঝছে না তা? এ ব্যাপারে হয়ত বেশীই বলেছিল কল্যাণ, অতিরঞ্জিত ক'রে বলেছিল।

তবে যতটুকু না মিলুক যা মেলে তা পুরোপুরিই মেলে। অথচ আশ্চর্য এমন স্নেহময়ী ঠাকুমাকে এরা সবাই বাড়ীর এক কোণে আড়ালে রেখে দিয়েছে! বাড়ীর যে তিনি একজন এবং তিনিই যে এ বাড়ীর, এ পরিবারের উৎস তা পর্যন্ত অস্বীকার এরা কেন যে ক'রতে চায় এমিলি ভেবে পায় না তা। ভেবেছে প্রসেনজিৎকে জিজ্ঞেস ক'রবে কিন্তু এরকম একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ কি করে যে উত্থাপন করা যায় এমিলি তাও ভেবে ঠিক ক'রতে পারে না।

অবশেষে এমিলি নিজেই খুঁজে বের ক'রল, বাড়ীর পুরানো চাকর বাসুদেব-এর বাড়ী মেদিনীপুর। ধরল রুমিকে, তুমি বাসুদেবকে একবার জিজ্ঞেস কর না মেদিনীপুরে আমাকে নিয়ে যাবে কি না?

প্রস্তাব শুনে রুমি আকাশ থেকে পড়ল, শেষকালে কিনা চাকর-বাকরের বাড়ী যাবার ইচ্ছে হ'ল এমিলির! বেড়াতে যাবার আর জায়গা পেল না? মুখে বলল, এ কথা তুমি যেন মার সামনে কখনও ব'লো না। মা শুনলে অনর্থ হবে। ভীষণ রাগ ক'রবেন।

রাগ ক'রবেন! কেন? এমিলি ভেবেই পেল না।

বাঃ রাগ করবে না? চাকর-বাকরদের দেশে যেতে চাইলে কখনও মান সম্মান থাকে?

এমিলি মান সম্মান না থাকার কারণ কিছুই খুঁজে পেল না। তবে তর্ক করা তার অনভ্যাস বলে চুপ ক'রে রইল।

রুমির মনের মধ্যে তখনও বিস্ময়। সে ভেবেই পেল না এ ইচ্ছে এমিলির কেন জাগছে? সৌগত একবার প্রস্তাব ক'রেছিল এমিলিকে ফ্রেজারগঞ্জে সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসবে। সকালে যাবে সন্ধ্যের মধ্যে ঘুরে

চলে আসবে। এমিলি রাজী হয়নি। রুমি নিজেও উৎসাহী ছিল, বলেছিল, চলনা ঘুরে আসি, আমি দাদাকে বলে নিচ্ছি।

না তোমরা যাও। ফিরে এসে ব'লো কি দেখলে।

আমি একদিন গেছি। সমুদ্র। কালো জল। যতদূর তাকাও শুধু জল।

সমুদ্র সুন্দর। গভীর নীল জল — অসীম। ওই অসীম জলের তলায় যে কি আছে দেখতে ভারী ইচ্ছে করে আমার।

তবে যাচ্ছ না কেন?

ঠাট্টা ক'রে এমিলি বলল, তুমি যে বললে ওখানে সমুদ্রের জল কালো?

আমি না হয় ভুল বলেছি, তাই বলে তুমি যাবে না?

তুমিই না হয় গিয়ে আর একবার ভাল ক'রে দেখে এসো তারপর আমি দেখব।

— এইসব আজেবাজে কথা বলে যে সেদিন নাকচ ক'রে দিয়েছিল সৌগতর প্রস্তাব আর সে-ই কিনা আজ চাকরের দেশে যাবার জন্যে তাকে দিয়ে বলাতে এসেছে চাকরকে! তার জানা ছিল আমেরিকার লোকেরা খুবই বুদ্ধিমান হয়। পৃথিবীর সেরা বুদ্ধিমান ওরা, আর এই মেয়েটা! দাদা কি তবে একটা পাগলীকে বিয়ে ক'রে এনেছে ওদেশ থেকে? তা যদি না হয় তবে নিশ্চয়ই কোন কূট বুদ্ধি আছে ওর পেটে। কি সেই বুদ্ধি কে জানে? কখন কি যে বলে কোন ঠিক নেই। একবার জিজ্ঞেস ক'রেই দেখা যাক কি বলে। নিজের মনোভাব গোপন ক'রে অন্তরঙ্গ সুরে জানতে চাইল, হঠাৎ তোমার বাসুদেব-এর বাড়ী যাবার ইচ্ছে হ'ল কেন?

গ্রাম দেখতে যাব। এদেশের আসল পরিচয় তো গ্রামে। কাজেই এদেশকে জানতে হলে গ্রামকেই জানতে হবে।

আমরা কি দেশের বাইরে?

এমিলি চুপ ক'রে থেকে বলল, তোমরা কি মাঠে চাষ ক'রতে ক'রতে গান গাও? নৌকার থেকে যে গান উঠে আকাশের তারা ছোঁয় সে গান কি তোমাদের? সংসারের ভোগ্য সামগ্রীর আকর্ষণ ছেড়ে যে মানুষ একটা ঝুলি কাঁধে নিয়ে একতারা বাজিয়ে দেশান্তরী তার গান কি তোমার কাছে বাঁধা আছে?

এসব কি বলছ! কে বলেছে তোমাকে?

কেউ নিশ্চয়ই বলেছে, নইলে জানলাম কি ক'রে?

এত সব তো আমিই জানি না —

জানা সম্ভবও নয়। নিউইয়র্ক, টোকিও, কলকাতা, প্যারী — চরিত্রে সবই এক। এদের মধ্যে সামান্যই তফাৎ। আসল যে পার্থক্য তা আমার বাবার খামার বাড়ীর সঙ্গে বাসুদেব-এর বাড়ীর। সেইখানেই আসল পশ্চিম আর পুব।

কিন্তু কি দেখবার আছে সেখানে?

সে তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

দাদাকে জিজ্ঞেস ক'রেছ ?

অফিস থেকে ফিরলে ক'রে নেব।

দাদা রাজী হবে তুমি মনে কর ?

যদি না মনে ক'রতাম তা'হলে তোমাকে বলতাম না। একদিকে তোমার দাদা অনেক মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এমন কি কল্যাণের চেয়েও — সে হচ্ছে উদারতা। আমি এমন উদার মানুষ জীবনে আর দেখিনি।

রুমি আসল কথার কাছ দিয়ে না গিয়ে বলল, তুমি না আর একদিন বলেছিলে ওই কল্যাণ-এর ব্যাপারটা বলবে — ?

কল্যাণ-এর কথা তো সবই বলেছি।

কই বলেছ ?

এই যে গ্রাম দেখতে চাচ্ছি এ তো কল্যাণেরই জন্যে।

কল্যাণের বাড়ী কি ওখানে ?

তার বাড়ীর ঠিকানা জানলে তো আর কোন অসুবিধেই ছিল না।

রুমির সন্দেহ ছিল কল্যাণকেই এমিলি খুঁজছে, সেই কথাটাই মনে হ'ল তার। নইলে এত আগ্রহ কিসের ? কথাটা একদিন সৌগতর সঙ্গেও বলেছিল রুমি, সৌগতও সায় দিয়েছিল, ওদেশের মেয়েরা এই রকমই হয়। ওদের একজনকে নিয়ে চলে না।

তাহ'লে ওদের স্বামীরা কি করে ?

তারাও অমনি। আসলে ওরা এ ব্যাপারে আদৌ রক্ষণশীল নয়। এ ওর স্ত্রীর সঙ্গে দুদিন স্ফুর্তি ক'রল, এর স্ত্রী আবার আর একজনের সঙ্গে একটু ঘুরে বেড়ালো সেই সময়। সবাই সব জানে কিন্তু তাতে কেউ কিছু মনে করে না।

তাই আবার হয় !

হ্যাঁ হয়। জীবনকে ওরা ভালবাসে বলে জীবনকে ভোগ ক'রতেও জানে। কৃপণ-এর মত জীবনকে টক খাবার মত ক'রে চেখে চেখে জমা রাখে না।

তবে কি করে ? — ঠাট্টা ক'রে রুমি জানতে চাইল, ট্যাবলেট খাওয়ার মত ক'রে গিলে ফ্যালে ?

সৌগত সেই ঠাট্টায় যোগ দিয়ে চট ক'রে দুই হাতে রুমিকে ধরে তাকে আদর ক'রে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, এমনি ক'রেই ভোগ করে জীবনকে।

— পরে কথাগুলো গড়িয়ে গিয়েছিল অন্যদিকে। কিন্তু সেদিন এমিলির প্রসঙ্গে যে কথা সৌগত বলেছিল তা একেবারে নির্ভুল বলে মনে হচ্ছে আজ রুমির। সত্যিই এমন কিছু সেই কল্যাণের কাছে এমিলি পেয়েছিল যার জন্যে তাকে ভুলতে তো পারেই নি, বরং খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার কাছে কল্যাণ সম্বন্ধে এতদিন সবই মিথ্যে বলে এসেছে। তবে এতই যদি ভালবেসেছিল কল্যাণকে তো বিয়ে ক'রল না কেন ? ওদেশে তো বাধা দেবার কেউই ছিল না। সমস্ত

ব্যাপারটাই কেমন রহস্যজনক। একটু ঘুরিয়ে সে পুরানো প্রশ্নই জিজ্ঞেস ক'রল, আচ্ছা তোমার আগে আলাপ সেই কল্যাণের সঙ্গে, না আগে দাদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল?

এমিলি এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজভাবেই দিল, কল্যাণ ওদেশ ছেড়ে চলে আসবার অনেক পরে তোমার দাদার সঙ্গে আমার আলাপ।

আলাপ ক'রে তোমার কি মনে হ'ল? —

এমিলি কথাটা বেশী বাড়তে না দেবার জন্যে শেষ উত্তরে পৌঁছাল, অত তো আমার এখন মনে নেই, তবে একথা আমি বলতে পারি প্রসেনজিৎ-এর মত মানুষের সঙ্গে বিয়ে করতে পারায় সত্যিই আমি সুখী।

কথাটা এমিলি এমনই আন্তরিকভাবে বলল যে রুমির আর সন্দেহ করবার মন রইল না। তবু নিজের অবিশ্বাসকে জোর ক'রেই জাগিয়ে রাখল সে, হয়ত এমিলি এটা ভণ্ডামী ক'রছে। মনের আসল কথা গোপন ক'রে অভিনয় ক'রছে।

হ্যাঁ, দাদা তো কোন সাতে-পাঁচে থাকে না — বলে রুমি ঠেস দিতে চেষ্টা ক'রল। কিন্তু এমিলি বাংলাভাষা শিখলেও অত ভাল জানে না বলে 'সাতে-পাঁচে' না থাকা বুঝল না। রুমির মুখের মধ্যে যে কথাটুকু আটকে গেল সেটুকু বলা হয়ে গেলে বুঝে নিতে পারত তার মনোভাব।

ওদিকে টেলিফোন বেজে উঠতে রুমি বাকী কথা শেষ না ক'রেই ছুটল বলে তার কথা আর শুনতে হ'ল না এমিলিকে।

কিন্তু সে কথাগুলো সৌগত শুনল। দুদিন কলকাতার বাইরে কাটিয়ে কলকাতা ফিরেই ফোন ক'রছে সৌগত। সে যে কোন কাজে বাঁকুড়া গেছে রুমি জানত। রুমির গলা শুনেই জানতে চাইল, কি ক'রছিলে?

কথা বলছিলাম, তোমার মেমসায়েব-এর সঙ্গে। আজ বড় মজার কথা বেরোল।

কি কথা?

তুমি এলে বলব, টেলিফোন-এ হবে না।

একটু তো শুনি, বাকী না হয় গিয়েই শুনব সন্ধ্যেবেলা।

অন্য একজন কে ওর ভালবাসার লোক ছিল দেশে থাকতে, তাকেই খুঁজতে ও গ্রামে যাবে।

কোন গ্রামে?

ঠিকানা জানে না। এমনিই খোঁজাখুঁজি ক'রছে।

তাই নাকি?

দাদা তো এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না তাই খুব সুবিধেই হয়েছে।

তা মন্দ কি? একলা তোমার দাদার সঙ্গে আর চার্ম নেই।

দাদা বলেই এসব চলছে, তুমি হলে সহ্য ক'রতে? ঠাট্টা ক'রল রুমি।

ইচ্ছে আছে নাকি?

হ্লাদিনী স্বরে রুমি বলল, রক্ষে কর! এরকম একজনকে সামলাতেই প্রাণান্ত আবার একজন।

ঠিক আছে সন্ধ্যে বেলা আসছি।

দুপুরে কি ক'রছ?

অফিস আছে।

এখনই এলে কখন অফিস যাবে? আজ ডুব দিয়ে দাও না —

যখনই হোক একবার যেতে হবে।

তবে তুমি থেকো আমি একটা নাগাদ তোমার ফ্লাটে যাচ্ছি। — খুব আস্তে কথাগুলো বলল রুমি।

তুমি এসে চলে যাবার পর আর সময় থাকবে না। বরং সন্ধ্যেবেলা তৈরী থেকো, আমি গেলেই বেরিয়ে আসবে, তখন হবে।

সেদিন কিন্তু আমার ফিরতে খুব রাত হয়ে গিয়েছিল, ভারী অসুবিধে হয় বাড়ীতে ফিরে। কেমন লজ্জা লজ্জা করে।

আচ্ছা ঠিক আছে আজ তাড়াতাড়িই চলে যেয়ো। তাহ'লে ছাড়ছি —

ফোন ছেড়েই রুমি নিজের ঘরে যেতে গিয়ে শুনল বিশ্বজিৎ-এর ঘরে কে যেন কথা বলছে। বিশ্বজিৎ-এর ঘরের মধ্যে কথা এবাড়ীর কেউ বোধহয় এই প্রথম শুনল। খুব চাপা স্বরে যেন কোন গোপন সলাপরামর্শ ক'রছে। কি যে বলছে বোঝা গেল না কিছুই। রুমি অবশ্য শোনবার জন্যে বিশেষ ব্যাগ্রও ছিল না। এই এক আশ্চর্য ছেলে ছোটদা। জীবনে কাউকে ভালও বাসল না। এতটা যে বয়েস হ'ল একটা মেয়ের টেলিফোন এল না কোনদিন। শুধু বসে বসে বই পড়া আর লাইব্রেরী থেকে রাশি রাশি বই বয়ে নিয়ে আসা মুটের মত। চারপাঁচ বছর ধরে মা-র সঙ্গে কোন কথা-ই বলে না, বাড়ীর অন্য সকলের সঙ্গে যদি বা কিছু কিছু বলত কিছুদিন ধরে একদমই বলে না। দাদা আসার জন্যেই কি এরকম পরিবর্তনটা হয়ে গেল? সে কি দাদার আসা অথবা দাদার বিয়ে ক'রে এই বউ আনা পছন্দ ক'রল না, কি তা কে জানে? আর মাথা-ই বা কে ঘামায় এ নিয়ে। আজ দীর্ঘদিন বাদে হঠাৎ ওর ঘরের সামনে দিয়ে যেতে ঘরের মধ্যে কথা শুনতে পেয়েই এসব ভাবনা মাথায় এল রুমির।

বিশ্বজিৎ আগে খুবই খোঁজখবর নিত, রুমিই ছিল ছেলেবেলায় তার একমাত্র সঙ্গী। দুই ভাইবোন ছাড়া বাড়ীতে আর কোন ছোট-ছেলেমেয়ে না থাকায় দুজনেই ছিল যা কিছু খেলাধূলা। বড় হয়েও, কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েও বোনের খোঁজখবর নিয়মিতই নিয়েছে বিশ্বজিৎ। আর ছোটদার সঙ্গে সখ্যতার সুবাদেই সৌগতর সঙ্গে আলাপ রুমির। কিন্তু এই প্রায় দুবছর ধরে কি যে হয়েছে — সৌগতর সঙ্গে তো ভুলেও কথা বলে না বিশ্বজিৎ, আর রুমির সঙ্গেও না। সৌগতর সামনাসামনি পড়ে গেলে এমনভাবে অন্যমনস্ক হয়ে যায় যে সেটা উপেক্ষা বলে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। রুমি কারণ বুঝত

না প্রথম দিকে, পরবর্তীকালে তার মনে হয়েছে সৌগতর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার জন্যে বিশ্বজিৎ অসন্তুষ্ট। সেই অসন্তুষ্টি যাতে না থাকে সে জন্যে কিছু কিছু প্রচেষ্টা ক'রে সে দেখেছে বিশ্বজিৎ নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। ফলে আর সে অপমানিত হতে চায় নি, প্রবলতর উপেক্ষা দিয়েই জবাব দিতে চেয়েছে বিশ্বজিৎ-এর ব্যবহারের। 'সৌগতর সঙ্গে তার সম্পর্ক অপছন্দ করার সে কে? ভাল লাগে না লাগে তার জন্যে মা আছে'—এমনি মনোভাব নিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা ক'রেছে রুমি। দীর্ঘদিন বাদে আজকে যে আবার কেন বিশ্বজিৎ সম্বন্ধে তার কৌতুহল হ'ল তা নিজেই বুঝতে পারল না, এবং স্বাভাবিক উপেক্ষা দেখিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল সে।

তার ঘরের পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে ও লাইনের বাড়ীর পেছন দিকটা দেখা যায়। ওটা নাকি বোস সায়েব-এর বাড়ী। বোস সাহেব অনেকদিন রিটায়ার ক'রেছেন। বড় ছেলে সুকুমার শোনা যায়, যে নাকি স্কুলের ক্লাশ এইটে তিনবার জিগবাজী খেয়েছিল, আজ একুশ বছর পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে নির্বিকারচিত্তে দুবেলা খাওয়া এবং ঘুম দিয়ে বাপের মতই যেন অবসর যাপন ক'রছে। সুকুমার সম্পর্কিত ব্যক্তিগত সংবাদগুলো অবশ্যই এ এলাকার বিখ্যাত ঠিকে ঝি অমল-এর মা যখন কাজ ক'রত তখনই তার কাছে শোনা। কিন্তু ছোট ছেলে সুকোমল-এর বৃদ্ধি এবং বিকাশ অনেকটাই ঘটেছে রুমিরা এবাড়ী আসবার পরে এবং রুমির চোখের সামনেই লেখাপড়া সে-ও সময়মতই ছেড়েছে তবে দাদার সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে সে নিজেকে সুকুমার-এর মত বাড়ীর মধ্যেই আটকে রাখে না। আত্মাকে সে অবারিত মুক্তির স্বাদ দিয়েছে — সারাটাদিন কোথায় কোথায় কাটিয়ে খেতে আসে রাত দুপুর হলে। কোন কোনদিন দুপুরে এসে হাজির হয়ে যায় খাবার জন্যেই, খাওয়াটা হবার যা অপেক্ষা তারপরই কোথায় উধাও হয়ে যায় সন্ধান রাখে না কেউ। ··· আজ হঠাৎ জানালা দিয়ে নজর গিয়ে পড়তেই রুমি দেখল ওবাড়ীর একতলার পেছন দিকের কলতলার পাশের ঘুপচিটায় কাকে যেন দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরে আছে সুকোমল। ব্যাপারটা প্রথম চোখেই বুঝতে পারল না কিন্তু পরের মুহূর্তেই বুঝল ওদের বাড়ীতে কাজ ক'রতে আসে যে অল্পবয়স্ক মেয়েটা সেই মেয়েটাকেই ঠেসে ধরে আছে সুকোমল। মেয়েটা, রুমি লক্ষ্য ক'রল ছটফট ক'রছে, দুহাত দিয়ে ঠেলে সরাবার চেষ্টা ক'রছে সুকোমলকে, পারছে না। কিন্তু মেয়েটা মুখে কোন শব্দ ক'রছে না কেন, রুমি ভাবল, চেঁচালেই তো পারে —। আর এরকম জায়গাতে ওকে ধরেই বা ক'রবে কি — রুমি ভেবে পেল না। দেখাই যাক কি করে — নিজেকে আড়াল ক'রে রুমি নিচের দিকে নজর রাখল। ঝিটা কি বোবা? গায়ের রঙ কালো বটে ছেঁড়া কাপড় প'রে থাকে কিন্তু শরীরটা মেয়েটার বেশ হৃষ্টপুষ্ট। সেই হৃষ্টপুষ্ট মেয়েটাকে সামলাতে সুকোমল-এর মত ডাকসাইটে ছোকরাকেও হিমসিম খেতে

হচ্ছে। ছেলেবেলায় যখন তার বাবা মফস্বল সহরে বাগানওয়ালা একটা বাড়ীতে থাকতেন একদিন রুমি দেখেছিল একটা সাপ বিরাট এক ইঁদুর ধরে এই রকমই নাস্তানাবুদ হচ্ছিল। সেই স্মৃতি মনে এল রুমির বহু বছর বাদে। সুকোমল-এর কথা-ও মনে এল রুমির। প্রথম প্রথম কেমন প্রেমিক প্রেমিক চোখে চেয়ে থাকত রুমির দিকে। রুমি মজা দেখত বলে একদিন চোখ টিপে ইঙ্গিতও ক'রেছিল। রুমি তবু ওর দিকে চেয়ে থেকেছে, রাগও করেনি সরেও যায় নি, মজা দেখার মত দেখেছে ওই কিন্তুৎকিমাকার পোষাকপরা সুকোমলকে। মুগ্ধ হবার কথা ছিল না, কারণ অমন ডাকসাইটে বাউণ্ডুলে, যার আচরণ সার্কাসের ক্লাউন-এর চেয়ে হাস্যকর তার ইঙ্গিতে মুগ্ধ হওয়া কখনই যায় না। তারপর বহুবারই স্বাভাবিকভাবে দৃকপাত হয়েছে, সুকোমল চেষ্টা ক'রেছে চটজলদি প্রেমিক সাজতে। ইদানীং কি হয়েছে কে জানে, আর সে সব করে না। রুমি ও নিয়ে ভাবে নি, ভাবে না। আজ শুধু ঘটনাচক্রে মনে হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর ঝি মেয়েটা সুকোমল-এর হাত ছেড়ে যখন পালাল ওর গায়ের জামাটা ছিড়ে তখন বুকের একদিক ফাঁক হয়ে একটি স্তন অনেকটাই বেরিয়ে পড়েছে, দূর থেকে হলেও রুমির মনে হ'ল যেন রক্ত লেগে রয়েছে, কে জানে হয়ত ছড়ে বা কেটেই গেছে। কিসে হ'ল ওরকম? ছুরিটুরি চালায় নি তো সুকোমল? ও যা মানুষ ওর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই। কিন্তু এ কী! ইচ্ছে ক'রলে তো দেখে শুনে একটা বিয়ে ক'রলেই পারে, ঝি-এর মেয়েকে নিয়ে — আর এত কিছু হ'ল অথচ ঝিটা চেঁচাল না একবার! সবই কেমন রহস্যময় মনে হ'ল রুমির কাছে। সুকোমল-এর বয়েস, রুমির মনে হয়, ত্রিশেরও অনেক বেশী হবে। কোথায় থাকে কি করে কেউ জানে না, সবাই নাকি জানে যে বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক খালি খাওয়া আর শোয়া। এদিকে যে খুব বেপরোয়া বা দুর্দান্ত তাও নয়। অত্যন্ত নিরীহ, শান্ত চেহারা। শুধু ঘুরে ঘুরে পাকাটে হয়ে গেছে এই যা।

মেয়েটা পালিয়ে যাওয়ায় একটু যেন নিরাশ হ'ল রুমি। নাটকের শেষ হবার আগেই থেমে গেলে যেমন হয় এও তেমনি হ'ল। নাঃ সুকোমলটা কোনই কাজের নয়! এই জন্যেই ওটাকে দেখতে পারে না রুমি, মনে মনে সিদ্ধান্ত ক'রল সে। একটু আগে পর্যন্ত তার মনে হচ্ছিল মেয়েটা ছাড়া পাবার জন্যে চেঁচাচ্ছে না কেন, আর সে ছাড়া পেয়ে পালাবার পরমুহূর্তেই অপদার্থ মনে হচ্ছে সুকোমলকে! প্রসঙ্গত মনে পড়ল সৌগতর কথা, হ্যাঁ ও-ই হ'ল পুরুষ। ওর হাতে পড়লে ছাড়া পাবে কেউ? বাঘের মুখ থেকে ছাড়া পেতে পারা সম্ভব কিন্তু সৌগতর হাত থেকে নয়। সৌগতর কথা মনে হতে রোমাঞ্চিত হ'ল রুমি। সত্যি সৌগতর সঙ্গে সুখ আছে, স্পর্শে উন্মাদনা আছে, ওর মত পুরুষের ভোগ্য হয়েও তৃপ্তি আছে। কিন্তু কেমন যেন মনে হয় রুমির, মনে হয় অন্য কোন

মেয়েও আসে ওর ঘরে। একদিন একটা রুমাল পড়ে থাকতে দেখে মনে হয়েছিল, সৌগতকে জিজ্ঞেস ক'রতে সে বলল যে ঘর পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যায় সে-ই ফেলে গেছে, হয়ত কোন বাড়ী থেকে হাতসাফাই ক'রেছিল এখানেই ফেলে গেছে বাড়ী নিয়ে যাবার পথে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, বিশ্বাস করেও নি এবং বিশ্বাস করানোর জন্যে বিশেষ গরজও সৌগতর ছিল না। তাই সন্দেহটা রুমির মনে জমে আছে। তবে সে ভেবেছে ওরকম পুরুষমানুষের ঘরে যদি এক আধজন আসে তাতে কিছুই এসে যায় না, বিয়ে হয়ে গেলে আর আসবে না।

বিয়ের কথায় অন্য চিন্তা এসে গেল, মা সেদিন বাবাকে বলছিল, তোমার এখন যা পজিসন এই সময় রুমির বিয়েটা হয়ে গেলে ভাল ছিল, বাইরে থেকে যা উপহার পেত তারই ভার সামলাতে সৌগতর বাবাকে একটা ঘর ছেড়ে দিতে হ'ত।

তা বিয়েটা দিচ্ছ না কেন, বাবা জিজ্ঞেস ক'রেছিল মাকে।

মার জবাবটা ভাল লাগে নি রুমির। সে অসন্তুষ্ট হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ শুনে ফেলা আলোচনা বলে জবাব দিতে পারে নি। মা তারই দোষ দিয়েছিল, যেন বিয়েটা সে ই ক'রছে না। 'মেয়ের মর্জি' নাকি জানে না। বাবাকে বোঝাতে মার জুড়ি আর দুনিয়ায় নেই। বাবাও শুনে অমনি চুপটি ক'রে রইল। কেন মাকে বলতে পারল না চল যাই সৌগতর বাবাকে গিয়ে ধরি? ও তো প্রায় রোজই আসে মা বলতে পারে না ওকে? বলতে পারে না শুধু শুধু দেরী ক'রছ কেন? তা কেউ ক'রবে না সব মেয়েই করুক, নিজে নিজেই বন্দোবস্ত ক'রে নিক আমরা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াই। সকলের কাছে ভাল থাকি। প্রেজেন্টেশন তো পাওয়া যাবে তার আগে বিয়ের ব্যবস্থাটাতো ক'রতে হবে! বিয়ের দেখা নেই প্রেজেন্টেশনের ভাবনা! কত আশা মার! বাবার পেয়ারের লোক সাদানী, চৌরাশিয়া আর কান্তিভাই — এই তিনজনকে নিয়েই তো যা কিছু হিসেব। আর তো সব সরবৎ সেট আর কাপড়ের বাক্স! মরুক গে যাক। গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেল দিয়ে কি হবে। প্রেজেন্টেশন বোঝা যাবে বিয়ের মুকুট পরে, এখন সে ভাবনা মার সে ভাবুক গে। তবে সত্যি বলতে কি প্রেজেন্টেশনের লোভটা মার চিরদিনই খুব বেশী। দাদার দেশে আসবার পর মা র খুব ইচ্ছে ছিল একটা পার্টি দেবে ছেলে আর বউকে নিয়ে। দাদা কি জানি কেন রাজী হয়নি। এমিলিই হয়ত দাদাকে কিছু বুঝিয়েছিল — যা মেয়ে! মা তাতে দুঃখ প্রকাশ ক'রেছিল সবাইকে বউ দেখাতে পারল না বলে, আসলে বউ দেখানোর উপলক্ষ্য ক'রে কে কি দেয় তাই পাওয়া! আর নিজেদের প্রতিপত্তিকে যাচাই করা।

শেষকালে এমিলি ঠাকুমাকে পেল যিনি বলামাত্রই রাজী হয়ে গেলেন।

বসুদেবকে ডাকিয়ে এনে বললেন, ও বাবা বসুদেব, এই রাঙ্গা দিদিমণি তোমাদের দেশ দেখতে চাইছে। নিয়ে যাও না বাবা একদিন।

প্রস্তাবটা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল বসুদেব। বলে কি বড় মা! এই মেমসাহেব যাবেন তাদের গ্রামে! সেই গেঁয়ো খালের আল পেরিয়ে দুমাইল পথ সাইকেল রিক্সা চড়ে ওলটাতে ওলটাতে কোন ক্রমে বেঁচে এক পা ধুলো মেখে ঘামে ভিজে — নাঃ সে ভাবাই যায় না। তাই সে একমুখ হেসে বলল, উনি কেন সেখানকে যেতে পারবেন বড় মা? আধরাস্তা পর্যন্ত যেতেই ওঁর শরীরের রক্ত সব শুকিয়ে যাবে। তাছাড়া আমাদের গ্রাম সে গ্রাম মানে একেবারে বনবাদাড় যাকে বলে। তারও বেহদ্দ।

তা যাই হোক মেয়েটার সখ যখন হয়েছে একবার নিয়েই যাওনা — ঠাকুমা বললেন।

নিয়ে যেতে তো বলছেন, মেমসায়েব সায়েব ওঁরা শুনলে ভীষণ রাগ ক'রবেন।

কিছু রাগ ক'রবে না। পরীক্ষিতকে আমি বলে দেব।

সে আশ্বাসেও আদৌ আশ্বস্ত হ'তে পারল না বসুদেব। কারণ শিব তো সমস্যা নয় আসল সমস্যা তো ওই চামুণ্ডা। শিব জায়া। আর সেখানে যে শাশুড়ীর কথা চলবে না তা বসুদেব-এর চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না।

ঠাকুমা আরও সাহস দিলেন, সঙ্গে দাদুভাই-ও যাবে। সে-ই নিয়ে যাবে তুমি শুধু পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সবই তো বুঝলাম বড়মা কিন্তু সেথা তো এরকম ঘর বাড়ী নেই, দিদিমণিরা বসবেন কোথা?

এমিলি সবই শুনছিল, এবার বলল, ঘর বাড়ী তো আছে —

সে মাটির ঘর খড়ের চাল —

ওঃ সুন্দর। এই রকমই আমাকে বলেছিল।

সে আপনাদের পা দেবার যুগ্যি নয় গো দিদিমণি — অন্তরঙ্গভাবে বলে উঠল বসুদেব। এমনিতে এবাড়ীর নিয়ম নয় কাউকে দিদিমণি-দাদাবাবু বলে ডাকা। কিন্তু বড়মার ঘরে এসে এইসব আন্তরিক আলোচনার মধ্যে পড়ে শেখানো প্রথা খসে গিয়ে আন্তরিক শব্দগুলো বেরিয়ে পড়ল।

কথাগুলোর মধ্যেও এমন এক ভাব ছিল যা বসুদেব-এর অন্যদিনের ব্যবহারের থেকে আলাদা। সেই পার্থক্য এমিলিও অনুভব ক'রতে পারল। তার বেশ ভাল লাগছিল বসুদেব-এর কথাবার্তা। সে যেন অনুভব ক'রছিল তাদের বাড়ীর চাকর বসুদেব নয়, কোন এক গ্রামের মানুষ বসুদেব কথা বলছে তার সঙ্গে। সহজ সরল প্রাণের কথা সব। সে আরও বলল, সেথা কি দেখতে যাবেন দিদিমণি? কাদামাটি, ধুলো, খানাখন্দ — আপনারা সেথা কি দেখবেন?

'খানাখন্দ' ব্যাপারটা বুঝল না এমিলি। সে বলল, তুমি যে বললে মাটির

ঘর খড়ের চাল — খড়ের চাল জিনিষটা দেখতে কেমন? আচ্ছা কি এক পাখীর বাসা আছে টাল গাছের মাথায় —

বসুদেব হেসে ফেলল, বলল, অনেক পাখিই তো বাসা করে।

না না — এমিলি স্মরণে আনবার চেষ্টা ক'রতে লাগল কি পাখির কথা সে বলবে। তার কিছুতেই মনে আসছিল না বাবুই পাখির নাম। তাই সে দুচারবার মাথা নেড়ে অবশেষে নিরাশ হয়ে বলল, নাঃ কিছুতেই মনে আসছে না—

কি পাগলী মেয়ে না কি বলব বসুদেব, সস্নেহে এমিলির কথা বলতে লাগলেন ঠাকুমা, কোথায় যে কি সব জেনেছে — এক ঝোঁক হচ্ছে গ্রাম দেখবে।

কথাটা শুনে এমিলির কি মনে হ'ল সে জিজ্ঞেস ক'রল, তোমাদের গ্রামে কোন জানা আছে?

জানা মানে?

মানে ধর বসুদেব জানা, পদবী, নামের পেছনে থাকে —

জানা? হ্যাঁ সে অনেকই আছে। অর্জুন জানা, তারপর সেদিকে মিটিয়ে আছে সন্তোষ জানা, বাগ আছে, পোড়োল আছে, আমরা দশঘর সাঁতরা আছি, সে পাশকে চকচরায় মাইতি আছে, গোষ্ঠ মাইতি খুব বড়লোক — সমানে বলে চলল বসুদেব।

তাকে থামিয়ে এমিলি বলল, না না আমি বলছি কল্যাণ জানা বলে কোন লোক আছে কিনা।

কল্যাণ জানা — ভাবতে লাগল বসুদেব। তাকে সাহায্য করার জন্যে এমিলি বলল, আমেরিকায় গিয়েছিল। অনেকদিন ছিল সেখানে।

বসুদেব বলল, তা হতে পারে দিদিমণি। আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেক লোক তো রোজই কলকাতা আসে ফুল নিয়ে। ফুলের চাষ আছে তো সব —। তা অনেকে তো আবার থেকেও যায়। এই যেমন আমিই থেকে গিয়েছি।

ঠাকুমা ব্যাপারটা অনুমান ক'রলেন, বললেন, এ কলকাতা নয় বসুদেব, আমেরিকা মানে এই দিদিমণিদের দেশে, সেই বিলেত।

শুনেই তো একেবারে আকাশ থেকে পড়ল বসুদেব — বিলেত! সেখানে কে যাবে বড়মা আমাদের গাঁয়ের! খড়্গপুর ইস্টিশনের সে পাশকে পৌঁছাবেনি কেউ — তায় যাবে বিলেত! জানা-মানা কেন সেই গোষ্ঠ মাইতির মত বড় লোকের ব্যাটা যে মৃত্যুঞ্জয় সে পর্যন্ত যায় নি তা আবার যাবে অর্জুন জানা, আর সন্তোষ জানা!

তোমাদের গ্রামে তা'হলে নয়। — স্বগতোক্তির মত এমিলি বলল ইংরিজীতে। তারপরই বলল, কি বললে ফুল নিয়ে আসে তোমাদের গ্রামের লোক?

হ্যাঁ দিদিমণি।

কেন?

ফুল বিক্রি ক'রতে আসে। হাওড়া পোলের নিচে বড়বাজারের পশ্চিমটায়

রোজ সন্ধ্যেবেলা যে ফুলের হাট বসে না ? সেখানে বেচতে আসে ফুল।

তাহ'লে তো অনেক বাগান আছে তোমাদের দেশে ?

বাগান নয়, চাষ আছে।

তার মানে ?

ক্ষেতে যেমন ধান চাষ হয়, তেমনি ফুল চাষ হয় আমাদের দেশের জমিতে।

কি ফুল ? —এমিলি ভাবল অন্য কোন ধরণের জিনিষকে বোধহয় ফুল বলছে বসুদেব।

সবরকমই হয়, রজনীগন্ধা, বেল, যুঁই, গোলাপ—

বল কি ? তবে তো বাগান আছে !

বাগান তো থাকে দিদিমণি সাহেবদের বাড়ীতে। আলিপুরের বাড়ীগুলোয় যেমন আছে —

ওই একই হ'ল। — খুবই উৎসাহিত হয়ে এমিলি বলল, তাহ'লে তো তোমাদের গ্রামে দেখবার অনেক কিছুই আছে।

বসুদেব চুপ ক'রে রইল। তার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছিল না দেখবার কি থাকতে পারে। এমিলিই আবার জানতে চাইল, তোমার বাড়ীতে কে আছে ?

মা আছে আর বউ ছেলেমেয়ে। মা কখনও ভাই-এর বাড়ী থাকে।

ভাই-এর বাড়ী কোথায় ?

ওই একসঙ্গেই। উঠোনের একপাশে আমার ঘর আর একপাশে ভাই-এর।

কেন ? এক বাড়ীতে থাক না ?

না দিদিমণি। আগে ছিলাম এখন ভিন্ন।

'ভিন্ন' মানে বুঝল না এমিলি। ভাবল জিজ্ঞেস করে কিন্তু লজ্জা পেল বলে ক'রল না। যে রকম অনেক শব্দই প্রতিদিন সে শোনে অথচ মানে বোঝে না এও তেমনি একটি শব্দ যার অর্থ অজানা রয়ে গেল। সে শুধু একটি জিনিষ বুঝতে পারল না বসুদেব-এর ভাই কেন আলাদা বাড়ীতে থাকে। কল্যাণ তো একথা বলে নি। সে বলত কর্মক্ষেত্র দূর না হলে সাধারণত ভাই-ভাই এক সঙ্গেই থাকে। আজকাল চাকরী দূরে হলে অনেকসময় মানুষকে পরিবার পরিজন ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে নইলে ভারতবর্ষের একান্নবর্তী পারিবারিক ঐতিহ্য এখনও গ্রামের দিকে দেখতে পাওয়া যায়। কই তা তো মিলছে না। তাই অনেক দ্বিধা ক'রে সে বসুদেবকে জিজ্ঞেস ক'রল, তোমাদের দেশে ভাই ভাই একসঙ্গে থাকে না ?

তেমন তো কই দেখিনি দিদিমণি আজকাল। তবে হ্যাঁ আমাদের পাড়ারই গ্যাঁড়া পোড়্যেল আছে — ওই যে গো যার ভাল নাম হরিপদ পোড়্যাল তার ছেলেগুলো খুব ভাল। সব বাপের কাছেই থাকে। আসলে বউগুলা ভাল জুটছে কিনা —

'গ্যাঁড়া পোড়্যেল' শব্দটা যে একটা নাম এবং একজন লোকের নাম এই

ব্যাপারটা অনেকবার শোনা সত্ত্বেও বুঝতে পারে নি। তাই ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে বুঝতে পারছিল না। এছাড়াও বসুদেব-এর অনেক কথাই সে আন্দাজে বুঝছিল। বুঝছিল বললে ঠিক হয় না, বুঝতে চেষ্টা ক'রছিল। বিষয়বস্তু না বোঝার জন্যেই প্রসঙ্গে অনাগ্রহ এসে পড়ছিল এমিলির। সে সেটা এড়াবার জন্যে জিজ্ঞেস ক'রল, তোমাদের বাড়ী এখান থেকে কতদূর ?

অনেক দূর গো দিদিমণি, বসুদেব জানাল, সেই পাঁশকুড়া নেমে বাস, বাস থাকতে রিক্সা তারপর হ'ল গিয়ে তোমার সাঁপড়, সাঁপড়ের পাশ দিয়ে হ'ল সে তোমার গেঁয়োখালি —

থাম তোমার অত জায়গার কিছু চিনি না আমরা — ঠাকুমা বললেন, ওসব জায়গার নাম আমিই জানি না ও কি জানবে ?

তাও তো বটে বড় মা, নিজের ভুল স্বীকার ক'রল বসুদেব। তারপর বলল, আসলে আমি রাস্তাটা বোঝাচ্ছিলাম আর কি।

তোমাকে অত রাস্তা বোঝাতে হবে না, তুমি একদিন নিয়ে যাও এদের —

আপনি তো বলে দিচ্ছেন বড়মা, শেষকালে — বাকী কথা আর বলল না বসুদেব। আসলে সে বলতে চাইছিল যে সুপ্রীতির অনুমতি ছাড়া তো কিছুই হবার নয়। সেখানে রাজী করাবে কে ?

ঠাকুমার সেদিকটা খেয়াল ছিল, তিনি বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। প্রসেনজিৎ বউমাকে বলে নেবে। তোমারও ছুটি করিয়ে নেবে।

আমাকে যেদিন বলবেন আমি চলে যাব। কিন্তু বড়মা সেথা গিয়ে ওনাদের বসতে দেব কোথা —

সে ওরা বুঝবে'খন। তোমাদের ঘরেই বসতে দেবে আবার কোথায় —।

বসুদেব আর কোন কথা বলল না। তার মনে সেই একই শংকা কোথায় সে বসতে দেবে মনিবদের। তারপর আবার যে সে মনিব নয়, খাস মেম বউওয়ালা মনিব। গ্রামের লোকে দেখলে তো চমকে যাবে। গোষ্ঠ মাইতিরাও চমকে যাবে সব। বুঝবে হ্যাঁ বড় লোক বটে এরাই। গোষ্ঠ মাইতিদের বাড়ীতে একবার নাকি বি,ডি,ও, গিয়ে উঠেছিল, তাই গাঁয়ের লোকেদের কি খাতির গোষ্ঠ মাইতিকে। গ্রাম ভেঙে মোড়ল-আধমোড়ল সব হাজির হয়ে গেল গোষ্ঠ মাইতির দরজায়। আর এ যে যাচ্ছে — এ হচ্ছে দেশের সব বি,ডি,ও, — ম্যাজিস্ট্রেট আর যতকিছু আছে সকলের ওপরওয়ালার ছেলে আর সেই ছেলের মেম বউ। গ্রামের লোক যে কি ক'রবে — বেশী ভাবতে পারল না বসুদেব। আর সব চমকপ্রদ ভাবনার মধ্যেই খোঁচা দিতে লাগল সেই এক চিন্তা এই রকম মানুষদের সে বসতে দেবে কোথায় ?

সন্ধ্যে বলেছিল কিন্তু বিকাল হতেই চলে এল সৌগত। এসেই এমিলির সঙ্গে সামনাসামনি। এমিলি তার স্বাভাবিক সৌজন্যে একমুখ হেসে অভ্যর্থনা ক'রল, সুস্বাগত!

সৌগতও তার স্বভাবগত চঞ্চল ভঙ্গীতে দুপা জোড়া ক'রে দুহাত দুদিকে প্রসারিত ক'রে দাঁড়িয়ে ইংরিজিতে বলল, হোয়াট!

ভুল বলিনি তো? — শঙ্কিত হয়ে এমিলি জানতে চাইল। তারপরই কৈফিয়তের সুরে বলল, কথাটা কালই শিখেছি। একটি ছেলে বলল 'সুস্বাগত' কথাটা নাকি খুব ভাল অভ্যর্থনা।

সৌগত যেমন আগে কখনই ইংরিজি ছাড়া এমিলির সঙ্গে কথা বলেনি আজও তেমনি ইংরিজিতেই বলল, তোমার এই সাদর অভ্যর্থনার জন্যে ধন্যবাদ। — ঈষৎ নুয়ে পড়ল সে সামনের দিকে, অভিবাদনের ভঙ্গীতে। পরমুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার মত সুন্দরীর আহ্বানে আমি ধন্য।

এমিলি মনে মনে চায় সবাই ওর সঙ্গে এদেশের ভাষাতেই কথা বলুক। তাতে ওর নিজেরও শেখার সুবিধে হবে। তাছাড়া সৌগতর এই এমিলির ভাষা বলতে চাওয়াকে এমিলির মনে হয় ওর ক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হচ্ছে। সৌগত বোধহয় ভাবে এমিলি ওদের ভাষা শিখতে পারবে না। তাছাড়া সৌগতর শেষ কথাটা তার কাছে চাটুকরিতার মত শোনাল। সে তাই ঠাট্টার সুরেই বলল, অতটা না বললেও চলত। শুনলে রুমি খুব সন্তুষ্ট হবে না।

কেন? — সৌগতও যোগ দিল রহস্যালাপে।

যে কোন মেয়েকে সুন্দরী মনে হওয়া এবং তার অভ্যর্থনাতেই ধন্য হয়ে যাওয়া খুব সুলক্ষণ নয়। অন্তত কোন মেয়েই তা মনে ক'রবে না — ঠাট্টা ক'রেই মনের কথা বলল এমিলি।

মেয়েদের এই স্পর্শকাতরতা বড়ই খারাপ।

এটা কি স্পর্শকাতরতা? এ কি পুরুষদের হয় না?

মেয়েদেরই নয়, আমার তো যতদুর মনে হয় শুধু এদেশের মেয়েদেরই।

আমার আবার অন্য কথা মনে হয়। মানুষ-মাত্রেরই একটা নিজস্ব ধারা আছে, সেটা সারা পৃথিবীতেই এক। আবেষ্টনীতে সেটার কিছু বাহ্যিক পার্থক্য হয় বটে ভেতরে দুদেশের মানুষের একান্ত মানসিকতায় বিশেষ তফাৎ থাকে না।

সেটা কি রকম?

এই ধর, সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না এইসব অনুভূতির উৎসগুলো সারা পৃথিবীতেই এক রকম।

কথাগুলো ক্রমশ গভীরে চলে যাচ্ছে দেখে সৌগত তাড়াতাড়ি বলল, এ তুমি

নেহাৎ মন রাখা কথা বলছ। আসলে তোমাদের দেশের মেয়েরা অনেক উদার আর মনের দিক থেকে স্বাধীন। সেইজন্যেই অত উন্নতি হয়েছে তোমাদের দেশের।

এটা বোধহয় ভুল।

না এমিলি। আমি ঠিক বলছি।

হঠাৎ এমিলির মনে হ'ল এইভাবে এর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তাই সে কথার মোড় ঘুরিয়ে হালকা ক'রল, অতই যদি পছন্দ তাহ'লে আমাদের দেশের মেয়ে বিয়ে ক'রলে না কেন?

পেলাম কোথায়?

চলে গেলে না কেন আমাদের দেশে?

শুধু বিয়ে ক'রতে?

ক্ষতি কি?

তোমার কাকা তো আসছে, আমাকে তোমাদের দেশে চলে যাবার একটা ব্যবস্থা ক'রে দাওনা বলে কয়ে।

কি ক'রবে?

সেখানেই কাজকর্ম ক'রব, থাকব এবং আমেরিকান শিশু উৎপন্ন ক'রব?

সৌগতর ইচ্ছার শেষ বিন্দুতে গিয়ে বড়ই বিস্মিত হ'ল এমিলি, জিজ্ঞেস ক'রল, কেন? ভারতীয় নয় কেন?

কারণ ভারতীয় হবার চেয়ে আমেরিকান হ'লে অনেক উচ্চস্তরের হবে।

পুয়োর সোল — উচ্চারণ ক'রল এমিলি অনুকম্পায়। মনে মনে সে বলল, এমন মানুষ জন্মাবার জন্যে সত্যিই এ দেশ দুর্ভাগ্যসম্পন্ন। যে দেশে জন্মাবে সেই দেশই দুর্ভাগা। কিছুক্ষণ থেমে হাসি মুখে বলল, আমেরিকায় জন্মানোর শিশুর অভাব হয়নি। কিন্তু কদর্য মানুষ গিয়ে সেখানে শিশুসৃষ্টি না ক'রলেই সে দেশ বাঁচবে।

ওদের কথা যখন এই পর্যায়ে এসেছে সেই সময় রুমি এসে হাজির। সৌগতকে এত শীঘ্রি আসতে দেখে বলল, আরে! তুমি এত সকাল সকাল চলে এলে যে!

এমিলির সামনে বলে রুমিকেও ইংরিজি বলল সৌগত, কাজ ছিল না চলে এলাম। আচ্ছা, তোমার কি ধারণা, এদেশের চেয়ে আমেরিকা অনেক ভাল নয়?

সে তো একশবার — রুমি জবাব দিল।

রুমিকে পেয়ে এমিলি বাংলা বলতে পারল, আচ্ছা এই সৌগতর কি ধারণা দেখ, আমেরিকায় জন্মালেই তোমার ছেলেমেয়ে আমেরিকান হয়ে যাবে।

সৌগত চট ক'রে ভ্রম সংশোধন ক'রে দিল, ও নিশ্চয়ই নয়! আমেরিকান মায়েব কাছ থেকে তাদেব আসতে হবে —

রুমি আগের কথাবার্তা সব শোনেনি বলে চুপ ক'রে রইল আর

এমিলি অপার বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল সৌগতর মুখের দিকে। এই লোকটাকে সে যতটা খারাপ মনে ক'রত তা যে এই মানুষের আসল প্রকৃতির কাছে অতি কিঞ্চিৎ তাই সে বুঝল আজকের কথাবার্তায়।

রুমি বলল, আগে এসেছ ভালই হয়েছে। বৌদি তুমি একটু কথাবার্তা বল আমি এখনই পোষাকটা বদলে আসছি।

এমিলির ইচ্ছে হচ্ছিল না সৌগতর সঙ্গে আর এক মুহূর্তও কথা বলে, কিন্তু রুমি চলে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই বসে থাকতে হ'ল সৌগতর সামনে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সে। সৌগতও কোন কথা বলল না। এক ভয়ানক অস্বস্তিকর পরিবেশ-এর মধ্যে সুপ্রীতি এলেন। তাঁর পেছনে খাবারের প্লেট নিয়ে ঝি সারদা। এসে কোনদিকে না তাকিয়েই বললেন, রুমির কাছে শুনলাম তুমি এসেছ। অফিস থেকে এলে খাবারটুকু খেয়ে নাও। শুনলাম বাইরে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ বাঁকুড়া যেতে হয়েছিল একটা কাজে, সৌগত জানাল।

এই সময় যা দিনকাল পড়েছে তাতে বাইরে যাওয়াটা একেবারেই উচিত নয়। কলকাতার বাইরে তো ডাকাতদের রাজত্ব সুরু হয়ে গেছে। এখন তো গ্রামে যাওয়া — না না খুব অন্যায় ক'রেছ তুমি —।

ব্যাপার হয়েছে কি আমার ওপরে মিস্টার মুখার্জী ছিলেন তিনি চলে গেছেন দিল্লী। আমাকে এখন তাঁর সব কাজ দেখতে হচ্ছে। তাই না গিয়ে উপায় ছিল না। তবে বাঁকুড়ায় ওসব নকশালী হামলা তেমন নেই।

কোথায় আছে আর কোথায় যে নেই এ কি বলা যায়? দেখছ না চারিদিকে কেমন খুনখারাপি চলছে? কলকাতার অফিস পাড়া আর আমাদের এই এলাকাটা ছাড়া একটা জায়গা খুঁজে পাবে না যেখানে রোজই একটা না একটা খুন না হচ্ছে।

তবে অনেকটা কন্ট্রোল ক'রে ফেলেছে পুলিশ।

কন্ট্রোল আর কি ক'রেছে মেরে দিলে কি আর পুলিশে বাঁচাতে পারবে? অতবড় বড় এম, এল, এ, বিচারপতি, নেতা সকলকে মেরে দিল কি করল পুলিশ? যাকগে যাক ওসব রিস্ক নেওয়া মোটেই ভাল নয় তুমি বাবা আর কোথাও যেয়ো না।

সুপ্রীতির স্নেহসম্ভাষণের মধ্যেই উঠে যাবার সুযোগ পেল এমিলি, এবং কথা না বলেই উঠে গেল নিজের ঘরে। বদমাস। আস্ত বদমাস একটাকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে মেয়েটাকে নিশ্চিত সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে সবাই। অত্যন্ত অপবিত্র চরিত্রের লোভী অমানুষ একটা। আশ্চর্য যে এ কল্যাণ-এর দেশের মানুষ! প্রসেনজিৎকে কল্যাণ-এর দেশে তবু মানায় কিন্তু এই লোকটি? কল্যাণ-এর স্বর্গে এ এক শয়তানের অবস্থান।

ঘরে এসেও সে কেমন অস্বস্তি অনুভব ক'রতে লাগল। সৌগতর সঙ্গ

কোনদিনই তার সুখোদ্রেক করে না আজ তা এমনই বিরক্তির সঞ্চার ক'রল যে তার মনে হতে লাগল একে ভাল ক'রে জেনে রুমিকে জানিয়ে সাবধান ক'রে দেওয়া একান্ত কর্তব্য। নইলে মেয়েটি অসুখী হবে। মনে মনে ঠিক ক'রল বিশ্বজিৎ-ই একমাত্র মানুষ হতে পারে যে তাকে হয়ত সৌগত সম্পর্কে কিছু খবর দিতে পারবে। সে শুনেছে সৌগত আসলে বিশ্বজিৎ-এরই বন্ধু হিসেবে প্রথম এবাড়ী আসে। অথচ এখন বিশ্বজিৎ সৌগততে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। নিশ্চয়ই এমন গূঢ় কোন কারণ আছে যার জন্যে এ অবস্থা! অতএব যদি বিশ্বজিৎকে ধরা যায় তাহ'লে তার সঙ্গে এই বিচ্ছেদ-এর কারণ নিশ্চয়ই জানা যাবে। আর সে কারণ এমনও হতে পারে যাতে সৌগতর চরিত্রের কদর্যতা আরও বেশী ক'রে জানা যাবে। তাতে এমিলির কোন লাভ নেই কিন্তু রুমির লাভ হলেও হতে পারে। এমনি সাত-পাঁচ ভেবেই এমিলি বিশ্বজিৎ-এর ভেজানো দরজায় গিয়ে টোকা দিল। কোন সাড়া পেল না। তবে কয়েক মুহূর্তেই দরজা ফাঁক হ'ল। বিশ্বজিৎ-এর বিস্মিত মুখ সেই ফাঁকে। সে কোন প্রশ্ন করবার আগেই এমিলি বলল, তোমার ঘরে কি আসতে পারি?

বিশ্বজিৎ এরকম প্রশ্নের জন্যে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। তার মনে নিমেষের মধ্যে সন্দেহ চমকালো বিদ্যুৎ-এর মত। অবিশ্বাস কুঞ্চিত ক'রল তার মনের ভ্রূ। নিমেষের মধ্যেই শঙ্কিত জিজ্ঞাসা আর ব্যবহারিক বুদ্ধি পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে নিল। তবে কি সবই জেনে গেছে মেয়েটা? শেষ দেখা ক'রতে এসেছে হাতে নাতে ধরতে? কিন্তু এত কাঁচা ভাবে তো কাজ ক'রবে না সিয়ার কর্মীরা? হাতে হাতে ধরতে তারা যাবে না এমনিভাবে। সন্দেহের কথাটা রাহুলকেও বলেছিল সে, রাহুলও বলেছে সাবধান হয়ে থাকতে। আর কত সাবধান হওয়া যায়? ঘরের বউ সেজে যে এসেছে এতদিন তাকে যখন তখন ঘরে ঢুকতে দেয় নি অথচ এখন আটকানোই বা যায় কি ক'রে? কি বলে সে প্রতিরোধ ক'রবে এমিলিকে? মুখের ওপর দরজা বন্ধ ক'রে দিলেও বিপদ কমবে না, যদি তার সন্দেহ সত্যি হয় তো নিশ্চয়ই সব ব্যবস্থা করাই আছে — বামাল সমেত তাকে পাচার ক'রবে। নিজের জন্যে ভয় করে না বিশ্বজিৎ ভয় এই বইগুলোর জন্যে। কিভাবে টাকা জোগাড় ক'রে কত কষ্ট ক'রে যে সবগুলো ছাপা সে কথা কেউ কি বুঝবে? টাকা থাকলেও তো ছাপা যায় না, কাজেই এই প্রচণ্ড মূল্যবান বইগুলো......না তার চেয়ে নেওয়া যাক ঝুঁকি, দেখাই যাক কি করে। শেষ যদি হতেই হয় তো সামনাসামনি হয়ে সব বুঝে শুনেই শেষ হোক। কেন আড়ালে থাকতে দেবে সে এমিলিকেই বা? বরং এমিলি যেমন বিগলিত ভাবে কথা বলার অভিনয় করে তেমনি করারই চেষ্টা করা যাক। দেখা যাক তাতে কি হয়? ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই সে আহ্বান জানাল, কি ব্যাপার? কি মনে ক'রে হঠাৎ?

এখানে বলব না, তোমার ঘরে গিয়ে বলব, এমিলি জানাল।

এস, এস — দরজা নিজেই খুলে দিল বিশ্বজিৎ। ঘরের টেবিল-এর কাছে বসতে না দিয়ে বসাল বিছানায়। দরজাটা আবার একটু ঠেলে দিয়ে বলল, এমন আকস্মিক ভাবে কি জন্যে?

অদূরে টেবিলের ওপরকার খোলা বইটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে এমিলি বলল, আমি বোধহয় তোমার পড়াশোনার অসুবিধে ক'রলাম সেজন্যে সত্যিই দুঃখিত।

না না এ কিছু না, তুমি বল —

আমি তোমার কাছে একটা বিশেষ কাজে এসেছি —

সে তো অনুমানই করছি, মনে মনে প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা বাড়লেও বাইরে তা প্রকাশ ক'রতে না দিয়ে বিশ্বজিৎ বলল।

আমার কথাগুলোর জন্যে তুমি কিছু মনে ক'রবে না, এটা আমার একান্ত অনুরোধ।

এই রকম সব ভূমিকা শুনে বিশ্বজিৎ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল এর পর কি এমিলি বলবে। তবু সে শক্ত ক'রে রাখছিল নিজেকে। এবং যথাসম্ভব শক্ত রেখেই সে বলল, না বৌদি কিছু মনে ক'রব না। যে যেটা কর্তব্য মনে করে সেটা যত অপ্রিয়ই হোক ক'রতে যখন তাকে হবেই তখন মনে করার কি থাকতে পারে?

ঠিক তাই ভাই, — অতি আবেগে নিজের মাতৃভাষা বলে ফেলেই এমিলি সংযত হ'ল, কিছুক্ষণ থেমে বলল, আমি শুনেছি সৌগত তোমার বন্ধু ছিল —

এবার আরও বিস্ময়ে এমিলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বিশ্বজিৎ, কিছু পরে বলল, তাতে কি?

তোমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব কি এখনও আছে?

বিশ্বজিৎ অন্যরকম সন্দেহ ক'রে বলল, আমার শত্রুতা সে ক'রতেও পারে।

হ্যাঁ তা হয়ত পারে। তবে বন্ধুত্ব আছে কি?

কেন বলত?

আমি ওর সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন ক'রতে চাই তোমাকে —

এবার সমস্ত গুলিয়ে যেতে লাগল বিশ্বজিৎ-এর। ব্যাপারটা কোথা থেকে কোন দিকে যাচ্ছে সে বুঝল না, -অথবা এমিলি কি ঘুরিয়ে আরম্ভ ক'রছে সরাসরি বলতে না পেরে? কিংবা সৌগতই হয়ত কোন বিশেষ খবর কোনও ভাবে জেনে বলে দিয়েছে এ-ও হতে পারে। যা-ই হোক শোনা-ই যাক কি বলে। — আমাকে কি প্রশ্ন ক'রবে?

প্রশ্ন এমিলির মনেও তৈরী ছিল না। একটু চিন্তা ক'রে সে বলল, তোমার বন্ধু অথচ তুমি ওর সঙ্গে একেবারেই কথা বল না কেন?

এই রকম অবান্তর প্রশ্নের কোনও উদ্দেশ্য খুঁজে পেল না বিশ্বজিৎ, তুমি যদি কিছু না মনে কর তো একটা কথা আগে জেনে নিই —?

নিশ্চয়ই কিছু মনে ক'রব না। তুমি যা খুসী জিজ্ঞেস ক'রতে পার —

এসব কথা তুমি আজ হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রছ কেন ?

তোমার যা কিছু জানবার আছে সব আমি বলে যাব তার আগে আমাকে আমার কথাগুলো জানতে দাও।

বিশ্বজিৎ খুব শান্তভাবে বলল, আসলে কি জান, তোমার এসব জিজ্ঞাসার কারণ জানলে আমি তোমার সঙ্গে হয়ত মন খুলে সব বলতে পারি।

সেটা ঠিক বটে, এমিলি স্বীকার ক'রল, বলল, ব্যাপারটা হচ্ছে কি জান আমি এদেশের ভাবধারা সম্পূর্ণ তো জানি না, আদবকায়দাও জানি না তাই হয়ত সৌগতর কিছু কিছু ব্যবহার আমার খুব খারাপ লাগে। কিন্তু দ্যাখ রুমির সঙ্গে ওর বিয়ে হলে ও তো আমাদের নিজের লোক হবে, সে অবস্থায় আমার এই মনোভাব তো অন্যায় ?

বিশ্বজিৎ-এর মন থেকে বিরাট মেঘভার কেটে গেল। অনেকটা হালকা হ'ল সে। তাহ'লে হয়ত সবই ভুল — এতদিন ধরে অকারণেই ভয় পেয়ে এসেছে এই মেয়েটিকে। সৌগতকে নিয়ে সত্যিই হয়ত এমন কিছু সমস্যায় বেচারী পড়েছে যার কোন সমাধান পাচ্ছে না ; এই সব ভেবে বলল, দ্যাখ বউদি, সৌগত আমার বন্ধু হিসেবে এই বাড়ীতে এসেছে এটা আমার পক্ষে দুঃখজনক কিন্তু যদি রুমিকে এ বাড়ী থেকে নিয়ে যায় তবে রুমির হবে সেটা নির্বুদ্ধিতা।

এমিলি আরও কথা শোনবার জন্যে থেমে রইল। বিশ্বজিৎও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, সৌগতর মত চরিত্রের লোকেরা সমাজের সবচেয়ে বড় ক্রিমিন্যাল। অথচ এদেশের আইন এদের শাস্তির কোন ব্যবস্থা তো করেই না উপরন্তু এদের প্রশ্রয় দেয়। এরা দেশের অসংখ্য গরীব মানুষকে নানাভাবে প্রতারিত করে, মানুষের আর্থিক দারিদ্রের সুযোগে তাদের সম্ভ্রম নষ্ট করে। কি আর বলব, বনের পশুরা এইসব লোকের চেয়ে চারিত্রিক মর্যাদায় অনেক উঁচু স্তরের। এই রকম লোকেরা সাক্ষাৎ পাপ। যাকে তোমাদের ধর্মগ্রন্থে বলেছে শয়তান।

বিশ্বজিৎ-এর কথা শুনে তার মুখের দিকে স্থিরভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল এমিলি। ভালভাবে বুঝতে চাইল তার কথার তাৎপর্য। নিশ্চয়ই নিজের কথার প্রমাণ সাপেক্ষে কিছু বলবে বিশ্বজিৎ। বন্ধু হিসেবে সে যা জেনেছে তা অন্যের জানা অসম্ভব। কাজেই বিশ্বজিৎ এমন কিছু যদি বলে যাতে রুমির ভুল — না ভুল ভাঙ্গা অসম্ভব। বরং অপছন্দ যদি ওর মা করেন তাহ'লে হয়ত মেয়েকে বাধা দিতে পারেন। তাছাড়া সৌগতকে ঘৃণা করবার মত একটা কারণ খুঁজে পেলে নিজেও শান্তি পায় এমিলি ; তাহ'লে এই যে স্বতোৎসারিত ঘৃণা এ অকারণ ভেবে অপরাধবোধ হয় না নিজের মনে।

কিন্তু যে রকম কোন ঘটনা শুনলে তার মনে শান্তি হ'ত তার চৌহদ্দি দিয়ে গেল না বিশ্বজিৎ, সে বলল, তুমি বৌদি ওই অসৎ লোকটার কথা আমার সঙ্গে ব'লো না। ওকে আমি ঘৃণা করি।

সে তো আমিও বুঝি ভাই, আমারও একেবারে ভাল লাগে না ওকে কিন্তু কেন যে ভাল লাগে না আমি বুঝি না। শুধু মনে হয় ওর চরিত্রে এমন একটা কিছু আছে যা মানুষের ঘৃণা আকর্ষণ করে। কিন্তু ব্যাপার কি জান রুমি বা মা — ওঁরা কেউই সেটা ধরতে পারেন না।

কথাটা শোনামাত্র মুখের ভাব বদলে গেল বিশ্বজিৎ-এর। তার অতি সুন্দর পবিত্র মুখ কঠিন হয়ে উঠল, কঠোরভাবে সে বলল, এসবের কিছুই তুমি জান না বউদি। ওরা হচ্ছে আরও জঘন্য। ও যে ঘুষের পয়সায় মদের নিশান উড়িয়ে বেড়ায় এ কথা কি মা জানে না মনে করো? ও যে রাশি রাশি টাকার মালিক হয়েছে — সেই টাকা যে ওর কৃপণ বাপ দেয়না তাও কি আমার মা জানে না? ও যে আমাদেরই কলেজের একটা মেয়েকে পাঁচ বছর ধরে ভোগ ক'রে তাকে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে দিয়েছে সে-কি আমার মা শোনে নি? ওর জন্যে সেই মেয়েটার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে, সে ওর পায়ে ধরে কাকুতিমিনতি ক'রেছে, ওই শয়তান তাকে বাঁচতে দেয় নি। প্রচণ্ড ক্ষোভে অপমানে সেই মেয়েটি এখন কি করে জান? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। পাগল হয়ে গেছে।

কি বলছ তুমি?

এ সব মা শুনেছে।

শুনেছেন?

হ্যাঁ। বিশ্বাস না করার ভাণ ক'রেছে।

— বিশ্বজিৎ-এর কথা শুনে এমিলি এমনই বিমূঢ় হয়ে গেল যে কি বলবে তা ভেবেই পেল না। বিশ্বজিৎ-ই আবার কথা বলল, আসলে কি জান? এ:দেশের মেয়েরা বড়ই বোকা। বিশেষ ক'রে এই বাঙ্গালী মেয়েরা।

এমিলি লক্ষ্য ক'রল বিশ্বজিৎ-এর মুখ যেমন হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠেছিল তেমনি কোমল হয়ে গেল ধীরে ধীরে। একটু আগে তার মুখাবয়বে যে ঘৃণার অভিব্যক্তি তীব্রভাবে ফুটে উঠেছিল তাও আবার মিলিয়ে গেল তার শান্ত মুখ-মণ্ডলে। অতি ধীর স্বরে সে বলল, যার চরিত্রের মূল উপকরণই অন্যায় আর পাপ দিয়ে তৈরী সে কি কখনও খারাপ কাজ না ক'রে থাকে? আমার স্থির বিশ্বাস ওকে নজরে রাখলে যে কেউ জানতে পারবে ও নিশ্চয়ই অসৎ কাজ একাধিক ক'রে থাকে। তা ছাড়া যে চাকরীতে ও আছে সেখানে ঘুষ পাওয়াটাতো মাইনে পাবার মত। এবং আমার মনে হয় প্রতিমাসে ও যত মাইনে পায় তার অন্তত চারগুণ পায় ঘুষের টাকা।

ঘুষ? মানে ব্রাইব? তুমি কি তাই বল?

হ্যাঁ।

কিসের বিনিময়ে পায়?

কন্ট্রাক্টররা খারাপ কাজ করে, কম কাজ ক'রে বেশী পয়সা নেবার বিনিময়ে কিছু দিয়ে ওকে দিয়ে ঠিক কাজের টাকা পাবার ব্যবস্থা করে নেয়।

তারা তো তাহ'লে সরকারকে মানে জনসাধারণকে ঠকায়!

তা তো নিশ্চয়ই। নইলে তুমি জান ব্রিটিশরা তাদের বিশ্বস্ত কুকুরগুলোকে সিংহাসনে বসিয়ে রেখে চলে যাবার পর পৃথিবীর দরজায় দরজায় ভিক্ষে ক'রে তোমাদের দেশের কাছে ধার ক'রে ক'রে আমরা টাকার হিমালয় সংগ্রহ ক'রেছি অথচ এদেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা দেখেছ? প্রত্যেকটি ভারতীয় শিশু — হিসেব ক'রে দেখ জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় চাপছে দুশো ছেষট্টি কোটি টাকা বিদেশী দেনা।

বিশ্বজিৎকে এ সময় খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তার চোখে মুখে যে শান্ত চিন্তাশীলতা সব সময়েই ফুটে থাকে তার পরিবর্তে জেগে উঠেছে প্রচণ্ড উত্তাপ, আর তা যেন তাপ বিকিরণ ক'রছে! এমিলি এক নতুন রূপে অন্য বিশ্বজিৎকে প্রত্যক্ষ ক'রতে লাগল। বিশ্বজিৎ-এর মুখে নতুন কথা শোনবার জন্যে সে চুপ ক'রে রইল একজন উঁচুদরের শ্রোতার ধৈর্য নিয়ে। ভারতবর্ষে এসে বা তার আগে এদেশ সম্বন্ধে অনেক মানুষের কাছে অনেক কথাই শুনেছে সে, অনেক রকম কথা, কিন্তু আজ যা বলছে বিশ্বজিৎ তা একেবারে নতুন, অশ্রুতপূর্ব, অভাবিত। কাকা ভারতবর্ষ বলতে সেই সামগান-বেদোচ্চারিত এক শান্ত জগতের স্মৃতি বহন করেন বলে বারংবার সেই অতীত ভারতের কথাই বর্ণনা করেন। তিনি ভারতবর্ষ বলতে গিয়ে এক মন্দিরের দৃশ্য বর্ণনা করেন যেন সব সময়েই। অন্য কোন কথাই বলেন না। যে লোক অতীত ভারত সম্বন্ধে পড়াশোনা ক'রেছে সে নিশ্চয়ই বর্তমান ভারতের কথাও জানবে, অথচ কাকার বর্ণনায় কোথাও বর্তমান ভারত থাকে না। বর্তমান ভারতকে সে বিশেষভাবে যার কাছে জেনেছে সে-ও যেন অনেকটা ওই বেদমন্ত্র মুখরিত এক শান্ত গাম্ভীর্যের চলমান প্রতীক — কল্যাণ। কাকার বর্ণনা শুনে শুনে জানা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রলে সে বলেছে, এ সব অতীত দিনের স্মৃতি। তবে সত্য। এখনও পাহাড়ে জঙ্গলে হয়ত এমন অনেক তাপস আছেন যাঁরা বুকের মধ্যে বেদমন্ত্রের ধ্বনি রেখেছেন জ্বালিয়ে। — আরও অনেক কথা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শুনেছিল তারমধ্যে কোথাও বিশ্বজিৎ-এর কণ্ঠস্বর ছিল না। কিন্তু এও তো ভারতবর্ষ। আর এক ভারত কথা বলছে! আত্মবিশ্লেষণ মগ্ন, ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ ভারত প্রকাশ ক'রছে তার অসন্তোষ। কাকা হয়ত বলবেন, এ হচ্ছে সেই শাশ্বত ভারতআত্মার স্বর। কল্যাণ হ'লে কি বলত কে জানে? কল্যাণ হয়ত বলত, এ-ও এক রকম ভালবাসা, গভীর ভালবাসা; একেবারে নিজের মনের মত ক'র চাওয়া।

হয়ত সেটাই ঠিক, ভালবাসে বিশ্বজিৎ। নিজের দেশকে কল্যাণের মতই ভালবাসে। অত্যুক্ষ ভালবাসায় হয়ত এ আরও গভীর। কল্যাণের ভালবাসায় হয়ত কিছু আছে বৈরাগ্যের বিভূতি-প্রলেপ কিন্তু বিশ্বজিৎ-এর প্রেম গাঙ্গেয় পলিমাটি। এমিলির ভাবনাকে বেশী সময় না দিয়েই বিশ্বজিৎ বলে উঠল,

এইসব অসৎ লোক দেশের প্রত্যেকটি ক্ষমতার বিন্দুতে বসে আছে, সাধারণ মানুষকে শোষণ ক'রে নিজেদের লালসা চরিতার্থ ক'রছে। এদেশের আইন এদেরই রক্ষা করে, এদেরই স্বার্থরক্ষা করে প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ফলে অপ্রতিহত এরাই আজ হয়ে উঠেছে দেশের অসংখ্য জনতার দারিদ্রের কারণ।

এতক্ষণে এমিলি একটিমাত্র প্রশ্ন ক'রল, এইসব লোককে তোমরা সহ্য কর কেন?

সহ্য করা না করার মালিক যারা, তারা তো সব এদেরই দোসর। এরাই সব নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন ক'রে নিজেদের লুঠের অধিকার কায়েম রাখে।

অধিকার 'কায়েম' রাখা ব্যাপারটা বুঝল না এমিলি। অনেক শব্দেরই অর্থ সে এখনও জানে না বলে বেশ অসুবিধে হয় তার। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নেয়, মাঝে মাঝে অসুবিধে হয় জানতে, কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করা হয় না বলে জানাও যায় না। আন্দাজে কিছুটা বুঝে কিছুটা না বুঝে চুপ ক'রে থাকে। তবে এবার সে জানতে চাইল, কেন, ওরা সরকার গঠন করে কেন? তোমরা করো না কেন?

কয়েক মুহূর্ত ভাবল বিশ্বজিৎ, তারপর বলল, আমাদের গরীব দেশ, এখানে যে নির্বাচন হয় তাতে টাকা প্রচুর লাগে। সেই টাকা জোগায় তেমনি সব লোকে যাদের হাতে প্রচুর টাকা অপব্যয় করবার মত থাকে। আর সেই সব টাকা তারা তেমনি প্রার্থীকেই দেয় যারা নির্বাচনে জিতে নিশ্চিতভাবেই তাদের সাহায্য ক'রবে, অর্থাৎ স্বার্থরক্ষা ক'রবে।

এমিলি কথাগুলো মন দিয়েই শুনছিল, কিছুক্ষণ ভেবে বুঝে বলল, তোমার যুক্তি ঠিক।

তাহ'লেই বোঝ এই সব দুশ্চরিত্র বদমাস লোকেদের শোধরানোর কোন উপায়ই এদেশে নেই।

কিন্তু আমাদের দেশেও তো নির্বাচনে চাঁদা দেওয়া নেওয়া হয় —

তোমাদের দেশের পরিস্থিতি আমি জানি না বউদি। সে দেশ নিয়ে ভাবিও না। আমি এদেশ সম্বন্ধে জানি, ভাবি, বলছি।

হঠাৎ বিশ্বজিৎ-এর মুখে 'বউদি' শব্দটা বেরিয়ে পড়তে শুনে খুবই খুশী হ'ল এমিলি। অন্য সব প্রসঙ্গ ভুলে নিমেষে সে বলল, তোমাদের ভাষায় এই যে শব্দটা এটা বাস্তবিকই খুব সুন্দর। এত সুন্দর একটা শব্দ আর কোনও ভাষায় আছে কিনা আমি জানি না। বড় মিষ্টি কথা।

বিশ্বজিৎ এমত আকস্মিক প্রসঙ্গ পরিবর্তনে হকচকিয়ে গেল। পরক্ষণেই সে বুঝে বলল, তোমার হয়ত বিশেষ ভাল লাগে অথবা নতুন শুনছ বলেই এত বেশী ভাল লাগছে।

তা নয়। কি সুন্দর সম্পর্কের কথা নির্দেশ ক'রছে শব্দটা?

আমাদের এই সম্পর্কটা খুব মধুরও বটে। তবে কি জান এদেশের আর্থিক

অনটন আমাদের জীবনের সব সৌন্দর্য নষ্ট ক'রে দিচ্ছে।

তুমি একজন বিজ্ঞানকর্মী হয়েও এত অর্থনীতি জানলে কি ক'রে ?

অর্থনীতি তো জানি না। আমি যা বলছি এ কেবল ব্যবহারিক জীবনের কথা, এর মধ্যে কোথাও অর্থনীতির গন্ধ নেই।

বাদপ্রতিবাদে গেল না এমিলি। বলল, যাক গে এখন যা বলছিলে তাই বল।

কি বলছিলাম ভুলে গেছি।

ওই সৌগতর কথা।

ওর মত লোকের কথা কি আর বলব, ওর মত লোকের জন্যে খতমই হচ্ছে একমাত্র বিচার।

খতম মানে ?

মানে ওদের এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া, যাতে মানুষের সমাজ থেকে এইসব নোংরা বোঝা কমে।

কথাটা বলবার অনেক আগেই বিশ্বজিৎ-এর উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল বলেই খুব শান্তভাবে কথাগুলো বলছিল সে। এমিলিও তাই কথাটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিল না, তবে সে বুঝল বিশ্বজিৎ অত্যন্তই ঘৃণা করে সৌগতকে। ঘৃণা তো সে নিজেও করে কিন্তু কি হবে তা দিয়ে ? ঘৃণা ক'রে ক'রছে কি ? সংসারের উপকার তো আর কিছু হচ্ছে না — রুমিও বুঝছে না তার চরিত্র, ওর মা-ও অপছন্দ ক'রছেন না তাকে জামাই হিসেবে।

বিশ্বজিৎ অকস্মাৎ জানতে চাইল, তা তুমি হঠাৎ ওর বিষয় জানতে চাইলে কেন ? তোমার সঙ্গেও কোন খারাপ ব্যবহার ক'রেছে কি ?

এমিলি বেশ দ্বিধা ক'রে বলল, তা ঠিক নয়। আমার সব সময়েই কেমন ভয় করে ওকে। আসে যায় আত্মীয়তাও ধর নিশ্চিত অথচ ওর আচার আচরণ আমার ঠিক নির্ভরযোগ্য মনে হয় না।

বিশ্বজিৎ বলল, ওর পক্ষে সবই সম্ভব। কিছু কিছু ব্যাপারে ও যথার্থই পশুর মত। চতুষ্পদ জন্তুদের যেমন মা-বোন জ্ঞান থাকে না ওরও সে জ্ঞান নেই। —কথাগুলো বলে স্বগতোক্তির মত বলল, আমার হাতদুটো যে বাঁধা নইলে ইচ্ছে করে নিজের হাতে এই রকম একটা জানোয়ারের গলার টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলি।

কথাগুলো অস্পষ্টভাবেই শুনল এমিলি, দেখ। রাগে যেন ফেটে পড়ছে বিশ্বজিৎ। তার মুখে চোখে দারুণ উষ্মা এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে একটা অগ্নিকুণ্ডের মত দেখাচ্ছে তাকে। যে তেজ বিকীর্ণ হচ্ছে তাতেই যেন জ্বলে যাবে সৌগত আর তার মত অসংখ্য ভ্রষ্টাচারী। কিন্তু আরও একটা প্রশ্নের সমাধান সে ক'রতে পারছে না ঘুষই যদি নেয় সৌগত, তাহ'লে তার জন্যে কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা করে না কেন ? কথাটা সে বিশ্বজিৎকেও জিজ্ঞেস করল।

কর্তৃপক্ষও তো এদেশে ঘুষখোর। তাছাড়া ঘুষ যে নেয় সে তো আইন

বাঁচিয়েই নেয়। এদেশের আইন শিথিল, শাসন শিথিল, বিচার শিথিল — শুধুমাত্র ন্যায়ের জন্যে লড়াই করাই হচ্ছে অপরাধ। শাস্তির ব্যবস্থা শুধু রাজনৈতিক বিরুদ্ধতার জন্যে। — বিশ্বজিৎ দৃঢ়ভাবে একজন রাজনৈতিক নেতার স্বরে কথাগুলো বলে গেল। তারপর অত্যন্ত শান্ত স্বরে বলল, এ দেশটা যে কিভাবে চলছে সেটা বাইরে থেকে কেউ বুঝবে না। এদেশেরই যারা বাইরে থাকে তারাও বুঝতে পারছে না প্রকৃতপক্ষে কি এর অবস্থা।

এমিলি বুঝল যে কথাটা তাকেই বলছে বিশ্বজিৎ, হয়ত তাকে অনধিকার চর্চা ক'রতে নিষেধ ক'রছে এই কথার মাধ্যমেই। তাই এমিলি ম্লানভাবে বলল, আমার পক্ষে অল্প ক'দিন দেখে এখানকার পরিস্থিতি বোঝা একই রকম অসম্ভব একথা ঠিক।

বিশ্বজিৎ তখন অন্যচিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল তাই এমিলির কথাগুলো শুনতে পেল না। এমিলি ভাবল বিশ্বজিৎ অসন্তুষ্ট হয়েই জবাব দিচ্ছে না। নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল এইসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করার জন্যে। এসব কথা না তুললেই ভাল ছিল। সৌগতর কথা জিজ্ঞাসা করাও উচিত হয়নি। এভাবে যে কোন একজন ভদ্রলোক সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে যাওয়া নিশ্চিতভাবেই অভব্যতা, শিষ্টাচার বহির্ভূত। এমিলির অন্তত উচিত হয়নি ওটা ক'রতে যাওয়া। কে জানে বিশ্বজিৎ কি ভাবে ধরবে সমস্ত জিনিষটাকে, যদি খুব একটা খারাপ কিছুই মনে করে তাতেই বা কি করবার থাকবে তার? বরং একটা অত্যন্ত খারাপ ধারণা চিরদিনই মনের মধ্যে ধরে রাখবে বিশ্বজিৎ। আর সেই ধারণা কোনদিনই বদলাবে না। সাধারণ ব্যবহার বজায় রেখেও মনে মনে তাকে হয়ত ঘৃণাই করে যাবে সে চিরদিন। সে হবে বড়ই লজ্জার এবং মর্মদাহের। সে ধারণা তো কোনদিন ভাঙ্গবে না, ভাঙ্গতে পারবেও না এমিলি।

তার চেয়ে এখনই এর বিহিত করা দরকার। এখনই অকপটে স্বীকার করা দরকার যে সৌগত সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে এমিলি যে অন্যায় ক'রেছে তার জন্যে যেন মার্জনা করে বিশ্বজিৎ। বললও সে। শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল বিশ্বজিৎ, অন্যায়! কিসের অন্যায়? ওর সম্বন্ধে সজাগ থাকা প্রত্যেক ভদ্রমহিলার কর্তব্য। আমার তো মনে হয় ওকে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়।

এবার এমিলি। সে কিছুটা বিস্মিত অধিকন্তু আশ্বস্ত হ'ল, যাক তাহ'লে সে যা ভাবছিল তা নয়, অসন্তুষ্ট হয়নি বিশ্বজিৎ। সত্যিই বিশ্বজিৎ বড় ভাল ছেলে, দূর থেকে যতটা দেখা যায় তার চেয়ে অনেক ভাল। যারা ওর সঙ্গে কথা না বলবে, না মিশবে তারা কি ক'রে বুঝবে ওকে? কেমন ক'রে জানবে ওর মনের কথা? ওপরে কঠিন এই ছেলেটির মধ্যে যে এমন নরম মন সবসময় নানা চিন্তায় সজাগ হয়ে আছে তা দূর থেকে কেউ বুঝবে কি ক'রে? এমিলি

নিজেই কি বুঝেছিল ? অনেকটা মিল আছে কল্যাণের সঙ্গে। যদিও কল্যাণ অন্য সুরে কথা বলত, নরম কথা, আর বিশ্বজিৎ কথা বলে শক্ত দৃঢ়। কিন্তু দুজনেই নিজের দেশের আর দেশের মানুষের কথা বলে। দুজনের মনে একই আগুনের চেতনা তফাৎ এই যে কল্যাণ জ্বলে প্রদীপ শিখার মত বিশ্বজিৎ দেশলাই কাঠির বারুদ — একজন যেখানে নরম আলোর উদ্ভাসে আত্মমগ্ন অন্যজন সে সময় যেন অপরকে চায় আলোয় উদ্বুদ্ধ ক'রতে, জ্বালিয়ে দিতে। একজন যেখানে স্মৃতির সৌন্দর্যে বিভোর অন্যজন তখন বর্তমানের বিচ্যুতিতে ক্ষুব্ধ।

সাহস পেয়ে এমিলি প্রশ্ন ক'রল, আচ্ছা বিশ্বজিৎ, তোমার উচ্চাশা নেই ?

উচ্চাশা ! সে কি ? — উচ্চাশা শব্দটা না জানায় কথাটা ইংরিজিতে বলেছিল এমিলি। বিশ্বজিৎ-ও ইংরিজি শব্দটা ব্যবহার ক'রেই প্রতিপ্রশ্ন ক'রল। এমিলি ভাবল সে বাংলা শব্দ বলতে না পারায় বোধহয় এমনি কথা বলছে বিশ্বজিৎ, তাই সে বলল, আমি বাংলা শব্দটা জানি না।

তাতে কি ? শব্দের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে বস্তুর কথা। এম্বিশন মানে হচ্ছে উদ্দেশ্য। আসলে উচ্চাশা বস্তুটি কি তাই আমার জানা নেই।

এটা তুমি বোধহয় ঠিক বলছ না — এমিলি অবিশ্বাস জানাল।

না তুমি এটাকে অন্য অর্থে ধরো না। এদেশে উচ্চাশা থাকা মানে হয়ত অনেক টাকার মালিক হওয়া অথবা এমন কিছু যা আমরা জানি-ই না।

এমিলি এবার বিশ্বজিৎ-এর কথার তাৎপর্য অনুধাবন ক'রতে পারল — সেই বিক্ষোভ। বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গে ক্ষুব্ধ হৃদয় কথা বলে বিশ্বজিৎ-এর মধ্যে থেকে। তখন বিশ্বজিৎ অন্য মানুষ। সে মানুষ বলে অত্যাচারীকে হত্যা করার নাম কখনই খুন হতে পারে না, তার নাম খতম, সে হচ্ছে তার নির্ধারিত শাস্তি। মনে মনে তখন সে ভয়ঙ্কর, বিশাল, দুর্বার। এমিলি তাকে সমীহ করে। ঠিক আগের সময়টির যে স্নেহ তারই পরিবর্ত হিসেবে আসে সমীহ। এদেশ এবং তার মানুষ হিসেবে অন্য উপলব্ধি ঘটে তার। সে অনুভব করে তার দেশ আর এ দেশ-এ একটা বিরাট মৌলিক ব্যবধান। তাহ'ল একটি পূর্ণবয়স্ক চলমান যুবকের সঙ্গে একটি আসন্নজন্ম গর্ভস্থ শিশুর ব্যবধান। এদেশ এখনও সংগ্রামই ক'রে চলেছে — হয়ত সে সংগ্রাম তার স্বাধীনতারই সংগ্রাম। কিন্তু ধারণাটা তার কাছে এতই অস্পষ্ট যে সেটা স্পষ্ট করে বোঝার জন্যে বিশ্বজিৎ এর সাহায্য নিতে হয় — আচ্ছা এরকমটা কেন হচ্ছে বলতে পার ? যদিও আমি রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে একেবারেই কিছু জানি না, তবু জানতে ইচ্ছে ক'রছে — আমি যেন দেখছি তোমাদের দেশে অতীতে যে শান্ত পরিবেশ ছিল তা এখন একবারেই নেই।

বিশ্বজিৎ এমিলির দিকে সরাসরি তাকাল। ওর চোখের দৃষ্টিতে কি এক তীব্র আলোকচ্ছটা ছিল যাতে এমিলির দৃষ্টি বিচলিত হ'ল, সে যেন কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারছিল না তার তীব্রতা। কয়েক নিমেষেই তার চক্ষু-

বলয়ের অন্তর্লোকে যে অনুভূতি কেন্দ্র আছে সেখানে দারুণ চঞ্চলতা সঞ্চারিত হ'ল।

আসলে বিশ্বজিৎ তাকে বুঝে নিতে চেষ্টা ক'রল। সে জানতে চাইছিল এমিলির আগ্রহে সত্য কতটুকু আর কতটা তার উদ্দেশ্যমূলক। এমিলির চোখে কোন ধূর্ততা না দেখতে পেয়ে সে বলল, তোমার এ জিজ্ঞাসায় আন্তরিকতা আছে বলেই আমার মনে হয়, আর আমি আশ্চর্য হচ্ছি এইজন্যে যে সাধারণ কোন মানুষের মনে এই সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো ধরা পড়ে না, তার কারণ অবশ্য এই যে তাদের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ, এ সব বিষয়ে জানবার কোন প্রয়োজন থাকে না তাদের। কিন্তু তোমার এই জিজ্ঞাসার কারণ আমার অজ্ঞাত। এই পর্যন্ত বলে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল বিশ্বজিৎ, তারপর নিজেই আবার বলল, তবে কারণ যাই হোক আর তুমি যে-ই হও প্রশ্ন যখন ক'রেছ তখন উত্তর দেওয়াটাও আমার কর্তব্য। আসলে কি জান আমাদের দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। এদেশের মানুষ এখনও পরাধীন। বড়লোকেরা যখন বাড়ীর বাইরে যায় তখন যেমন বাড়ীটা তাদের দারোয়ান আর কুকুরদের হেফাজতে রেখে যায় আমাদের দেশেরও বিদেশী প্রভুরা তেমনি ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে বসিয়ে গেছে তাদের বিশ্বস্ত অনুচরদের। ফলে সাধারণ মানুষ এই আমলাদের দ্বারা আরও বেশী শোষিত।

এ এক নতুন কথা। নতুন অভিজ্ঞতা। অন্য এক ভারতবর্ষ কথা বলছে। এখানে কল্যাণ জানা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। তার আত্মতুষ্টি নেই, তার গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিময়তা নয় রুক্ষ রূঢ় ইস্পাতকঠিন বাস্তব এখানে বাঙ্ময়। এই সুদর্শন কমনীয়কান্তি যুবক-এর মধ্যে এমন কাঠিন্য। এই স্বরে কি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে না এরই গভীর মনের নৈরাশ্যপীড়িত কোন একক চিন্তা? সে জানতে চাইল, তুমি দারুণ কথা বললে ভাই। এ চিন্তা আর কোনও লোক করে নি?

অসংখ্য মানুষ এই কথা ভাবছে, প্রকাশ ক'রতে পারছে না। যারা প্রকাশ ক'রছে তারা মরছে।

মরছে! বল কি?

হ্যাঁ। কিন্তু মৃত্যুর ওপর তারা তৈরী ক'রে যাচ্ছে নব জাগরণের বনিয়াদ — বিশ্বজিৎ-এর কথাগুলো আদর্শবাদীর স্বগতোক্তির মত শোনাল। সে কথাগুলো এমিলির কাণে গেলেও মনে গেল না, তার মন জুড়ে বসে ছিল 'মরছে'। সে জানতে চাইল, কি ক'রে মরছে?

প্রত্যেকদিন খবর দেখছ না কাগজে? বিপ্লবী যুবকেরা কেমন বীরের মত মরছে এই ভ্রষ্টাচারী শাসকদের ভাড়াটে পুলিশের গুলিতে।

তুমি কি ওদেরই সমর্থন কর? — যুগপৎ ভয়ে এবং বিস্ময়ে প্রশ্ন ক'রল এমিলি।

বিশ্বজিৎ জবাব দিল না। অন্য প্রসঙ্গ এনে বলল, তোমরা ধনী দেশের নাগরিক, স্বাধীন জাতি, বুঝবে কি আমাদের কথা? ওসব থাক।

থাক বললেই কি থাকে? এমিলির সমস্ত চেতনা জুড়ে তখন ওই এক

নাম নিয়ে এসে গদীতে বসে ওঁরা আইন শৃঙ্খলা একেবারে শেষ ক'রে গেছেন।

ছোটলোকদের মাথায় তুললে যা হয় এ-ও তাই হয়েছে আর কি, মন্তব্য ক'রলেন সুপ্রীতি।

পরীক্ষিৎ যেহেতু স্ত্রীর সব কথাকে প্রশ্রয় দেওয়া অ-বিবাহ রপ্ত ক'রেছেন তাই যে কথা গুরুত্বপূর্ণ নয় তাতেও সায় দেন নীরবতায়। পরীক্ষিৎ পুঁথিগত তত্ত্ব জানেন এবং বাস্তববোধও তাঁর যথেষ্ট তাই তিনি স্বচ্ছভাবেই বোঝেন যে সুপ্রীতিদেবীর ছোটলোকেরাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজের নিয়ন্ত্রক সংখ্যা। অতএব যাঁরা লাল শালু নিয়ে এসে বসেছিলেন তাঁরা এবং অন্যরঙের কাপড় উড়িয়ে যাঁরা বসবেন তাঁরাও সবাই ওই ছোটলোকদের প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হবেন — যে প্রশ্রয় দেওয়াকে মাথায় তোলা বলে সুপ্রীতি মনে করছেন। আসলে সেটা যে মাথায় তোলা নয় তাদের আশ্রয় ক'রে আখের গোছানো এ তো স্ত্রীবুদ্ধির এক্তিয়ারভুক্ত হবার কথাও নয়। অনেকটা অনুকম্পামিশ্রিত উপেক্ষায় চুপ ক'রে থাকা পরীক্ষিৎ-এর, যাতে সুপ্রীতি এটাকে স্বচ্ছন্দেই সমর্থন বলে মনে ক'রে নিতে পারেন। আসল ব্যাপার যেটা সেখানে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত তো বটেই বরং স্ত্রীর বিচক্ষণতার জন্যে তাঁর তৃপ্তি মনোরম। গ্রামের পরিস্থিতি ভয়াবহ, এই পরিস্থিতিতে একমাত্র পাগল ছাড়া আর কেউ গ্রাম বেড়াতে যাবার কথা ভাবতে পারে না।

প্রসেনজিৎকে কথাগুলো বলার সময় একটি পরিবর্ত পরামর্শও দিলেন পরীক্ষিৎ — একটা কাজ করো না, এমিলির কাকা তো কয়েকটা দিন বাদেই দিল্লী এসে পৌঁছচ্ছেন। এমিলিকে নিয়ে বরং তুমিও চলে যাও, দিল্লীর আশেপাশে আগ্রার ওদিকের গ্রামগুলো ওকে দেখিয়ে নিয়ো।

প্রসেনজিৎ কোন জবাব দিল না তবে কথাটা তার মনঃপূত হয়েছে নিঃসন্দেহেই। এমিলির সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কোন কথা বলতেই সে রাজী নয় তাই চুপ ক'রে থাকল। পরীক্ষিৎ নিজেই আবার বললেন, আমি যা শুনেছি তাতে ভুল যদি না থাকে তাহ'লে তো তিনি এদেশে বেড়াতেই আসছেন?

ওঁর ইচ্ছে বিদেশে কোথাও থাকবেন। পছন্দমত একটা জায়গা পেলে আর দেশে উনি ফিরবেন না। অনেকটা সেই উদ্দেশ্যেই এই দেশ-ভ্রমণ। — প্রসেনজিৎ জানাল।

তাহ'লে আরও দেশ ঘুরে আসছেন?

না, ভারতবর্ষে সোজা-ই চলে আসছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওঁর বিশেষ দুর্বলতা আছে। — এবিষয়ে এমিলিই ভাল বলতে পারবে।

কথাটা যেহেতু খাবার টেবিলে বসে হচ্ছিল এবং বাড়ীর প্রথা অনুসারে এমিলিও একপাশে বসে খাচ্ছিল সেজন্যে তাকেই মাছের টুকরোটা গিলে নিয়ে বলতে হ'ল, কাকা চিরদিনই বলতেন ভারতবর্ষের পুরাণো চিন্তাধারা অত্যন্ত সুন্দর। প্রত্যেক মানুষেরই শেষ বয়সে সংসার ছেড়ে আশ্রম জীবনে যাওয়া উচিত।

বাঃ, তারিফ করলেন পরীক্ষিৎ, বললেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তোমার কাকার ধারণা তো খুবই উঁচুস্তরের!

হ্যাঁ। ভারতীয় সভ্যতা আর সমাজ জীবনকে উনি খুবই পছন্দ করেন। অফিসের কাজের পর ও'র অভ্যেস বই পড়ার। প্রায় সব বই-ই ভারতবর্ষের সম্বন্ধে। কত বই যে পড়েছেন তার শেষ নেই। মাঝে মাঝে কোন কোন বই আমাকে দিতেন, বলতেন পড়ে দেখ।

পরীক্ষিৎ নিজের খাবারের মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন বলে শুধু মাথা নাড়লেন কোন কথা মুখে না বলে।

এমিলিই আবার বলল, তবে ও'র বিশেষ আকর্ষণ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার ওপরে। আফ্রিকা আর এশিয়ার যে সব অংশে পুরাণো সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় তা উনি সংগ্রহ ক'রতে ভালবাসেন।

পরীক্ষিৎ এবার মন্তব্য ক'রলেন, আমরা আগে সভ্য ছিলাম সত্যিই, এখন অসভ্য হয়ে গেছি। এখন এদেশকে আর আদৌ সভ্য বলা চলে না।

এমিলি কোন শব্দ ক'রল না। এ কথার জবাব না জেনে কিছু বলা অসঙ্গত মনে ক'রল সে, জবাব দিল প্রসেনজিৎ, বলল, কথাটা তুমি সত্যি বলেছ বাবা। গতকাল আমাদের কারখানায় কর্মীরা যা ব্যবহার ক'রল কোন ভদ্রদেশে এরকম ব্যবহার দেখা যায় না। অথচ সামান্যই কারণে।

এদেশে সাধারণ কর্মচারীরা শুধু তোমার কারখানা বলে কেন সব অফিসেই ভদ্রতার সীমার অনেক নিচে নেমে গেছে। ইউনিয়নগুলো এত বেশী প্রশ্রয় দিচ্ছে যে দায়িত্ব বলে যে একটা কথা আছে তা সবাই ভুলেই গেছে।

জাস্ট সো — তুমি একেবারে ঠিক বলেছ। আমি স্পষ্ট দেখছি একজন কর্মী অন্য দেশে, আমেরিকার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, যা কাজ করে এখানে তার বোধহয় দশভাগের একভাগও হয় না। আর সেইটুকুও তারা ক'রতে চায় না। সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে কোন ডিসিপ্লিন নেই। যে যা ইচ্ছে ক'রবে, তার প্রতিকার করা চলবে না।

এমিলি মন দিয়ে না শুনলেও প্রসেনজিৎ আর তার বাবার আলোচনা তার কাণে গিয়ে পেঁীছাতে লাগল। এসব এমন বিষয়বস্তু যা সে নিজে চোখে দেখতেও পায় না আর এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভবও নয় তার পক্ষে। তা ছাড়া এদেশের যা কিছু তার পূর্ব পরিচিত অর্থাৎ যা সে স্বদেশে থাকতেই শুনেছে তার মধ্যেও এসব কথা ছিল না। এই আলোচনায় সে কোন আকর্ষণ অনুভব করে না তার কারণ এর কোথাও রমণীয় কিছু নেই। বিষয়বস্তু যেখানে কোমল নয়, সুন্দর নয়, সেখানে এমিলি বিশেষ উৎসাহ বোধ করে না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার আকর্ষণের মূলও সেই সৌন্দর্যময়তা যা অনেকটা কেবলমাত্র কল্যাণের স্বপ্নের মধ্যেই বিচরণ ক'রে বেড়াত। হয়ত সবই তার সত্য কিন্তু সে সত্য আংশিক। কিন্তু সেই আংশিক সত্যই আপন

বিশ্বাস মিলিয়ে এক পূর্ণরূপের সৃষ্টি ক'রেছিল কল্যাণ, সেই রূপ মোহণীয়। আর সেই মোহন রূপই এমিলির কাছে সত্য হয়ে সব কিছুর উর্ধে উঠে দাঁড়িয়ে গেছে যাকে অতিক্রম করা এই সব দৈনন্দিন বিষয়বস্তুর সাধ্যাতীত। আসলে কল্যাণের স্মৃতিতে সে এক অন্য যুগ, বর্তমানের সঙ্গে বৈপরীত্য যার অত্যন্তই তীব্র। তবে কল্যাণ নিজেও সেই স্মার্ত ভারতের প্রতিনিধি, স্বদেশ তার আদর্শের, সে আদর্শ হয়ত বাস্তবের সঙ্গে না-ও মিলতে পারে তাতে তার হৃদয়ের বিশ্বাস খোয়া যায় না — যখন মেলে না তখন অন্য এক স্বপ্ন এসে যোগ দেয়, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি। আর সেই স্বপ্নই তার প্রবাসের কানে বারংবার গান হয়ে বেজেছে, তারই প্রতিধ্বনি বেজেছে এমিলির অন্তরে।

আজ কল্যাণের সেই 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী' দেশে এসে বাস্তবে যা দেখছে তাতে মিলছে না সেই সুর। অনেক জায়গাতেই তাল কেটে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও অল্প একটু মিলছে। একমাত্র ঠাকুমার মধ্যে এমিলি কল্যাণের বিধবা মাকে ছেলের জন্যে প্রতীক্ষিতা দেখতে পাচ্ছে, বিশ্বজিৎ-এর মধ্যে উঁকি মারছে একটি সপ্রাণ তরুণ। যে স্বচ্ছন্দে ভাইও হতে পারে আবার এদেশী জীবনযাত্রার সবুজ সম্পর্কে দেবরও হতে পারে। যদিও ছেলেকে দিনান্তে একবারও মার কাছে যেতে দ্যাখে না এমিলি, দৈবাৎ-ই কোনদিন মার খবর নিতে দ্যাখে পরীক্ষিৎকে তবু ঠাকুমা প্রায়ই জানতে চান তাঁর ছেলে বাড়ী ফিরছে কিনা, অথবা খাওয়া হয়েছে কিনা তাঁর ছেলের। এই ব্যাকুলতা সারা পৃথিবীর মায়েরই, তবু এমিলি তার নিজের মনের আলোর প্রতিক্ষেপণে সুক্ষ্মভাবে বিচার ক'রে দেখেছে বোধহয় একটু বেশীই এই বাঙ্গলা মায়ের। শুধুমাত্র ব্যবহারেই নয় ঠাকুমার কথা থেকেও একজন মাকে সে দেখেছে যে মা এক স্বতন্ত্র কোমলতায় পুষ্পসুলভ। এমিলির মনের মধ্যে ঠাকুমার একটা কথা অন্তত প্রায় সময়েই বাজে, সে কথা দুঃখের। দুঃখ ক'রেই ঠাকুমা একদিন বলেছিলেন, দ্যাখো দিদু, যাই করো ছেলেকে কখনও দূরে রেখে মানুষ ক'রো না। আজকাল যে কি সব কায়দা হয়েছে ছেলেকে হোস্টেলে রেখে দেওয়া — স্কুল বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দেওয়া — সে বড় খারাপ। যে ছেলে মানুষ হবার সে কাছে থাকলেও হবে দূরে গেলেও হবে। কিন্তু দূরে থাকলে ছেলে আর তোমার 'ছেলে' থাকবে না তোমার কর্মচারী হয়ে যাবে।

কেন ঠাকুমা? একথা কেন বলছেন? — জানতে চেয়েছিল এমিলি।

সে বাপ-মা বলতে চিনবে খালি পাঠানো টাকা আর দরকার মত জামাকাপড়। মাস ফুরোলে কর্মচারীরা যেমন মাইনের টাকার জন্যে তাকিয়ে থাকে মালিকের দিকে, ছেলেও একটু বড় হলে অমনি বাড়ীর টাকার দিকেই তাকাতে শিখে যায়।

কথাটা বেশ কিছুক্ষণ ভাবল এমিলি। বুঝল নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই দুঃখ ক'রছেন ঠাকুমা, কিন্তু কথাটিতে সত্য আছে। যে যুগে বাস ক'রে ঠাকুমা কথাটি বলছেন তার উপযোগী কথা হয়ত হচ্ছে না কিন্তু ছেলেকে

মনের কাছে ধরে রাখার যে ব্যাকুলতা তা যুগোত্তীর্ণ কালাতীত প্রাণচেতনার অভিব্যক্তি, তাতে দ্বিমত থাকা সম্ভব নয় একেবারেই। আর এই প্রাণচেতনার প্রতিবিম্বে আলোকিত যারা তারাই একমাত্র কল্যাণ হতে পারে। মোহ নয়, লোভ নয়, অঢেল বিলাসের প্রাচুর্য নয় — সব কিছুর বিনিময়ে তারা বেছে নেয় মায়ের হৃদয়, মায়ের স্নেহচ্ছায় নিত্যসঙ্গ। কল্যাণ প্রায়ই বলত, তুমি তো বলছ এমিলি যে এযুগে কলকাতা ফিলাডেলফিয়ার দূরত্ব একটা রাত্রির ঘুমের মত। কিন্তু আমার এখানকার অশেষ সুখও মায়ের একাকীত্বের কণ্টকর বেদনাকে মুছিয়ে দিতে পারে না। আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না আমার দুঃখী মা কি অসীম ধৈর্যে একা নিঃশব্দে কেরোসিনের আলো জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা ক'রে থাকেন তাঁর ছেলে ফিরবে, তাঁর কাছে বসে দুঃখে দুঃখিত হবে, সুখে ভাগ ক'রে ভোগ ক'রবে সেই সুখ।

তবু অন্তিম প্রতিবাদ ক'রেছিল এমিলি, তুমি এত কিছু শিখে সেই গ্রামে গিয়ে কি ক'রবে?

গ্রামে আমার কাজ নেই তা জানি, শহরেও যে উপযুক্ত কাজ পাব তারও আশা নেই, কারণ আমাদের দেশে কাজের এত সুযোগ গড়ে ওঠে নি।

তবে তুমি ফিরে যাবার জন্যে এত ব্যাকুল কেন?

করুণ একটুখানি হেসে কল্যাণ বলেছিল, সে আমার দেশ বলেই।

তুমি যদি শহরেই থাক তাহ'লে তোমার মা তো সেই আলাদাই থাকবেন?

তাঁকেও আমার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখব।

এখানেও তো রাখতে পার তাঁকে?

তা অসম্ভব।

কেন?

আমাদের দেশের শহরের সঙ্গে সে দেশের গ্রামের পার্থক্য কম, এই দেশের শহরের সঙ্গে আমার গ্রামের তুলনাই চলে না। আমাদের দেশে এক রকম মাছ আছে জল থেকে তোলামাত্র মারা যায়, কারণ তারা জল ছাড়া অন্য কোন অবস্থাকে সহ্য ক'রতে পারে না। এদেশে এলে মার অবস্থাও সেইরকমই হবে।

যত কথাই হোক এমিলির মন সেদিন মানতে চায় নি যে সত্যিই কল্যাণ শুধুমাত্র মায়ের জন্যেই ফিরে যেতে চায় নিজের দেশে। মনে হয়েছে আরও কিছু হয়ত আছে। দীর্ঘদিন সেই বিশ্বাসই কাজ ক'রেছে মনের মধ্যে। এখানে এসেও সেই কৌতুহল মনের মধ্যে অনড় পাথরের মত বসে থেকেছে জানতে হবে, দেখতে হবে কিসের কারণে হঠাৎ চোরের মত পালিয়ে এসেছে কল্যাণ? কল্যাণ-এর মুখোমুখি তাকে হতেই হবে। কল্যাণ-এর মুখ থেকেই সে শুনবে সেই গূঢ় তথ্য। কিন্তু সেই সন্দেহ থেকে অনেকটা মুক্ত হয়েছে এমিলি ঠাকুমার সঙ্গে পরিচয়ের নিবিড়তায়। এত কিছুর মধ্যে থেকেও ঠাকুমাকে কেন যেন অসহায় মনে হয় তার। আপন পরিবারের মধ্যে থেকেও ঠাকুমা নিজেকে খুব

একা মনে করেন। মুখে কিছু বলেন না কিন্তু অনেক ভাব আছে যা কথার চেয়েও বেশী ফুটে ওঠে। অনেক ব্যাথা আছে যা চেঁচিয়ে বলার চেয়েও বেশী বাজে অপরের অন্তরে। নইলে এমিলির মনে পড়ে সেই দৃশ্য, কাকার স্প্যানিয়াল কুকুরটা একটুও শব্দ না ক'রে শুধুমাত্র সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে যখন ধীরে ধীরে মারা যেতে লাগল তখন তার শারীরিক যন্ত্রণায় পাগলের মত ছটফট ক'রে বেড়াল বাড়ীর সকলে। কাকা ঝরঝর ক'রে শুধু কাঁদলেন সমবেদনায়। অবিশ্রান্ত চিকিৎসাতেও প্রতিরোধ করা গেল না তার মৃত্যু। আর সেই মৃত্যুর আগে শব্দহীন জেনির সম্বন্ধে কাকা শুধু অল্প ক'টা কথাই বলেছিলেন, আমি ওর মৃত্যুকে ঠেকাতে চাই না ঈশ্বর, ওকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে চাই মাত্র। সেই অব্যক্ত যন্ত্রণার বাঙময়তা সেদিন কাকা এবং আর সকলে যেমনভাবে বুঝেছিল তেমনিভাবেই এমিলিও আজ স্পষ্টকরেই বুঝতে পারে ঠাকুমার মনের ভাষা-না-পাওয়া বেদনার তীব্রতা। আজ মনে হয় যার বিবেক লোভের কাছে আত্মসমর্পণ না করে সে মানুষ মায়ের মনের বার্তা নিজের মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত অনুভব করে — হয়ত তাকে চালিত ক'রতেও পারে মায়ের প্রতি দায়িত্ববোধ।

তবে যত কর্তব্যই ক'রে থাক কল্যাণ, এমিলির ধারণা, ওর ব্যাপারে সে ভুল ক'রেছে। শেষের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। এমিলি সরাসরি বলে নি, বলতে পারে নি, আভাসে ইঙ্গিতে অনেকবার বুঝিয়েও ফল না হওয়াতে একদিন প্রায় স্পষ্ট ক'রেই বলেছিল, আচ্ছা কল্যাণ। যদি এদেশের কোন মেয়েকে তুমি ভালবাস, যদি সে তোমাকে ভালবেসে বিয়ে ক'রে চলে যেতে চায় তোমার দেশে তাতে নিশ্চয়ই তোমার আপত্তি থাকবে না ?

আমি ভালবাসলেও চাইব না, খুব ধীরে অল্প অল্প ক'রে জবাবটুকু উচ্চারণ ক'রেছিল কল্যাণ।

আর তাতে চরম বিস্ময়ে এমিলি বাঘের লাফ দিয়ে পড়ার মত ক'রে বলেছিল, কেন ?

কারণ — ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়েছিল কল্যাণ, আমার দেশে আমার পারিবারিক পরিবেশে নিয়ে গিয়ে এদেশের কোন মেয়েকে তুললে তাকে হত্যা করাই হবে।

বাঃ এ তুমি কি বলছ ?

যা বলছি তা তুমি বুঝছ না কারণ আমার দেশকেও তুমি জান না, তাই আমি যে পরিবার থেকে এসেছি সে সম্বন্ধে কোন ধারণা করাই তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কথাটা মনে আছে বলেই সে বিশেষভাবে দেখতে চায় কল্যাণের পারিবারিক পরিবেশ আর কল্যাণকেও দেখাতে চায়, এই দ্যাখ কল্যাণ। তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। দ্যাখ তোমার দেশে এসে আমি কেমন তোমাদের মধ্যেই মিশে আছি।

সে বাসনায় বাদ সাধলেন পরীক্ষিৎ। কে জানে হয়ত বসুদেব-এর বাড়ী

গেলে কল্যাণের সঙ্গে দেখা হয়েও যেতে পারত। বার বার অকারণেই মনে হতে লাগল ওখানেই বাড়ী কল্যাণ-এর। কিন্তু সকলের বাধায় অনন্যোপায় হয়েই এমিলিকে পরীক্ষিৎ-এর প্রস্তাবই মেনে নিতে হ'ল। প্রসেনজিৎকে বলল, কাকাকে আজই তাহ'লে টেলিগ্রাম ক'রে দাও এমিলি তোমার ভারত ভ্রমণে সঙ্গী হতে চায়। যদি তোমার প্রোগ্রাম হয়ে থাকে জানাও।

প্রসেনজিৎ ইচ্ছা প্রকাশ ক'রল তার অফিস থেকে টেলেক্স-এ খবর পাঠাবে কাকার অফিসে।

পরীক্ষিৎ সমস্ত শুনে বললেন, তা পাঠাও তার চেয়ে আজ এমিলি ট্রাঙ্ক কলে কথা বলে নিক না কাকার সঙ্গে? এখনই লাইন বুক ক'রে দাও যখন পাওয়া যায় যাবে।

কথাটা ভালই বলেছেন বাবা। প্রসেনজিৎ সায় দিয়ে উৎসাহিত ক'রল এমিলিকে। এখানে এসে প্রথমদিকে বার তিনেক টেলিফোনে কথা বলেছিল এমিলি বাড়ীর সঙ্গে তবে যা সাংঘাতিক খরচ তাতে মাঝে মাঝে কথা বলবার কথা ভুলেই গেছে। বিশেষ ক'রে প্রসেনজিৎ-এর বেতন-এর অনুপাতে সে খরচ অত্যধিক। তাই সংকোচ করে আর করে নি। আজ বিশেষ ব্যাপারে সে কথা আর মনে হ'ল না।

গভীর রাত্রে লাইনটা পাওয়া গেল কিন্তু কাকাকে পাওয়া গেল না। খবর পাওয়া গেল কি কাজে তিনি ওকলাহামা সিটি গেছেন। একদিন বাদে ফিরবেন। আরও জানা গেল তিনি এমাসেরই ষোল তারিখে টোকিওর উদ্দেশ্যে প্লেন-এ উঠছেন। অর্থাৎ আর নদিন বাদে। এমিলি যতদূর জানল তাতে কাকা জাপান শ্যাম কম্বোডিয়া দূরপ্রাচ্যের এমনকি আরও দুএকটা দেশ ঘুরে আসবেন ভারতবর্ষে। জীবনে বহুবার ইয়োরোপে ঘুরেছেন কাকা বহু সময়ে, একবার কি কাজে আরবেও এসেছিলেন অথচ যে ভারতবর্ষ তাঁর চূড়ান্ত ভাললাগার, সেই ভারতবর্ষেই আসেন নি কোনদিন। কারণ জানতে চাইলে এমিলিকে বলতেন ব্যবসার জন্যে যাব না, যদি কোনদিন যাই তো বিশ্রামের জন্যে যাব। তাহ'লে এখন কি বিশ্রামের জন্যেই আসছেন কাকা?

অফিস থেকেও টেলেক্সে-এ খবর চেয়েছিল প্রসেনজিৎ। খবর এল কাকা জানিয়েছেন, এমিলির জন্যে উনি যাত্রাপথ বদল ক'রেছেন দূরপ্রাচ্য ঘুরে হংকং হয়ে প্রথম কলকাতা যাবেন তারপর দিল্লি। কলকাতা পৌঁছাবেন আগামী মাসের কোন তারিখে তা আগেই জানিয়ে দেবেন।

এমিলি মনে মনে চাইছিল কাকা এখনই এসে পড়ুন। সে জায়গায় ওঁর এখনও যে প্রায় একমাস দেরী হবে তা জানতে পেরে মনে মনে একটু নিরাশ হ'ল। কিন্তু তার স্বভাবের বৈশিষ্টে সেই নৈরাশ্য ছাপিয়ে ঔৎফুল্লই ফুটে উঠল কাকার কলকাতা আসার খবরকে কেন্দ্র ক'রে। খবরটিতে আর একজনও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন — পরীক্ষিৎ। তাঁর উৎসাহকে বাড়ীর সকলে নেহাৎ সৌজন্যমূলক

বলেই মনে ক'রল। এমিলিকে পরীক্ষিৎ পরামর্শ দিলেন, তুমি কাল পরশুর মধ্যেই আর একবার ফোন ক'রে তোমার কাকার সঙ্গে কথা বলে নিয়ো। গত মাসের আঠাশ তারিখেই তো ওঁর আসবার কথা ছিল। দিন প্রোগ্রাম সবই তো অনেক পেছিয়ে গেল।

হ্যাঁ, কাকা না এলে কারণ জানতে পারছি না। আমার মনে হয় আরও বেশী দিনের জন্যে বেরোচ্ছেন বলেই কাজকর্ম সেরে নিলেন। তাছাড়া আগে ছিল শুধু ভারতে আসার পরিকল্পনা এবার দেখছি জাপান, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া সব ঘুরে আসবেন।

পরীক্ষিৎ বেশ চিন্তিতভাবে বললেন, এখানে ওঁর ঘোরবার পরিকল্পনাটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, যদি উনি কোন পরিকল্পনা না ক'রে থাকতেন তাহ'লে আমি একটা তৈরী ক'রে রাখতাম ওঁর জন্যে। এখানকার টুরিস্টব্যুরোর সঙ্গে আমি পরামর্শ ক'রে রাখছি —! তুমি যদি কথা বলো তো কোন পরিকল্পনা ক'রে আসছেন কিনা সেটাও জেনে নিয়ো —

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল এমিলি।

অফিসে গিয়েই পরীক্ষিৎ প্রথম খোঁজ ক'রলেন বড়কর্তার। টেলিফোন অপারেটার জানাল এখনও আসেন নি। তাতে বললেন, পুলিশ কমিশনারের লাইনটা দাও।

প্রথমে পুলিশ দপ্তরে, তারপর বাড়ীতে আবার তাঁর দপ্তরে ফোন ক'রে খুঁজে খুঁজে বার ক'রে অপারেটার পরীক্ষিৎকে জিজ্ঞেস ক'রল, স্যার, কমিশনার রাজভবনে। ওখানে লাইন দেব?

তার দরকার নেই। ফিরে যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। — নির্দেশ দিলেন পরীক্ষিৎ। তারপর নিজের ফাইলপত্র খুঁজলেন, দুচার মিনিট যেতে না যেতেই এক ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন, তাঁর দিকে তাকিয়েই পরীক্ষিৎ বললেন, এত সকালেই কি মনে ক'রে?

এলাম আপনার কাছে যদি এক কাপ চা খাওয়ান — হাসলেন ভদ্রলোক।

পরীক্ষিৎও হাসলেন, বললেন, শুধু এটুকু হ'লে তো খুব আনন্দের সঙ্গেই ইচ্ছাপূরণ ক'রতে পারি।

এর বেশী হ'লে — জিজ্ঞাসাটা শেষ ক'রলেন না আগন্তুক।

পরীক্ষিৎ-এর মুখ থেকে হাসিটা তো মেলালই না বরং হাতের ফাইলটা সই ক'রে বেঁধে পাশে রেখে আগন্তুক-এর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, চা-টা নেহাৎই জোলো উপলক্ষ্য এরপর আসল যে বস্তুটি আছে সেটি তাহ'লে চায়ের পর হবে?

আমার কাছে কিছু নেই। আপনার কাছেই এলাম কোন খবর-টবর আছে কিনা খুঁজতে —

বেয়ারাকে ডেকে বললেন, শ্যামলবাবুকে চা দাও।

আগন্তুক বললেন, চা এখন থাক। একটু আগেই, বোধহয় পনের মিনিটও হয়নি চা খেয়েছি।

সে কি ? আমি চায়ের জন্যেই তো গঙ্গাধরকে ডাকলাম।

ডাকলেন, অন্যকোন কাজ না থাকলে ও চলে যেতে পারবে। সেজন্যে আমি চা খেতে রাজী নই।

এই না একটু আগেই শুনলাম চায়ের প্রয়োজন। আমার ধারণা ছিল রাজনীতিকরাই এমন কথা পালটায়। — বেয়ারার দিকে সই করা একটা ফাইল এগিয়ে দিতে সে সেটি নিয়েই বেরিয়ে গেল। আগন্তুক শ্যামলবাবু বললেন, আপনার ঘরে আজকাল প্রায়ই দেখছি সতীবাবু আসছেন ?

পরীক্ষিৎ হেসে বললেন, এখানে কেউ আসতে পারবে না এমন কোন নির্দেশ তো দেওয়া নেই ?

তা হয়ত নেই তবে অলিখিত কিছু নিয়ম তো দেখা যায়ই।

আমি তো দেখি না ?

দেখেন না ?

কি ক'রে দেখব ?

চারুবাবুরা তো কই আসেন না ? — ঠাট্টা ক'রেই বললেন শ্যামল।

পরীক্ষিৎ-ও তেমনি জবাব দিলেন, ওঁরা এবাড়ীর ঘর দরজা চেনেন না বলেই বোধহয় আসেন না। · আসতে কারও বাধা নেই।

কিন্তু বিনা কাজে কেউ আসে না।

এবার পরীক্ষিৎ চূড়ান্ত রহস্য ক'রলেন, নির্বাচন তো আবার হবে, হয়ত তাই ঘর পছন্দ ক'রতে আসছেন —

মানে ?

আবার ওঁরা এলে উনি কোনটা নেবেন —

আর ওঁরা আসছেন না।

এটাও কি কোন গোপন সূত্র থেকে পাওয়া খবর ?

এটা কি ক'রে খবর হবে ? অনুমান।

যেমন দৃঢ়ভাবে বললে মনে হ'ল কোন বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া সংবাদ।

শ্যামল হাসলেন। তারপর বললেন, এ অনুমান মিলবে বলেই আমার মনে হয়।

ওঁরা বোধহয় এ অনুমান করেন না। তাহ'লে আর আসতেন না।

শ্যামল বিশ্বাস ক'রলেন না, বললেন, কথাটা আপনি ঠিক বললেন না।

ঠিক বলছি। আমার সঙ্গে দুচারবার যা দেখা ক'রেছেন সে নেহাৎই সৌজন্যমূলক। দুচার দিনের জন্যে হ'লেও আমাদের ওপরওয়ালা তো ছিলেন কাজেই খাতিরটা না করি কি ক'রে ?

সে যাক, ও কোন সংবাদ নয়। আর কিছু থাকে তো বলুন।

আজ কিছু নেই। তবে একটা ছোট্ট সংবাদ আছে সেটা ছেপে যদি দাও তো খুব ভাল হয়।

বলুন।

ফিলাডেলফিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মিঃ উইলিয়াম হ্যারল্ড স্ট্রঘাণ আগামী মাসে কলকাতা আসছেন। দূরপ্রাচ্য ঘুরে উনি এখানে এসে পৌঁছোবেন।

শ্যামল লিখে নিলেন। পরীক্ষিৎ বললেন, এখানকার ব্যবসায়ীরা, বিশেষ ক'রে যারা রপ্তানী ক'রতে ইচ্ছুক উপকৃত হতে পারে।

কোন প্রজেক্ট নিয়ে আসছেন কি?

না। দূরপ্রাচ্যে কোন কোন দেশে কিছু কাজকর্ম আছে এখানে এমনিই বেড়াতে আসছেন বলে বলছেন। তবে ব্যবসায়ীদের বেড়ানো কি কখনও উদ্দেশ্য হীন হয়?

ঠিক আছে আমি একটা সংবাদ তৈরী ক'রে দেব। তবে এখনও তো অনেক দেরী আছে আসতে।

হ্যাঁ তা আছে, তবে তোমাদের ইংরিজী কাগজটায় একটা খবর ছেপে দিলে কাজ হ'ত। আফটার অল বর্তমানে এই রাজ্যের যা অবস্থা তাতে দুচারজনও যদি উদ্যোগ ক'রতে চায় তাহ'লেও আমাদের একটু সুবিধে হয়। দিল্লি শুনছি এই যুববিদ্রোহ থামাতে কিছু কাজ শীঘ্রিই চালু ক'রবে। প্ল্যান-প্রোগ্রাম তৈরী হচ্ছে। এই সময় যদি আমরা কিছু ফরেন কারেন্সী রোজগার ক'রতে পারি তাহ'লে অনেক ভাল হয় আমাদের রাজ্যের পক্ষে —

শ্যামল শুনলেন, মন্তব্য ক'রলেন না। তবে এটা তাঁর ভালভাবেই বোধগম্য হ'ল, যে কোন কারণেই হোক পরীক্ষিৎ এই সংবাদটার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী। এই আগ্রহ কিসের এবং কেন তা পরে অবশ্যই বেরিয়ে পড়বে অতএব এখনই অত আগ্রহ নিষ্প্রয়োজন। এবং যেহেতু পরীক্ষিৎ কাজের মানুষ অতএব তাঁকে ভবিষ্যতের জন্যই কথা দিতে হ'ল, ঠিক আছে ছেপে দেব। কালকের কাগজেই পাবেন।

ধন্যবাদ, পরীক্ষিৎ জানালেন। তারপর স্মিত হেসে বললেন, তোমরা কাগজের মানুষ অসীম ক্ষমতা তোমাদের।

কি রকম?

দিল্লি তো এখন তোমাদের ওপরই গুরুত্ব দেয় সবচেয়ে বেশী —।

আমাদেরই কি তবে মন্ত্রী ক'রবে এবার পশ্চিমবাংলায়?

তুমি ঠাট্টা হিসেবে নিয়ো না। কথাটা আমি সত্যিই বলছি। অমিত-এর রিপোর্ট ছাড়া প্রধানমন্ত্রী তো কিছু বিশ্বাসই করে না।

হাসালেন বটে আপনি। আসলে ওই মহিলা তাঁর আর পঁচিশটা নিজস্ব এবং সরকারী সংবাদকেই বিশ্বাস করেন, তবে যেহেতু পৃথিবীর কিছুকেই ওনার

বিশ্বাস নেই তাই এখানকার ব্যাপারে অমিতদার রিপোর্ট থেকে সব খবর যাচাই ক'রে নেন।

তা বোধহয় ঠিক নয়।

এটা যে ঠিক তা আমাদের চেয়ে বেশী অমিতদা নিজেই বোঝে।

তবে ইদানীং অমিত যা কাজকর্ম ক'রছে — সত্যিই সুন্দর। অবশ্য এটা ঠিক যে কিছু নেতা ওকে খুবই সাহায্য ক'রে থাকে।

শ্যামল জবাব দিলেন না।

টেলিফোন বেজে উঠতেই সেদিকে মগ্ন হলেন পরীক্ষিৎ। শ্যামল দুচারকথা শুনেই উঠে দাঁড়ালেন। পরীক্ষিৎ কথা বলতে বলতেই ইশারা ক'রে বিদায় জানালেন। তারপর ইংরিজিতে বললেন, হ্যাঁ আসুন, বলুন দুটো? হ্যাঁ তাই আসুন। আমি বলেই রাখছি। আপনি তো প্রায়ই আসছেন, সিকিউরিটির জন্যে আপনার অসুবিধে কি? বেশ। ঠিক আছে —। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন পরীক্ষিৎ।

অল্পক্ষণ বাদেই ফোন এল। পুলিশ কমিশনার। বললেন, হ্যাঁ আমিই খুঁজছিলাম। কাজ নিজস্ব মানে খুব জরুরী নয় একটু পরামর্শ আছে আর কি। বলছি। আমার ছেলের শ্বশুর জানেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ আমেরিকান। উনি আগামী মাসে আসছেন। হ্যাঁ ক'লকাতা। সেইজন্যেই তো ফোন করা। এই অবস্থায় আমি তো খুব একটা ভরসা করি না। ব্যাস ব্যাস তাহলেই হবে। আরে হ্যাঁ মশাই আপনার আশ্বাসই এখন সবকিছু। অনেকের কাছে আপনিই ভগবান এখন। না, এখনও আসেনি। হ্যাঁ। এলে এখানে আসবেন। অল রাইট, অল রাইট।

মনোহরলাল সোয়াইকা ঘরে ঢুকল ঠিক দুটোর সময়। কাঁটায় কাঁটায়। এটাই নিয়ম মনোহরলাল-এর। যে কোন কাজে যখনই এসেছে যা সময় বলেছে তার এতটুকু ব্যত্যয় হয়নি। লোকটা যেন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে চলে। পরীক্ষিৎ বাইরে বেয়ারাকে বলেই রেখেছিল বলে সরাসরিই ঘরে চলে এল মনোহর। তাকে দেখেই পরীক্ষিৎ বলে উঠলেন, আসুন আসুন মিস্টার সোয়াইকা। অত্যন্ত মূল্যবান স্যুট-এর মধ্যে থেকে হার্দ ও গম্ভীর স্বরে শব্দ এল, গুড আফটার নুন মিস্টার মুখার্জী।

পরীক্ষিৎ ইংরাজীতেই প্রত্যাভিবাদন ক'রলেন একই বাক্যের বিনিময়ে। হাতের ইশারায় সামনের চেয়ারে বসতে অনুরোধ ক'রলেন।

বসেই পকেট থেকে একটা খাম বের ক'রে তার ভেতর থেকে একখানা ফটো বের ক'রে বলল, পুলিশ বলছে মিস্টার আগরওয়ালাকে যারা খুন ক'রেছে তাদের সবাই হয় হাজতে নয় গুলিতে মারা গেছে কিন্তু কথাটা ভুল। যে কজনকে পুলিশ সন্দেহ ক'রে মেরেছে আমরা হাসপাতালে প্রত্যেকটি মৃতদেহ দেখেছি ওর মধ্যে একজন মাত্র ওই দলে ছিল। আর এই যে ছবি দেখছেন এই হচ্ছে ওই গ্রুপের নেতা। পুলিশ একে ধরতেই পারে নি। গতকাল এই ছবি তুলেছে

আমাদের ফটোগ্রাফার।

পরীক্ষিৎ ঈষৎ বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কিভাবে তুলল এ ছবি?

ওটা একান্তই গোপনীয়, এবং নির্ভুল।

পরীক্ষিৎ আর কিছু বললেন না। মনোহরলালই আবার বলল, এই ছবি আজ আমি পুলিশকে দিচ্ছি, এর কপি আমরা দিল্লিতেও পাঠিয়েছি আজ। আপনাকে জানিয়ে রাখলাম, দেখিয়েও রাখলাম। মিস্টার দুগার গতকাল দিল্লি থেকে ফিরে এসেছেন, আমাদের সমস্যা আমরা বলেছি। খুবই ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি আমরা সন্তুষ্ট। কিন্তু আপনারা, প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা আমাদের নিরাশ ক'রেছেন।

কেন? পরীক্ষিৎ প্রতিবাদের সুরে জানতে চাইলেন।

দুজনকে এভাবে রাস্তার মাঝে খুন করা হ'ল — আপনারা তাদের কোন প্রটেকশন দিতে পারলেন না!

মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন পরীক্ষিৎ তবে সেটা গোপন ক'রেই বললেন, পশ্চিমবাংলায় খুন কি মাত্র দুজনই হ'ল মিস্টার সোয়াইকা? এপর্যন্ত একহাজার সাতশত ত্রিশজন খুন হয়েছে।

সেটা আলাদা কথা মিস্টার মুখার্জী। ও তো নিজেদের মধ্যে মারামারি ক'রে হয়েছে।

না। সত্যি কথা আপনিও জানেন আমরাও জানি যে এই রকম মহাজন জোতদার-ব্যবসাদার অনেকেই খুন হয়েছে এদেশে।

মনোহরলাল বলল, তবু কি জানেন এদেশে আমাদের থাকতে হ'লে নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থাটা তো ক'রতেই হবে?

সবাই ভারতবর্ষের নাগরিক। প্রত্যেকেরই সুরক্ষার ব্যবস্থা সরকার করে। গাড়ীতে তো দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যে ডবল ব্রেক থাকে, তবুও তো দুর্ঘটনা ঘটে —

ও তো ঠিকই মিস্টার মুখার্জী। — সায় দিয়ে মনোহর চুপ ক'রে গেল, বোঝা গেল যে এসব প্রতিবাদ তার মনঃপুত হচ্ছে না। সেটা বুঝে পরীক্ষিৎ কথার কচকচি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বললেন, যাকগে ওসব কথা। আপনারা যা ভাল বুঝবেন ক'রবেন তাকে আমাদের কি বলবার থাকতে পারে। এবার বলুন ব্যবসার খবর কি?

এই রকম অবস্থায় কি ব্যবসা হয়? যেখানে প্রাণের জন্যেই চিন্তা সেখানে ব্যবসা কি রকম ক'রে হবে? তারপর ইণ্ডাস্ট্রিতে দেখছেন তো কি রকম অরাজকতা চলছে?

তা চলছে এটা ঠিকই। তবে কি জানেন মিস্টার সোয়াইকা, এ অবস্থা চলবেই। মানুষের মনোবৃত্তিই এখন এইরকম হয়ে গেছে কি কাজ না ক'রে পয়সা নেবে। এরজন্যে সমস্ত দেশময় একটা আমূল পরিবর্তন দরকার। চলতি ব্যবস্থা বজায় রেখে এই অবস্থার পরিবর্তন কিছুতেই হবে না।

আমাদের মধ্যে একটা কথা আছে কি জানেন, ইংরিজী কথার মধ্যে একটা স্বদেশীয় ছড়া বলল এবং ইংরিজীতেই তার তর্জমা ক'রে বলে দিল, যখন সবকিছু ডোবে তখন লবণ ডোবে না। এর তাৎপর্য বুঝলেন ?

না।

ধরুন নৌকা ডুবল। তাতে যা জিনিষপত্র ছিল সবই ডুবে গেল, শুধু লবণটুকু যা ছিল নৌকায়, মিশে গেল জলে। ডুবল কি ? আমাদের সমাজও হয়েছে তাই। সব রসাতলে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের চরিত্র এই অবস্থার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে ডোবার কথা আমরা ভাবতেই পারছি না।

কথাটা পরীক্ষিৎ মন দিয়েই শুনলেন, মন্তব্য ক'রলেন, একটা কথা আপনি ঠিকই বলেছেন মিস্টার সোয়াইকা, আমরা চরিত্রের দিক থেকে একেবারে নিজেদের হারিয়েছি। কাজেই আমরা সবকিছুই নষ্ট ক'রে ফেলেছি।

শুধু তাই নয় মুখার্জী সা'ব আমরা যারা ব্যবসা করি সোজাভাবে তারা বদনাম কিনছি সাধারণ মানুষের কাছে, যতকিছু হচ্ছে তার জন্যে আমরাই হচ্ছি দায়ী, কিন্তু আপনি লক্ষ্য ক'রে দেখুন ব্যবসা যারা আত্মগোপন ক'রে ক'রছে তারাই দেশটাকে সব চেয়ে বেশী নষ্ট ক'রছে।

পরীক্ষিৎ ঠিক বুঝলেন না কাদের কথা মনোহরলাল বলছে।

মনোহরলাল বলল, যারা রাজনীতি ক'রছে তারাও কি এদেশে ব্যবসা ক'রছে না ? রাজনীতিটা আমাদের দেশে পুরোপুরি ব্যবসা হয়ে গেছে। এবং তাতেই ক্ষতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী।

আলোচনার মোড় ঘোরাতে পরীক্ষিৎ বললেন, কি করা যাবে, এরই মধ্যে কাজ ক'রে যেতে হবে আপনাদের, আমাদেরও এই পচা জলেই গলা ডুবিয়ে পদ্মতুলতে হবে যে ক'টা ফোটে। একটু থেমে থেকে বললেন, এর মধ্যে এক ব্যক্তিগত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। আমেরিকার এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আগামী মাসে কলকাতা আসছেন। এই দিনকাল, এরমধ্যে তাঁর সিকিউরিটির ব্যবস্থাও তো ক'রতে হয়।

আপনাদের আবার কি অসুবিধে ?

বেসরকারী আসা কিনা তাই সবরকমই অসুবিধে। আমরা সরকারী মানুষ সরকারী কোন ব্যাপারেই আমাদের কোন অসুবিধে যেমন নেই তেমনি বেসরকারী ব্যাপারগুলোতে আমাদের আবার প্রচণ্ড অসুবিধেয় পড়তে হয়।

ভদ্রলোক কোনও প্ল্যান নিয়ে আসছেন ?

তেমন তো কিছু নেই বলেই জানি। তবে জাপান, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া ঘুরে যখন আসছেন তখন নিশ্চয়ই ওইসব দেশে ব্যবসায়িক ভ্রমণেই আসছেন। এখানে এলে, আমি ভাবছি, এখানের রপ্তানীকারীদের কিছু অর্ডার পাইয়ে দেওয়া যাবে। আচ্ছা মিস্টার সোয়াইকা, ভালই হ'ল আপনি তো খবর দিতে পারবেন, ধানুকাদের তো বিভিন্ন জিনিষ রপ্তানীর কাজ আছে ? আমাকে সেদিন

বিশ্বনাথ বলছিল ওরা নাকি কানাডায় প্রচুর সিল্কের অর্ডার নিয়েছে?

মনোহরলাল ঈষৎ নড়ে বসল, বলল, হতে পারে দুচার লাখটাকার অর্ডার নিয়ে থাকতে পারে।

খৈতানরাও তো বিদেশে রপ্তানীর কাজ করে। ভাবছি এদেরই দুচারজনকে আলাপ করিয়ে দেব, যে যা করে নিতে পারে।

ভদ্রলোক উঠছেন কোথায়?

এখনও ঠিক হয়নি। সেটাও তো আমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে।

তাহলে একটা কাজ করুন মুখার্জী সাব। ওনার থাকবার জন্যে আপনাকে কোন ব্যবস্থা করতে হবে না। হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশানাল-এ আমার যে স্যুইট আছে উনি যে কদিন থাকবেন আমার অতিথি হয়েই থাকবেন। আপনি শুধু তারিখটা আগে থেকে জানিয়ে দেবেন।

শুধু শুধু আপনি কেন ঝামেলা করবেন?

এটাকে ঝামেলা কেন বলছেন? ও তো আমাদের অতিথিদের জন্যেই ব্যবস্থা রাখা। আপনি যদি খুবই দ্বিধা করেন তবে না হয় আমার আতিথ্যের ব্যাপারটা খৈতান বা ধানুকাদের না বললেন।

কিন্তু মিঃ শত্রুঘ্ন এসেছেন জানলেই তো ওরা জানবে কোথায় আছেন।

এ তো বেসরকারী আসা কাজেই খবর ওরা পাবে না। আর পেলেও যখন কোথায় আছে জানবে, মনে করবে আমার কাছেই এসেছেন। আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

পরীক্ষিৎ নিজের সাফল্যে মনে মনে খুশী হলেন। মনোহরলাল-এর ফোন পেয়েই তাঁর মনে পড়েছিল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে সোয়াইকা কোম্পানীর নিজস্ব সুইট-টার কথা। সরাসরি প্রস্তাব করাটা ঠিক হবেনা মনে করেই নানা কায়দায় কথাটা শোনালেন মনোহরলালকে, ফলটা যেমন চেয়েছিলেন তেমনি হওয়াতে তৃপ্ত হলেন।

কথাবার্তার সময়ই দেয়ালে টাঙ্গানো ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ল মনোহর-লাল-এর। সাড়ে তিনটে। চমকে উঠল মনোহরলাল, নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল। তিনটে বাজতে এখনও পঁচিশ মিনিট বাকী। আর একবার দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, কি রকম হল?

পরীক্ষিৎ-ও একবার দেয়াল ঘড়ি আর একবার নিজের হাত ঘড়ি দেখে বললেন, এ ঘড়িটা বেশ কিছুদিন যাবৎ গোলমাল করছে।

এইজন্যেই সরকারী ব্যবস্থাকে লোকে নিন্দা করে, ঠাট্টা করে সোয়াইকা বলল, আপনারা আপনাদের হেড়কোয়ার্টারের ঘড়িটা পর্যন্ত ঠিক রাখতে পারেন না এতবড় দেশ ঠিক রাখবেন কি করে? — বলে খুব হাসল একচোট, তারপর বলল, আমাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এসব চলে না।

পরীক্ষিৎ সেই ঠাট্টায় যোগ দিয়ে বললেন, কথাটা ঠিকই বলেছেন। একদিন

হয়ত আপনাদেরই ডেকে এই বাড়ীর য়্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন লীজ দেওয়া হবে।

ভাল চলবে — মনোহরলাল উঠে দাঁড়াল, বলল, আজ চলি মিস্টার মুখার্জী।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেন পরীক্ষিৎ। মনোহরলাল সোয়াইকা বিদায়ী করমর্দন করল।

এমিলির কাকার থাকার ব্যবস্থা যে মোটামুটি হয়েই গেল সেকথা স্ত্রীকে জানাতে চাইলেন পরীক্ষিৎ অনেকটা তাঁর সম্মতির জন্যেই। সুপ্রীতি জানতে চাইলেন, কি ব্যবস্থা হল? কোথায়?

হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল-এ — বললেন পরীক্ষিৎ। কিভাবে হল এবং কি সত্রে সে সব কথা সুপ্রীতি কখনও বিস্তারিত জানতে চান না, জানান না কোনদিন পরীক্ষিৎও। শুধু এই একটা ব্যাপারেই নয় অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারই আপনা আপনিই মিটে যায়, যেকোন সমস্যা বরাবরই সমাধান হয়ে যায় এটাই জানেন সুপ্রীতি এর বেশী আর কিছু জানা তাঁর ইচ্ছা নয়। দর্শক যেমন নাটকের অভিনয় দেখার সময় পেছনের দীর্ঘ মহড়ার কথা স্মরণ করে না, জানতে চায় না, তেমনি অপ্রয়োজন সুপ্রীতিরও; তিনি কেবল বললেন, হিন্দুস্থান! মোস্ট আনয়্যারিস্টোক্র্যাট। আর কোথাও জায়গা পেলে না?

পরীক্ষিৎ বুঝলেন কিসের দিকে ইঙ্গিত। সাহেবদের আমলের হোটেলগুলোতেই আভিজাত্য আছে বলে বিশ্বাস করেন সুপ্রীতি; পরে যেসব হোটেল হয়েছে সেগুলোর কোনটার নামেই মন ওঠেনা তাঁর। তাঁর একটা যুক্তিও আছে, বলেন, পুরোনো মোহা খোঁচে পয়সা ক'রে যে কালোয়াররা হোটেল করে তাদের হোটেল-এ জাঁকজমক থাকতে পারে, আভিজাত্য থাকে না। সাহেব, যারা হোটেল করেছিল তারা সব হোটেল কাকে বলে জেনেই হোটেল খুলেছিল, কালো-বাজারে হঠাৎ ফুলে গিয়ে নয়। হোটেলের ব্যবসা একটা আর্ট।

কথাটা অস্বীকার করার নয়। অন্তত পরীক্ষিৎ অস্বীকার করেন না যে হোটেলের ব্যবসাও একটা আর্ট। বরং এটাকে তিনি সুপ্রীতির হোটেল সংক্রান্ত কথাগুলোর মধ্যে মৌলিক সত্য বলে মনে করেন। আর তাই, এসব কথা মনে রেখে সুপ্রীতির প্রস্তাব গ্রহণ করে বললেন, আজকাল জায়গা পাওয়া তো মুস্কিল তাই ওখানে পেয়ে গেলাম, নিয়ে রাখলাম। এখনও তো অনেক সময় আছে, পছন্দমত একটা দেখি।

সুপ্রীতি বললেন, এখন জায়গা পাওয়া মুস্কিল হবে কেন? যা দিনকাল এখন তো বরং আরও ফাঁকা থাকবে।

চট করে বুদ্ধি এসে গেল পরীক্ষিৎ-এর মাথায়, বললেন, এখন অনেকে কি করছে বাড়ী ছেড়ে হোটেলে এসে থাকছে। কাজেই হোটেলগুলো প্রায়ই ভর্তি।

কথাটা বিশ্বাস হল সুপ্রীতির। সত্যিই তো, পাড়ায় পাড়ায় যা খুনখারাপি

চলেছে তাতে কে আর প্রাণ নিয়ে থাকবে? বরং ভাল ওই হোটেল এলাকা, এখনও ওসব দিকে শোনা যায়নি। তাছাড়া হোটেলে থাকার সুখই আলাদা। এজন্মে হল না তাঁর, যদি সুযোগ আসে পরজন্মে, তাহলে হোটেলবাসী হয়ে জন্মাবেন। দার্জিলিং, মুসৌরী কি নৈনিতাল বেড়াতে গিয়ে দু-দশ দিনের জন্যে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছেন। আসলে এদেশে ভাল হোটেলই নেই। নিজের এ চিন্তাটা স্বামীর কাছে প্রকাশ করে নিজের কথার সমর্থনে বললেন, খোকার কাছে যা শুনি তাতে ওদেশের হোটেলের তুলনায় এদেশের হোটেলগুলো চৌরঙ্গী পাড়ার রেস্টুরেন্টগুলোর তুলনায় বেহালার গলির মোড়ের চায়ের দোকান।

তুলনাটা মনঃপূত হল না পরীক্ষিৎ-এর। মৃদুস্বরে প্রতিবাদ ক'রলেন, অতটা বলা ঠিক হবে না। এখানকার হোটেলগুলোতেও প্রায় সব ব্যবস্থাই আছে। সামান্য পার্থক্য হয়ত হতে পারে। আর এ হ'তে পারে যে ওদের সার্ভিস অনেকটা ভাল।

সুপ্রীতি এবং পরীক্ষিৎ দুজনের মধ্যে কারও য়ুরোপ-আমেরিকার হোটেল সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু নেই। পরীক্ষিৎ-এর আগে বহু প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে শোনা অভিজ্ঞতা আর সুপ্রীতির শোনা কেবল ছেলের কাছে। তবে সুপ্রীতির অন্ধবিশ্বাস অভিজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নয়। বিদেশের সব কিছুই এদেশের চেয়ে ভাল এই নিশ্চিত চিন্তা সব কিছুর ঊর্ধে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাঁর বক্তব্যকে পরীক্ষিৎ সে বিশ্বাস পালন করেন না। য়ুরোপ আমেরিকার অনেক কিছু এদেশের তুলনায় উন্নত মানলেও সবকিছু ভাল এ রকম বিশ্বাস ক'রতে তাঁর জাতীয়তাবোধ বাধা দেয়। মনে হয় এতে তাঁর দেশের মর্যাদায় আঘাত লাগছে। অবশ্য আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি যখন খুঁজে না পান তখন খুঁজতে বসেন দর্শন। বেদ-এ এমন সব তত্ত্ব আছে বলে তিনি বেদ-এর ধার কাছ দিয়ে না গিয়েও জানেন বলে মনে করেন, যার সাহায্যে নাকি বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তিবিদ্যার অনেক ওপরে উঠতে পারে তাঁর দেশ।

এই একজায়গায় কেবল বদ্ধমূল বিশ্বাসের দুই প্রান্তে স্বামী-স্ত্রী দুজন দাঁড়িয়ে। কিন্তু সংঘাত তবু হয় না, কারণ এ বিশ্বাস ব্যবহারিক জীবনে এত অদরকারী যে প্রয়োগ ক'রতে হয় তাঁদের কদাচিৎ। আর প্রয়োগ যখন ঘটে প্রায়শ সুপ্রীতির অবোধযুক্তি গোঁয়ার্তুমির রূপ ধরে এসে চোখ রাঙ্গায়, পরীক্ষিৎ তখন মনে মনে স্মিত হেসে অবহেলা মিশ্রিত অনুকম্পার ভঙ্গীতে চুপ ক'রে যান। সেই অভ্যাস এবারও শান্তি রক্ষা করল। সুপ্রীতি দমবার পাত্রী নন বলে পরীক্ষিৎ-এর কথার প্রতিবাদ ক'রে বসলেন, শুধু সার্ভিস-টাই ভাল? আর কিছু ভাল নয়?

পরীক্ষিৎ আলোচনা নিষ্প্রয়োজনে বিধায় আত্মসমর্পণ ক'রলেন সামান্য কথায়, আমার তাই মনে হয়। অবশ্য হ'তে পারে আরও পার্থক্য আছে, আমি তো দেখিনি, জানি না।

যুদ্ধজয়ের আনন্দ পেলেন সুপ্রীতি, ঘোষণা ক'রলেন, তাই বল। খোকা সব

দেখেছে, সে বলে অনেক তফাৎ।

অকাট্য যুক্তি। এবার মাথা নোয়াতেই হ'ল এবং বিজিত রাজার মত তা ক'রলেন পরীক্ষিৎ। ক'রলেন সানন্দেই।

এই জয়ের আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরতে পথেই পেলেন এমিলিকে। তাকে দেখে বিপরীত চিন্তা খেলে গেল তাঁর মাথায়। ভাবলেন তার কাকার আসাটাকে যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেটা বোঝাবার জন্যে হোটেল ঠিক হওয়ার কথাটা তাকে বলে দেন। চিন্তা মতই কাজও ক'রলেন।

এমিলি খুব প্রীত হবার মত ক'রে আপন কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ ক'রল, তবে কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, কাকার থাকবার ব্যবস্থা বাড়ীতে ক'রলেই ভাল হ'ত মা। যদি খুব — বলে চুপ ক'রে গেল, বাকী কথা বলল না।

সুপ্রীতি বললেন, আমাদের বাড়ীতে থাকতে তাঁর খুবই অসুবিধে হবে। ওঁর মত লোকের জন্যে ঠিক ব্যবস্থা ক'রতে পারব না শেষকালে উনি কষ্ট পাবেন।

এমিলি একথায় সাহস পেয়ে বলল, ওঁর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা কিছু লাগবে না। আমি তো আছিই যদি কিছু দরকার হয় তা আমিই করে দেব।

সুপ্রীতি এমিলির কথা মানতেই চাইলেন না। ওই রকম একজন জাঁদরেল বড়লোককে কখনও যেখানে সেখানে রাখা যায়? এমিলি বলছে বলুক। এমিলির নিজের কাকা বলে সে যা খুশী বলতে পারে তাই বলে সুপ্রীতি তা করেন কি ক'রে? অত কথা না বলে বললেন, এই রকম পরিবেশে থাকার অভ্যেস তো ওঁর নেই —

এ তো বেশ সুন্দর মা। সকলের মধ্যে থাকতে ওঁর খুব ভাল লাগবে। কাকা এদেশের পারিবারিক জীবনযাত্রা খুবই ভালবাসেন। এই পরিবারের অনুকরণে আমাদের বাড়ীতেও সব ব্যবস্থা ক'রেছেন তিনি। তাই তো আমি তাঁর কাছেই থাকতাম। আমাকে রান্না ক'রতে হ'ত শহরের বাড়ীতে।

সুপ্রীতি উপেক্ষা ক'রে বললেন, সে তোমাদের বাড়ীতে যা ক'রেছ আমি দেখতে যাইনি। এখানে ভদ্রলোকের অযত্ন হলে আমাদের মান সম্মান থাকবে?

আমার কাকাকে আপনি জানেন না। ওঁকে আপনি যেভাবে রাখুন ওঁর কোন অসুবিধে হয় না। বরং সকলের মধ্যে থাকতে পেলে উনি খুব আনন্দ পাবেন।

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে চলতে দেওয়া সুপ্রীতির অভ্যাস বিরুদ্ধ। এবাড়ীর প্রত্যেকটি মানুষ তাঁর ইচ্ছার অনুবর্তী। তাই তিনি এমিলির বাক-বিতণ্ডার বল্গাহীনতা দেখে চুপ ক'রে যাওয়া সাব্যস্ত ক'রলেন। প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে বললেন, ওঁর আসতে তো এখনও দেরী আছে। পরে যা হোক ঠিক করা যাবে।

কিন্তু এমিলি নির্ভর ক'রে থাকতে পারল না। সেদিনের রাত্রেই সে প্রসেনজিৎকে বলল, জান, মা বলছিলেন কাকার থাকবার জন্যে হোটেল-এ ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

ভালই তো — প্রসেনজিৎ বলল।

আমার মনে হচ্ছিল কাকা আমাদের সঙ্গে থাকতে পারলেই বেশী খুশী হবেন। ওঁর জন্যে বাড়ীতে একটা জায়গা যদি রাখা যেত ভাল হ'ত।

তাই নাকি? তাহ'লে বাড়ীতে ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন?

মা বলেন কাকার অসুবিধে হবে এখানে থাকতে। আসলে কাকাকে তো ওঁরা জানেন না — ভারতবর্ষে থাকার জন্যেই উনি আসছেন। ভারতীয় জীবনের সঙ্গে মিশতে না পারলে তো ওঁর সে আসা অর্থহীন হয়ে যাবে —

তা কেন? আমাদের সঙ্গে তো উনি সবসময়েই মিশবেন। আমিও ওঁর সঙ্গে অনেকের আলাপ করিয়ে দিতে পারব। আমাদের অফিসের মিস্টার রে আছেন ভারী মিশুক লোক। উনি তো তোমার কাকাকে নিশ্চয়ই নেমন্তন্ন ক'রে বসবেন।

মিস্টার রে, চ্যাটার্জী, পি, কে, মিস্টার কাপুর — সকলকেই তো দেখলাম কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় তো কাউকেই দেখলাম না। তোমাদের সঙ্গে মিশলে কি ভারতীয়দের সঙ্গে মেশা যাবে?

কেন কেন?

এখানে এসে আমি যাদের সঙ্গে মিশেছি তাদের সকলকেই আমার আধা ভারতীয় বলে মনে হয়।

একমুখ হেসে প্রসেনজিৎ বলল, তুমি বেশ মজার কথা বলছ তো?

তুমি কিছু মনে করনি নিশ্চয়ই?

উচ্ছ্বসিত হেসে প্রসেনজিৎ বলল, আরে না না। সে কোন কথাই নয়। তুমি সব নিঃশব্দে লক্ষ্য কর দেখছি। এর মধ্যে তোমার কাউকে ভারতীয় বলে মনে হয় নি?

একটু চিন্তা ক'রে এমিলি বলল, বিশ্বজিৎকে। একটু হতে গিয়েছিল তবে সে-ও নয়।

সে-ও নয়? কেন নয়?

কি জানি তা ঠিক বলতে পারব না। আমি সমস্ত বুঝতে পারছি, তোমাকে বোঝাতে পারছি না।

ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং তো।

হতে পারে, কিন্তু এটা আমার অনুভবের ব্যাপার।

সেটা আমি বুঝি, বলেই ইংরিজীতে বলল, কিন্তু কৌতুকের ব্যাপার হচ্ছে এই যে তুমি ভারতবর্ষে এসে একজনও ভারতীয় দেখতে পেলে না।

এটা আমার দুর্ভাগ্য।

চিন্তিত হবার মত ক'রে প্রসেনজিৎ বলল, তা নয়। তবে ভারতবর্ষের লোকমাত্রই যদি ভারতীয় না হয় তাহ'লে ভারতীয় আর কে হবে তাই ভাবছি।

এমিলি ভাবল এসব আলোচনায় ঢুকে পড়া ঠিক হবে, কি হবে না। কি আর দোষ আছে আলোচনা ক'রলে? রাগ ক'রবে? তা কেন ক'রবে? প্রসেনজিৎ অনেক উদার, এই সামান্য কথায় অসন্তুষ্ট হবার মানুষ সে নয়। তাই সে বলল, আচারে আচরণে খাওয়া-দাওয়ায় যারা ঘরে বাইরে সব সময়েই অন্যদেশকে অনুকরণ করে তাদের ভারতীয় ভাবি কি ক'রে?

এবার সত্যিই চিন্তিত হ'ল প্রসেনজিৎ। কথাটা এমিলি বড় মারাত্মক বলেছে। একটু ভাবতে গিয়েই ঠাকুর্দাকে মনে পড়ল তার। একজন শান্ত মানুষ। পরণে একটা সাধারণ ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবী আর পায়ে সাধারণ একটা চটি। এই কি তাহ'লে ভারতীয়ত্ব? পোষাকে? যখন দেখেছিল তখন আর কিছুই ভাল ক'রে দেখেওনি তাই ঠাকুর্দা সম্পর্কে আর কিছু মনে পড়ে না প্রসেনজিৎ-এর। চট ক'রে মনে পড়ল ঠাকুমার কথা, জিজ্ঞাসা ক'রল, ঠাকুমার সঙ্গে তো তোমার আলাপ হয়েছে। তাঁকে দেখনি?

আমি কি একবারও বলেছি যে ভারতবর্ষ থেকে ভারতীয় মানুষ একবারে চলে গেছে? তাহ'লে দেখব না কেন?

তবে?

এখানে যত পরিবারে মিশলাম তাদের সবারই মধ্যে দেখলাম এদেশের ভাবধারা আদৌ নেই।

কি ক'রে বুঝলে?

আমি কি তোমাদের দেশের কালচার সম্বন্ধে কিছু জানি না?

কেমন ক'রে জানবে?

কল্যাণ গল্প ক'রত।

মিঃ জানা যে ঠিক গল্প ক'রেছে তা তুমি কি ক'রে বলছ? প্রসেনজিৎ হাল্কা ভাবেই বলল।

বলছি এইজন্যে যে সে তার দেশকে তো জানে? তার কথা তো অনেকটা মিলছেও —

তবে আর কেন বলছ দেখতে পাচ্ছ না?

হতাশ হবার মত ক'রে এমিলি বলল, ওঃ আর পারছি না তোমার সঙ্গে। তুমি এখন ঠিক যেন একজন আইন-ব্যবসায়ী — শেষ বাক্যটা সে ইংরিজীতেই বলে ফেলল।

ইংরিজী সুরু ক'রল প্রসেনজিৎ-ও, আমি দুঃখিত।— বলেই খুব একচোট হাসল। তারপর বলল, আমরা কাকার প্রসঙ্গ থেকে কোথায় চলে এলাম। ওঁর ব্যাপারে এখন কি ক'রতে পারি বল?

তুমি এমন একটা ব্যবস্থা কর যাতে কাকা বাড়ীতেই থাকতে পারেন।

সমস্যায় পড়ল প্রসেনজিৎ। এবং এটা এমনই সমস্যা যেরকমটির সামনে জীবনে আর কখনও পড়েনি। এ ব্যবস্থা কিভাবে সম্ভব ভাবতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে গেল। কাকে কি কথা বললে, বা কি ক'রলে এটা হতে পারে বুঝতে পারল না কিছুতেই। জ্ঞানে বাবার সঙ্গে সামান্যই কথা বলেছে সে, মার কাছেও কোন কিছু কোনদিন চাইতে হয়েছে বলে তার মনে পড়ে না। কিছুর জন্যেই অপেক্ষা করে নি সে কখনও। সবচেয়ে যেটা বড় কাজ সেই বিয়েটাও সেরে ফেলেছে একা এবং বাড়ীর সকলের অসাক্ষাতে অজান্তেই। আজ তাই মার কাছে বা বাবার কাছে — কার কাছে প্রার্থী হবে সে ভেবেই পায় না। আর সে প্রার্থনাটাও এমনই যা মর্যাদাহানিকর বলেই তার মনে হচ্ছে। আবার এমিলিকেই বা বোঝায় কি বলে? সমস্যায় ডুবে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল প্রসেনজিৎ। তারপর নেহাৎ কালহরণের অভিপ্রায়েই বলল, দেখা যাক না কি হয়। এখনও তো ওঁর আসতে দেরী আছে।

প্রসেনজিৎকে কিছুই বলতে হ'ল না। পরেরদিন সপ্রীতিই পরীক্ষিৎকে খাবার টেবিলে বসে বললেন, এমিলির ইচ্ছে ওর কাকার থাকবার ব্যবস্থা এখানেই করা হোক। কোন হোটেলে নয়।

পরীক্ষিৎ মুখের মধ্যে বেশ বড় একটুকরো মাংস পুরেছিলেন বলে একটু সময় লাগল কথাটার জবাব দিতে। সেটুকু পেটে পুরে দিয়ে বললেন, আমাদের বাড়ীর পরিবেশ ওঁর থাকবার মত যদি না হয়?

এমিলি-ও টেবিলের বিপরীত দিকে ছিল, বলল, সেইজন্যেই তাঁর ভাললাগবে। উনি এদেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশতে চান।

পরীক্ষিৎ তাঁর স্বভাবমত শান্ত স্বরে বললেন, এদেশের জীবনযাত্রা। সে কি আমাদেরই আছে?

কথাটা শুনেই প্রসেনজিৎ বাবার দিকে সরাসরি তাকাল, বলল, আপনিও এই কথা বলছেন বাবা?

কেন?

এমিলি আমাকে কেবল এই একই কথা বলে। আমাদের জীবনযাপনে নাকি ভারতীয়তা নেই।

না ঠিক তা নয় — এমিলি দূরপ্রান্ত থেকে প্রতিবাদ ক'রতে চাইল, আমি বলছিলাম —

সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য না ক'রে পরীক্ষিৎ বললেন, দুঃখের বিষয় এই যে, একজন বিদেশী মহিলার চোখে যেটা ধরা পড়ে আমাদের নিজেদের চোখে সেটা কখনই পড়ে না।

প্রসেনজিৎ চুপ ক'রে রইল — সে এসব তারতম্য বোঝে না। কি যে

ভারতীয় আর কি ভারতীয় নয় জানেই না সে। তাই অবোধ যেমন ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে তেমনি মনের অবস্থা নিয়ে সে খেতে লাগল। সুপ্রীতি তর্ক তুলে নিলেন, ওদের ভালটা নিতে দোষ কি?

ভাল-মন্দ দোষ-গুণের কথা স্বতন্ত্র। এখানে যে কথা সে হচ্ছে জীবন-যাত্রার ধারা এদেশে অনেক বদলে গেছে। অবশ্য একথাও ঠিক যে নানা রকম পরিবর্তন মানুষের সমাজে সব সময় চলছে। তবে এমিলি, এখনও এদেশে সামান্য সংখ্যক লোকের বাড়ীতেই তুমি পশ্চিমের ভাবধারার চলন দেখবে, বেশীর ভাগ মানুষই তা নয়।

এমিলি জবাবে বলল, সেটাই খুব স্বাভাবিক। আমিও সেই কথাই বলছিলাম, যে ক'টা বাড়ীতে আমি গেলাম কোথাও সেই খাঁটি ভারতীয় জীবনযাত্রা দেখলাম না।

খাঁটি ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে? — পরীক্ষিৎ জানতে চাইলেন।

এমিলি কি জবাব দেবে ভাবতে গিয়ে একটু দেরী ক'রে ফেলল, একটু ইতস্তত ক'রল, তারপর বলল, প্রত্যক্ষ নেই তবে শোনা আছে কিছু —

কার কাছে শুনেছ? সে কি ভারতীয় না তোমাদের দেশেরই কেউ?

প্রশ্নগুলোয় পরীক্ষিৎ-এর আন্তরিকতায় সহজ সরলতা ছিল বলে এমিলিও অকপটভাবে জবাব দিয়ে যাচ্ছিল, বলল, আমার এক ভারতীয় বন্ধু আমাদের দেশেই এদেশের জীবন সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিল।

ভারতীয় তো তবে কোথাকার লোক?

এখানকার। বাংলার।

প্রসেনজিৎ বলল, মিঃ জানার কথা বলছ নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। — এমিলি জানাল।

প্রসেনজিৎ বাবাকে বলল, সত্যিই এক অদ্ভুৎ ভদ্রলোক বাবা! আমি দেখিনি, এমিলির কাছেই শুনেছি সে নাকি ওখানেও কোথাও নেমন্তন্ন খেতে গেলে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে যেত।

পরীক্ষিৎ এতক্ষণ কথা বলছিলেন মুখ খাবারের দিকে রেখেই, এবার মুখ তুললেন, ছেলের দিকে তাকালেন, বললেন, ভদ্রলোক অত্যন্তই আত্ম-মর্যাদাবোধ সম্পন্ন। এমিলিকে বললেন, সে ভদ্রলোক ওখানেই থাকেন?

না চলে এসেছেন, প্রসেনজিৎই জানাল।

তবে তো তাঁর সঙ্গেই একদিন তোমরা গিয়ে দেখা ক'রে আসতে পার — পরামর্শ দিলেন পরীক্ষিৎ। এমিলি তার জবাবে বলল, উনি যে কোথায় থাকেন তা তো জানি না। ওখান থেকে চলে এসেছেন হঠাৎ। তারপর আর কোন খবর নেই।

এখানকার ঠিকানাও জানতে না?

না। বলতেন মেদিনীপুরের কোন গ্রামে যেন বাড়ী, নামটা ভুলে গেছি।

আর কোন কথা বললেন না পরীক্ষিৎ, খাবার শেষ ক'রতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অল্প সময়ের মধ্যেই বাকী খাবারটুকু শেষ ক'রে বললেন, আমার এক পিসিমার ছেলে শুনেছি বাগবাজারে কোথায় থাকে, মা জানে।

সুপ্রীতি যেন লাফিয়ে উঠলেন, যারা জীবনে কোনদিন সম্পর্ক রাখল না তুমি তাদের কাছেই এমিলিকে যাবার বুদ্ধি দিচ্ছ নাকি?

যদিও বা মনের মধ্যে সেই রকম ভাবনা একটু ছিল কিন্তু সে পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত হলেন পরীক্ষিৎ, বললেন, সম্পর্ক আমরা যে রাখি না এটাও তো তারা বলতে পারে?

একথার জবাব না দিয়ে সুপ্রীতি প্রত্যক্ষভাবেই এর অপ্রয়োজনীয়তা বোঝালেন। আর তার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে তিনি এই সব সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাপারগুলোকে সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষা করেন। সেটা অবশ্য এভাবে না বোঝালেও বিগত একত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে পরীক্ষিৎ চূড়ান্তভাবেই উপলব্ধি ক'রেছেন বলে নিজেদের আত্মীয় স্বজন সকলের থেকে মহাকাশ দূরত্বে বসবাস ক'রছেন একমাত্র বৈবাহিক সূত্রে পাওয়া কিছু আত্মীয়কে স্বজন ক'রে। নিজের একান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও মদ্যপ একমাত্র শ্যালককে সহ্য ক'রতে হয় তাঁকে কষ্ট ক'রে। বাড়ীতে তিনি থাকাকালে কোন সময় হঠাৎ এসে পড়লে অভ্যর্থনাও ক'রতে হয় যথোচিত ভদ্রতার মুখোশটা পরে নিয়ে। অথচ মনে মনে চাননা যে লোকটি আসুক। বিনা পেশার এই মানুষটা শুধুমাত্র নেশা ক'রেই পৈত্রিক সম্পত্তির পুরোটা খরচ ক'রে ফেলেছে এটা তাঁর কাছে একান্তই অসহ্যের। রাগের চোটে তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল সুপ্রীতিদেবীর ছোট বোন সুমিত্রাকে দিয়ে দাবী করিয়ে তাঁর শ্বশুরের সম্পত্তি তিনভাগে ভাগ করিয়ে নেন, হয়নি। সুপ্রীতিই সে বুদ্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সুমিত্রাকে চিঠি লিখতে দেন নি — মর্যাদায় আঘাত লাগবে বলে। মুখে বলেছিলেন, ছোট ভাই-এর সম্পত্তি সে নিজেই ভোগ করুক, যদি রেখে যেতে পারে ভালই না হ'লে নষ্ট করে তো করুক আমাদের তাতে কি?

এরপর আর কথা চলে না তাই দীর্ঘদিন ধরে চুপ ক'রে অপ্রিয় সমস্ত কিছু সয়ে নেবার অভ্যেস ক'রে নিয়েছেন পরীক্ষিৎ শান্তি বজায় রাখবার জন্যে। আর দীর্ঘ দিন ধরে অভ্যেস করবার ফলে ইদানীং তাঁর নিজেরও বিশ্বাস জন্মে গেছে যে স্ত্রীর স্বজন-কজন ছাড়া তাঁর আত্মীয় বলতে আর কেউ কোথাও নেই। সে হিসেবে হারিয়ে যাওয়া পিসিমার ভুলে যাওয়া ছেলের কথা মনে পড়ল তাঁর শুধুমাত্র এমিলির প্রয়োজনেই। তারও একটা কারণ আছে, ছেলের বউ হিসেবে এমিলিকে তাঁর ভালই লেগেছে। মার্কিন মেয়ে বলে কোন শ্লাঘার ভাব তাঁর মনে নেই, ভাল মেয়ে বলেই ভাল লেগেছে তাঁর। মনে মনে তৃপ্ত হয়েছেন তিনি; বিদেশে তাঁদের অজান্তে হঠাৎ বিদেশী একটা মেয়েকে বিয়ে ক'রে ফেলার জন্যে যে ক্ষোভ ছিল তাঁর, এমিলির ব্যবহারে সে ক্ষোভের বদলে বরং

প্রশংসাই ক'রেছেন নিঃশব্দে। ভালই ক'রেছে প্রসেনজিৎ, ভাল বুঝেই ক'রেছে। কাকার পরিচয় পেয়ে হয়েছেন খুশী। বুঝেছেন প্রসেনজিৎ বুদ্ধিমান। তাঁর মনের মতই হয়েছে প্রসেনজিৎ।

কিন্তু বিশ্বজিৎটা যে কি রকম হ'ল এই কথাটা মাঝে-মাঝে কখনও বুঝতে চান পরীক্ষিৎ। মনে মনে হাতড়ান। হদিশ পান না। কার মত হ'ল সে? সকলের চোখের আড়ালে নিজের ঘরের মধ্যেই সব সময় থাকতে চায়। বাড়ীতে থাকলে কারও সঙ্গেই মেশে না। অথচ আগে ঠিক এতটা ছিল না। পড়াশোনায় অত্যন্ত ভাল বলে চিরদিনই একটু অন্তর্মুখী। নিজের মধ্যেই মগ্ন থাকে। তবু তো আগে খাবার টেবিলে পাওয়া যেত তাকে, আজকাল দেখা-ই যায় না। এই অনুপস্থিতির প্রথম দিনগুলোয় খোঁজ নিতে চেষ্টা ক'রেছিলেন স্ত্রীর কাছে। সুপ্রীতি কারও ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত দিতে চান না বলেই বেশী গবেষণা করেন নি ছোটছেলের পরিবর্তনের, তবে কর্তার আগ্রহে দুএকবার অনিচ্ছুক আগ্রহ প্রকাশ তাঁকে ক'রতেই হয়েছে, যাও তো বসুদেব দ্যাখ তো ছোট সাহেব খেতে আসবেন কিনা?

বসুদেব সন্তর্পণে খবর এনেছে — ছোট সাহেব এখন পড়ছেন। পরে খাবেন বললেন।

ব্যস্। পরীক্ষিৎও সন্তুষ্ট, তাঁরও কর্তব্য করা হ'ল। এমনি ক'রেই বিশ্বজিৎ আড়ালে চলে গেছে। একদিন একান্ত আলাপে পরীক্ষিৎ বেশী আগ্রহ প্রকাশ করায় সুপ্রীতি পরিস্কারই বলেছিলেন, ও যে কি এত পড়াশোনা করে বুঝি না। তবে আজকাল বোধহয় দিনের বেলা বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকে না।

তাহ'লে নিশ্চয়ই এমন কোথাও যায় যেখানে যাওয়া প্রয়োজন মনে করে বিশ্বজিৎ। নিজেকে গড়ে তোলবার বুদ্ধি যে তার আছে এ বিষয়ে কারও সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। তাছাড়া বিশ্বজিৎ এরকম না হ'লেও তার সঙ্গে ব্যবহারে এর অন্যথা কিছু হ'ত না কারণ এবাড়ী ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পীঠস্থান বলে সুপ্রীতির গৌরব এবং জীবন চর্যায় গণতন্ত্রীকরণের উৎকৃষ্ট উপমা বলে পরীক্ষিৎ-এর গর্ব।

প্রসেনজিৎ পরীক্ষিৎ সুপ্রীতি আর এমিলি। ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রাখতেই শব্দ শোনাগেল। যে বিমানটা মাথার ওপর চক্রের মত ঘুরল সেটাই টার্মিনাল বিল্ডিংএর পেছন দিয়ে নেমে আসছে। সুপ্রীতি স্বামীর হাতে ধরে থাকা ফুলের তোড়াটার দিকে চোখ ফেললেন। মহিলাদের ভার চিরদিন যাদের কাঁধে ন্যস্ত থাকে সেই স্বামী শেষের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মালিকানার ভিত্তিতে ধরে আছেন হগসাহেবের বাজার থেকে কেনা বিশাল ফুলের তোড়াটা। সুপ্রীতি বললেন,

কাগজটা এবার খুলে ফেল। পরীক্ষিৎ স্ত্রীকে অমান্য ক'রলেন। তিনি ফুলগুলোকে আরও সতেজ রাখবার জন্যে আরও কিছু সময় কাগজের মোড়কের মধ্যেই ঢেকে রাখবার পক্ষপাতী। আর এমিলি নিজেই ধরেছিল ফুলের মালাটা। কাগজে মোড়া ছিল সেটাও। অত্যন্ত তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে সে বিমানটার ভেতরটাকে খুঁজছিল মনশ্চক্ষে। আগ্রহ ছিল প্রসেনজিৎ-এর—সে অন্য এক সাধারণ আগ্রহ ; অপেক্ষা করা — কিছুর জন্য অথবা কিছুর জন্য নয়। আর সুপ্রীতির কৌতুহল। পরীক্ষিৎ সৌজন্যমণ্ডিত ভদ্রতার নিশান উড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার তলায়। সামান্য কয়েক মুহূর্ত কাটিয়েই বিমানটা হুস ক'রে নেমে এল মাটিতে — অনেকটা দূরে। বিমানবন্দরের কর্মীদের ব্যস্ততা — পেছনে লাউডস্পীকারের ঘোষণা — সামনে বিমানের সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন রকমের যান্ত্রিক গাড়ীগুলোর ছুটোছুটি — সবকিছুর ওপারে নিস্পৃহভাবে দাঁড়িয়ে গেল ব্যোমযানটা। তারপর ধীরে ধীরে একে একে নেমে আসা যাত্রীদের দেখেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাততালি দিয়ে উঠল এমিলি ছোট্ট মেয়ের মত। তার কাকা নেমে আসছেন — মাথার বিশাল টাকটা চকচক ক'রছে এশিয়ার রোদ পড়ে। প্রসেনজিৎ নিজেও উৎসাহিত হয়ে উঠল, পকেট থেকে রুমালটা বের ক'রে নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা ক'রল মিস্টার হ্যারল্ড স্ট্রঘাণ-এর। কিন্তু সেই টাক সমন্বিত ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন প্রত্যুত্তর লক্ষ্য করা গেল না।

তবে তিনি যে প্রসেনজিৎ-এর রুমাল নাড়া দেখেছেন সেটা বোঝা গেল পরে যখন আগন্তুক অন্তঃশুল্ক-কর্মীদের কাছে অভিমন্যু। আধঘন্টা সময় আটকে ভদ্রলোককে নাস্তানাবুদ ক'রে অহেতুক কৈফিয়ৎ আদায় ক'রে যখন ছাড়ল, পরীক্ষিৎ এতক্ষণের অসহায় দর্শকের ভূমিকা ছেড়ে সচকিত হয়ে উঠলেন। তাঁর সমস্ত চাকরী-জীবনের আত্মবিশ্বাস, যা নাকি অনেকের কাছেই আত্মম্ভরিতা মনে হবে, এক শুল্ক পরীক্ষাতেই তছনছ হয়ে গেল — নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি ক'রে। বিব্রত, ব্যতিব্যস্ত আগন্তুক যখন মুক্তি পেয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁর এরকম অভ্যর্থনার জন্যে পরীক্ষিৎ-এর নিজেরই লজ্জা বোধ হতে লাগল। আর সে লজ্জা গোপন করবার জন্যেই এমিলির পেছন পেছন তিনি দৌড়ে গেলেন সিদ্ধান্ত ভুলে গিয়ে। সুপ্রীতি অসন্তুষ্ট হলেন। এমিলি ততক্ষণে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে কাকাকে। পরীক্ষিৎ আগের মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকলেও যে মুহূর্তে মনে পড়ল হাতের ফুলের গোছা তুলে দিলেন স্ত্রীর হাতে। সপ্রীতি ফুলের তোড়াটা মোড়ক খুলে আগন্তুকের হাতে তুলে দিতে এমিলি পরিচয় করিয়ে দিল, আমার শাশুড়ী। মিস্টার স্ট্রঘাণ হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, পরিচয়ের সুযোগ পেয়ে তিনি খুব আনন্দিত বোধ করছেন। পরীক্ষিৎ স্বাগত জানানোতে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, এখানে আসতে পেরে আমি খুবই খুশী। আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে পেরে খুবই গর্বিত বোধ করছি। প্রসেনজিৎ হাতের ফুলগুলো তুলে দিতে সেগুলোকে বগলদাবা ক'রে হাত বাড়িয়ে দিলেন, কেমন আছ মাই বয় ?

এখন খুবই সুখী, আপনাকে পেয়ে — প্রসেনজিৎ বলতেই মিস্টার স্ট্রঘাণ বললেন, ধন্যবাদ। আমিও এখানে তোমাদের মধ্যে আসতে পেরে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

রাস্তায় কোন কষ্ট হয় নি তো? সৌজন্যমূলক প্রশ্ন ক'রল প্রসেনজিৎ।

ওঃ এটা একটা সুন্দর পথ। সারারাস্তা ভাবতে ভাবতেই কেটে গেল।

পরীক্ষিৎ বললেন, তার যার যত বেশী ভাবনাও তার ততই বেশী।

খুব সুন্দর বলেছেন। তবে আমি সব ভার নামিয়ে এসেছি। এখন আমার কোন ভার নেই।

সুপ্রীতি বেশ একটু অসুবিধের পড়ছিলেন। সব কথা বোঝা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না বলেই বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল তাঁকে। বেগতিক দেখে তিনি একে একে জিনিষগুলো এনে বাচ্চারা যেখানে জড় ক'রছে সেখানেই গিয়ে হাজির হলেন। এবং অচিরেই তদারকিতে আত্মনিয়োগ ক'রলেন। অফিসের সুবাদে একটা জীপ গাড়ী সংগ্রহ ক'রে তাতে বসুদেব আর তারই পরিচিত, এক প্রতিবেশী বাড়ীর চাকর রামকে বসিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে তুলে নেবে বলে।

এমিলির ইচ্ছামত বাড়ীতেই থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল তার কাকার। এমিলি সেটা কাকাকে বিমানক্ষেত্রেই জানিয়ে দিল, জানাল এটাই এদেশের প্রথা। বিদেশ থেকে আত্মীয় কেউ এলে হোটেলে ওঠা এখানকার মানুষ নিজেদের পক্ষে অসম্মানজনক মনে করে। — কথাগুলো অবশ্য কল্যাণ-এর কাছে শোনা — যেমন শোনা প্রায় তেমনি সে কাকাকে শোনাল। কাকাও খুবই খুশী হলেন, বললেন, প্রাচ্যের অভ্যর্থনারীতির তুলনা হয় না।

বিমানবন্দরেই শুল্কবিভাগের যে অভ্যর্থনা প্রথমেই তাঁর জুটেছিল এমিলির কথাশুনে তা তখনকার মত ভুলে গেলেন মিস্টার স্ট্রঘাণ।, যে হৃষ্টচিত্তে দীর্ঘদিন এদেশে আসার প্রতীক্ষা তিনি ক'রছিলেন সেই রকম উৎসাহ নিয়েই পরীক্ষিৎ-এর বাড়ীর দক্ষিণের ঘরটিতে এসে উঠলেন। যথাসম্ভব মোলায়েমভাবে রঙ করা হয়েছিল দুদিন আগেই, ঘরের দেয়ালের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে প্রায়গেরুয়া রঙের নতুন কেনা পর্দা এমিলি নিজেই লাগিয়েছিল পছন্দ ক'রে, বিছানায় চাদর পেতে রেখেছিল সে একই রঙের — ঘরে ঢুকেই সর্বত্র একই কোমল-গৈরিক রঙের ব্যবহার দেখে অত্যন্তই প্রীত হলেন স্ট্রঘাণ। বেশ মুগ্ধভাবে কিছুক্ষণ চারপাশে চেয়ে নিজের প্রীতির কথা প্রকাশ ক'রে ফেললেন। রঙটা খুবই ভাল লেগেছে তাঁর। সব মিলিয়ে বললেন, সুন্দর।

সুপ্রীতি লজ্জা পাচ্ছিলেন ঘরটা তাপনিয়ন্ত্রিত নয় বলে। তাঁর বড় সাধ এয়ার কণ্ডিশনের, কিন্তু সে আর হয়ে উঠল না। সেই ক্ষোভই এখন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সুযোগ পেয়ে। মিস্টার স্ট্রঘাণ-এর বারংবার প্রশংসার উত্তরে সুপ্রীতি সবিনয়ে বললেন যে তাঁর উপযোগী কোন আয়োজন করাই সম্ভব

হয়নি। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন ও'র জন্যে কোন হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করাই ভাল হবে। স্যুইট একটা বুক করাও হয়েছিল, শেষে এমিলির কথা মত তা বাতিল করা হয়।

সুপ্রীতির কথা শুনে এমিলি লজ্জিত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ আগে সে এদেশের অতিথি আপ্যায়ণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যা বলেছে শাশুড়ী বলছেন তার বিপরীত কথা। সে তাড়াতাড়ি সে কথা চাপা দেবার জন্যে বলল, সবাই খুব চিন্তিত ছিলেন যে বাড়ীতে থাকতে তোমার অসুবিধে হবে। আমি বললাম তা হবে না। কি, ভারতীয় খাবার খেতে অসুবিধে হবে?

ও নিশ্চয়ই নয় — স্ট্রঘাণ বললেন। তারপর বললেন, আমি খুব আনন্দের সঙ্গে সব কিছু দেখতে চাই। — বেশ একটু থেমে তিনি আবার বললেন, ভারত-এর ঐতিহ্য বহু পুরাণো। এর সভ্যতা ও কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হতে পারার জন্যেই এখানে আসা। এই সুযোগ পাবার জন্যে অবশ্য এমিলির অবদান অনেকখানি। —বলে তিনি এমিলির দিকে তাকালেন। এমিলি বলল, ধন্যবাদ। এরপর কাকা বলে চললেন, মেয়েদের এই একটা বিশেষ সুবিধে আছে। তারা ইচ্ছে ক'রলেই যে কোন সংস্কৃতিকে আপন ক'রে নিতে পারে, সে কোন সভ্যতার সঙ্গে মিশে যেতে পারে।

পরীক্ষিৎ অতিথির জন্যে আজ অফিস যাওয়া স্থগিত রেখেছিলেন আগেই ছুটি নিয়ে। তিনিও ছিলেন সঙ্গে, মিস্টার স্ট্রঘাণ-এর কথার উত্তরে একটু হেসে রহস্যালাপ-এর মত বললেন, একটু সংশোধন ক'রে বলছি এই সুবিধেটা মেয়েদের নয় — অবিবাহিত মেয়েদের।

নিমেষমাত্র চিন্তা ক'রে স্ট্রঘাণ বললেন, আপনারা সেটা বলতে পারেন। আমাদের ওখানে হলে মেয়েরা এ বিষয়ে অনেকটা স্বাধীনতা পেয়ে থাকে।

এখন এখানেও পেয়ে যাচ্ছে।

খুবই ভাল। যা মঙ্গলের তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়াই ভাল।

সবাই শুনলেও কেউ কোন জবাব দিল না। পরীক্ষিৎ এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত। প্রকৃতপক্ষে কোনটা মঙ্গল এবং কোনটা অমঙ্গলের তা কখনই সঠিকভাবে নির্ধারিত নয়। একই বস্তু পাত্রভেদে মঙ্গল এবং অমঙ্গল দুই-ই ক'রে থাকে। যে আগুন জীবজগতের অপরিহার্য — সেই আগুনই পরিস্থিতি বদলে করে চরম অমঙ্গল। প্রদীপের সলতেয় তার যে ভূমিকা অন্য ভূমিকা তার খড়ের গাদায়। এই ধরণের স্বাধীনতাগুলোও তেমনি — কোন মানুষ তার যোগ্য ব্যবহার করে কোন মানুষ করে তার অপব্যবহার। কাজেই সর্বত্রই মিস্টার স্ট্রঘাণ-এর কথা প্রযোজ্য কিনা সেটা বিচার না ক'রে তাঁকে সমর্থন পরীক্ষিৎ ক'রলেন না। তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলেন, জাপান আপনার কেমন লাগল?

এসব দিকে আমি এই প্রথম এলাম। জাপান-এর সঙ্গে আমাদের দেশের পার্থক্য বোধহয় শুধু জনসংখ্যায়। দৌড়ে ওরা আমাদের ধরতে চাইছে কি

আমরাই ওদের ধরতে চাইছি — এ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না টোকিও ঘুরে। যদি হঠাৎ জাপানী নাগরিকদের পরিবর্তে আমেরিকার মানুষে ভরে দেওয়া যায় তাহ'লে ওদেশটাকে জাপান বলে আর চেনবার উপায় থাকবে না — আমেরিকা বলেই মনে হবে।

পরীক্ষিৎ বললেন, আমার মনে হয় সমস্ত পৃথিবীতে এখন একই ধরণের স্থাপত্য-শৈলী প্রবর্তিত হচ্ছে। আগে যেমন আচার-আচরণ প্রভৃতির মত স্থাপত্য রীতি-ও দেশে দেশে ভিন্ন হ'ত এখন আর তা হচ্ছে না।

মিস্টার স্টুঘাণ খুব আস্তে বললেন, পরিবর্তনই হচ্ছে পৃথিবীর বৈশিষ্ট। প্রতি মুহূর্তে এই পৃথিবীতে পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে মানুষ কখনও সন্তুষ্ট নয়। সব সময়ই মানুষ চায় 'আরও ভাল'; তাই এই পরিবর্তন চলছেই।

স্টুঘাণের কথাটি পরীক্ষিৎ-এর মনে বেশ আলোড়ন আনল। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্যের মৌলিক দিক উনি যেমন এক কথায় বুঝিয়ে দিলেন তা পরীক্ষিৎ-এর খুবই ভাল লাগল। তাঁর মনের মধ্যে কথাটি ঘুরতে লাগল। অন্য প্রাণীরা তো সত্যিই তাই, অল্পেই সন্তুষ্ট, যা তারা পেয়েছে তার বেশী কিছু চাইতে তারা শেখেনি। এমন কি হিংস্র প্রাণীরাও ক্ষিধে মিটে গেলে সাধারণত অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করে না। মানুষের অসন্তুটিই তাকে পরিবর্তনমুখী ক'রেছে। মানুষও আবার পারস্পরিক ভাববিনিময়ের মাধ্যমে — চিন্তার উৎকর্ষতাকে ব্যবহারিক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। আমেরিকা সুন্দর যা ক'রছে তারই অনুকরণ হয়ে যাচ্ছে জাপানে। চীনে যে বস্তু উদ্ভাবিত হচ্ছে ব্রিটেন তা গ্রহণ ক'রছে সুযোগ মাত্রই। তাই বোধহয় আজ পৃথিবীতে পার্থক্যটা কমে আসছে। শেষ কথাটুকুই পরীক্ষিৎ নিজের সিদ্ধান্তের মত ক'রে স্টুঘাণ-এর জাপান দেখা প্রসঙ্গে জানালেন।

স্টুঘাণ বক্তব্যটুকু শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলেন তাঁর স্বভাব অনুসারে। তারপর যে রকম শান্ত স্বরে কথা তিনি বলে থাকেন তারও চেয়ে ধীরে তিনি বললেন, সেটাই হয়ত সত্য হবে। কিন্তু সেটা মানুষের পক্ষে একঘেয়েমীরই সামিল হচ্ছে। সবাই তো আর একঘেয়েমী সহ্য ক'রতে পারে না।

পরীক্ষিৎ যখন চিন্তার জগতে পা দেন — সিগারেট ধরিয়ে নেন অভ্যেস বশে। তেমনি কারণেই নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে খোলা প্যাকেট এগিয়ে দিলেন অতিথির দিকে। স্টুঘাণ বললেন, ভারতীয় সিগারেট খুবই ভাল।

খুব ধীরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে স্টুঘাণ বললেন, একসময় ভেবেছিলাম ভারতীয় সিগারেটের ব্যবসা ক'রব।

পরীক্ষিৎ বললেন, ভালই ভেবেছিলেন। আমরা কিছু ডলার পেতে পারতাম।

স্টুঘাণ বললেন, ডলার আপনাদের একটা সমস্যা বটে। অনেক সমস্যার একটা। তবে কি জানেন, এ সমস্যাটা আপনাদেরই সৃষ্টি।

কেন ?

স্বাধীনতার পর আপনাদের অর্থনীতি যতটা স্বনির্ভর হওয়া উচিত ছিল, তার বিপরীত ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে একে। — আমি আশা করি আমার মন্তব্যে আপনি কিছু মনে ক'রবেন না। আমি নেহাৎ আলোচনার জন্যেই বলছি।

নিশ্চয়ই মনে ক'রব না। অনেক জিনিষ শেখবার আছে। অনেক কিছুই জানবার আছে — আলোচনা না হ'লে সবই নাজানা রয়ে যায়। আপনি বলতে পারেন, আমি খুব আনন্দের সঙ্গেই শুনব।

সমস্ত মাথার ওপরটা জুড়ে টাক। দুদিকে কাঁচাপাকা চুল। আর অসম্ভব ঘন চুল দুই চোখের ভ্রূতে। তাতে চোখ দুটোকে জঙ্গলের ধারে দীঘির মত মনে হয়। আর মণিবলয় দুটো প্রায় কোন সময়েই দেখা যায় না বলে মনে হয় খুবই রাগী প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের হ্যারল্ড অত্যন্তই শান্ত, এবং মিতবাক। সেই পরিমিত বাক্যালাপ তাঁর এতই কোমলভাবে ফুটে বেরোয় যে মানুষটাকে কথা বলতে না দেখলে সেটা যে ওঁরই বলা তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না। তা ছাড়া মানুষের সঙ্গে কথোপকথনে মনে হয় যে প্রত্যেকটি কথাই তিনি চিন্তা ক'রে বলছেন। প্রতি দুটো বাক্যের মাঝখানে একটু থামা তাঁর নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গী। স্বকীয় ভঙ্গীতে তিনি বললেন, ঘরে ইলেকট্রিকের তার লাগানো বা আলো লাগানোর কাজ দেখেছেন তো? ইলেকট্রিক যেদিক থেকেই আসুক না কেন তার যেমন ভাবে লাগালে সুবিধে হয় তেমনিভাবেই তার লাগানো হয় বা আলো খাটানো ঘরের সুবিধে মতই হয়ে থাকে। যে কোন চিন্তা ধারাকেও তেমনি — যেখান থেকেই তা নেওয়া হোকনা কেন — নিজেদের আবেষ্টনীর উপযোগী ক'রে তাকে প্রয়োগ ক'রতে হয়। পশ্চিম জগতে শিল্পের এই যে প্রসার, এ হয়েছে তার স্বাভাবিক বিবর্তনে। এর জন্যে তাকে কোথাও হাত পাততে হয়নি। এখানে কিন্তু রাতারাতি শিল্পপরিকল্পনা করা হ'ল — আলাদীনের প্রদীপ জ্বালা দৈত্যের এনে দেওয়ার মত ক'রে বসানো হ'ল বিশাল বিশাল কারখানা। অথচ এই কারখানাগুলোর একটাও এ দেশের ধারা অনুসারে গড়ে ওঠেনি, রাতারাতি গড়ে তোলা হয়েছে য়ুরোপীয় কলকারখানার পরিকল্পনা অনুসারে, সেই ছাঁদে। — থামলেন স্ট্রগান। এতগুলো কথা যদিও মাঝে মাঝে থেমে থেমে বললেন, তবু এক নাগাড়ে বলা তাঁর অনভ্যাস বলে মনের কথা শেষ না ক'রেই থামলেন। চুপ ক'রে রইলেন; তারপর এমনভাবেই সিগারেট আঙুলের ফাঁকে ধরে ধূমপান ক'রতে লাগলেন যেন একটু আগের কোন আলোচনাতেই তিনি ছিলেন না, শ্রোতা হিসাবেও নয়।

পরীক্ষিৎ একজন পরীক্ষা দিয়ে পাশকরা প্রশাসক। এবং এমন একটি প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় পাশ ক'রে তাঁদের আসতে হয় যে সরকারও মনে করে এই পরীক্ষায় পাশ ক'রলে বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, অর্থনীতি, দর্শন, বাণিজ্য — ব্যবহারিক জগতের যতগুলো দিক আছে সবদিকে দিকপাল হওয়া

যায়; অপরদিকে প্রশাসক পদাধিকারী খুব সঙ্গত কারণে মনে করেন একমাত্র তাঁর ওপরওয়ালা ছাড়া পৃথিবীতে আর প্রাণীমাত্র নেই যে তাঁর থেকে অধিক জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান। পরীক্ষিৎ নিজেও এর ব্যতিক্রম নন, তবু একমাত্র স্টুঘাণ-এর ক্ষেত্রে কি হ'ল তিনি শুধুমাত্র শ্রোতা-ই রয়ে গেলেন। স্টুঘাণ নিজেই তাই বেশ কিছুক্ষণ বাদে নতুন কিনে বসানো ছাইদানীর মধ্যে সিগারেট-এর শেষটুকু গুঁজে দিয়ে বললেন, ও প্রসঙ্গ থাক।

স্টুঘাণ চাইলেও পরীক্ষিৎ প্রসঙ্গটাকে বন্ধ ক'রতে দিলেন না, বললেন, আপনি কি বলবেন এই শিল্পীকরণের প্রয়োজন ছিল না?

মানুষ যখন যেটা সিদ্ধান্ত করে তখন সেটা তার কাছে আবশ্যিক হয়ে যায়। তখন তার কোনও পরিবর্ত ভাবনা থাকে না। এই ধরুণ যে চিন্তা নিয়ে আমি দেশ ছাড়লাম এই চিন্তা বেশ কিছুদিন ধরে মনের মধ্যে ঢুকে বসে থেকে একটা সিদ্ধান্তের আকার ধারণ ক'রেছিল, তাই পরিবর্ত কিছু ছিল না। আসতেই হ'ল।

পরীক্ষিৎ ভূমিকার যুক্তিটির ওপর মন্তব্য ক'রতে চেয়েও থেমে গেলেন, বাকী অংশ বলাবার জন্যে চুপ ক'রে রইলেন। স্টুঘাণ নিজের দুই করতল হঠাৎ একবার দেখলেন, যেন সেখান থেকে কিছু পড়ে নিয়ে বললেন, ভারতবর্ষে বিরাট পরিবর্তন এসেছে বৃটেন-এর সঙ্গে সংযোগ হবার পরে। — এমিলির দিকে চেয়ে স্টুঘাণ জিজ্ঞেস ক'রলেন, সেই মিস্টার জানার সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছিল?

না, আমি তার সঙ্গে দেখা ক'রতে পারিনি, এমিলি জানাল।

স্টুঘাণ বললেন, আমাদের ওখানে এক ভদ্রলোক অনেকদিন ছিলেন, মিস্টার জানা — যার নামটা আমি ঠিক মনে ক'রতে পারছি না — সেই ভদ্রলোক এ বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান রাখেন। আপনি যদি তাঁর দেখা পেতেন তিনি আপনাকে ভাল ভাবে বোঝাতে পারতেন।

এমিলি নামটা কাকার মনে করিয়ে দিতে চাইল, মিস্টার কল্যাণ জানা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টুঘাণ বললেন, আপনি কি ভদ্রলোককে জানেন?

আমি দুঃখিত, পরীক্ষিৎ বললেন, আমি শুনিনি।

এদেশে এলাম ওঁর দেখা পেলে আমার অনেক সুবিধে হ'ত। তুমি কি তাঁর ঠিকানা জানতে না এমিলি?

আমি অত্যন্তই দুঃখিত। জানতাম না, এমিলি জানাল।

যা হোক, স্টুঘাণ প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাইলেন, ভারতবর্ষের নাম শান্তি — একেবারেই প্রায় থেমে গেলেন স্টুঘাণ। আবার ঈষৎ হেসে শুরু ক'রলেন, তবে আমি খুবই আশা ক'রছি বিমানবন্দর থেকে যতটুকু এলাম ভারতবর্ষের সবটাই এই রকম হয়ে যায় নি!

এই রকম হয়ে যাওয়া অর্থে যে উনি কি বলতে চাইছেন পরীক্ষিৎ তা ভাবতে

লাগলেন। কি এমন খারাপ তিনি পা দেওয়ামাত্রই দেখলেন ?

কিন্তু এমিলি বুঝল। কারণ সে তার কাকাকে জানে। তার কাকার ভারতবর্ষ সম্পর্কে ধারণাকেও জানে, তাই বলল, সে তোমার স্বপ্নের ভারত কাকা, আমি তোমাকে যেমন বলতাম ভারত ঠিক তেমনিই।

স্ট্রঘাণ তবু সে কথা স্বীকার ক'রলেন না, বললেন, এখনও আমি সে কথা স্বীকার ক'রতে পারি না, প্রিয় খুকু।

এমিলি নিজের কথা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, একথা তোমাকে উপলব্ধি ক'রতেই হবে।

তাহ'লে সেটা খুব দুঃখেরই হবে।

পরীক্ষিৎ দুজনের কথাই শুনছিলেন কিন্তু তাঁর বোধগম্য হচ্ছিল না কি ওরা বলছে। এমিলি তার স্বাভাবিক বিচক্ষণতায় ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে বলল, কাকার ধারণা ভারতবর্ষে সেই পুরোণো মুনিঋষিদের আশ্রম এখনও দেখা যাবে, এখনও ভারতবর্ষের বুক জুড়ে সেই বৈদিক যুগের স্নিগ্ধ অরণ্য।

আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পরীক্ষিৎ বলার মত কথা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, বললেন, এ ধারণা ওঁর থাকতেই পারে না। অতীত যিনি এত ভাল ক'রে জেনেছেন বর্তমানও তিনি নিশ্চয়ই জানবেন —

না মিস্টার মুখার্জী, আমি সেই ভারতবর্ষকেই দেখতে চাই যেখানে শান্তি অবিচ্ছিন্ন। বর্তমান পৃথিবীতে যে গতিময়তা তাতে উদ্দামতা খুঁজে পাওয়া যায়, শান্ত বিশ্রাম খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা আত্মার ঐশ্বর্যের বিনিময়ে জীবনের জন্য সম্পদ কিনেছি।

স্ট্রঘাণ-এর কথাগুলোর অর্থ সবই বুঝলেন পরীক্ষিৎ, গভীরতা মাপতে পারলেন না। যেমন সবাই কথার কথা আলোচনা করেন, অনেক সময়ই ওকালতি ক'রে থাকেন জীবন চর্যায় অনাচরিত দর্শনের, এ-ও তেমনি এক কথার কথা বলে মনে হ'ল তাঁর কাছে। অনেক সত্য আছে যা জীবনে প্রয়োগ করে না মানুষ, শুধু আলোচনা ক'রে নিজেকে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চায়, এও এক তেমনি অন্তঃসারশূন্য আলোচনা হয়েই তাঁর সামনে দাঁড়াল।

কিন্তু আসলে হ্যারল্ড স্ট্রঘাণ অন্য এক মনের গভীর মানুষ। তাঁর মননানুসারী-জীবন যতটা আবেগচালিত ঠিক ততটাই আবেগশূন্য। একটা উপগ্রহ যেমন রকেট-এর সাহায্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে নিজের কক্ষপথে পৌঁছে রকেটটিকে ছেড়ে দিয়ে নিজের শক্তিতেই মহাশূন্যে ভাসমান থাকে স্ট্রঘাণও তেমনি ; তাঁর চিন্তা আবেগএর দ্বারা চালিত হয়ে নির্দিষ্ট একটা স্থানে পৌঁছে আবেগ ছুঁড়ে ফেলে বাস্তবানুগ হয়ে পড়ে পরিপূর্ণভাবেই।

অথচ পরীক্ষিৎ চিরদিনই দেখে এসেছেন ব্যবসায়ীরা বায়ুশূন্য পাত্রের মত আবেগশূন্য মানুষ। বড় ব্যবসায়ী তো অনেককেই দেখেছেন তিনি এই কবছরে, বছর তিনেক ধরে ভারতবর্ষের এক নম্বর ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদেরও বেশ নিবিড়-

ভাবেই দেখছেন, পড়াশোনা বা বহির্জগতের জ্ঞান তাদের অসামান্য, দক্ষতা অপরিসীম, অনেকের চরিত্রে অনেক প্রসংশনীয় গুণও লক্ষ্য করা যায় কিন্তু যা কারও চরিত্রেই দেখা যায় না তা, ভাবাবেগ। সে ক্ষেত্রে আশ্চর্য ব্যতিক্রম এই মানুষটি। এদেশের একনম্বর ব্যবসায়ীদের পর্যায়ে না পড়লেও মার্কিন একজন ব্যবসায়ী তো এদেশের অনেক দুধেয়ালা-গানেরিওয়ালার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড় এ বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই! তবু সেই মানুষও যখন এমনি হৃদয়াবেগে ভেজা কথা বলেন তখন বিস্ময় হয় কূলপ্লাবী। কিন্তু অধিকতর বিস্ময় অপেক্ষা ক'রছিল ভবিষ্যতের জন্যে। সেটা এল অল্পক্ষণ বাদে, যখন স্টুঘাণ বললেন, ঠিক কথা বলতে গেলে বলতে হয় আমি বর্তমান ভারতকে দেখতে চাইনি। ইচ্ছে করেই একালের ভারত সম্বন্ধে আলোচনা শুনিনি পাছে আমার উপনিষদ-এর ভারত হারিয়ে যায়! পরীক্ষিৎ ফস ক'রে একটা নির্বোধ প্রশ্ন ক'রে ফেললেন নিজের কৌতূহলের আধিক্যে, আপনি এত সব জানলেন কি ক'রে?

ভালবাসায় — এমিলি ছোট্ট ক'রে জবাব দিল কাকার পক্ষ থেকে।

স্টুঘাণ সেকথা অন্যমনস্কতার জন্যে ঠিক শুনতে পেলেন না, নিজে খুব ধীরে জবাব দিলেন, ঠিক জানিনা। মানুষ কেমন ক'রে যে কিছু জানে, সে নিজেই জানে না তা।

পরীক্ষিৎ নিজের প্রশ্নের নির্বুদ্ধিতা ধরতে পেরে বললেন, সুন্দর বলেছেন।

টেলিফোন বেজে ওঠায় পরীক্ষিৎ চলে গেলেন। এমিলি বলল, তুমি কি চা খেতে চাও কাকা?

হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে স্টুঘাণ বললেন, মন্দ নয়।

উঠে গেল এমিলিও। স্টুঘাণ উঠে দাঁড়ালেন। অকারণ ঘরটাতে একপাক ঘুরে নিয়ে বসে পড়লেন। আস্তে আস্তে শরীরটাকে পেছন দিকে এলিয়ে দিয়ে দেখলেন বেশ অনেকটা হেলানো যায়, আরাম কেদারার মত। মাথাটাও পেছন দিকে রাখা যায় কিনা চেষ্টা ক'রলেন। হ'ল না, অনেকটা নিচু। আসলে তিনি নির্ভরতা চাইছিলেন। ঘর থেকে একে একে সবাই বেরিয়ে যাওয়াতে ব্যাপারটা অনুভব ক'রলেন তিনি। যে শান্তি তিনি দীর্ঘদিন ধরে কামনা ক'রে এসেছেন এখনই, এই মুহূর্তেই তিনি তা নিরবচ্ছিন্নভাবে পেতে চান। আরও একটু ভাল হয় ঘরটা আলোশূন্য হ'লে। পাশের ঘরগুলোয় আলো জ্বলে জ্বলুক, শব্দ হয় হোক। এ ঘরটি থাকুক অন্ধকার, নিঃশব্দ। যদি আশেপাশের কথার টুকরো শব্দ হয়ে এঘরের অন্ধকারে পা টিপে টিপে ঢোকে তো ঢুকুক চোরের মত, ক্ষতি নেই। সে বরং ঘুমের মত মনোরম হবে, ঘুম যেমন আগে এবং পরে জেগে থাকার জন্যে মৃত্যুর সাযুজ্য সত্ত্বেও রমণীয়, আশেপাশের মৃদুশব্দের মধ্যে নিঃশব্দ অন্ধকারে অবস্থিতিও মনোরম ঠিক সেই রকমই। কিন্তু আলোটা বেশ তীব্র-ভাবেই জ্বলছে, এখনই এমিলি আসবে চা নিয়ে, স্বাভাবিক সৌজন্যেই হয়ত আরও কেউ আসবে কথা বলতে — অথচ এখন এসব না হ'লেই ভাল হ'ত। ব্যবসা

থেকে মুক্তি নিয়ে এসেছেন স্ট্রঘাণ, দায়দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন অংশীদার জেমস হলডেন-কে। দীর্ঘদিন ধরে বলে কয়ে বুঝিয়েও রাজী করাতে পারেন নি জেমসকে, অংশ ছাড়তে দেয় নি জেমস, বলেছে, আমি ব্যবসা দেখছি তুমি ঘুরে এসো।

ঘুরে আর যাবেন না স্ট্রঘাণ। যাবেন বলে আসেন নি। তিনি অর্থ চান না, যশ চান না, প্রতিপত্তি চান না — শান্তি চান। শান্তি; সারা জীবনের জন্যে শান্তি। একদিন ভাবতেন সাফল্যই বড় জিনিষ এখন বুঝতেই পারেন না সাফল্য জিনিষটা আসলে কি। সাফল্যকে যদি উঁচু দিকে ধরা যায় তাহ'লে কতটুকু উচ্চতাকে সাফল্য বলে তাও তাঁর অজ্ঞাত। অথবা কতখানি ওপরে নিজেকে সফল ভাবা যায় তাও তাঁর চিন্তায়ত্ত নয়। চিরদিন যেভাবে ভেবেছেন আদপেই ব্যাপারগুলো সেইরকম কিনা আজ জীবনের মধ্যযাম অতিক্রম ক'রে সেখানেই দেখা দিয়েছে সংশয়। এই সংশয় নিয়েই তিনি পেশার জীবন বয়ে বেড়িয়েছেন দীর্ঘকাল। তারপর ক্রমাগত সে হয়ে উঠেছে গুরুভার। তাই মরিয়া হয়ে বোঝা নামিয়ে সোজা হয়ে বুকে ভরে নিতে চাইছেন মুক্তির বাতাস, দীর্ঘ যাত্রাপথের পর কোন সবুজ মাঠের মধ্যে গাড়ী থামিয়ে ঘোড়ার লাগাম খুলে দিলে শ্রান্ত ঘোড়া যেমন তৃপ্তি অনুভব করে তেমনি তৃপ্তি নিয়ে শুয়ে পড়তে চাইলেন বেতের চেয়ারের পিঠের দিকে রাখা গদিতে।

এমিলি এসে ঘরে ঢুকল একটু পরেই। পেছনে কে একটি অপরিচিত যুবক। হাতের চা নামিয়ে রেখেই পরিচয় করিয়ে দিল, পরিবারের বন্ধু সৌগত দত্ত।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রতে যাবেন তার আগেই হাত বাড়িয়ে দিল সৌগত। করমর্দন ক'রে সৌগত বলল, আপনি আসবেন অনেকদিন ধরেই শুনছিলাম আজ আপনাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হ'লাম।

ধন্যবাদ জানালেন স্ট্রঘাণ তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণের উত্তরে।

এমিলি পরিচয় দিল, মিস্টার দত্ত একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। সরকারী কাজে নিযুক্ত।

স্ট্রঘাণ বললেন, ভারী সুন্দর।

সৌগত বলল, এদেশে সরকারী চাকরী কিন্তু আপনাদের মত নয়।

পার্থক্যটা তলিয়ে না দেখে এবং দেখতে না চেয়ে স্ট্রঘাণ বললেন, খুবই স্বাভাবিক।

সৌগত যে কথা বলতে চাইছিল তা চেপে বলল, আপনাদের দেশ অনেক উন্নত, সেখানকার সমস্ত ব্যাপারই আলাদা রকম।

স্ট্রঘাণ সৌগতর দিকে তাঁর চোখ কুঞ্চিত ক'রে তাকালেন, স্মিত মুখে বললেন, পৃথিবীটাই তো একটা দেশ বলে আমার মনে হয়। এখন অন্য দেশ আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি কোথায় তা আছে। পৃথিবী থেকে দিকদিগন্তে অনুসন্ধান

ক'রা হচ্ছে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোনও নক্ষত্রে কোন প্রাণী আছে কিনা? থাকলে সেটাই অন্য দেশ। সৌরমণ্ডলের বাইরে, পৃথিবী থেকে চব্বিশ হাজার আলোকবর্ষ দূর পর্যন্ত আমরা ছেড়ে দিয়েছি এক শব্দ তরঙ্গ, এই দূরত্বের মধ্যে যদি কোন বুদ্ধিসম্পন্ন বিজ্ঞানবিদ প্রাণীজগৎ থাকে তাহলে তারা সাড়া দেবে এই শব্দ তরঙ্গ ধরে।

সৌগত এ কথার কোন জবাব দিতে পারল না।

স্ট্রঘাণ আবার বললেন, প্রিয় যুবক, আমরা একই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বাস করি যেমন একই শহরের বিভিন্ন বাড়ীতে বাস করি সেই শহরের অধিবাসীরা।

প্রতিযুক্তি খাড়া করা শুধু মাত্র তর্ক করা হবে বলেই সৌগত তা ক'রল না। বরং কথাটি তার ভাল লাগল। একেই বলে ঔদার্য, একেই বলে আমেরিকান চিন্তাধারা। মনে মনে খুব তৃপ্তি অনুভব ক'রল সৌগত। গুণ না থাকলে কি আর দেশটা এত উঠেছে? সৌগত খুবই হ্লাদিত হ'ল এমিলির কাকার ব্যক্তিগত ব্যবহারে। সত্যিই বেশ অমায়িক মানুষ, তার কাজ তাহ'লে হবে; কিন্তু ব্যাপারটা এখনই বলা ঠিক হবে না সে জানে। সে তাই আলাপটা ভাল ক'রে জমাবার জন্যে স্ট্রঘাণকে প্রীত করবার উদ্দেশ্যে বলল, আপনার চিন্তাধারা অনেক উঁচু ধরণের। সব মানুষ এভাবে চিন্তা ক'রলে —

সৌগতকে কথা শেষ ক'রতে না দেবার জন্যেই ঘন ঘন প্রতিবাদ ক'রলেন স্ট্রঘাণ, ফলে সে থামতে বাধ্য হ'ল। স্ট্রঘাণ বললেন, কথাটা বলে আমার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। তা যা হোক, যা যথার্থ তাই সকলের করা উচিত।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই — সায় দিল সৌগত।

পরীক্ষিৎ ফিরে এসে বললেন, এক ভদ্রলোক আপনার খবর নিতে ফোন ক'রছিলেন।

স্ট্রঘাণ মাথা নাড়লেন। পরীক্ষিৎ সৌগতকে দেখে বললেন, তোমার সঙ্গে আলাপ হ'ল? — স্ট্রঘাণকে বললেন, আপনি বরং এখন বিশ্রাম করুন খাবার টেবিলে আমরা আবার একসঙ্গে হবো। এমিলি সৌগতর খাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও, ও আজ খেয়ে যাবে।

সৌগত প্রতিবাদ না ক'রে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রল।

পরীক্ষিৎ বেরিয়ে গেলেন, সৌগতও বেরিয়ে এসে মাঝের সময়টুকু কাটাবার জন্যে রুমির ঘরে ঢুকল। রুমি নিজের মুখের ওপর পাতলা ক'রে পাউডারের প্রলেপ লাগাচ্ছিল। সৌগতকে ঢুকতে দেখে নিজের কাজে মগ্ন অবস্থাতেই বলল, আলাপ হ'ল?

তুমি তো আর আলাপ করিয়ে দিলে না? — সৌগত অনুযোগ ক'রল।

আমি ওনার কথা ভাল বুঝতেই পারি না — কি যে বলেন!

কেন? ভারী চমৎকার কথা বলেন তো ভদ্রলোক!

কথা না হয় চমৎকারই হ'ল — বুঝিনা যে কি বলছেন। একটার মধ্যে একটা এমন জড়ানো কথা যে শব্দগুলোই বুঝে উঠতে ঘাম ছুটে যায়।

সৌগত খুব হাসল, বলল, বেশ মজার কথা বললে তুমি। এই ঠাণ্ডাতেও তোমার ঘাম ছুটে যায় — বাঃ। কিন্তু আমার তো বুঝতে কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। বেশ আস্তে আস্তে উনি কথা বলছিলেন।

তুমি ওদের কথা বোঝ তাই তোমার অসুবিধে হয় না। কত লোকের সঙ্গে কথা বলে অভ্যেস তোমার — আমার কি তাই ?

দুচারদিন কথা বলে দেখ ওঁর কথা বুঝতে তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

যে ক'দিন কষ্ট ক'রতে হবে তার মজুরী দেবে কে ?

তোমার হবে উপকার আর অন্য লোকে তার জন্যে মজুরী দিতে যাবে ? মজা মন্দ নয় তো!

কি উপকারটা আমার হবে শুনি ? কোন সাহেব-এর সঙ্গে আমায় ঘর করতে হবে যে দিনরাত গ্যাডম্যাড ক'রে ইংরিজি বলতে হবে ?

আমার সঙ্গেই না হয় বললে —

কোন দুঃখে ?

দুঃখে কেন হতে যাবে, আনন্দেই বলবে —

আনন্দে ? তোমার যদি তেমন আনন্দ কখনও হয় দুচারটে কথা না হয় বৌদির সঙ্গেই এসে বলে যেয়ো।

তোমার ভাল লাগবে ?

না লাগলেই বা আর ক'রছি কি ?

কেন ?

পরশু দিন তোমার বালিশ-এর পাশে একটা হেয়ার পিন পড়েছিল।

হেয়ারপিন! বাজে কথা।

তোমার টেবিলের ওপরেই রেখে এসেছি।

তাহ'লে সেটা তোমারই হবে।

আমি কোনদিন হেয়ারপিন ব্যবহার করি না।

আমার বিছানায় তাহ'লে হেয়ারপিন কি ক'রে আসবে ?

যেভাবে আসা সম্ভব। কোন শুতে আসা মেয়ের সঙ্গে।

কি যা তা বলছ তুমি ?

রুমি অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে কথা বলছিল, তেমনি নিরুত্তেজিত কণ্ঠে বলল, আমি তোমার ঘরে যেদিন মেয়েছেলে দেখি তারপরই তোমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে আমার বাকীটুকুও তোমাকে দিয়েছি — সর্ত ছিল এই, যে তোমার যেহেতু প্রয়োজন মিটছে অন্য বাজে মেয়েছেলে তুমি আর আনবে না।

রুমি!

অকারণ উত্তেজিত হয়ো না। ওটা আমার হবার কথা।

তুমি অনর্থক বাজে কথা বলে আমাকে উত্তেজিত ক'রছ।

তাতে আমার কি লাভ?

লাভ লোকসান তুমিই জান।

তুমিও জান তাতে আমার কোন লাভ নেই।

তবে সামান্য ব্যাপার নিয়ে অকারণ ঝামেলা বাড়িয়ো না, তোমারও ভাল লাগবে না, আমারও নয়।

হ্যাঁ ব্যাপারটা খুব সামান্যই বটে, তবে ভয় আমার এই, যে বাবা মা যদি তোমার এই ব্যাপারটা জেনে ফ্যালে তাহ'লে আমার লজ্জা হবে সবচেয়ে বেশী। কারণ মা বহুবার বিয়ের ব্যাপারটা জানতে চেয়েছে, তোমার আপত্তির জন্যেই কেবল বাবা তোমার বাবার কাছে কথাটা পাড়তে পারে নি।

সৌগত কথা বলল না।

রুমিই আবার বলল, তোমার এতই যদি প্রয়োজন তাহ'লে বিয়েটা যে কেন পেছিয়ে দিতে চাও আমি বুঝছি না।

সৌগত একথার একটা কিছু জবাব দেবে রুমি আশা ক'রেছিল কিন্তু সৌগত দিল না। বরং সে এমন একটা ভাব ক'রে রইল যেন ভীষণ অসন্তুষ্ট। সৌগতর শরীরকে রুমি চেনে, তাই ব্যাপারটাকে অনেকটা সহজভাবে নিয়েছে বলেই অশান্তি তার সীমাবদ্ধ। তবু মুখরক্ষার মত কৈফিয়ত নেহাৎ সৌজন্য রক্ষার জন্য দেবে এটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিল রুমি। তার অনুমান না মেলাতে সে ধরে নিল সৌগত রাগ ক'রছে, তাই সেও চুপ ক'রে গেল। তাছাড়া এনিয়ে সে খুব বেশী চিন্তিত নয়। তার ধারণা বিয়েটা হয়ে গেলে যখন নিঃসঙ্গতা কেটে যাবে তখন আর ওসব দিকে মন যাবে না সৌগতর। এখন রুমির সঙ্গ রোজ পায়না বলেই এসব ক'রছে সে। কাজেই অকারণ অশান্তি না ক'রে অনুকম্পাই করে সে সৌগতর প্রতি। এ ব্যাপারে শুধু একটা জিনিষই সে বোঝে না বিয়ের দিন ক'রতে কেন রাজী হয় না সৌগত, কি বাধা? যে সুপ্রীতি কারও কোনও ব্যাপারে মাথা গলানো চিরদিন অপছন্দ করেন, তিনিও একদিন জিজ্ঞেস ক'রে ফেলেছেন, কি রে রুমি, সৌগতর কথা কি বুঝছিস?

সৌগতর কথা ছেড়ে মায়ের কথা-ই না বোঝার ভাণ ক'রল রুমি, জানতে চাইল, কিসের কথা বলছ মা?

বলেছি বিয়েটা শুধু শুধু আটকে রেখে কি লাভ? বলিস তো তোর ড্যাডিকে ওর বাবার সঙ্গে যোগাযোগ ক'রতে বলি।

সরাসরি বক্তব্য। শুনে দুচার মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল রুমি, তারপর বলল, তুমি কথা বলে দেখো।

তুই বরং জিজ্ঞেস ক'রে রাখিস, কবে নাগাদ পাঠাব।

রুমি জবাব দিল না। কারণ এর আগেও কবার মা এমনি প্রশ্ন আভাসে ইঙ্গিতে ক'রেছিলেন, তা রুমি সৌগতকেও বলেছিল, সৌগত স্পষ্ট কোন জবাব

দেয় নি। মায়ের এদিনের কথার পরও যথারীতি আলোচনা ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিল সৌগতর সঙ্গে, লাভ হয়নি। সৌগত বলেছিল, পরীক্ষাটা দিয়ে নাও না।

কি হবে পরীক্ষার জন্যে অপেক্ষা ক'রে। সে তো এখনও এক বছর।

এক বছর আর এমন কি সময়। দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

এমনি ক'রে ক'রে সব বছরগুলোই তো কেটে যাবে, তখন তো বুড়ী হয়ে যাব।

চট ক'রে রুমির কোমরটা জড়িয়ে ধরে তাকে উঁচু ক'রে তুলে ধরে সৌগত বলল, আরে না। তোমার শরীরে যা আছে তুমি চট ক'রে বুড়ী কিছুতেই হবে না।

রুমি কথাটা শুনে খুবই খুশী হ'ল। তারপরই বলল, এখন সেই জন্যে বসে থাকি —

না বসে থাকবে কেন? তবে কি জান, কোন কিছুই তাড়াতাড়ি পুরাণো ক'রতে নেই।

পুরাণো কি রকম?

বিয়ে হয়ে গেলেই তো জীবনটা তাড়াতাড়ি পুরাণো হয়ে যাবে!

বাঃ বেশ কথা বলছ তো? আমার দাদুর আর ঠাকুমার বিয়ে হয়ে পঞ্চাশ বছর ওঁরা এক সঙ্গে ঘর ক'রেছিলেন, ঠাকুমার কাছে তো একদিনও শুনিনি যে জীবনটা পুরাণো হয়ে যায়!

আগেকার দিনের লোকের কথা ছেড়ে দাও।

সে না হয় ছেড়ে দিলাম, তাই বলে তোমার এ যুক্তিও মানতে পারা যায় না।

মানতে পারা যায় না? — সৌগত চঞ্চল হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রল, তারপর খুব অন্তরঙ্গ ভাবে বলল, তুমি কি মনে কর না যে প্রত্যেকটি জিনিষই যত পুরাণো হয় ততই তার আকর্ষণ কমে যায়?

মানুষের বেলাতেও কি তাই?

সৌগত জবাব দিল না। রুমি কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে নিজেই বলল, তাহ'লে তো একদিন আমার আকর্ষণও কমে যাবে?

সৌগত চট ক'রে বলল, এটা তুমি কি বলছ রুমি? আমি যা বললাম সে হল গিয়ে সাধারণ কথা। তোমার বেলায় কি সে কথা খাটে?

কেন খাটবে না, আমিও তো একজন মানুষ?

তুমি একজন মানুষ শুধু নও, রুমি, তুমি একজন, এবং একজনই।

তবে কেন বিয়ে ক'রতে এত ভয় পাও?

ভয় বিয়ে ক'রতে নয়। বিয়ে হচ্ছে এমন একটা স্বর্গীয় জিনিষ যা আমি — সত্যি বলতে কি — অত্যন্ত সন্তর্পণে ব্যবহার ক'রতে চাই।

একথাটা রুমি বিশ্বাস না ক'রে পারল না। বস্তুতঃ সে অনেক সংশয়ের পথ পার হয়ে এসে প্রথম বিশ্বাসে পা রাখতে পারল। কিন্তু সে পা রাখা নেহাৎই পা ছোঁয়ানো মাত্র, ভালভাবে দাঁড়াতে পারা নয়। তবু ওই বিশ্বাসের

ছোঁয়াটুকু লাগার জন্যেই সে আর কোন কথা বলল না। তাছাড়া অনেকবার অনেকভাবে নিজের মনটাকে ব্যক্ত ক'রেও দেখেছে কাজ হচ্ছে না, একটা না একটা অজুহাতে পিছিয়ে থেকেছে সৌগত, তাই বেশী আর বলতে ভাল লাগে না তার। নেহাৎ মনের তাড়নাতেই একটু কখনও বলে ফেলা। সৌগতর মনে অন্যকিছু থাকতে পারে এ ভাবনা তার চিন্তার জগতে প্রবেশাধিকার পায় নি। তবু যা ক'রতেই হবে তাকে অনর্থক পেছিয়ে রাখার ইচ্ছেটাকে সমর্থন ক'রতে পারে না রুমি, বেশী কিছু বলতে পারে না হ্যাংলামীর পর্যায়ে চলে যাবে সেই লজ্জায়। এই যে এইটুকু বলে ফেলেছে সেই লজ্জাটুকু গোপন করার প্রয়াসেই সে ঘর ছেড়ে গেল, বলল, বসো তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।

শুধু শুধু চুপচাপ বসে থাকব? — সৌগত পরিবেশটাকে হালকা করবার জন্যে বলল।

চুপচাপ থাকবে কেন, হাওয়ার সঙ্গে কথা বল না — বলে আর অপেক্ষা ক'রল না রুমি।

সৌগত ঘরময় খুঁজতে লাগল কোন হালকা পত্রপত্রিকা পাতা উলটে ছবি দেখবার মত পাওয়া যায় কি না। নাঃ নেই। সারাঘরে কোথাও একটুকরো কাগজ পর্যন্ত নেই। পড়াশোনা যে রুমির ভাল লাগে না সৌগত শুনেছে। তাই বলে এই অবসর কাটানোর জন্যে ছবির পত্রিকা রাখা — তাও কি ভাল লাগে না! আসলে মেয়েটা অভিরুচিহীন। যাকে বলে টেস্টলেস — মনে মনে বলল সৌগত। এতবড় পরিবারের মেয়ে অথচ এরকম দেখা যায় না! ডক্টর মিত্রের বাড়ীর নেমন্তন্নে গিয়ে আলাপ হয়েছিল ডক্টর মিত্রের মেয়ের সঙ্গে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পড়ছে সঙ্গীতে। কথায় কথায় নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল সে মেয়েটিও। ঘরে সারি সারি রেকর্ড — সেই সঙ্গে একসারি বই। বোঝা যায় সঙ্গীতে বিশেষ আগ্রহ আছে মেয়েটির। শুধু পড়ার জন্যেই পড়ছে না, ভালবাসার জন্যেই পড়ছে। বহুদিন আগেকার মিস মল্লিকা সামন্তর কথা মনে পড়ল আজ এখানে বসেই। কিভাবে যে লোকমুখে অমন জাঁদরেল হয়ে গিয়েছিল নামটা — মিস মল্লিকাকে দেখে সেটা গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল সৌগতর কাছে। কারণ একঘর দ্রুপদী সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে চশমা চোখে সাধারণ সাদা তাঁতের শাড়ী পড়া মল্লিকা তার নামের উৎস বস্তুটিরই সামঞ্জস্যপূর্ণ, মিস মল্লিকা সামন্ত হবার পক্ষে অত্যন্তই বেমানান। বেমামান হওয়াতে সেদিন ভাল লেগেছিল বলে আজ মনে হচ্ছে। জীবনে বিশেষত্ব কিছু না থাকলে তার মাধুর্য থাকে না। বড় তাড়াতাড়িই তা একঘেয়ে হয়ে যায়। সৌগতও বুঝে পায় না এই বিশেষত্বহীন নারীর সঙ্গে সারাজীবন সে কি করে কাটাবে। ডক্টর মিত্রের মেয়ে অথবা মিস মল্লিকা — দুজনের কেউই হয়ত জীবনে দ্বিতীয়বার দেখা দেবে না, সারাজীবন জুড়ে থাকবে শুধু রুমি — একটি কৃশতনু। রোমাঞ্চহীন, বৈচিত্র্যহীন, মৃতকল্প এক নারীসত্ত্বা — গ্রহ, গলগ্রহ।

এর চেয়ে বীণার মত বারোয়ারী মেয়েকে নিয়ে পড়ে থাকা অনেক স্বাদের। আর কিছু না থাকলেও তার অপর্যাপ্ত সম্ভার আছে দেহে — মাদকতা আছে সম্ভোগে। মহম্মদ মুস্তাক তাকে যেদিন প্রথম এনে দিয়ে বলে, আব ঈয়াদ রাখিয়ে গা কি মুস্তাক নে ক্যা দিয়া — সেদিনের সন্ধ্যেটা অত্যন্তই আনন্দে বেগবান হয়ে নিমেষেই পৌঁছে গিয়েছিল রাত বারটায় —তখন তার চেতনাকে ক্লান্ত ক'রে স্খলিত চরণে উঠে গিয়েছিল বীণা নামের নায়িকাটি — হয়ত গিয়ে উঠেছিল নিচে দরজার বাইরে মুস্তাকের ঠিক ক'রে রাখা রিক্সায়।

শুধু রুমি নয় — ভাবতে গিয়ে একমাত্র পরীক্ষিৎকে তাঁর পদমর্যাদার জন্যে ছাড়া এবাড়ীর আর সকলকেই নির্বোধ মনে হ'ল সৌগতর। বিশ্বজিৎটা শেষ পর্যন্ত বিকারগ্রস্ত মানসিক অবস্থায় গিয়ে পড়ল। বন্ধুবান্ধব যারা সব এক সঙ্গে এক সময় মেলামেশা ক'রত ইদানীং নাকি কারও সঙ্গেই মেশে না। কোথায় যায় কি যে করে বলতে পারে না কেউই। রুমি যে আপন বোন, সেও তো ভালভাবে বলতে পারে না। শুধু নাকি পড়ে। এত পড়া তো মস্তিষ্কবিকৃতিরই লক্ষণ। ওর দাদাটা যদি বুদ্ধিমানই হবে তাহ'লে কখনও আমেরিকার মত দেশ ছেড়ে মরতে এদেশে আসে। তাছাড়া আর সময় পেল না এল এখন, যখন মুরগী ছাগলের মত রোজ মানুষ জবাই হচ্ছে পথে ঘাটে। আবার বলে কি বউ-এর আব্দারে এসেছি। মার্কিন মেয়েরা দেশ-বিদেশ ঘুরতে ভালবাসে, তাই বলে কি এতই বোকা তারা হয়ে গেছে যে নরক-বাস ক'রতে চাইবে? বউ কি বলল আর কি বুঝে উনি একেবারে চাকরী ছেড়ে এদেশে চাকরী জুটিয়ে চলে এলেন বাপের ভিটেয় বাতি ধরাতে। দূর দূর। অমন জাঁদরেল আই-এ-এস-এর এমনি সব নির্বোধ কুসন্তান। বিয়ে করার জন্যে হাঁকপাঁক ক'রছে মেয়েটা। আরে তোর আছেটা কি? তেরাত্তিরেই তো বাসি হয়ে যাবি। সমস্ত ব্যাপারটাই এখন কেমন বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। দূর। — মনে মনে উচ্চারণ ক'রে উঠে দাঁড়াল সৌগত। পায়চারী ক'রতে লাগল ঘরময়। কলেজ-এর সহপাঠি অমিতাভ — দীর্ঘ ঋজু গঠনের বলিষ্ঠ আকর্ষক চেহারার যুবক। কোত্থেকে যে মেয়েরা এসে পতঙ্গ হ'ত। অমিতাভর যত সুযোগ ছিল উপভোগের সব সে কাজে লাগাত না, বলত 'উয়োমেন বাই ব্রেণ্ট'। কথাটা এখন বিশেষভাবে মনে পড়ছে। ঘরময় যত চলছে কথাটাও তেমনি ফিরেছে তার সঙ্গে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রসেনজিৎ ভাগ্যবান। ওদেশ থেকে এমন ভাল একটা মেয়ে যার তার ভাগ্যে জোটে না। এদেশের যারা যায় তারা উচ্ছিষ্ট ভোগের মত ঝড়তি-পড়তি বাতিল মেয়েগুলোকেই বগলদাবা ক'রতে পারে, ভালগুলো লাগে দেশের ছেলেদেরই ভোগে। কিন্তু ব্যতিক্রম এই প্রসেনজিৎ-এর ভাগ্য. — একটু ঈর্ষাই হচ্ছে সৌগতর। শুধু কি একটা মুলতানী গাই-এর মত ডাঁশা রসাল মেম। এমন টাকাওয়ালা খানদানী শ্বশুরকুল —।

রুমি এসে পড়ায় ছেদ পড়ল ভাবনাটাতে। মনে মনে যে একটু অসন্তুষ্ট

হয়েছিল সেই ভাব গোপন করতে চেষ্টা ক'রে রুমি শুধুমাত্র বলল, তোমার কফি।

অন্যদিন হ'লে এমনি ছোট্ট কথার জন্যে রুমিকে জড়িয়ে ধরত সৌগত, জানতে চাইত, হঠাৎ কি হ'ল ? এমন মেঘলা কেন ?

হয়ত কিছু জবাব দিত রুমি নয়ত কপট কোপে না-ও দিতে পারত, আজ সৌগতই কিছু বলল না, শুধু রুমির দিকে এগিয়ে এসে তার হাত থেকে কফির কাপটা ধরে নিয়ে বলল, কফিটা যে কোন ভদ্রলোকের দেশে শুধুমাত্র সকাল বেলাকার পানীয় হওয়া উচিত। সন্ধ্যায় কফি দেওয়া নিষিদ্ধও হওয়া উচিত।

উদ্দেশ্য বুঝল রুমি তবে জবাব দিল না। আজ তার মনে হ'ল কথাটা অবান্তর। যদিও এমনি অনেক অবান্তর কথার অনেক অবান্তর উত্তর অতীতে অনেকবারই সে দিয়েছে আজ কেমন নিস্পৃহতা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখল যার ফলে কোন কথা বলা-ই তার কাছে ভাল লাগল না। নিজের এই অস্বস্তিকর পরিবর্তনের বোঝা নিজেকেই বইতে হচ্ছিল বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না — রুমি চলে যেতে সিদ্ধান্তটা মনে মনে আউড়ে নিল সৌগত। যা হবার তা ভবিষ্যতে হবে, এখন অকারণ সম্পর্ক খারাপ ক'রে এক একটা দৃশ্য রচনা ক'রে কি লাভ ? বরং সমস্ত চিন্তার ওপরে একটা রঙের প্রলেপ লাগিয়ে যেমন চলছে তেমনিভাবে চালিয়ে যাওয়াই ভাল। নিজের ম্লান ভাবটা কাটিয়ে ওঠবার জন্যে চট ক'রে কফিটা খেয়ে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল রুমির বিছানায়।

একটু বাদেই রুমি এসে আবার ঘরে ঢুকতে সৌগত বলে উঠল, ঘরের মধ্যে একটা ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত টাঙিয়ে রাখ নি যে ছবি দেখে একটু সময় কাটানো যাবে—

রুমির মনে এল সে বলে তারিখ দেখলেই তো দেখতে পাব দিনগুলো সব দৌড়োচ্ছে। এই কথার বদলে সে বলল, যার জীবনে তারিখের কোন দাম নেই তারিখ দেখায় তার কি প্রয়োজন ?

তারিখের কোন দাম নেই ? — সৌগত খুবই হালকা ক'রে বলল।

কি দাম আছে ?

সৌগত চট ক'রে বলল, তেশরা জুলাই-এর কোন দাম নেই ?

কি দাম আছে ?

তোমার কাছে না থাকতে পারে অন্য সকলের কাছে আছে।

অন্য আর কার কাছে থাকবে, হয়ত আছে, আমার মা-বাবার কাছে।

আমার কাছে নেই বুঝি ?

রুমি কোন জবাব দিল না।

সৌগত খুব চাতুর্যের সঙ্গে বলল, তোমার জন্মদিনটি যদি মূল্যবানই না হবে তাহ'লে আমি এমন যত্ন ক'রে মনে রেখেছি কি ক'রে ?

রুমি মুখে কিছু না বললেও মনের খুশী গোপন করবার জন্যে একটু সরে গেল। সৌগতর ভালবাসা সম্বন্ধে সে এইজন্যেই কখনও সন্দিহান হয় না। যত

যা-ই করুক সৌগত, রুমিকে সে সত্যিই ভালবাসে, এবং সে ভালবাসা অপরিসীম। রুমি আরও বিশ্বাস করে এই যে বিয়ের দিন স্থির না করা এটা ওর খেয়ালী মনেরই একটা ভাবমাত্র। আসলে খেয়ালী মানুষ বলেই হালকাভাবে দিন কাটিয়ে দিতে চায়। এবং এরই জন্যে বন্ধন ওর বিশেষ ক'রে প্রয়োজন। বন্ধন মজবুত না হ'লে অমন খেয়ালী মানুষের চলে না। নিজের প্রাণের জোয়ারেই যে ভেসে চলে তাকে বাঁধতে হ'লে শক্ত দড়ির দরকার। কিন্তু সৌগতর মনের স্রোত এতই বেগবান যে রুমিও তাতে ছিঁড়ে যায়, ভেসে যায়। কাজেই, মাঝে মাঝে রুমির মনে হয় এ তার আপন অক্ষমতা। যে বাঁধবে সে-ই যদি শক্ত না হয় তাহ'লে যে বাঁধা পড়বে কি হবে তাকে দোষ দিয়ে? মাঝে মাঝে নিভৃত সময়ের সমীক্ষায় তার মনে হয় এভাবে সর্বস্ব সমর্পণ করাটাই ভুল হয়েছে। কিছু রাখা উচিত ছিল যার আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণে অন্তত — আবার মনে হয় তাও হয়ত ঠিক নয় কারণ রুমি ছাড়াও নারী সঙ্গ উপভোগ করা সৌগতর পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়। বরং যখনই রুমি বুঝেছে অন্য নারীতে আসক্তি সৌগতর আছে সেই আসক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যেই শেষ অস্ত্রও হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে রুমি। কাজেই যে বস্তু গোপন নয় তার স্বাদ আকর্ষক থাকতে পারে না। আসলে যদি এমন ঘটনা হত যে রুমির বদলে অন্য কোন মেয়েকে মনে মনে ভালবাসত তাহলে ছিল ভয় কিন্তু একথা স্থির যে যেখানে সৌগত যা-ই করুক বিয়ে সে অন্য কাউকে করবে না। ছোটদা-টা কেবল বাজে কথা বলত, যার চরিত্র খারাপ তাকে কখনও বিশ্বাস ক'রতে নেই রুমি। সৌগত আমার বন্ধু আমি ওকে জানি। — কথাটা এতই অবিশ্বাস্য ছিল যে রুমি একথা শুনে বিশ্বজিৎ-এর সঙ্গে কথা-ই বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে বিশ্বজিৎ-ই আর কথা বলে না। কিন্তু আজকাল কখনও দৈবাৎ মনে হয় চরিত্র খারাপ বলতে কি সে এই কথাটাই বোঝাত যে সৌগত অন্য মেয়ের সঙ্গে সহবাস ক'রেছে? আগেও ক'রত? তা সত্ত্বেও যদি রুমিকে সে ভালবেসে থাকে তা'হলে রুমির ভয়টা কোথায়? বরং সেই তো জিতেছে। আর যারা একের পর এক সৌগতর সঙ্গে শুয়েছে সবাই হেরে যাওয়া প্রতি-যোগীর মত কোথায় পড়ে গেছে পেছিয়ে। একে নিশ্চয়ই চরিত্র খারাপ বলে না। আসলে ছোটদার সঙ্গে কি নিয়ে যেন ঝগড়া হয়েছে তাই ওকে সে দেখতে পারে না।

ইদানীং রুমির মনে হচ্ছে এমিলিও যেন ঠিক পছন্দ করে না সৌগতকে। যদিও তার মনের কথা বোঝা যায় না তবু মনে হয় মনে মনে সে অপছন্দ করে। তা করুক, বরং ভাল। ওর শরীরের যা প্রশংসা করে সৌগত তাতে কোনদিন না আবার দখল ক'রে নিত ওকে। ওদেশের মেয়েদের তো আবার ওসব বাছ-বিচার নেই, হয়ত দাদাকে ছেড়ে ওর ঘাড় ধরেই ঝুলে পড়ল শেষকালে। সেদিক দিয়ে ভালই হয়েছে এই অপছন্দ করা। — হিসেব নিকেশ যখন মনের মধ্যে

হয় সব দিক থেকেই তো মেলে — মেলে না কেবল বাস্তবে। সৌগত যে কেন পেছিয়ে রাখে কাজটাকে রুমি আদৌ তা বোঝে না। ইদানীং সে আবিষ্কার ক'রেছে দেশের পরিস্থিতি এখন আদৌ বিয়ে করার উপযোগী নয়। আজকাল নাকি প্রায় বিয়ে বাড়ীতেই হামলা হচ্ছে — একদল ছেলে এসে বলে যাচ্ছে তাদের কজনকে খেতে দিতে হবে। এসব খবর সৌগতই জোগাড় করে — অফিসে এসে নাকি সেই সব পাড়ার লোকেরা গল্প করে শুনে এসে বলে সৌগত। একদিন রুমি বলেছিল, তাতে কি? অত লোকের যেখানে নেমন্তন্ন সেখানে দশটা ছেলে খেতে চাইলে কি আর এমন অসুবিধে হয়?

অসুবিধে-সুবিধের প্রশ্ন তো নয় — ব্যাপারটা হচ্ছে প্রিন্সিপলের। ওদের খাবার দেব কেন? ওরা সব সমাজের শত্রু।

এসব ব্যাপার রুমির বোধাতীত তাই সে চুপ ক'রে থাকে। তাদের কলেজেও যে ক'টি নকশালপন্থী হয়ে গেছে তাদের মধ্যে কাউকে তো কোন খারাপ বলে মনে হয় না কারও। এবং অনিমেষ বলে যে ছেলেটি শোনা যায় নাকি পুলিশের গুলিতে মারা গেছে, সেই ছেলেটিতো কলেজের মধ্যে সবচেয়ে ভদ্র ছেলে ছিল। অমন শান্ত নিরীহ ছেলেকে যে কেন পুলিশে গুলি ক'রে মারল এটা সমস্ত ছাত্রী মহলেরই বিস্ময়ের। কাজেই অনেকে এখনও বিশ্বাসই করে না, মনে করে কোথাও লুকিয়ে বা পালিয়ে আছে একদিন হঠাৎ এসে হাজির হবে। অথচ সৌগত বলে ওরা নাকি সব সমাজদ্রোহী। এসব রহস্যের কিছুই জানে না, জানতেও চায় না রুমি। একদিন এমিলি জিজ্ঞেস ক'রেছিল তোমাদের এখানে এসব গণ্ডগোল কতদিন হচ্ছে?

অনেকদিন। — এর বেশী বিস্তারিত কিছুই বলতে পারে নি সে।

খবরের কাগজ পড়ে আমার মনে হচ্ছে এটা একটা যুদ্ধ-বিদ্রোহ।

কি বিদ্রোহ জানি না তবে এত মানুষ মরবার কোন দরকার ছিল না।

মনে হয় এটা একটা গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

গৃহযুদ্ধ যে কি বস্তু রুমি জানে না, সে চুপ ক'রে রইল। এমিলিই আবার বলল, এদেশে যা পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। শুধুমাত্র ভাববাদী চিন্তা-ধারার মানুষ বলে এদেশের লোকেরা মরে তবু মারতে চায় না। তবে বর্তমান কালে যুবসমাজ সারা পৃথিবীতেই পুরাতন স্বদেশীয় চিন্তাধারা থেকে মুক্ত। তারা বিদ্রোহ ক'রছে। এই বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ থেকে হয়ত বা আগুন কোথাও জ্বলেও যেতে পারে। — কথাগুলোর মধ্যে অনেক ইংরিজী শব্দ ব্যবহার বোঝাল এমিলি।

এতসব বোঝবার প্রয়োজন রুমিরও ছিল না। সে এত সব নিয়ে ভাবিত নয়। তার প্রত্যক্ষ যে অসুবিধে হয়েছে তা হচ্ছে একা সন্ধ্যের দিকে বাড়ী থেকে মা বেরোতে দেয় না। সন্ধ্যেবেলা সিনেমা দেখতে চাওয়ার উপায় নেই, কচিৎ কখনও কোন বন্ধুর বাড়ী যাবে সে সাহসও নিজেরই হয় না। আজকাল পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে কে যে কি তাই বুঝে ওঠা যায় না। শুধুমাত্র সৌগত

এলে তার সঙ্গে বেরোনো যায়। কলেজগুলো সব বন্ধ হয়ে গিয়ে আরও হয়েছে মুস্কিল — সমস্ত দিন ঘরের মধ্যে বন্দী। তবু এমিলি ছিল বলে কোন কোন দিন দুপুরে বেরিয়ে নিউমার্কেট এলাকায় ঘোরাঘুরি করা যায় কিছু একটা কেনার নাম ক'রে — নইলে দিনগুলো অস্বস্তিকর ভারী।

হঠাৎ দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে নজর পড়ল এমিলি বিশ্বজিৎ-এর দরজায় টোকা দিচ্ছে। ব্যাপারটা দেখবার জন্যে চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল রুমি। কথা বা কোন শব্দ শুনতে পেল না শুধু সবিস্ময়ে দেখল এমিলি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। অনুমান ক'রতে রুমির অসুবিধে হল না বিশ্বজিৎ-এর অনুমতি নেবার জন্যেই অপেক্ষা করছিল এমিলি। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় মনে হ'ল। রুমির কাছে অনেকদিন অনেক গল্প এমিলি বিশ্বজিৎ সম্পর্কে ক'রেছে অনেক কিছু জানতেও চেয়েছে, শুধু কোনদিন বলে নি যে বিশ্বজিৎ-এর দরজা তার জন্যে সবসময় খুলে যায় এমনি নিঃশব্দে! ব্যাপারটা এমনই যে সৌগতকে না জানিয়ে পারল না। কিন্তু পরবর্তী ঘটনার জন্যে সে চোখও সেদিকেই রাখল। যে কোন পরিবারের পক্ষে এটা কোন ঘটনাই নয় এতই স্বাভাবিক যে বিস্মিত হওয়া ছেড়ে এটা লক্ষণীয় বিষয়ই নয়, সৌগত তাই বিস্ময় প্রকাশ না ক'রে মনে মনে বলল, বিশ্বজিৎটা ভাগ্যবান। মুখে বলল, কোন লাভ নেই।

কার — জানতে চাইল রুমি।

বিশ্বজিৎ-এর। ওটা একটা নির্বোধ।

এতে লাভ লোকসানের কি আছে রুমি বুঝল না, জানতে চাইল।

সৌগত রহস্য করে জবাব দিল, থাকতে পারত। বুদ্ধিমান ছেলে হলে যা হ'ত বললাম তো বিশ্বজিৎ-এর বেলায় সে কথা খাটে না।

দূর। তুমি সব বাজে বকো। — বলে রুমি হঠাৎ গুরুত্ব কমিয়ে চলে এসে বলল, তবু যা হোক বাড়ীতে একজনের সঙ্গে ছোটদা কথা বলছে।

সৌগত ঠাট্টা ক'রে বলল, আচ্ছা তুমি ওকে একদম দেখতে পার না কেন বলতে পার?

রুমি শান্তভাবে জবাব দিল, অবাক লাগে ছোটদাটা কেমন যেন বদলে গেল।

ওর গবেষণার কাজ কবে শেষ হবে বলতে পার?

আমরা কোত্থেকে জানব?

ওতেই ওর সর্বনাশটা হয়েছে।

একদিন মাকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম —

কি?

ও আর কত দিন পড়াশোনা নিয়ে থাকবে। মা সরাসরি বলে দিল, তুমি নিজের বিষয় চিন্তা কর সেটাই ঠিক হবে। সেই থেকে ওসব কথার মধ্যে আমি আর থাকি না। তবে এটা তুমি ঠিক বলেছ যে অতিরিক্ত পড়াশোনা

ক'রে মাথাটা ওর গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

তাইতেই তোমার দাদার মেমটার সঙ্গে ওর ভাল জমেছে।

কেন?

মাথায় ওই এমিলিরও একটু গণ্ডগোল আছে।

তোমার মুণ্ডু —।

নইলে কখনও কেউ স্বেচ্ছায় স্বর্গ থেকে নরকে আসে?

ও বলে ও নাকি স্বর্গ দেখতে এসেছে।

কি রকম?

ওর এক এদেশীয় বন্ধু নাকি ওর কাছে এদেশ-এর বর্ণনা দিয়ে গল্প করত ওর কাছে। এখানকার নানারকম গল্প বানিয়ে বলত। কি একটা গান নাকি ওকে গেয়ে শোনাত বাংলা গান হলেও তার মানে বুঝিয়ে দিয়েছিল, এ দেশের মত ভায়ের মায়ের স্নেহ পৃথিবীর কোথাও নেই। তারপর আরও কত কথা — সেইসব দেখতে নাকি এদেশে এসেছে —।

তা কি দেখছে?

সে কথা আর বলে না।

তবে সেই বন্ধুটাকে ধরে বলুক না, কোথায় তোর সেইসব গল্প, এখন দেখা?

মজা তো আরও সেইখানেই হয়েছে, সেই বন্ধুটি বহুদিন আগে দেশে পালিয়ে এসেছে ঠিকানা কেউ জানে না।

আবার কিছু ক'রে পালিয়ে এসেছে না কি?

তা তো বলে না তবে কে জানে?

নিশ্চয়ই কিছু একটা ক'রে এসেছে, আর আসলে ওই মেম তোমার দাদার চেপে কাঁধে এসেছে তা'কে ধরতে।

কি ক'রে পালাতে পারে?

কত কি আছে? ছেলেপিলে ক'রে রেখেও তো পালাতে পারে?

তাহ'লে দাদা নিশ্চয়ই খবর পেত।

ওদেশে কেউ কারও খবর রাখে না।

সৌগতর অনুমান রুমির মন মানতে চাইল না। সে মৃদু প্রতিবাদ ক'রে বলল, সে রকম হলে বৌদির অন্য রকম কথাবার্তা শুনতে পেতাম। তুমি জান না কি গভীর ভালবাসায় বৌদি সেই বন্ধুর কথা বলে। তাছাড়া দাদা-ও সেই ভদ্রলোকের কথা জানে।

জানে! বল কি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি।

তাহ'লে তোমার দাদাটি একটি 'ম্যাড়া'।

'ম্যাড়া'! সে আবার কি?

ওই ভেড়ার চেয়ে একটু ছোট জাত আর কি — ।

বাজে বকো না, আমার দাদা আসলে খুবই ভদ্র।

পুরাণো জিনিষ ব্যবহার ক'রলেই লোক ভদ্র হয়ে যায় বুঝি ?

ম্যাড়া হয়ে যায় বুঝি ?

তা ছাড়া ক'রবে কেন ?

তাহ'লে তুমিও ম্যাড়া।

কেন কেন ?

তুমি যতগুলো মেয়ের সঙ্গ ক'রেছ সব কি নতুন ছিল ?

তোমার আজগুবি চিন্তা নেহাৎ অর্থহীন। আমি যার সঙ্গে সঙ্গ করছি তাকে আমি জানি।

রুমি প্রসঙ্গান্তরে গেল ইচ্ছে ক'রেই। বলল, তবে একটা কথা ঠিক যে বউদি খুবই চালাক মেয়ে।

সৌগত সংশোধন করে বলল, চালাক যাকে বলে তা নয়, বুদ্ধিমতী।

সে যাই হোক এভাবে হঠাৎ ছোটদার ঘরে কেন গিয়ে ঢুকল কে জানে ?

কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে।

রুমি আর কথা বলল না, তার মনের মধ্যে কেবল একটাই প্রশ্ন ঘুরতে লাগল কারও সঙ্গে মেশে না, কথা বলে না যে ছোটদা তার ঘরে এক কথায় যখন বউদি ঢুকে গেল তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বেশ রহস্যজনক। কিন্তু কি সেই কারণ যার জন্যে বউদি গেল এবং ছোটদা-ও ঢুকতে দিল।

রুমির মস্তিষ্কে যখন ওইসব গবেষণা আঁক কাটছে সেইসময় এমিলি কিন্তু বিশ্বজিৎ-এর ঘরে তার বিছানার ওপর জাঁকিয়ে বসে অনুরোধ করছে, যাও না ভাই। তোমার যখন সময় হবে তখনই নিয়ে যাও।

তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, আমার একটু অসুবিধে আছে।

কি অসুবিধে সে অবশ্য জানতে চাইব না কিন্তু যদি নিয়ে যেতে একটু ভাল হ'ত। তোমার দাদাদের কারখানায় কি সব গোলমাল চলছে, ছুটি পাবে না, আমি শহরের কিছুই প্রায় চিনি না, কি দেখাব বল তো ?

বিশ্বজিৎ বলল, এটা বোধহয় দেখার ঠিক সময় নয়। উনি এসময় কেন এলেন ?

এখানে বসে তো এখানকার পরিস্থিতি ঠিক বোঝা যায় না, তাছাড়া অনেকদিন ধরেই কাকা চাইছিলেন আসবেন। আমিও এমন কিছু দেখছি না যাতে নিষেধ ক'রে লিখব।

দেখছ না ?

কই না তো? খবরের কাগজে কিছু কিছু খুনের খবর রোজই থাকে তবে বুঝতেই তো পারি না কোথায় কি হচ্ছে।

খুন কোথাও হচ্ছে না, খতম হচ্ছে। মানুষের ওপর যারা শোষণ ক'রছে তাদেরই খতম করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কোন ঘা বা ফোড়া হলে যেমন সেটা কেটে শরীর থেকে বাদ দেওয়া হয় এ-ও সেইরকম চেষ্টা হচ্ছে আর কি — সমাজ থেকে এইসব দূষিত গ্লানি দূর করে দেওয়া।

এমিলি এদেশের সমাজের কথা ঠিক জানে না, যেটুকু জানে তা বাহ্যিক, তাই বোঝেও না। কথাটা সে এইভাবে বলল, আমি তোমার অনেক কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারি না। তোমাদের সমাজের সমস্যাগুলো না জানলে এসব কিছুই বোঝা যাবে না।

বিশ্বজিৎ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে এমিলিকে অনুধাবন করতে চেষ্টা করল। এই কিছুদিনে সে কিছুটা বুঝেছে এমিলিকে, তার কিঞ্চিৎ বিশ্বাস হয়েছে সত্যিই এমিলি হয়ত সি-আই-এ-র চর নয়। অথবা যদি হয় তো তার কাছ থেকে সে এমন কিছু খবরই নিতে পারবে না যা তাদের কাজে লাগবে। তা ছাড়া সে নিজে এমন কিছু ব্যক্তি নয় যে তার জন্যেই একজন এমন মূল্যবান চরকে 'সিয়া' নিয়োগ ক'রবে। অনেক ভেবেচিন্তে এমিলির আগ্রহ এড়িয়ে যাবার বুদ্ধি দমন ক'রে দুচারটে কথা বলা-কওয়া করে তার সঙ্গে। আর সেই কারণে সে বলল, এ দেশের প্রধান সমস্যা শোষণ।

শোষণ — শব্দটা বুঝতে মাথা গুলিয়ে গেল এমিলির। সে জানাল, 'শোষণ' কি জানি না।

মানে অসংখ্য মানুষকে তার ন্যায্য পাওনা এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে নিজে সব দখল করা, ভোগ করা।

তাই বুঝি! — ব্যাপারটা বড় সাংঘাতিক মনে হ'ল এমিলির কাছে। সে বলল, এখানে এসব হয় বুঝি? কিন্তু কল্যাণ তো কই সেসব কথা বলে নি?

তোমার বন্ধু সেই কল্যাণ এদেশের আরও অনেক রক্ষণশীল মানুষেরই একজন। আর এই রক্ষণশীল চিন্তাধারাই এদেশের মুক্তির পথ বন্ধ ক'রে আছে। কোটি কোটি মানুষকে অসহ্য দারিদ্রের দুঃখে রেখে যারা নিজেদের জন্যে অপরিসীম সম্পদ সংগ্রহ ক'রছে পরোক্ষে তাদেরই স্বার্থরক্ষা করে এই রক্ষণশীল মানুষগুলো।

ব্যাপারটা খুবই দুরূহ মনে হতে লাগল এমিলির। সে বলল, সত্যিই অনেক গরীব লোক এখানে আছে।

তুমি কি ক'রে জানলে?

কেন, রাস্তায় যে দেখি।

রাস্তায় ক'জনকে আর দ্যাখ, সকলকে কি আর দেখতে পাও? যাদের রাস্তায় বসা ছাড়া আর উপায় নেই তাদেরই শুধু রাস্তায় দেখতে পাও। অথচ ওই স্তরেরই নিঃস্ব আরও কয়েক কোটি লোক না ঘরে না পথে পড়ে

আছে। তাদের তোমরা বাইরে থেকে এসে দেখতে বা বুঝতে পারবে না।

কেন?

তারা আরও সকলের সঙ্গে মিশে সংসার ক'রে যাচ্ছে ভদ্রতার মুখোশ কোনও রকমে বাঁচিয়ে। এই যে রাস্তায় অসংখ্য মানুষকে হাঁটতে দ্যাখ এদের অনেকেই — বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখলে দেখতে পাবে ভালভাবে খেতে পর্যন্ত পায় না।

কিন্তু তার সঙ্গে এইসব মারামারির কি সম্পর্ক আছে?

এদেশের বিপ্লবীরা চায় এই শাসন ব্যবস্থার শেষ হোক। তারা চায় দেশের জনতা এই শোষক সম্প্রদায়কে ক্ষমতাচ্যুত ক'রে সত্যিকারের জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলুক।

তার জন্যে এত মানুষের মৃত্যুর কি দরকার?

কোনই দরকার নেই। কিন্তু যারা এই দেশকে সুন্দর ক'রে দেখতে চায় তাদের তো ওরাই হত্যা ক'রছে। শয়তান কখনও স্বর্গ চায় না, সে চায় তার একচ্ছত্র অধিকার, এখানেও তেমনি শোষকেরা চায় তাদের দখল ঠিক রাখতে। যারা সেই দখলদারীর বিরোধিতা ক'রবে তাদেরই হত্যা ক'রবে ওরা।

এমিলি কথাটির জবাব দিল না। মনে মনে বলল, কি জানি, আমি এর কিছুই বুঝি না।

তার মনোভাব অনুমান ক'রে বিশ্বজিৎই বলল, আচ্ছা তুমিই বল পৃথিবীর যে দেশের মানুষ তার দেশকে যেভাবে গড়ে তুলতে চায় তুলুক না, মার্কিন সরকারের এত কি মাথা ব্যথা যে সেখানে টন টন বোমা ফেলে সে দেশের মানুষের ইচ্ছাকে গুঁড়িয়ে দিতে চায়?

তাই কি? ব্যাপারটা তো বিপরীতও হ'তে পারে? এমনও তো হতে পারে যে সামান্য কিছু লোক অস্ত্র জোগাড় ক'রে দেশের অধিকাংশ লোকের ওপর নিজের কর্তৃত্ব চালাবার চেষ্টা ক'রলে তাকেই প্রতিরোধ করে আমেরিকা?

এবার থামল বিশ্বজিৎ। এই বক্তব্য কোনদিন শোনে নি সে, ভেবেও দেখে নি। এটা একটা যুক্তি বটে, ভাবল, তারপর তার মনে হ'ল এখানকার এই চলতি মুনাফাতন্ত্রের আগলদাররাও তো একই যুক্তি দেখাতে পারে! এবং তাদের বক্তব্যও তাই। কিন্তু এই যে শোষণ যার পরিবর্তন সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা অসীম, অজানা কোন কিছুকে মানুষ পরীক্ষা না ক'রে গ্রহণ ক'রতে চায় না। সেইজন্যেই সামান্য কয়েকজন মানুষই সাধারণত নতুন কোন চিন্তাকে গ্রহণ ক'রে সকলের মধ্যে তা প্রচার ক'রতে চায়। কোন পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা তো শুধুমাত্র মুখে প্রচার করবার বিষয় নয় — প্রতিষ্ঠা ক'রে তাকে দেখিয়ে দিতে হয় — মানুষকে দুটো অবস্থার প্রভেদ তুলনামূলকভাবে বুঝতে দিতে হয়। তাই রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্যে অস্ত্রধারণ কায়েমী স্বার্থ-বাদীদের প্রতিরোধের জন্যে আবশ্যিক হয়ে পড়ে। যে কোন অছিলাতেই এই

প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়া মানুষের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ারই সামিল। — নিজের চিন্তায় যা এল ঠিক এইভাবেই এমিলিকে বোঝালো বিশ্বজিৎ। এমিলিও তার স্বভাবমত মন দিয়ে সব শুনল। বিবেচনা করার চেষ্টা ক'রল এবং উপলব্ধি ক'রল কথাগুলোর সারবত্তা। সত্যিই হয়ত অন্যায় করে তার দেশের প্রশাসন, মিত্রদের সাহায্য করার নামে অনেক সময়েই হয়ত ভুল কাজ করা হয়ে থাকে বা এমন সব মিত্রকেই সাহায্য করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে যারা নিজের নিজের দেশের মানুষের মিত্র হবার উপযোগী নয়। বিশ্বজিৎকে সে বলল, এসব ব্যাপার আমি কিছুই বুঝি না। তবু একটা হালকা ধারণা থেকে মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই বলছ। কিন্তু এসব আমাদের সমস্যা নয়, প্রশাসনের বিষয়বস্তু। রাজনীতির কর্মীরা এসব ভাববে, তুমিই বা এসব এত ভাব কেন? তোমার নিজের তো বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা!

কোন মানুষই রাজনীতির বাইরে নয়। বিশেষ ক'রে দেশে যখন এমনি ধরণের দুর্দিন সেই সময় কোন মানুষই মুক্ত থাকতে পারে না। তোমাদের দেশ — যেখানে মানুষের সমস্যা সীমাবদ্ধ সেখানে নিস্পৃহতা সম্ভব, এ দেশে নয়। বরং যতদিন না এদেশ মুক্ত হচ্ছে ততদিন রাজনীতিই আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

বেশ তোমার কথা না হয় মানছি এবার আমার কথাটা তুমি শোন।

বল।

তুমি দুটো দিন কাকাকে একটু বেড়াতে নিয়ে বেরোও, রবিবার তোমার দাদা নিয়ে যাবেন।

সে কথা পরে হচ্ছে আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রছি তার আগে জবাব দাও। তোমরা তো স্বামীর নাম ধরেই ডাক, দাদাকেও তো আগে শুনেছি নাম ধরেই বলতে আজকে আমাদের দেশের বউদের মত ক'রে যে বলছ?

আমি কি তোমাদের দেশের বউ নই? অন্য দেশের মেয়ে হ'তে পারি বউ তো তোমাদেরই-দেশের!

আমি অবশ্য একটু ভুল বলেছি, আসলে আমি বলতে চেয়েছি তোমাকে এভাবে কথা বলতে কে শেখাল, মা বা রুমি তো নিশ্চয়ই নয়?

কি ক'রে বুঝলে?

সে প্রশ্ন না-ই ক'রলে।

কয়েক মুহূর্ত থেমে থেকে এমিলি আস্তে বলল, ঠাকুমা।

বিশ্বজিৎ চুপ ক'রে রইল দেখে এমিলিই জিজ্ঞেস ক'রল, তুমিও কি ঠাকুমার কাছে যাওয়া পছন্দ কর না?

ওসব ব্যাপার নিয়ে কখনও ভাবি না। তাছাড়া যাবে না কেন? অপছন্দ কেন ক'রব? ঠাকুমা — বলতে বলতে থেমে গেল বিশ্বজিৎ।

এমিলি বাকী কথাটুকু শোনবার আশা ক'রে নিষ্ফল হ'ল, জানতে চাইল,

থামলে কেন ?

নেহাৎ অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু। এবার তোমার আসল প্রশ্নের উত্তর দিই, তুমি কিছু মনে ক'রো না আমি এতই ব্যস্ত যে কোথাও যাবার সময় করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

যদি তা হয় তবে আর কি করা যাবে। আমার মুস্কিল আমি যে সব চিনি না।

এখন চেনবারও অবশ্য অসুবিধে আছে। সব জায়গায় যাতায়াত করা পুলিশের উৎপাতে খুবই অসম্ভব। পুলিশে লুকিয়ে কত লোককে মেরে ফেলছে নাম দিচ্ছে অন্যের। অনেক সময় কোন হদিশই পাওয়া যাচ্ছে না মানুষের।

বল কি ?

বিশ্বাস না হবার মতই কথা।

কেন মারছে ?

রাস্ট্রশক্তির সক্রিয় বিরোধিতার অপরাধে।

ব্যাপারটা ঝাপসা লাগল এমিলির। শব্দগুলো বোঝবার অসুবিধের জন্যেই সে বুঝে নিতে পারল না বিষয়বস্তুটা। তাই এ আলোচনায় ছেদ টেনে বলল, প্রথম দিকে বিশেষ বুঝতে পারতাম না, তখন ভাবতাম আমি নতুন এসেছি বলে কোথাও যাতায়াত ক'রতে পারছি না। কিন্তু আমার তো প্রায় দুটো বছর এখানে হয়ে গেল, এখন বুঝতে পারি সত্যিই ব্যাপারটা অন্যরকম। তবে সত্যি বলতে কি আসল ব্যাপার এখনও বুঝতে পারি না।

কি বোঝ না ?

কেন এত হত্যা, কেন এত মৃত্যু!

হয়ত অনেকেই এটা বোঝে না, বলে অনেকটা নিজেকেই নিজে বলল, বুঝলে তো সমস্যার সমাধান অনেকটাই হয়ে যেত।

শেষের কথাগুলো ভাল শুনতে পেল না এমিলি। সে বলল, তোমাকে ভাই আজ একটা কথা বলব। তোমাদের দেশ শান্তির দেশ। আমার কাকা বলেন ভারতবর্ষ ধ্যানের দেশ। আমার বন্ধু কল্যাণ এদেশ সম্বন্ধে যা বলত তার অনেকটাই দেখছি মিলছে না।

কি বলত ?

এদেশ সম্বন্ধে, নিজের দেশ বলেই হয়ত, সে অনেক গল্প বলত আমাকে। আমি ওখানে থাকতেই এদেশের বহু কিছু জেনে গিয়েছিলাম যা আজ মিলছে না।

কোন অঞ্চলের লোক সে ? মানে ভারতবর্ষের কোথায় তার বাড়ী ?

ঠিকানা তো জানি না তবে তোমাদের এই পশ্চিম বাংলাতেই মেদিনীপুরে বাড়ী আমাকে বলেছিল।

বিশ্বজিৎ বলল, তাহ'লে সে অতিরঞ্জিত ক'রে বলেছিল তোমাকে।

এমিলি কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বলল, আমার মনে হয় না। সে

মিথ্যে কথা বলবার মানুষ নয়, আমি হয়ত ঠিক দেখতে পারছি না। কাকাও ঠিক দেখতে পাবেন না যদি কেউ সাহায্য করবার না থাকে। তোমার দাদা এদেশের ছেলে শুধু নামেই, দেশের কিছুই সে জানে না।

আমি খুব দুঃখিত বউদি, তোমাদের সাহায্য ক'রতে পারলাম না। তুমি আমাকে হয়ত ভুল বুঝবে কিন্তু আমার উপায় নেই।

কথাগুলো এমনই আন্তরিকতার মিশ্রণে বিশ্বজিৎ বলল যে এমিলির অন্তর স্পর্শ ক'রল তা। সে তৎক্ষণাৎ বলল, না না, আমি কিছু মনে ক'রছি না ভাই। তুমি যে অত্যন্ত ব্যস্ত আমি জানি। স্কলাররা, আমি জানি কখনই বাইরের কাজকর্মের দিকে মন দিতে পারে না। — কথাগুলো বলে অত্যন্ত লঘুভাবে হেসে সে বলল, তোমাকে একটা ঘটনা বলি আমার এক বন্ধু এক স্কলারকে বিয়ে ক'রেছিল। একদিন সে ক্ষেপে এসে বলল যে ডাইভোর্স চাইবে। ব্যাপারটা জানলাম, সেই স্কলার নিজের কাজকর্মে এমনই মগ্ন যে একদিন বই পড়তে পড়তে নিজের বউকে চিনতেই পারে নি!

এমিলির কথার লঘু ভঙ্গীতে বিশ্বজিৎ বেশ শব্দ ক'রেই হেসে ফেলল, এবং এমিলিও যে হাসছিল তারও মাত্রা বেড়ে গেল বিশ্বজিৎ-এর বেগে। বিশ্বজিৎ অনেক প্রয়াসে হাসি থামিয়ে বলল, গল্পটা তুমি ভালই বললে।

গল্প নয়, এমিলি জোর দিয়ে বলল, আমার বন্ধু মার্থার ঘটনা। আমরা অনেক বুঝিয়ে মার্থাকে ডাইভোর্স করা থেকে আটকেছিলাম।

পরে কি হ'ল?

জানি না, কারণ মার্থা আর তার স্বামী পরে অস্ট্রেলিয়া চলে গেল।

এখানে তো তোমরা বুঝিয়ে বিয়েটা রেখেছিলে, ওখানে গিয়ে আবার ওরকম হ'লে সামলাবে কে?

ভগবান সামলাবেন। তবে সেই থেকে আমি স্কলারদের চিনেছি। তাই বা কেন, কল্যাণও তো স্কলার টাইপের ছিল। তারও দেখেছি বিশেষ কোনদিকে নজর ছিল না। নিজের মনেই থাকত।

বিশ্বজিৎ একটু ঠাট্টা ক'রে ফেলল, তোমাদের দিকেও নয়?

তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে তো দেখছি! — বলেই চট ক'রে জিজ্ঞেস ক'রল, তুমি কি কারও দিকে নজর দেবার সময় পেয়েছ? যে কোন কেউ?

বিশ্বজিৎ একটু হাসল, বলল, তেমন কেউ সামনে পড়েনি যার দিকে নজর যেতে পারে।

এমিলি বলল, এই পৃথিবীতে সৌন্দর্য এত বেশী যে যেদিকেই তাকানো যায় চোখে পড়ার মত সৌন্দর্য পড়বেই। যদি মনের দরজা কোন কারণে বন্ধ থাকে তাহ'লে কথা আলাদা। তুমি তো সব সময় দরজা বন্ধ ক'রে রাখ, দেখবে কি ক'রে?

আবার একটু হাসল বিশ্বজিৎ। সে হাসি রহস্যময়। তাই এমিলি আবার

বলল, তুমি বোধহয় সত্যি কথা বলছ না। কোথাও কোন ভালবাসা নিশ্চয়ই আছে স্বীকার ক'রছ না।

ভাললাগা নিশ্চয়ই আছে, অস্বীকার ক'রব কেন? কিন্তু কি সে ভাললাগা সেটা বলা-ই মুস্কিল।

কেন?

শুনে লাভও নেই কারণ ভাললাগা কোন মেয়ের প্রতি নয়।

মেয়ের প্রতি হ'লেই যে শুনে লাভ হবে তা কি ক'রে মনে ক'রলে?

তোমরা মেয়েরা তো সেটাই মুখরোচক মনে কর।

এবার হাসল এমিলি, তোমার গবেষণার বিষয়বস্তু কি মেয়েদের মন?

হ'লে কি খুশী হ'তে?

না মানে তোমার কথাটা বিশ্বাস ক'রতে পারতাম।

কথার মধ্যেই উঠে গিয়ে নিজের হাত ঘড়িটা দেখে নিল বিশ্বজিৎ, বলল, কিছু মনে ক'রো না আমাকে এখন বেরোতে হবে। কথা বলতে বলতে সময় ফুরিয়ে গেছে খেয়াল করিনি।

এমিলি লজ্জিত হয়ে বলল, আমি তোমার দেরী করিয়ে দিলাম না তো?

না, সে রকম কোন ক্ষতি করনি। — বলতে বলতে বিশ্বজিৎ নিজের বাইরে যাবার প্যান্ট-সার্ট টেনে আনতে লাগল, এমিলি বলল, আমি তাহ'লে চললাম।

বিশ্বজিৎ জানাল, তোমাকে সাহায্য ক'রতে না পারার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত।

এমিলি বলল, ধন্যবাদ।

ভয় কাকে বলে জীবনে তার আস্বাদ পাননি উইলিয়ম হ্যারল্ড স্টুঘাণ। কেউ কখনও ভয় পাবার কথা তাঁকে বলেও নি। কিন্তু এখানে এসে দেখছেন সবাই যেন ভয় পাবার সুরে কথা বলছে। চারিদিকে গণ্ডী এঁকে একটা নির্দিষ্ট জগতের পরিমিতির মধ্যে বাস ক'রছে সকলে। একে অন্যকে সবসময়েই আতংকিত ক'রতে চাইছে, হয়ত তা দিয়ে নিজেই শংকিত হ'তে চাইছে সবচেয়ে বেশী। এ কি এক উন্মাদনা, না এক বিলাস, মিঃ স্টুঘাণ সেটাই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া ক'রতে লাগলেন বেশ কয়েকদিন। সবাই যেন ভয় পেতে চায়। ভয়-এর মধ্যে একরকম আনন্দ আছে সেজন্যে ছোটছেলেরা ভয়ের গল্প শুনতে ভালবাসে, অনেকেই ভালবাসে ভয় পাওয়া সম্ভব এমন কোন কাজ ক'রতে — এও তেমনি আনন্দ পাবার জন্যে ভয় পাওয়া কিনা কে জানে। নইলে স্টুঘাণ এমন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না যাতে মানুষ এত আতংকিত হতে পারে। খবরের কাগজে

হত্যার আর মৃত্যুর খতিয়ান যা দেখছেন তাতে এত ভয় পাবার কারণ নেই। এমন কোন খবরও তিনি পাচ্ছেন না যাতে চীনের সাম্যবাদী বিপ্লবের শেষদিকের দিনগুলোর মত এক একটা অঞ্চল কমুনিস্টদের হাতে চলে গেছে অথবা ভিয়েৎনামের মত গ্রামের এপাড়া ওপাড়া ভাগ হয়ে যায় নি সাম্যবাদী আর সরকারপক্ষের মধ্যে। তবে ভারতবর্ষের মত দেশের পক্ষে হয়ত এটাই সত্য, এই সামান্য অশান্তিই এদেশের পক্ষে যথেষ্ট, তাই মানুষ বেশী বিচলিত হয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুদ্ধ নেই, পরাধীনতা প্রচুর, মিস্টার স্ট্রঘাণ মনে মনে ভাবলেন। পরক্ষণেই তাঁর মনে হল যুদ্ধ না থাকলে পরাধীনতা হয় কি ক'রে? এ একরকম বিনাযুদ্ধেই পরাজয় মেনে নেওয়া। শান্তির দেশ বলেই এটা হ'তে পেরেছে। সব অবস্থাকেই বারংবার মেনে নিয়েছে এখানকার মানুষ। একদিকে ধর্মীয় চেতনায় আচ্ছন্ন অন্যদিকে এখনকার মানুষেরই ধর্ম বদল হয়েছে বারবার। এ বড় আশ্চর্য দেশ। — ভাবনাটাকে এমিলি এসে ছিঁড়ে দিল, তুমি কি বিকালে বাইরে যাবে?

মিঃ মুখার্জী সেইরকমই বলছিলেন, কাকা জানালেন।

আমি সেটাই জানতে চাইছি।

তুমি কি যাবে?

না। তোমরাই ঘুরে এসো। আমি বরং তোমাকে একদিন হর্টিকালচার গার্ডেন নিয়ে যাব।

সেখানে কি দেখাবে?

অনেক ফুলের চাষ সেখানে, আমি একবার গেছি, খুব সুন্দর সাজানো।

মিস্টার স্ট্রঘাণ মনে মনে ভাবেন কোথায় গেলে ঠিক হবে। একজন এমন প্রদর্শক দরকার যার মনের সঙ্গে তাঁর নিজের মিল থাকবে, তাহ'লেই তিনি মনের উপযোগী দৃশ্য দেখতে পাবেন। সেই প্রদর্শক খুঁজে বের ক'রতে হবে। তাই এমিলিকে জিজ্ঞেস ক'রলেন, তুমি কোথায় কোথায় গেছ?

আমি সে রকম কোথাও যাইনি। এটা বোধহয় খুবই বিস্ময়ের কথা তোমাকে বলছি, সেন কিছু চেনে না। নিজের দেশ সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না।

হতে পারে, অল্প বয়সে সে তো দেশ ছেড়ে বাইরে চলে গেছে —

এমন কি এই দেশের ইতিহাসও তোমার থেকে সে অনেক কম জানে।

আমার মনে হয় মিস্টার জানার মত বন্ধু পেলে খুব ভাল দেখা যেত। সে জানত।

সে অনেক কিছু জানত। তোমার মত লোকের সঙ্গী হিসেবে তার মত লোকই দরকার।

তুমি তার ঠিকানা জান না যে! জানলে খুব ভাল হ'ত।

তার দেশ দেখতে এসেছ শুনলে খুব আনন্দ ক'রেই সে তোমাকে দেখাত

সব কিছু।

আমার দুর্ভাগ্য।

এমিলি নিজে কোন মন্তব্য ক'রল না। কাকার মন্তব্য নিজের মনে ক'রতেও পারল না। কল্যাণ-এর ওপর কিছু অভিমান তার মনের মধ্যে তখনও ছাইচাপা আগুনের মত। তেজ তার ছিল না। তবু যেহেতু ছিল অস্তিত্ব তাই প্রাকসমাপ্তি জ্বলছিল। নিজের দুর্ভাগ্য নয় কল্যাণ-এরই অন্যায্যতা তার মন জুড়ে বসেছিল। সে ধরে নিয়েছিল যে তাকে এড়াতে না পেরেই কল্যাণ চুপচাপ পালিয়েছে, কেন সে কি ওর ঘাড়ে চেপে বসত, না বসেছিল? নাকি এমিলি ধরে রেখেছিল তাকে জোর ক'রে?

তার ভাবনা দু'টুকরো ক'রে সত্রঘাণ বললেন, মিস্টার মুখার্জী কখন আসবেন বলেছেন?

আমি জানি না। আমার শ্বাশুড়ী জানেন কিনা শুনে আসি।

প্রয়োজন নেই। সময়মতই উনি আসবেন।

তুমি যে বলতে কাকা ভারতবর্ষ অনেক পুরাণো সভ্যতার দেশ — কলকাতায় এসে তার কোন চিহ্ন তো দেখছি না। আমার মনে হয় পৃথিবীর অন্যান্য আধুনিক সহরগুলোর মতই কলকাতাও একটি।

ব্যাপার হয়েছে কি জান পৃথিবীর প্রত্যেকটি অংশই বদলাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে। নতুনের স্থান ক'রে দিতে প্রাচীনকে সরে যেতে হচ্ছে। বেশীরভাগ সময়েই প্রাচীন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে নয়ত সে পড়ছে লুকিয়ে। কালের বদলের সঙ্গে জনপদও বদলে যাচ্ছে, পুরাণো দিনের জনপদ এখন নিশ্চিহ্ন, কলকাতা, বোম্বাই এসব এখন নতুন দিনের জনপদ। তবে এখানের মিউজিয়ামে গেলে তুমি অতীতের অনেক কিছুরই দেখা পাবে, দূর অতীতেরও দেখা পাবে। তোমার তো এতদিন দেখে নেওয়া উচিত ছিল।

কার সঙ্গে যাই?

প্রসেনজিৎ নিয়ে যায় নি?

এসব বিষয়ে ওর কোন আগ্রহই নেই; ও খুবই সরল সাদা মানুষ। অতীত পুরাণো বা অপ্রয়োজনীয় বস্তুতে কোন আকর্ষণ নেই ওর। ও শুধু জীবনের বর্তমান অবস্থাকেই সঙ্গে ক'রে চলতে চায়।

এরা খুব সুন্দর মানুষ হয়। জীবনের ওপরে যা আছে তাকেই সত্য বলে শান্তি পায়, তলায় গভীরে খোঁড়াখুঁড়ি ক'রে অকারণ অশান্তি ডেকে আনে না। প্রসেনজিৎ সম্পর্কে বলেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রলেন, আমার ইচ্ছে আছে এখানকার মিউজিয়ামটা দেখব। ব্রিটিশরা খুব যত্ন ক'রে এই সংগ্রহশালা ক'রেছিল। বর্তমান অবস্থা জানি না একসময় এটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালার মধ্যে একটি ছিল।

তাই নাকি?

তুমি নিজেই দেখে সেটা অনুমান ক'রতে পারবে।

দরজার সামনে দিয়ে রুমিকে যেতে দেখে এমিলি ডাকল, সে ঘরে আসতেই বলল, এই, তোমাদের এখানে নাকি সুন্দর একটা মিউজিয়াম আছে?

রুমি মিস্টার স্ট্রঘাণের উপস্থিতির জন্যে ইংরাজীতেই জবাব দিল, সুন্দর কিনা মনে নেই তবে ছোটবেলায় একবার গেছি তো, আছে খুব বড় মিউজিয়াম। কেন তোমাকে তো নিউমার্কেট যাবার সময় চৌরঙ্গীর ওপর বিরাট হলদে বাড়ীটা দেখিয়েছি।

ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে বাড়ীটা দেখিয়েছ বটে —

মিস্টার স্ট্রঘাণ এবার বললেন, তুমি আমাদের প্রদর্শক হও। আমরা বাড়ীর ভেতরটা দেখতে চাই। তোমার কি সময় হবে?

নিশ্চয়ই! আমার এখন কি কাজ? কলেজ বন্ধ, সারাদিন তো কিছুই করবার থাকে না।

কলেজ বন্ধ কেন, ছুটি চলছে?

এক রকম তাই! নকশালপন্থী ছাত্রেরা হামলা ক'রে কলেজ-স্কুল সব বন্ধ ক'রে দিচ্ছে।

কেন?

এই শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের মতে ঠিক নয়!

শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা বলে, কি শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে?

রুমি মুস্কিলে পড়ল। পদ্ধতি আর ব্যবস্থার পার্থক্য সে ধরে উঠতে পারল না। তাছাড়া সে ভাসা ভাসা যা শুনেছে, নকশালদের বক্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান তার সেই পর্যন্তই। কাজেই সে সামলে নেবার জন্যে বলল, তারা দুই-এরই বিরুদ্ধে।

স্ট্রঘাণ বললেন, ইয়োরোপে আমেরিকাতেও আজকাল যুবকেরা শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাচ্ছে। এটা বোধহয় একটা হাওয়া!

আমাদের এখানে তো পড়াশোনার খুবই ক্ষতি হ'চ্ছে — রুমি জানাল, যদিও সে নিজে জানে কলেজে যেতে পারা ছাড়া তার ক্ষতি কিছু একটা হচ্ছে না। কিন্তু অনেকেই যেহেতু এই ক্ষতির কথা উচ্চকণ্ঠে বলে, মুরুব্বীয়ানা ক'রে সে-ও তাই বলল কথাগুলো।

মিস্টার স্ট্রঘাণ কোন মন্তব্য ক'রলেন না। তবে কলেজ বন্ধ হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের যে প্রভূত ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিক সেটা স্বীকার করলেন।

রুমি সেই কথা শুনে জানাল, অনেক ছাত্র এখান থেকে বাইরে চলে গেছে। বিশেষ ক'রে দিল্লীতে গিয়ে পড়াশোনা ক'রছে আমারই জানা বেশ কয়েকজন।

স্ট্রঘাণ মাথা নাড়লেন শুধু। এখানকার কোন কিছুই জানা না থাকায় কথাবার্তা ওই প্রসঙ্গে আর এগোল না, এমিলি প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে আলোচনা টিকিয়ে রাখল।

বিকালে অফিস থেকে ফিরে পরীক্ষিৎ জানালেন, এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রতে চান, চলুন তাঁর সঙ্গেই আজ দেখা ক'রে আসি।

আলাপ করার ব্যাপারে আপত্তি কি থাকতে পারে? স্ট্রঘাণ উৎসাহিত হয়েই রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, ফেরবার পথে একবার টুরিস্ট অফিস হয়ে আসব।

টুরিস্ট অফিস তো পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যায়। কাল বরং দুপুরের দিকে চলে যাবেন, আজ আমি আপনাকে দেখিয়ে রাখব।

তাতেই সম্মতি দিলেন স্ট্রঘাণ, জানতে চাইলেন মিউজিয়াম আর টুরিস্ট অফিস কোনটা কতদূর কারণ রুমি আর এমিলি আগামীকাল তাঁকে সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছে।

খুব বেশী দূর হবে না, রুমিকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, সেই আপনাকে নিয়ে যেতে পারবে।

ভালই হল। আপনাকে কষ্ট দেবার চেয়ে এটাই ভাল ব্যবস্থা।

আমার কষ্ট কিছু নয় তবে রুমি তো এখন কলেজ যাচ্ছে না, ভালই হবে ও আপনাকে কলকাতার কিছু কিছু জায়গা ঘুরিয়ে দেখাতে পারবে। তবে সহরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কোন ভাবনা ছিল না, অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্যেই আপনার ঘোরাঘুরির অসুবিধে হবে।

মিস্ট্যার স্ট্রঘাণ বললেন, আমি তো অস্বাভাবিকতা কিছু দেখতে পাচ্ছি না!

এমিলিরা যখন আসে তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, এখন অনেকটা আয়ত্বে এসেছে। দিল্লী বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে পুলিশকে — সত্যি কথা বলতে কি আমাদের পুলিশ-ও গর্ব করবার মত দক্ষতা নিয়ে কাজ ক'রছে। কতকগুলো উগ্রপন্থী লোকের কার্যকলাপকে গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে যেতে দেয় নি। — কথা বলতে বলতে একটু থেমে পরীক্ষিৎ বললেন, অবশ্য সিকিউরিটি আপনাদের সঙ্গে থাকছে —

স্ট্রঘাণ সেকথা অমনোযোগে শুনলেন। আসলে কোন কথাই তিনি খুব ভালভাবে শুনছিলেন না, তাঁর মনের মধ্যে ভাবনা অন্যধারায় বইছে। তিনি শুধুই ভাবছেন এমন একজন পরিদর্শক প্রয়োজন যিনি তাঁকে সাহায্য ক'রতে পারবেন। যাঁর কাছে সেই আধ্যাত্মিক ভারতের শান্ত পরিবেশ-এর সন্ধান পাওয়া যাবে। আসলে তিনি পরীক্ষিৎকেও এখন পর্যন্ত মনের কথা বলছিলেন না, তিনি একটু অপেক্ষা ক'রে মনে মনে বুঝে নিতে চাইছিলেন সমস্ত পরিস্থিতি এবং পরিবেশ। তাঁর মনে আশা ছিল এখানে হয়ত কল্যাণের সঙ্গে এমিলির দেখা হয়ে থাকবে, কল্যাণ তাঁকে ঠিক পথ বলে সাহায্য ক'রতে পারবে। কিন্তু ঘটনা বিপরীত বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকাতে তাঁকে স্বভাবতই চিন্তিত হতে হচ্ছে। এমিলির কাছে শুনে নিয়েছেন প্রসেনজিৎ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

অতএব মনের কথা বলবার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি খুঁজে নিতে তাঁকে একটু অনুধাবন ক'রতেই হবে। অপেক্ষা ক'রছিলেন তিনি সেই সুযোগের।

আর তা অপ্রত্যাশিতভাবে জুটে গেল সেইদিনের সন্ধ্যাতেই। ইন্টারন্যাশনাল হোটেল-এর নিজস্ব স্যুইটে নেমন্তন্ন ক'রেছিল মনোহরলাল সোয়াইকা। প্রসেনজিৎকে বলেছিল আমি তো আপনার অতিথির জন্যে সব ব্যবস্থা ক'রেই রেখেছিলাম কিন্তু স্যার আপনার মনের ইচ্ছাটা হ'ল না — আমার ভাগ্য।

মনোহরলাল-এর মত সর্বভারতীয় শিল্পপতির একম্বিধ বিনয়ী কথায় পরীক্ষিৎ বিচলিত বোধ ক'রে তাড়াতাড়ি বললেন, না না মিস্টার সোয়াইকা আপনি এটা কি বলছেন? আপনার বদান্যতায় আমি খুবই কৃতজ্ঞ কিন্তু অতিথির ইচ্ছা পরিবারের মধ্যেই থাকা। উনি আসলে ভারতীয় জীবনযাত্রা দেখতে চান।

সঙ্গে সঙ্গে মনোহরলাল বলল, ভাল ভাল। এ তো খুবই ভাল কথা, আপনি কিছু একটা কাজ করুন। আমার সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দিন। আজ সন্ধ্যে বেলায় আমার স্যুইটে আপনি আর মিস্টার স্ট্রঘাণ দয়া ক'রে একটু পায়ের ধুলো দিন। ডিনারটা ওখানেই হবে।

সেই অনুরোধেই উপস্থিতি।

মনোহরলাল নিজেই আপ্যায়ণ ক'রলেন। করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমি আপনার মত মানুষকে অতিথি হিসেবে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব ক'রছি।

পরীক্ষিৎ আলাপ করিয়ে দিলেন, এঁর নাম মিস্টার এম, সোয়াইকা, বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি আর ইনি মিস্টার উইলিয়াম হ্যারল্ড স্ট্রঘাণ —

কথা শেষ ক'রতে না দিয়েই মনোহরলাল বলল, ওঁর পরিচয় আমি জানি। উনি আমার এতই পরিচিত যে ওঁর নতুন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না।

স্ট্রঘাণ বললেন, ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আমিও খুব খুশী। আপনার পরিচয় পেয়ে খুশী হলাম।

ধন্যবাদ জানাল সোয়াইকা। এবং বলল, মিস্টার মুখার্জীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা যে উনি আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হবার সুযোগ ক'রে দিলেন।

পরীক্ষিৎ নিজেই বললেন, মিস্টার মুখার্জী এমন কিছুই করে নি যার জন্যে সে ধন্যবাদ পেতে পারে। একটা খালের দুপারে দুজন লোক যদি দাঁড়িয়ে থাকে আর যদি কোন সেতু থাকে তাহ'লে দুজনের দেখা হবেই।

স্ট্রঘাণ বললেন, আপনার মধ্যে কবিত্ববোধ প্রবল। এইজন্যেই শুনি বাংলার লোকেদের মধ্যে কবিত্ব বেশী থাকে।

মনোহরলাল বলল, বাংলাদেশের মানুষ খুব আবেগপ্রবণ হয়, এটা ঠিক।

পরীক্ষিৎ বললেন, এর মধ্যে কবিত্ব কি দেখলেন আপনারা? আমি

আপনাদের দুজনের মধ্যে এক সেতুমাত্র। ধন্যবাদ আমার প্রাপ্য নয়।

কবিতা কি কথার বাইরে কিছু? শুধুমাত্র বলার কায়দা।

একজন এসে সেলাম ক'রে কথার ছেদ টেনে দিল। তার হাতে একটা কারুকাজ করা খুবই সৌখিন থালায় সুনির্বাচিত ফুলের একটা তোড়া। মনোহরলাল সেটি তুলে নিয়ে মিস্টার স্ট্রঘাণের হাতে দিলে স্ট্রঘাণ বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। খুবই সুন্দর!

ফুলগুলোকে বেশ মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলেন স্ট্রঘাণ। বেশ কয়েক রকম ফুল যত্ন ক'রেই সাজানো হয়েছে তোড়াটায়। তিনি গুণে দেখতে চেষ্টা ক'রলেন কতরকমের ফুল এতে আছে। শুঁকে দেখলেন সুগন্ধ আছে কিনা। নেই। মোটামুটি গন্ধহীন ফুল, সামান্য গন্ধ হয়ত কোন কোনটায় আছে যাতে সবে মিলিয়ে মিশ্র গন্ধের সামান্য আভাস মাত্র তিনি পেলেন। পরীক্ষিৎকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, এগুলো কি ফুল?

পরীক্ষিৎও প্রত্যেকটিকে চিনতেন না, বললেন, বেশীর ভাগই মরশুমী ফুল।

গোলাপ ছাড়াও এদেশে বহুরকম সুগন্ধি ফুল ফোটে। — স্ট্রঘাণ তাঁর জ্ঞানের মধ্যে থেকে বললেন, পরেই বললেন, এদেশের সাদা ফুলগুলোয় রাত্রে নাকি গন্ধ হয়, দিনে গন্ধ থাকে না।

পরীক্ষিৎ বললেন, সব ফুলে নয়। তবে যে সব সাদাফুল সুগন্ধী তাতেই এটা দেখা যায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমিও তাই বলতে চাইছিলাম। হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে নাকি একটা জায়গা আছে যেখানে অজস্র ফুল ফুটে থাকে। ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স। আমার মনে হয় এরকম জায়গা অনেকই আছে। যে জায়গাটা আবিষ্কৃত হয়েছে সেটার কথা-ই শুধু জানি আমরা।

থাকতে পারে। পরীক্ষিৎ-ও বললেন, হ্যাঁ কিছুদিন আগে এমনি একটা জায়গার কথা কি একটা বইতে পড়ছিলাম যেন।

আমি জায়গাটা দেখতে চাই।

কথাটা লুফে নিল মনোহরলাল, বলল, আপনি সেখানে যেতে চান? হিমালয়ের মধ্যে কিভাবে যাবে লোকে?

হেঁটে যেতে হয়। আমি যে বই পড়েছি সেখানে যে পথ আছে সে বহু পুরাণো। এখন কেমন হয়েছে কে জানে?

মনোহরলাল এবিষয়ে কোন আলোকপাত ক'রতে পারল না, কারণ এহেন শহর ছেড়ে হিমালয় ওর জ্ঞানের অনধিত। সে কোনদিন শোনেই নি এই জায়গার নাম। পরীক্ষিৎ অবসর বিনোদনের জন্যে কদাচিৎ কখনও ইংরাজী বই দু একটা পড়ে থাকেন, দৈবাৎ তার মধ্যে লুকিয়ে চুরিয়ে ঢুকে যায় বাংলা কখনো। তারই একটা হঠাৎ চোখের সামনে এসে গিয়েছিল আর সেই বিদ্যেই তাঁর মুখ রক্ষা ক'রল অবশেষে, বললেন, সে তো অতি দুর্গম পথ। অনেক

হাঁটতে হয়।

আপনি পথটা জানেন কি? — স্ট্রঘাণ উৎসাহিত হয়ে জানতে চাইলেন।

আমি জেনে আপনাকে জানাতে পারি।

মনোহরলাল বলল, আমিও আপনাকে এখবর জানাতে পারি যদি প্রয়োজন মনে করেন।

হ্যাঁ আমার একটু প্রয়োজন।

ঠিক আছে। আপনাকে সব বিবরণ আমি দুএকদিনের মধ্যেই জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ স্ট্রঘাণ বললেন।

পরীক্ষিৎ মনোহরলাল-এর আগ্রহের জন্যেই চুপ ক'রে গেলেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মনোহরলাল সেই একই উদ্দেশ্যে স্ট্রঘাণ-এর সর্ববিষয়েই আগ্রহ তার। এসব আগ্রহ ব্যবসায়িক অতএব চুপ ক'রে থাকাই ভাল।

টেবিলের তিনপাশে তিনজন বসলে একজন পরিচারক একটা ট্রেতে তিনটি পানপাত্র এনে বসিয়ে দিল সামনেটাতে। মনোহরলাল জানতে চাইল পানীয়ের ব্যাপারে মিস্টার স্ট্রঘাণের বিশেষ পছন্দ কোনটি?

স্ট্রঘাণ সামান্য হাসির সঙ্গে বললেন, যদি আন্তরিকভাবে বলতে বলেন তো বলি ভাল সরবৎ এক গ্লাস।

সরবৎ। — বিস্ময়ে অভিভূত হল মনোহরলাল।

হ্যাঁ। এমিলি এদেশে ভাল যা কিছু শিখেছে তার মধ্যে সরবৎ তৈরী একটা। আর ওরই কাছে আমি সরবৎ খাওয়াটা শিখলাম।

যদি আগে জানতাম আমি খুব ভাল সরবৎ-এর ব্যবস্থা ক'রতে পারতাম। কিন্তু এই শীতকালে তো এখানে সে আয়োজন থাকে না।

তাতে কি, আপনি যা খুশী আনান।

পানভোজনের মধ্যেই সোয়াইকা এক অবসরে বলল, আপনি জাপান থাইল্যাণ্ড তো ঘুরে এলেন, ওদিকের বাজার কেমন দেখলেন?

বাজার তো কোনও দেখলাম না?

মনোহরলাল একটু হকচকিয়ে গেল। জানতে চাইল, জাপানে টোকিয়োতেই ছিলেন তো?

খুব কম সময়। বেশীর ভাগ সময়ই আশে পাশে ঘুরেছি।

কি কি প্রোডাক্ট এবার আপনার নির্বাচনসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল?

মিস্টার স্ট্রঘাণ মনোহরলাল-এর কথা শুনে তাঁর মনোভাব আন্দাজ ক'রে বললেন, আমি তো আর ব্যবসাদার নই মিস্টার সোয়াইকা। আমি একজন সাধারণ পর্যটক মাত্র।

মনোহরলাল সেকথা অন্যভাবে ধরে নিয়ে বলল, এটা আপনি ঠিক বলছেন

মিস্টার স্ট্রঘাণ। যথার্থ ব্যবসাদারের মতই বলছেন আপনি।

স্ট্রঘাণ মুস্কিলে পড়লেন। তিনি সোয়াইকার বক্তব্য বুঝেছেন কিন্তু সোয়াইকা তাঁকে আদৌ বুঝতে পারছেন না তাই তিনি খুব শান্তভাবে বললেন, একজন মানুষ ব্যবসা করে বলে কি আর সে ব্যবসাদার ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না?

নিশ্চয়ই পারে। এবং আপনাকে যথার্থ একজন পরিব্রাজক মনে করায় কোনই বাধা থাকতে পারে না। একজন আদর্শ পরিব্রাজক হয়েই তো আপনি ঘুরছেন।

এবং কোনও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছাড়াই — মিস্টার স্ট্রঘাণ যুক্ত ক'রলেন।

মনোহরলাল মনে ভাবল ওই দেশগুলো সফর ক'রে বোধহয় সুফল পান নি যার জন্যে এরকম কথা বলছেন। হয়ত এমন কোন বিশেষ ব্যাপার নিয়ে এসেছেন যেটা সফল ক'রতে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছে। ওইসব চিন্তা ক'রে বলল, জাপান এখন প্লাস্টিক শিল্পকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে দূর-প্রাচ্যে আপনাদের অনেক বস্তুই বাজার হারাচ্ছে। আমার মনে হয় মাল পাঠানোর খরচের জন্যেই এটা পারছে ওরা।

শুধু প্লাস্টিক কেন, বহু জিনিষের ব্যাপারেই জাপানের বিক্রি দামের সঙ্গে আমাদের পেরে ওঠা মুস্কিল হচ্ছে। আসল সমস্যা অন্য। সব দেশই এখন বিক্রি ক'রতে চায়, কিনতে চায় অল্পই।

না বেচতে পারলে কেনবার টাকা কোত্থেকে আসবে বলুন? তাই যার যা আছে তাই নিয়েই সে পৃথিবীর হাটে গিয়ে দাঁড়ায়।

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে সমর্থনসূচক মাথা নাড়লেন স্ট্রঘাণ। তারপর অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললেন, কিন্তু আমার কিছুই দেবার নেবার নেই।

সে কি বলছেন! আজ আমেরিকা না দিলে এবং না নিলে অর্ধেক পৃথিবীর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।

একথায় স্ট্রঘাণ একটু সজাগ হলেন, বললেন, আমেরিকা আর উইলিয়ম স্ট্রঘাণ এক তো নয়। আমি আমেরিকাও নই, ভারতও নই, চীনও নই। এবং আমি কারও প্রতিনিধিত্বও করি না। বর্তমানে বিশ্বনাগরিকত্ব আমার।

এটা একটা মহৎ চিন্তা। একদিন সমস্ত দেশে এই চিন্তা এসে যাবে।

পরীক্ষিৎ মিস্টার স্ট্রঘাণ-এর কথা কিছুটা অনুমান ক'রতে পারছিলেন, কারণ ওঁর মনোভাব তাঁর কিছুটা জানা ছিল। এতক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আলোচনার মত বিষয়বস্তু পেয়ে তিনি মুখ খুললেন, সমস্ত রকম সংকীর্ণতার পাশে পাশে এমনি একটা চিন্তা সব সময়েই আছে কিন্তু সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে তা কখনই পড়ছে না।

কেন? — মনোহরলাল জানতে চাইল।

কারণ মানুষ মাত্রেই স্বার্থপর। আপন স্বার্থ, তারপর গোষ্ঠী স্বার্থ — এইভাবে গণ্ডীটা একটু বাড়ে মাত্র, কখনই তা মুছে যেতে দেয় না মানুষ।

মনোহরলাল কি কথা বলে পরীক্ষিৎ-এর যুক্তিকে ভাঙ্গবে ভেবে পেল না, অথচ তার মনে হতে লাগল ভাঙ্গতে পারলে মিস্টার স্ট্রঘাণকে হয়ত একটু তুস্ট করা যেত।

মিস্টার স্ট্রঘাণ নিজে চুপ ক'রে রইলেন। এই সময়টা তাঁর আদৌ ভাল লাগছিল না। এইসব ব্যবসায়িক লেনদেন-এর বহু আলোচনা পেছনে ফেলে এসেছেন তিনি। ছেড়ে এসেছেন বিকিকিনির জীবনটাকে। একটা মানুষ বাড়ীতে শয্যায় যাবার সময় যেমন চূড়ান্ত আরাম পাবার জন্যে তার সুট-বুট খুলে রেখে সামান্য একটা কামিজ গায়ে দিয়ে নেয় তেমনিভাবেই অবসর নিয়ে সেই ব্যস্ত জীবনটাকে খুলে রেখে এসেছেন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স স্কোয়ারের ঘরটিতে। এখানে তৃপ্তি চান যা গভীর এবং সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে আসা প্রাকৃতিক বাতাসের মত মনোরম। পৃথিবীর যেখানে যা বাণিজ্য হচ্ছে হোক, যা ক'রছে করুক তাইহোকু ট্রেডিং কর্পোরেশন বা স্টকার বেণ্ড ইনকরর্পোরেটেড, তাঁর কিছুই আসে যায় না তাতে। আজ দুপুরে যদি স্টকার বেণ্ড ইনকর্পোরেটেড জর্জিয়ার টাউন প্ল্যানিং অথরিটির কাছ থেকে এক ডজন হেভি ডিউট হাইড্রলিক সুইপার ভেহিক্‌লের অর্ডার পায় বা মিচিগান থেকে অর্ডার এসে থাকে একলাখ কিলোগ্রাম কফির তাতে তাঁর কিছুই এসে যায় না। অথবা গতকাল যদি ব্যাংকে সত্তর হাজার ডলারের চেক জমা হয়ে থাকে তিনি তাঁর ঘোরানো চেয়ারটায় ফিরে গিয়ে বসে ক্যাশডিপার্টমেন্ট-এর মিস মিচেলকে বলবেন না, চেক বইটা দয়া ক'রে নিয়ে এস তো? বন্ধু এবং অংশীদার ভিকি যতই বলে রাখুন না কেন ফিরে তিনি সেই চেয়ারে আর কখনই যাবেন না। বিমান বন্দরে রানওয়ের গাড়ীতে তাঁর প্রথম পদক্ষেপটির মুহর্তেও ভিকি বলেছিলেন, আমি অপেক্ষা ক'রে রইলাম হ্যারী তোমার সফর সুন্দরভাবে শেষ ক'রে ফিরে এস। ঈশ্বর তোমার সাথী হোন। সবই মনে আছে তাঁর, কিন্তু অর্থহীন। সে সব স্মৃতিমাত্র। এবং সমান অর্থহীন এই বিষয়বস্তুর আলোচনা যার মূলে শুধু অতৃপ্তি আর আকাংখা। সীমাহীন অতৃপ্তি আর আকাংখার আগ্রহে গড়ে তোলা স্বর্ণখনির বিনিময়ে তিনি শেষ প্রহরের সম্পদ হিসেবে পেতে চেয়েছেন শান্তি। দেখেছেন ভারতের জীবন চিন্তায় আছে তারই দিকদর্শন তাই বহুচ্চারিত শান্তিময় বুদ্ধের আশ্রয়স্থলগুলো ঘুরে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর বিশ্বাসের ভূমিতে — সেখানে সেই ছেড়ে আসা জীবনের ছায়া দেখতেও তাঁর অনিচ্ছা।

কথাগুলো জানাতে বাধ্য হলেন মনোহরলাল-এর আগ্রহাতিশয্যের জন্যে; বললেন ঠিক তখনই যখন মনোহরলাল বলল, আজকাল আমেরিকাতে সিল্ক তো অনেকে ভালবাসছে। সৌখিন বস্ত্র হিসেবে সিল্ক তো বেশী জনপ্রিয় হয়েছে খবর পাই। আমার ইচ্ছা কিছু সিল্ক-এর কাজ করি। খাঁটি মুর্শিদাবাদ আর কাশ্মীর সিল্ক।

এটা একটা ভাল চিন্তা। করুন না। ছাপা সিল্ক তো অনেক যাচ্ছে

আজকাল।

হ্যাঁ তাই আমি চাইছিলাম আপনার সঙ্গেই কাজটা সুরু হোক।

আমার সঙ্গে হবার তো আর উপায় নেই —

কেন, আপনি কি অন্য কারও সঙ্গে কথা বলেছেন?

না, আমি তো ব্যবসা ছেড়ে দিয়েই এসেছি। আপনি যদি আমাদের ফার্মের সঙ্গে ক'রতেই উৎসুক হন তো স্টকার বেগু-কে লিখুন। আমার নাম লিখতে পারেন যে আমার পরামর্শ অনুসারে চিঠি দিচ্ছেন। কিন্তু এটাও লিখবেন যে এই ব্যবসার ব্যাপারে আমি কোনভাবে জড়িত নই বা কিছু জানিও না। আমি শুধু ঠিকানাটা দিয়েছি মাত্র।

মানে ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝছি না — মনোহরলাল-এর মনে হ'ল তাঁর গলায় খাবারটা আটকেই যাচ্ছে।

ব্যাপারটা এই যে আমি ব্যবসা থেকে মুক্তি নিয়ে আপনাদের দেশ দেখতে এসেছি, যদি হয় এখানেই থেকে যাব।

মনোহরলাল বিশ্বাস ক'রতে পারল না কথাটা। এ-ও কি কখনও সম্ভব? অমন ঐশ্বর্য ছেড়ে, অমন স্বর্গের মত দেশ ছেড়ে কিজন্যে মিস্টার স্ট্রঘাণ এখানে থাকতে যাবেন! কোন দুঃখে? কি আছে এ দেশে? এখানে কি তবে গড়ে তুলতে চান কোন শিল্প? অথবা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবেন এখানে? তাই বা কি উদ্দেশ্যে? ব্যাপারটা অস্পষ্ট। অথবা মনের আবেগে হঠাৎ রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন স্টঘাণ? তাই বা এই বয়সে কি করে সম্ভব? তবে ব্যাপারটা যেহেতু একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ের তাই সরাসরি জিজ্ঞাসা করাটা যথাযথ মনে ক'রল না মনোহরলাল। একটু ঘুরিয়ে জানতে চাইল, জাপানে কোথায় কোথায় গেলেন?

মুখের খাবারটা চিবিয়ে শেষ ক'রে নেবার সময়টুকু থেমে থেকে স্ট্রঘাণ বললেন, প্রধানত বৌদ্ধ মঠগুলোতে। কয়েকদিন সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ীতে বাস ক'রেছিলাম।

এই কথায় মনোহরলাল স্ট্রঘাণের মানসিকতা আন্দাজ ক'রতে পারল। জানতে চাইল, জাপানে কেমন লাগল?

ভাল। সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছে দেশটাকে ওরা —

এখানে কেমন লাগছে?

এখানে আসবার আগে থেকেই আমার ভাল লাগে বলে আমি এখন মন্তব্য ক'রতে পারি না। তাছাড়া সদ্য পা দিয়েছি এখানে, কিছুই দেখি নি।

পরীক্ষিৎ বললেন, মিস্টার সোয়াইকা জানেন না মিস্টার স্ট্রঘাণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু খবর রাখেন। এদেশের প্রাচীন গ্রন্থ যা যা ইংরেজীতে অনূদিত আছে বা যা কিছু ব্যাখা তার পাওয়া যায় সমস্ত ও র পড়া। তাছাড়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যত বই ইংলণ্ড-আমেরিকায় বেরিয়েছে তার অধিকাংশই উনি পড়েছেন।

আপনি কি ক'রে জানলেন ? — স্ট্রঘাণ বিস্মিত হলেন।

এমিলি আমাকে বলেছিল।

হ্যাঁ, ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার আগ্রহ বহুদিনের। পুরাণো ঐতিহ্য পৃথিবীর যে অংশগুলোয় রয়েছে ভারতবর্ষ তার মধ্যে একটি। তাছাড়া একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য ক'রেছি এই ভারতবর্ষ কখনও অন্য কোন দেশকে আক্রমণ করেনি, এ-ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমার মনে হয়। আরও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার রয়েছে এই যে প্রত্যেক দেশেরই যে একটা নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা আছে, ভারতবর্ষে সেই ধারা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

এটা আপনি যথার্থই চিন্তা ক'রেছেন, পরীক্ষিৎ বললেন।

কাল তার নিয়মে বদলাচ্ছে, পৃথিবীর দিকে দিকে কতবার বদলেছে জীবনের ধারা, কিন্তু ভারতবর্ষ, আমার মনে হয় যেন তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ঠিক একইভাবে ধরে রয়েছে আপন অন্তরে। এর কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি।

মনোহরলাল মন্তব্য ক'রল, পরিবর্তন এখানেও হয়েছে।

কোথায় হয়েছে বলুন, পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে দেখুন সে দেশের পুরো সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা একেবারে বিপরীত স্রোতে বয়ে গেছে। ভারতবর্ষেও বাইরের চিন্তার ধাক্কা বহুবার লেগেছে, বহু অপশক্তির হাতে বহুবার পরাধীন থেকেছে ভারত, কিন্তু পরাজিত হয়নি তার সাংস্কৃতিক চেতনা। এটাই সবচেয়ে ভাল লাগে আমার।

খুব ঘন ঘন মাথা নেড়ে মিস্টার স্ট্রঘাণকে সমর্থন ক'রে মনোহরলাল বলল, এটা আপনি ঠিকই বলেছেন!

স্ট্রঘাণ সেই সমর্থনের জন্যে বিশেষ অপেক্ষা ক'রছিলেন না। নিজের মনেই তিনি বলে যাচ্ছিলেন এবং সেই কথার সূত্র ধরেই বলতে লাগলেন, জাপানেও স্বকীয়তা অনেকটা এই রকমেরই। তবে সেখানে তাদের ধর্মীয় আচার বা পদ্ধতিগুলো বহুবার বহুভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বৌদ্ধযুগ আসবার পরেও এই পরিবর্তন থেমে থাকে নি। তবে চীন ও জাপানে ধর্মীয় চিন্তায় আমূল পরিবর্তন হয়ে গেলেও নিজেদের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা বা জীবনযাত্রার ধারা সে রকম বদলায় নি।

জাপানে আকরিক লোহা বা বাতিল লোহার দাম সম্পর্কিত আলোচনা হ'লে মনোহরলাল তাতে সায় দেবার বা অংশগ্রহণ করবার সুযোগ পেতে পারত, কিন্তু বিষয়বস্তুকে এমনই জায়গায় নিয়ে দাঁড় করালেন স্ট্রঘাণ, যে মনোহর আদৌ উৎসাহিত হতে পারল না তাতে। সুযোগ পেলেন পরীক্ষিৎ, বললেন, পৃথিবীতে একটা সময় ছিল যখন প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা-ই ধর্মের সঙ্গে ছিল জড়ানো। তখন অনেক দেশেই দেখা গেছে রাজা বদলের সঙ্গেই ধর্ম বদল হত। আসলে জাতীয় জীবনে সেই পরিবর্তন কতটা প্রভাব বিস্তার ক'রেছে সেটাই বিচার্য।

মিস্টার স্ট্রঘাণ বললেন, ধর্মই সব নয় কিন্তু দেখা গেছে মানুষের জীবনে

ধর্মের প্রভাব অসামান্য। একই গোষ্ঠীর মানুষের জীবনচর্যা ধর্মবদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে বদলে গেছে।

কারণ ধর্মই ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে — পরীক্ষিৎ মন্তব্য ক'রলেন।

ঠিক তাই। আর তাই কখনও কখনও দেখা যায় উৎকট ধর্মাচরণ কোন কোন মানুষের জীবনের শান্তিকে নষ্ট ক'রে দেয়। অথচ ঈশ্বরের পথ শান্তির পথ। আমরা বোধহয় শান্তির পথেই তাঁকে অনুভব ক'রতে পারি। আপনাদের এক কবির উপলব্ধি আমার বড় ভাল লেগেছে, বলে তিনি রবীন্দ্রনাথের একটা পংক্তির ইংরাজী তর্জমা বললেন, তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি — বলেই বললেন, অনবদ্য উপলব্ধি। এমনি ক'রে ভাবতে পারা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

আপনি এ কবিতা কোথায় পেলেন? পরীক্ষিৎ জানতে চাইলেন।

একজন ভারতীয় ছাত্র আমাদের বন্ধু ছিল। সে আপনাদের ওই কবির খুব গুণগ্রাহী। কখনো কোন আলোচনা হ'লে সে কবিতা বলে তর্জমা ক'রে আমাদের বুঝিয়ে দিত। আমরা তাকে মাঝে মাঝেই বাড়ীতে নিমন্ত্রণ তার কাছে অনেক কিছু জেনে নিতাম।

পরীক্ষিৎ শুনে খুব খুশী হলেন, এরকম ছেলেও আছে তাহ'লে! এখনও এদেশ তাহ'লে গুণী শূণ্য হয়ে যায় নি! বেশ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রলেন তিনি। মনোহরলাল এসব কথায় কোন উৎসাহ পাচ্ছিল না। তার সমস্ত উদ্দীপনা নিভে গিয়েছিল স্ট্রঘাণের কথাবার্তা শুনে। তার সংশয় হচ্ছিল ইনি আবার সেই স্ট্রঘাণ তো —ফিলাডেলফিয়ার নামী ব্যবসায়ী! তাহ'লে এইরকম ভাবগতিক কেন! এরকম ভাবসাব তো ওদেশের হিপিদের হয় বলে শোনা যায়। যে সব অল্পবয়সী ছোকরার জীবনে কোন ভাবনা চিন্তা থাকে না তারা-ই তো সব এইরকম উদাসী চিন্তার মানুষ হয়! ভদ্রলোক ভ্রান্ত চিন্তায় এখানে এসেছেন, তাই জানাল, ভারতবর্ষের যে আধ্যাত্ম-চিন্তার কথা আপনি বললেন তা কি আপনি আর কোথাও খুঁজে পাবেন? সাধু সন্ন্যাসী তো সারা দেশে অসংখ্য আছে, নামডাকওয়ালা সাধুসন্তও কম নয়, তবে শহুরে সাধুদের থেকে আপনি সে জীবন পাবেন না যা ভারতবর্ষের আত্মার ধর্ম।

মনোহরলাল ভালভাবে বোঝাতে পারল না। তবে সে জানিয়ে দিল, আপনি যদি হরিদ্বার বা হৃষীকেশ যেতে পারেন তো অনেক সাধুসন্ত পাবেন, যাঁদের মধ্যে তপস্যা আছে। সাধু সন্তরা সব ওদিকেই থাকেন।

সংবাদটা পেয়ে স্ট্রঘাণ মনে মনে খুশীই হ'লেন কিন্তু চুপ করে রইলেন। সাধুসঙ্গের জন্যে তো তিনি আসেন নি, তিনি চান সেই বেদান্তোক্ত ভারতবর্ষের শান্তিবন, ছায়াচ্ছন্ন আবাস, যেখানে জীবন নির্বাক, মানুষ নিজের অন্তরের সঙ্গে বসে নিভৃতে যেখানে কথা বলতে পারে। রেসের ঘোড়ার মত সারাজীবন

দৌড়ানো অর্থহীন। নিজে দৌড়ানো আর দৌড়োচ্ছে এমন একটা যানের মধ্যে বসে থাকা দুটো একই ব্যাপার। আমেরিকার মত দেশে থাকা সেইরকম এক ধাবমান গাড়ীতে বসে থাকাই। চারপাশে সমস্ত কিছু উদ্দাম গতিতে ছুটছে। ছুটছে, ছুটছে আর ছুটছে। অবিরাম এই ছুটে চলার পর যে বিজয় রেখার সন্ধান, কেউ জানে না তা, জেনেও লাভ নেই কারণ এ এক নেশার মত, জয়ের নেশা, তা সে ব্রোঞ্জই হোক, রূপোই হোক, তামাই হোক বা হোক না সে স্বর্ণ-পদক। আসলে তো সেটা পদক এবং আসল মূল্য তার অঙ্কের অক্ষরে — এক, দুই, কি তিন! কিন্তু ছোটা সে এই একের জন্যেই ছোটা। ভারতীয় দর্শনও সেই এক-এর কথা বলে, অন্য এক। সেই এক-এর জন্যে চলা-ও সেখানে অন্তহীন। তবে সে বিপরীতমুখী গতিতে, অন্যভাবে। সম্পূর্ণ নিজের মধ্যে, নিজেকে ক্রমাগত স্থির বিন্দুতে নিয়ে যাবার জন্যে গভীরে ছোটা। অনেক সুযোগ পেলে ভারতীয় দর্শনের ভিন্নভিন্ন ধারাগুলো পড়াশোনা ক'রতে পারলে হয়ত আভাস পাওয়া যেত ব্যাপারটা কি, এখনও তিনি কিছু জানেনই না। যদি সংস্কৃত ভাষা জানতেন — মনে মনে আফশোস হ'ল তাঁর। পরক্ষণেই ভেবে স্থির ক'রলেন, শিখে নেবেন। একজায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারলে শিখে নেবেন তিনি। জীবন যতদিন সময় দেবে জেনে নেবেন যতদূর পারেন।

আসলে জৈবিক প্রয়োজনে ছোটাছুটির একটা শেষ থাকা দরকার। স্ট্রঘাণ বিশ্বাস করেন জীবন অত্যন্ত মূল্যবান, তার প্রতিটি মুহূর্তই চরম। হিন্দু দর্শনের কথা তাঁর বেশ ভাল লাগে — এর নাকি শেষ নেই। অন্তহীন। অনেক জন্ম মৃত্যুর ভেতর দিয়ে একই জীবন চলছেই, চলছেই। দিন-রাত্রির আলোই অন্ধকারের মত হ'ল জীবন্তাবস্থা আর মৃত্যুর মহানিদ্রা। আসলে সেই একই জীবন, অন্য দেহকে আশ্রয় ক'রে নতুন ভাবেই জেগে ওঠা, যেমন ঘুম থেকে উঠে নতুন পোষাক পরে মানুষ। সত্যমিথ্যা প্রমাণ নেই, অন্তত প্রমাণ পান নি স্ট্রঘাণ কিন্তু এভাবে ভাবতে ভাল লাগে। আর যে ভাললাগা তাঁর মনের ভেতরে শিশুর উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে। আর কিছু হোক না হোক জীবন তো সুন্দর-ই ; এভাবে ভাবলে মৃত্যুও মহীয়ান হয়ে ওঠে।

বাড়ী ফিরে স্ট্রঘাণ সটান শুয়ে পড়লেন। একটু বাদেই এমিলি এসে জানতে চাইল, কেমন লাগল তোমার ?

সুন্দর — জবাব দিতে দিতে উঠে বসলেন তিনি। কথাটা বললেন বটে তবে তাঁর মনের মধ্যে একটু কেমন দ্বিধা জড়ানো ছিল যা তিনি এমিলির কাছে প্রকাশ ক'রলেন না। এখন পর্যন্ত ঘরে এবং বাইরে যা তিনি দেখছেন তাতে ভারতীয়ত্ব কোথাও নেই। সবই পশ্চিমের মত। ঠিক সেরকমটি নয় তবে সেই ধারাতেই তৈরী। কিন্তু জাপানে ছিল, সেখানে বাহ্যিক জীবন

তাঁর দেশের চেয়েও দ্রুতগামী কিন্তু সঙ্গেই আছে ব্যক্তিগত যে জীবন, যাকে বলে গার্হস্থ সে একেবারেই তাদের স্বকীয়। নিজের পদ্ধতিতে তারা আমন্ত্রণ করে বিদায় জানায় নিজের ধারাতেই। স্ট্রঘান ভেবে নিয়েছেন নতুন বলেই হয়ত বেসুরো ঠেকছে, শ্রুতি ও বাস্তবে মিলছে না; মিলবে। আর সেইজন্যেই তিনি এমিলিকে সব সময়েই উৎসাহিত করেন. যা দ্যাখেন বলেন ভাল, বলেন সুন্দর। কোথাও থেকে ঘুরে এলেই এমিলি জানতে চায়, কেমন দেখলে ?

বলেন, চমৎকার।

মনে মনে হাসে এমিলি, খুশী হয়েই হাসে। সে জানে তার কাকা সরল প্রকৃতির মানুষ। তাঁর কাছে খারাপ কিছু নেই। চিরদিন ব্যবসার বিষয় ছাড়া আর কোন ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে এমনি অভ্যেস ক'রেছেন যে জগতের যা কিছু দ্যাখেন, দেখা মাত্রই ভাল লেগে যায়। যা একান্তভাবেই ভাল লাগাতে না পারেন, এড়িয়ে যান। এমিলি সেগুলো বোঝে। যাতে উৎসাহ প্রকাশ না ক'রে চুপ থাকেন জানতে হবে সেটি অতিপ্রেত নয়। এমিলি নিজে থেকেই সেটা বাদ দিয়ে যায়। অনেক সময় কাকাকে জিজ্ঞেস না ক'রেই বাদ দেয়। সৌগত এসে একদিন বলল, শুনলাম মিস্টার স্ট্রঘান নাকি হরিদ্বার চলে যাচ্ছেন ?

সৌগতর ইংরিজির উত্তরে বাংলাতে এমিলি বলল, আমার কাকা যাচ্ছেন এটা আমি তো এখনও নিশ্চিত ক'রে জানি না।

না মানে আমি শুনলাম, আমতা আমতা ক'রে বাংলাতেই বলল সৌগত।

কার কাছে শুনলেন ?

রুমি ঘরে এসে বলল, আসল কথা ও একদিন তোমার কাকাকে ডিনারে নেমন্তন্ন ক'রতে চায়।

কোথায় ? এমিলি জানতে চাইল।

গ্রাণ্ডে, বা ক্যালকাটায়। — সৌগত খুব গর্ব ক'রেই বলল।

আমি দুঃখিত কাকা কোন হোটেলে খাবার নেমন্তন্ন ঠিক পছন্দ ক'রছেন না। যদি আপনি সত্যিই ওঁকে খাওয়াতে চান আপনার বাড়ীতে আয়োজন ক'রতে পারেন, এদেশের খাবার।

রুমির মুখের দিকে তাকিয়ে সৌগত বলল, ওঁর অসুবিধে হবে না ?

রুমি হেসে জবাব দিল, বউদির কাকা তো, না হতেও পারে !

এমিলি বলল, ওঁর ইচ্ছার কথাটাই বলছি।

আমি তো এইমাত্র বললাম, ওঁকে না জিজ্ঞেস ক'রে কি ক'রে বলছেন যে উনি নিমন্ত্রণ নেবেন না ?

এই তো ভুল। নিমন্ত্রণ উনি নেবেন না একথা কি একবারও বলেছি ? কোন হোটেলে উনি কোন নিমন্ত্রণ হ'লে সেটা অপছন্দ করেন। উনি এদেশের সবকিছু দেখতে চান।

ও এই ব্যাপার। আচ্ছা তাহ'লে আবার আমাকে বাড়ী যেতে হবে ব্যাপারটা

নিয়ে সিদ্ধান্ত ক'রতে। বাড়ী হ'লে তো আবার স্বাধীনতা থাকে না।

এমিলির ইচ্ছে হ'ল বলে ফেলে, তবে থাক না। কে আর বলেছে এটা ক'রতেই হবে? — এতটা সে আর বলল না অভব্যতার শংকায়; শুধু বলল, খাওয়ানো নিয়ে আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ওটা কি এমন বড় জিনিষ?

সৌগত কয়েক সেকেণ্ড কি চিন্তা ক'রল, তারপর চট ক'রে প্রশ্ন ক'রল, উনি তো ভারতীয় খাবার খেতে চান? আচ্ছা ঠিক আছে আজই খাওয়াব। চলুন, সকলকে যেতে হবে।

কোথায়? এমিলি জিজ্ঞেস ক'রল। রুমি মুখে জিজ্ঞাসা না ক'রলেও সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে রইল সৌগতর দিকে।

সৌগত বলল, প্রশ্ন ক'রবেন না, স্থির করুন এবং আজই চলুন আর ঘন্টা দুয়েক-এর মধ্যে। — রুমিকে বলল, যাও তুমি বাড়ীতে বলে দাও তোমরা আজ রাত্রে খাবে না।

ব্যস! — রুমি জানতে চাইল, বউদির কাকার কাছে মত নিতে হবে না? মাকে একবার জিজ্ঞেস ক'রতে হবে না?

মিস্টার স্ট্রঘাণের কথায় সৌগত বলল, হ্যাঁ ওঁকে তো নিশ্চয় রাজী করাতে হবে আর সেটা তোমার বউদির দায়িত্ব। অন্যদিকটা তুমি দেখ।

মা কখনই আপত্তি ক'রবে না। আসল লোক রাজী হলেই হয়।

এমিলি বলল, আমাকে তো জানতে চাইবেন জায়গার কথা, তখন কি বলব?

ঠিক আছে বলেই দিই, অল বেঙ্গল উয়োমেনস কাউনসিল একটা সুন্দর ভোজনালয় চালায়, তার নাম সুরুচি, পার্কসার্কাসের কাছে ইলিয়ট রোডে। তোমার কাকাকে বল সম্পূর্ণ ভারতীয় খাবার সেখানে, মনের মত খাবার পাওয়া যায়।

এমিলি এক লহমার চিন্তায় বলল, এমন নয় যে কাকা দু একদিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছেন, বা গেলে আর আসবেন না, আপনার নিমন্ত্রণটা অন্য একদিনের জন্যে ঠিক করুন। কাকাকে বরং আগে থেকে বলে রাখব, উনি প্রস্তুত থাকবেন।

অগত্যা রাজী হতে হ'ল তাতেই। কিন্তু নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে এই স্থগিত রাখার কাজটা ক'রতে হ'ল তাকে। অফিসের কাজ ছাড়া আর কিছুই সে স্থগিত রাখাটা পছন্দ করে না। যে কর্ম তার ইচ্ছাধীন তা সে চিন্তার সঙ্গেই শেষ করে। এমিলিকে তুষ্ট ক'রতে সে বলল, বেশ তাহ'লে আপনিই বলুন কবে হ'তে পারে আমি সেই রকমই ঠিক ক'রে রাখছি।

সেটা তাহ'লে কাকার সঙ্গে আলোচনা ক'রেই বলছি।

রাজী হয়েই সৌগত জানতে চাইল, তা এত জায়গা থাকতে আপনার কাকার হরিদ্বারে যাবার ইচ্ছে হ'ল কেন?

ওখানে গেলে ভারতীয় যোগীদের দেখা পাওয়া যায় ---

যোগী মানে সাধু দেখতে হরিদ্বারে যেতে হবে কেন? এতটা পথ চলে

যখন ভারতবর্ষে এসেই পড়েছেন এখন কি আর সাধুর অভাব হবে? — রুমির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এই দেখুন একজন সাধু। প্রায় গেরুয়া রঙের কাপড় পরেছে, মাথায় বড় বড় চুল, সাধু নয়?

সৌগতর কথা বলার হালকা ভঙ্গীতে রুমি হেসে উঠল কিন্তু ভাল লাগল না এমিলির। এইরকম ব্যঙ্গবিদ্রূপ সে ভালভাবে মেনে নিতে পারল না, বলল, কিছু মনে ক'রবে না, এটাই কিন্তু ভারতের গর্বের। এখানে প্রচুর মানুষের মধ্যে ত্যাগের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

বেকায়দায় পড়ল সৌগত। একটু বিব্রতও হ'ল। এমিলি যে তাকে বিশেষ পছন্দ করে না এটা সে বোঝে না, সে ভাবে বোধহয় তার প্রতি দুর্বলতা পাছে ধরা পড়ে এই ভয়ে এমিলি রাগ করার ভাব করে থাকে; আসলে এমিলি তার প্রতি মুহূর্তের বিরক্তি দিয়ে সৌগতর প্রতি নিজের দুর্বলতাই প্রকাশ ক'রে ফেলে।

বিপরীত পক্ষে এমিলি সৌগতর কোন কোন কাজ বা কোন কোন কথা খুবই অপছন্দ করে। যেমন এই রসিকতাটি। এত হালকা কথাটিকে সে কোনভাবেই রসিকতা ব'লে মনে করতে পারল না। তার মনে হ'ল নির্বুদ্ধিতা। আরও একটা ব্যাপার সৌগতর কথাবার্তায় এমিলি প্রায়শ লক্ষ্য ক'রেছে তা হ'ল কারও প্রতিই শ্রদ্ধা পোষণ না করা। এমিলি মনে করে আসলে সৌগত নিজেই অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। যে নিজে শ্রদ্ধা না পায় সে অন্যকে কখনও শ্রদ্ধা করে না। সৌগতকে আরও ছোট মনে হয় কল্যাণের সঙ্গে তুলনায়। নিজের দেশ সম্বন্ধে তো বটেই, তাছাড়া এমিলি দেখেছে, সকল দেশ সকল মানুষ সম্বন্ধেই শ্রদ্ধা ছিল তার। তার কাছে প্রতিটি বস্তু, ব্যক্তি ও ঘটনার সঠিক মূল্যায়ন পাওয়া যেত। সৌগতর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললে মনে হয় যেন একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে সে আটকে পড়েছে, অথচ কল্যাণের সঙ্গ ছিল এক অন্তহীন প্রান্তরের মত। দূর প্রসারিত সবুজে আচ্ছাদিত নিবিড় নীলিমায় আদিগন্ত তার স্বপ্নময় বিস্তার। সে যেন এক সুন্দর বাস্তবের ওপর দাঁড়িয়ে বর্ণময় স্বপ্নের সঙ্গে কথাবলা। আরও মুস্কিল হয়েছে এই যে সৌগতর সান্নিধ্যে এলেই কল্যাণকে বেশী ক'রে মনে পড়ে। সাধারণত সদৃশ কিছুর সান্নিধ্যে অপরটির স্মৃতি স্বাভাবিক, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের সৌগতর সান্নিধ্যে এলে কেন যে কল্যাণ স্মৃতি থেকে উঠে আসে এমিলি তা বুঝতে পারে না। এতে আর একটা মুস্কিল হয়, সৌগত ক্রমাগত ছোট হ'তে থাকে। রূঢ় কথা এমিলি বলতে পারে না বলেই কথা বন্ধ করার ইচ্ছে হয় তার।

কিন্তু আপন নির্বুদ্ধিতার চাপে সৌগতই আবার খুঁচিয়ে তোলে, কি ঠিক বলিনি? কত সাধু চাই। কলকাতাতে সাধুর অভাব? পথে মাঠে ঘাটে সাধুর ছড়াছড়ি।

রুমি সৌগতর কথা খুব উপভোগ ক'রছিল। হাসতে হাসতে সে বলল,

এরপর হয়ত তুমি বলে বসবে তুমি নিজেও একজন সাধু ?

নয় কেন ? আমাদের অফিসের রায় একজন ভদ্রলোকের কাছে প্রায়ই যায়, রায় বলে ভদ্রলোক নাকি খুব উঁচু দরের মানুষ। অর্থাৎ শক্তিমান লোক। ভদ্রলোকের প্রচণ্ড শক্তির একটা নমুনা হচ্ছে এক নিঃশ্বাসে একটা বোতলের পুরো হুইস্কি সাফ ক'রে নির্বিকার থাকতে পারেন। আমি শুনে বিশ্বাস ক'রতাম না একদিন রায় ভার্মাকে পটিয়ে-সটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখি ভার্মা-ও বলতে সুরু করেছে 'স্পিরিচুয়াল ম্যান'। রায়-এর কথা বিশ্বাস করা যায় নি ব্যাটা নিজে নেশার ঘোরে গ্লাসকে বোতল দেখে থাকতে পারে কিন্তু মাল টেনে বেতাল হবার লোক ভার্মা নয়। কাজেই ভার্মার কথার গুরুত্ব দিয়েই বলছি মালটানা সাধুর থেকে আমি কিছু কমতি যাই না। ভালভাবে চালিয়ে যেতে পারলে আমিও একদিন বোতল খালিকরা সাধু হয়ে যাব।

থাক থাক। আর ব্যাখ্যা ক'রতে হবে না — রুমি আদরের সুরে বলল। আর বলল, নিজের গুণের কথা আর প্রকাশ ক'রতে হবে না।

এমিলি জোর ক'রেই যোগ দেবার চেষ্টা ক'রল ওদের রসিকতায়, বলল, ওদেশে একবার টেলিভিসন-এ সাধুদের অনেক ছবি দেখিয়েছিল, সব — কি বলে যেন — গানজা খাচ্ছিল। খুব খাচ্ছিল। — সেদিনের স্মৃতিতে খুব হাসল এমিলি আপন মনেই।

সৌগত দৃশ্যটা মনে মনে অনুমান ক'রে নিয়ে জিজ্ঞেস ক'রল, এখান থেকে ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিল বোধহয় ?

হ্যাঁ। একজন এদেশে এসে এইসব ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল।

কি দেখিয়েছিল শুধু গাঁজা খাচ্ছে ? — বলে এবার সৌগত খুব হাসল। তারপর এমিলির বলার ভঙ্গীটুকু অনুকরণ ক'রে বলল, খুব খাচ্ছিল ?

হ্যাঁ। খুব।

রুমি মজা ক'রে বলল, বউদি দেখি দৃশ্যটা ভোলনি ? খুব মজা লেগেছিল দেখছি।

হ্যাঁ। খুব মজার ছবি। কিন্তু এখানে তো কোন গানজা খাচ্ছে সাধু দেখিনি ?

গাঁজা শব্দটির বিকৃত উচ্চারণের মধ্যে এমনই মাধুর্য ছিল যে শুনতে খুব ভাল লাগছিল। রুমিও তাই আনন্দ পেল প্রচুর। সে বলল, ওমা ! আমি তো এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি যে বউদি 'গাঁজা' খাবার কথা বলছে !

তবে আর শুনছ কি ? সৌগত বলল রুমিকে।

আজকাল তোমাদের দেশের অনেক ছেলেমেয়ে এদেশে এসে গাঁজা খায়।

হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। আমাদের দেশে গানজা পাওয়া যায় না।

সবই যদি তোমাদের দেশে পাওয়া যাবে তবে অন্য দেশগুলোর আকর্ষণ থাকবে কিসের ? কেনই বা আমাদের দেশে আসবে তোমরা ?

হো। গাঁনজা খেতে আসবে? — এমিলি প্রতিবাদ ক'রল।

না তা নয়। যা যা আপনাদের দেশে নেই সেই সবের আকর্ষণেই আসবে। যেমন ধরুন তাজমহল — সৌগত বলল।

আমিও কাকার সঙ্গে যাচ্ছি। তাজমহল দেখব।

বাঃ এটা ভাল বুদ্ধি হয়েছে। গ্রাম দেখবার ভূত যে ছেড়েছে এটাই যথেষ্ঠ।

'ভূত ছেড়েছে' সৌগতর এই কথাদুটো বুঝল না এমিলি, ফলে মাথা নেড়ে সায় দিল সৌগতর কথায়।

তাতে রুমি জিজ্ঞেস করল, ছেড়েছে তা'হলে?

এবার যেন কিছু একটা রহস্যের আন্দাজ ক'রল এমিলি, প্রতিপ্রশ্ন ক'রল কি ছেড়েছে বলছ?

ভূত ভূত — ঘোস্ট।

ঘোস্ট!

এবার সৌগত ইংরিজি বলার সুযোগ পেয়ে বোঝাতে তৎপর হ'ল, আমাদের দেশে মানুষকে খুবই ভূতে ধরে। ধরলে আর ছাড়ে না।

তাই নাকি? — এমিলি যেন আতংকিত হয়ে পড়ল।

হ্যাঁ। কিন্তু এতদিন জানতাম এটা আমাদেরই নিজস্ব! এখন দেখছি ভূত সব দেশেই লোকেদের ধরে।

কি রকম?

গ্রাম দেখব ভূতে ধরে নি? এটা গেঁয়োভূতে ধরবারই ফল। মেম বলে চিকিৎসাটা ঠিক মত হ'ল না, এদেশের মেয়ের হ'লে দুচারটে ওঝার হাতফেরতা তাকে হতেই হ'ত। — বাংলায় কথাগুলো বলল সৌগত।

ওঝা কি মানে?

ওঝা মানে একদল লোক যারা মন্ত্র দিয়ে ভূত তাড়ায়।

কি আশ্চর্য! বিস্ময়কর! সে কিরকম ক'রে হয়?

যেমন ক'রে ধরে তেমনি ক'রে ছাড়ায়।

এমিলি ব্যাপারটায় খুব আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল, উৎসাহিত স্বরে জানতে চাইল, আমাকে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দিন তো কি ক'রে এসব হয়? কেমন সে ব্যাপারগুলো?

সৌগত বলল, ব্যাপারটা আমারও শোনা। কোনদিন দেখিনি। শুনেছি ভূতে ধরে আবার ওঝা এসে ভূত ছাড়ায়, কি ক'রে যে হয় আমি দেখি নি।

এমিলি মুষড়ে পড়ল। তার প্রচণ্ড উৎসাহ দমে গেল। আগেও সে কিছু কিছু শুনেছে এদেশে নাকি ভূত প্রেত খুব ঘুরে বেড়ায়, কল্যাণকে জিজ্ঞেস ক'রে কোন সদুত্তর পায় নি। কল্যাণ এসব বোধহয় বিশ্বাস করে না, সে বলত, আমি ওসব সম্বন্ধে কিছু জানি না। আমি কোনদিন ওসব দেখিনি। আজ সৌগতর কথা শুনে আবার উৎসাহ বাড়ল কিন্তু সৌগতও সেই একই

রকম বলল দেখে নি। তাহ'লে এমন কা'কে পাওয়া যায় যে এসব দেখেছে — জানতে চাইল এমিলি রুমির কাছে।

রুমি বলল, এমন লোকের সন্ধান সে-ও জানে না।

সামান্য যেটুকু আশা জেগেছিল সেটুকুও নিভে মুষড়ে গেল এমিলি আবার। যতক্ষণ এই ভূত প্রেত সংক্রান্ত কথা না শুনেছিল ততক্ষণ কোন ঝামেলা হয়নি, ব্যাপারটা শুনতেই সেসব সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ জেগে উঠল তার মনে। আর তার স্বভাবটাও এমনি যে, কোন কিছুর সম্বন্ধে কৌতূহল একবার জাগলে সে কৌতূহল নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত মনের মধ্যে স্বস্তি পায় না। ছিদ্রহীন পাত্রে বাষ্পায়িত জলের মত উদ্দাম বেগে সেই কৌতূহল ছটফট ক'রতে থাকে তার মনের মধ্যে। অপরে তা বোঝে না।

সৌগতও বুঝল না বলে রহস্য করবার অভিপ্রায়ে বলল, ভূত দেখবেন ?

দেখব ! দেখা কি সম্ভব ? — এমিলি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল।

সামান্য হেসে সৌগত বলল, সম্ভব হবে না কেন ?

কি ভাবে দেখাবেন ? এই তো বললেন আপনি নিজেই কখনও দ্যাখেন নি আর দেখেছে এমন কোন লোককেও আপনি চেনেন না।

সে আপনাকে পরীক্ষা করবার জন্যে বললাম। দেখলাম আপনার কতটা সাহস। কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়ে যাবেন, ভীষণ ভয়।

কেন ? ভয় পাব কেন ? — শিশুর মত সরল ভাবে এমিলি কথা বলছিল।

ভূত দেখলে সকলেই ভয় পায়।

তাই নাকি ! এমিলির চোখ দুটো এত বড় হয়ে গেল যে রুমি হেসে বলল, তুমি তো এখনই ভয় পেয়ে গেলে বউদি —

এমিলি অস্বীকার ক'রল, ভয় সে পায় নি।

বেশ তাহ'লে ভূত একদিন দেখানো যাবে — সৌগত বলল। তার পরক্ষণেই বলল, কিন্তু আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।

কেন ?

আমার সঙ্গে সে সব জায়গায় আপনি যাবেন কি ক'রে যে ভূত দেখবেন ?

কোথায় যেতে হবে ?

কোনও গ্রামের শ্মশানে, মাঝ রাত্তিরে যেতে হবে।

এবার একটু ঝিমিয়ে পড়ল এমিলি, পরক্ষণেই উচ্ছল হয়ে উঠল, বলল, বেশ তো ওর দাদাকেও নিয়ে যাব।

সৌগত বলল, অত লোক গেলে হবে না।

এমিলি বলল, আমি তো একলা যেতে পারি কিন্তু —

দাদা কিছু বলবে না — রুমি তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

এমিলি বলল, তোমার দাদা যে কিছু বলবে না সে আমি খুব ভালই জানি কিন্তু — বলে থেমে গেল বাকী কথা না বলেই।

সৌগত এবার লুফে নিল, বলল, তবে আর কি, যেদিন বলবেন নিয়ে যাব। তবে — ঠাট্টা ক'রে বলল, রুমি তোমার দাদাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে যাব যে ভয় পেলে বা কিছু হয়ে গেলে আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না।

এমিলি হঠাৎ বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ল। এবারকার কথায় সে কোন অংশ গ্রহণ করল না। তার অত উৎসাহও কেমন যেন স্তিমিত হয়ে গেল। সে নিজেও বেশ একটু ঝিমিয়ে পড়ল অকস্মাৎ। এসব দেখে রুমি জানতে চাইল, কি হ'ল তোমার ?

না ব্যাপারটা ঠিক বোঝাতে পারছি না — এমিলি বলল। এবং সত্যিই সে সমস্যাটা বোঝাতে পারছিল না। তার নিজের দেশের সংস্কারমুক্ত অপেক্ষাকৃত উদার সমাজ ব্যবস্থায় যা সম্ভব এখানে তা, সম্ভব নয় এটা সে বুঝেছে। কেউ বাধা না দিলেও এখানে অনেক কিছু করা অসম্ভব যা ওখানে অনায়াসে করা যেতে পারে। এই বাধা যে কিসের সেটা বোঝাতে গিয়েই যত তার সমস্যা। আবার অজানাকে জানার যে আগ্রহ অপরিসীম তারই পাদপূরণের জন্যে মনের ঐকান্তিকতা। এই দুই-এর টানাপোড়েনে এমিলি বিব্রত বোধ করতে লাগল। ভাবল প্রসেনজিৎ-এর সঙ্গে পরামর্শ করবে কিন্তু তার সঙ্গে পরামর্শ করবার মুস্কিল এই যে সে সব বিষয়েই সায় দিয়ে বসে, কোন সময়েই নিজের মত কিছু বলে না। তাতে সমস্যা বাড়ে তো কমে না। কাজেই তার পরামর্শ চেয়ে লাভ নেই। বাকী রইল বিশ্বজিৎ। ইদানীং অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে সে, বোঝা যাচ্ছে বেশ প্রসন্ন মনের মানুষ সে, তার শান্ত স্বভাবের মধ্যে বুদ্ধির প্রখরতা চকচক করে। যদিও একটা আড়াল সে সবসময় তৈরী ক'রে রাখে তবু সেটুকু অতিক্রম ক'রে তার কাছে পৌঁছোতে পারলে ব্যবহার বন্ধুর মত স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত পর্যায়গুলোয় মন খুলেই কথা বলে এমিলির মনে হয়। অতএব ওর কাছেই জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে এবিষয়ে কি করণীয়। সৌগতদের সে বলল, আমি শুনেছি খুব পুরাণো বড় বড় বাড়ীগুলোতে ভূত থাকে —

অনেক বাড়ীতে তো থাকেই, সৌগত জানাল। তারপর বলল, সেরকম বাড়ীতে কেউ বাস ক'রতেই পারে না।

আচ্ছা ভূতগুলো কি রকম ?

আমিও তো দেখিনি, শুনেছি। সঙ্গী পেলে না হয় আমারও দেখা হয়ে যাবে। তবে শুনেছি পুরাণো বড় বাড়ীতে, গ্রামের দিকে শ্মশানে, বাঁশ গাছে, এইসব জায়গায় ভূত থাকে।

এমিলি খুব মনোযোগী ছাত্রের মত শুনতে লাগল। তার উৎসাহ প্ররোচিত ক'রছিল সেই সব বিস্ময়কর ঘটনার সান্নিধ্য পেতে। এ এক নতুন দিক — কল্যাণ যা কোনদিন বলে নি সেই রহস্যময় রোমাঞ্চকর শিহরণের সন্ধান সৌগত এনেছে। তবে এ এমন কিছু নয়। এদেশে প্রেতলোক, জন্মান্তর প্রভৃতি বিষয়ে যে সব ধারণা রয়েছে তার কিছু কিছু পরিচয় কাকার কাছে জেনেছে

'সে আগেই। তবে সে সবই বাচনিক, এখন যদি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আসে —

বিশ্বজিৎকে বলতে সে অতি নির্লিপ্তভাবে বলল, সৌগতর সঙ্গে আসল বন্ধুত্ব তো আমারই ছিল ?

তাই শুনেছি — এমিলি বলল।

তাহ'লে ও আমার বন্ধু — ?

তাই তো হওয়া উচিৎ।

তুমি আমার হয়ে ওকে বলো না আমাকে একদিন ভূত দেখতে নিয়ে চলুক ?

এমিলি একথার কোন প্রত্যুত্তর দিল না। আসলে বিশ্বজিৎ-এর এ ধরণের কথার সে কোন তাৎপর্য খুঁজে পেল না। কয়েক মুহূর্ত বাদে বিশ্বজিৎ নিজেই রহস্য উদ্ঘাটিত ক'রে দিল, একটা শয়তান। স্কাউন্ড্রেল। — কথাগুলো উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে বিশ্বজিৎ-এর মুখমণ্ডল যেন বদলে গেল। সুন্দর প্রশান্ত মুখের ওপর ফুটে উঠল এক হিংস্র বাঘ। সে যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠল, ওর মত নীচ-স্তরের জানোয়ারকে চাবুক মেরে মেরে ছিঁড়ে ফেলতে হয়। জ্যান্ত চামড়া ছাড়িয়ে নিতে হয় এমনি জানোয়ারগুলোর !

কথা শেষ ক'রে রাগে ফুসতে লাগল বিশ্বজিৎ। এমিলি তার এই আকস্মিক রাগ আর ভয়াবহ মূর্তি দেখে আঁতকে উঠল মনে মনে। ভাবল সৌগতর কথা এর কাছে না বললেই ভাল ছিল। সৌগতকে যখন অপছন্দ করে, তখন না বলাই উচিত ছিল। কিন্তু বিশ্বজিৎ যে এত রেগে উঠবে এমিলি ভাবতে পারে নি। কি যে করা উচিত ভেবে ঠিক ক'রতে পারল না সে। চুপ ক'রে থেকে অপেক্ষা ক'রতে লাগল অনেকটা অসহায় আতঙ্কে।

অপেক্ষাকৃত শান্ত হ'ল বিশ্বজিৎ কিন্তু তখনও তার চোখে-মুখে তীব্র ঘৃণার অভিব্যক্তি ফুটে আছে। তবে কিছু শান্তভাবে ঘৃণামিশ্রিত স্বরে সে বলল, ওকে কখনও বিশ্বাস ক'রো না। ও মিথ্যে কথা বলে তোমাকে ঠকাতে চায়। আমার মনে হয় তোমার প্রতি ওর লোভ হচ্ছে। ও — ও — তোমাকে — তোমার ওপরে সুযোগ নিতে চায়। — শেষ কথাগুলো যেন অনেক জড়তা কাটাতে কাটাতে সে বলে শেষ ক'রল কোন রকমে।

এবার এমিলির কথা বন্ধ হয়ে গেল। বলে কি বিশ্বজিৎ !

বিশ্বজিৎ-এর কথা তখনও চলছে, ও একটা এমনই নীচস্তরের মানুষ যে এমন লোকের সামনে তুমি হয়ত জীবনেও আস নি ; তাই তুমি ওকে বুঝতে পারবে না। ও একটা জীবন্ত পাপ। এই পৃথিবী থেকে ওর মত মানুষ-গুলোকে না সরিয়ে দিলে সরল মানুষেরা এখানে চিরদিনই বঞ্চিত আর প্রতারিত হতে থাকবে। সভ্য সমাজের আইন এদের সঙ্গে বিরোধিতা করে না বলেই এরা স্বচ্ছন্দে আরামে বসে যত অপকর্ম ক'রে যায়। এদের জন্যে উচিত জনতার আদালত খুলে যাদের এরা প্রবঞ্চিত ক'রেছে তাদের

দিয়ে বিচার করানো এবং শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু। — এমন নির্মম দৃঢ় স্বরে বিশ্বজিৎ কথাগুলো বলছিল যে এমিলির কানে বজ্রপাতের শব্দের মত বাজল। সে থামলে এমিলি বিভ্রান্ত বিস্ময়ে আঁতকে উঠল, তুমি কি বলছ!

ঠিকই বলছি আমি, অতি শান্ত স্বরে বিশ্বজিৎ জবাব দিল। পুনরায় বলল, লোভ ওকে এত নিচে নামিয়েছে যে আপন পর জ্ঞান আর নেই। ওর অনেক অতীত দিনের এমন অনেক কাজের আমি খবর রাখি যা দিয়ে ওর গোটা ভবিষ্যৎ আমি হিসেব ক'রতে পারি। আর বর্তমানে ওর চলা ফেরা সম্পর্কে কিছু কিছু আমার জানা আছে। নিজের প্রবৃত্তিগত লোভ চরিতার্থ করবার জন্যেই ও নিজেদের বাড়ী ছেড়ে পার্ক স্ট্রীট এলাকায় ফ্লাট ভাড়া ক'রে বাস ক'রছে।

রুমি এসব জানে না? — এমিলি অনেকটা বিস্ময়ই প্রকাশ ক'রল।

বিশ্বজিৎ সে কথার কোন উত্তর দিল না। এমিলি আবার প্রশ্ন ক'রল, জবাব দিচ্ছ না কেন?

তোমাদের দেশে হ'লে এটা কি এমন কোন অপরাধ হ'ত?

না — সামান্য থেমে এমিলি বলল, যা তুমি বলছ এটা সব দেশেই অপরাধ।

আমাদের দেশের পাশ্চাত্য চিন্তার বাবুদের ধারণা ওসব দেশে এসব চলে, অন্যায় নয়। অতএব তাদের মধ্যেও এগুলো অন্যায় নয় বলে ধরে নেবার চেষ্টা চলছে। তাছাড়া চরিত্র বলে শব্দটাকে আজকাল গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে দেখছি।

এমিলি শুনে চুপ ক'রে রইল, বক্তা নিজেও চুপ ক'রে রইল। এমিলি তখন ভাবছিল বিশ্বজিৎ-এর কথা কতদূর সত্যি হ'তে পারে? একটা কথা স্পষ্ট যে বিশ্বজিৎ সৌগতকে পছন্দ করে না, তার হয়ত কোন বিশেষ কারণ থাকতে পারে, হয়ত হতে পারে সে বন্ধুদের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে রেষা-রেষি, তা থেকেও তো এরকম সম্পর্কের উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে? আর সে জন্যেও তো সৌগতর নামে অপবাদ দিতে পারে বিশ্বজিৎ? সৌগত যদি এমনই খারাপ হবে তাহ'লে কি রুমি জানবে না? আর এত জেনেও কি রুমি চেষ্টা ক'রবে না কোন প্রতিকারের? বোধহয় কথাগুলো সমস্ত সত্য নয় কারণ যে তীব্র ঘৃণায় বিশ্বজিৎ কথাগুলো বলছিল তা বিদ্বেষরই নামান্তর মাত্র। এবং সেই বিদ্বেষ ব্যক্তিগত। সৌগত খারাপ হতে পারে তবে অত খারাপ নয়। তার নিজেরও তো বিশেষ পছন্দ হয় না সৌগতকে, কিন্তু সে তো নিজেও জানে অকারণ! এমনি অকারণেই যদি কাউকে কেউ অপছন্দ ক'রতে পারে তবে ব্যক্তিগত কারণে বিদ্বিষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

আসলে মানুষকে খারাপ বলে ভাবতে পারেনা এমিলি। কোন মানুষকেই নয়। কল্যাণ নিঃশব্দে চলে আসবার পর তীব্র জ্বালায় তার সম্বন্ধে অনেক কটু কথা ভাবতে চেষ্টা ক'রেছিল প্রথম দিকে তারপর আবার নিজেই খতিয়ে

দেখে অন্য সিদ্ধান্ত ক'রেছে। অনুমান ক'রতে চেষ্টা ক'রেছে কেন সে এভাবে চলে এল, এখনও প্রতিমুহূর্তে ব্যাগ্র চোখে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই কল্যাণকে, দেখা হ'লে একটা কথাই সে শুধু জেনে নেবে কেন সে তাকে না বলে চলে এসেছিল? সে কি বন্ধন এড়াতে? এখানে কি কোন বাগদত্তা তার জন্যে প্রতীক্ষিতা ছিল? তবে সে কথা এত কথার মধ্যে একবারও জানায় নি কেন কল্যাণ? নইলে নিশ্চয়ই অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে যা জানা যায়নি।

ভাবতে ভাবতে এমিলির মনে আবার অন্য ভাবনা এল। বিশ্বজিৎকে এতদিন সে যেমন দেখছে তাতে ওর মনে এত তীব্র ব্যক্তিগত বিদ্বেস থাকতে পারে বলে মনেই হয় না। সৌগতর একসময়কার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও, হয়ত সত্যিই তার মধ্যে এমন কিছু পেয়েছে যার জন্যে ওর মত ছেলে তার কাছ থেকে সরে এসেছে। নইলে এ যদি নেহাৎ ব্যক্তিস্বার্থের সংঘাত হ'ত তাহ'লে অন্যভাবে প্রতিঘাত করার চেষ্টা নিশ্চয়ই ক'রত বিশ্বজিৎ। এভাবে সৌগতর প্রতি ঘৃণা পোষণ ক'রে চুপচাপ বসে থাকত না। ব্যাপারটা বোঝবার জন্যেই সে বলল, যদি এতই খারাপ লোক তাহ'লে রুমি তো তোমারই ছোট বোন, কেন তাকে বলছ না?

বিশ্বজিৎ বসেছিল খাটে বসে-থাকা এমিলির দিকে পেছন ক'রে রাখা একটা চেয়ারে, তার দিকে পেছন ফিরে। এবার সে তার সামনের টেবিলের দেরাজ থেকে একটা ব্লেড বের ক'রে নিয়ে হাতের পেন্সিলটা কাটতে কাটতে অত্যন্ত অবহেলায় বলল, এবাড়ীর শৃংখলা তাতে নষ্ট হবে। কেউ কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা দেবে এটা এখানে অপছন্দের।

কারও ক্ষতি দেখলেও না? — এমিলি জানতে চাইল।

সর্তটা সেই রকমই গড়ে উঠেছে। — অত্যন্ত শীতল জবাব বিশ্বজিৎ-এর।

তা হোক, তবু তোমার বলা উচিৎ।

কথাটা শুনেই ঘুরে বসল বিশ্বজিৎ, তীব্র স্বরে জানতে চাইল, অপমানিত হবার জন্যে?

আকস্মিকতায় এমিলি চমকে উঠল। তারপর পরিবেশকে আত্মস্থ ক'রে জানতে চাইল, অপমান কেন?

আগের মুহূর্তের উত্তেজিৎ হয়ে ওঠার সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে, খুবই শীতল স্বরে বিশ্বজিৎ বলল, তুমি অত বুঝবে না। থাক ওসব না বোঝাই ভাল। একটু থেমে সে আবার বলতে সুরু ক'রল, বেশ তো আছ, থাক না। কি দরকার, যার ব্যাপার তাকেই ভাবতে দাও।

এমিলি তখনই কোন কথা বলল না। কিছুক্ষণ ভেবে সে বলল, কি জানি কেন যে ইচ্ছে হয় —

কি ইচ্ছে?

দুহাত ছড়িয়ে এমিলি বলল, এই সবার সঙ্গে মিশে যাই।

বিশ্বজিৎ একথার প্রত্যুত্তর ক'রল না। তার এই মিশে যাওয়া ব্যাপারটা ঠিক

ধরতে পারল না বিশ্বজিৎ। এবাড়ীর পরিবেশ-এই তার জন্ম, এই অবস্থার মধ্যেই তার গড়ে ওঠা তাই সে এমিলির মিশে যাওয়াটা বুঝতে পারে না। কেবলমাত্র স্বভাবজাত সামাজিক বুদ্ধির বশে অতীতে সে রুমির ভবিষ্যৎ চিন্তায় সৌগত-প্রসঙ্গ এনে ফেলে দেখেছে, মায়ের কাছে সে কথা সুখকর হয়নি তাই সে বুঝেছে ব্যাপারটা যার একমাত্র তারই আছে সম্পর্কিত ব্যাপারে ভাবনার অধিকার। অন্য কিছু এবাড়ীতে স্বীকৃত নয়। এমিলি নামক এই মহিলাটির আগ্রহও তাই অরণ্যে রোদন হবে, নয়ত এমনও হ'তে পারে সে অপমানিতই হবে কথাটা উঠলে। কি তার প্রয়োজন? একটা জিনিষ বিলক্ষণ বোঝা গেছে মেয়েটি মাকিন দেশের একটি সাধারণ মেয়েই বটে, কোন গুপ্তচর প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়ে আসে নি। সকলের সঙ্গে মেলামেশা যে ক'রতে চায় সেটা নেহাৎই তার ব্যক্তিগত আগ্রহের দায়। অতএব শুধু শুধু তাকে আহত হ'তে দিয়ে কি লাভ? বরং সহানুভূতি জানিয়ে বলল, মানুষের স্বভাব কি জান? সব সময় তোমার সহানুভূতির মূল্য তারা দেবে না। আরও বিস্ময়কর এই যে অনেক সময় সহানুভূতির জবাবে মানুষ করে আঘাত।

এমিলি কথাগুলো শুনল। কোনই জবাব দিল না। সে যেন কল্যাণের স্বর বিশ্বজিৎ-এর কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছিল, অন্তত কথাগুলো তো নিশ্চয়ই কল্যাণের মত। সেই রকম আন্তরিক স্বরে উপলব্ধির গভীর কথাগুলো হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে সজীব বাতাসের মত বেরিয়ে আসছে আপন প্রাণের বেগে। এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে কল্যাণ আর বিশ্বজিৎ যেন একাকার হয়ে গেছে। গরমের মরশুমে ডেলায়ার নদীর ধারে যেমন হালকা বাতাস বয় সেই বাতাসের মত কথাগুলো ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে তার মনের ওপর দিয়ে। উন্মনা হয়ে গেল এমিলি। কোন কথা না বলে চুপ করেই বসে রইল।

বিশ্বজিৎ এমন মনোযোগ দিয়ে পেন্সিল কাটতে লাগল যেন এমিলির অবস্থিতি সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। একটু আগেও যে দুজন মানুষ এ ঘরে কথা বলছিল বা অন্য একজন মানুষ যে ঘরের মধ্যে আছে এদুটোই তার অগোচরে। পরম নির্লিপ্তভাবে আপন কাজ ক'রে যাচ্ছিল সে। এমিলি তার মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল কল্যাণ সত্যিই বলত এদেশে পারিবারিক সম্পর্কগুলো মনোরম। এই তো সামনেই যে বসে আছে বিশ্বজিৎ একে নিজের ছোটভাই বলে ভাবতে কি ভালই যে তার লাগছে — আবার একটু আগেই যখন পরামর্শ দিচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল বন্ধু। এই যে একই সম্পর্কের মধ্যে বহু সম্পর্কের প্রকাশ এ সত্যিই সুন্দর। কল্যাণ বলেছিল, আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা গেছে বড়ভাই-এর স্ত্রী মায়ের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকে, কখনও বড় বোনের কখনও বন্ধুর আবার কোন কোন অবস্থায় ছোট বোনের ভূমিকাও হয়ে পড়ে এই বউদিদের। কথাটা শোনা ছিল মাত্র, কিছুটা এখন উপলব্ধি হচ্ছে বিশ্বজিৎ-এর সঙ্গে মিশতে পেরে।

এইসব আকাশ পাতাল ভেবে সে বিশ্বজিৎকে আবার জিজ্ঞেস ক'রল, দেখ ভাই এখানে কেমন যেন বদ্ধ বদ্ধ ভাব। কোথাও বেরোতে পারি না, সন্ধ্যে হলেই বাড়ী ফিরে আসতে হয়, রোজ কাগজে দুচারটে খুনের খবর — মানুষ সব সময় যেন ভয়ে ভয়ে আছে — এরকম কেন হচ্ছে?

বিশ্বজিৎ পেন্সিলটা নামিয়ে স্কেলটা গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল, এসময় এদেশে এলে কেন? সময়টা ভাল হয় নি।

কেন?

এই যে অসুবিধেয় পড়েছ —

অসুবিধে — সত্যি বলতে কি আমার বিশেষ মনে হচ্ছিল না — কাকা এসে বেশী মনে হচ্ছে।

এটা তাহ'লে তোমার হচ্ছে না, কাকার হচ্ছে?

কাকা আসাতে বাইরে বেরোবার স্বাধীনতা বেশী দরকারী হয়ে পড়েছে কিনা, তাই ব্যাপারটা বেশী ক'রে বোঝা যাচ্ছে।

বাবা তো দেখছি তোমার কাকার জন্যে আলাদা সিকিউরিটির ব্যবস্থা ক'রেছেন, তবে আবার অসুবিধে কিসের? সিকিউরিটির লোকটা বোকা। সে যদি গাইড-এর কাজটা ক'রতে পারত তাহ'লে আর এই অস্বস্তি হ'ত না তোমার কাকার।

কথাটা মনে ধরল এমিলির, বলল, ঠিক বলেছ। আসলে মানুষের যদি মনে হয় যে তার চারপাশে বেড়া দেওয়া আছে তাহ'লে কিছুতেই তার ভাল লাগতে পারে না। অবাধে চলাফেরা ক'রতে না পারাই চারপাশে ঘেরা থাকার মত।

বিশ্বজিৎ বলল, পুলিশ আজ এমনই সন্ত্রাস সৃষ্টি ক'রে রেখেছে যে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই আতংকিত হয়ে পড়ছে।

আমি তো ব্যাপার কি হচ্ছে ভালভাবে জানি না, তবে আমি যা শুনছি তাতে তো গুণ্ডারাই এরকম ক'রে তুলেছে বলেই পুলিশকে কড়া হতে হচ্ছে।

কে বলল তোমাকে?

বাবা সেদিন খাবার টেবিলে বসে বলছিলেন।

ও — এই টুকুই মাত্র শব্দ ক'রল বিশ্বজিৎ, তারপর বেশ কিছুক্ষণের নীরবতার পর বলল, বাবা তাঁদের শাসনব্যবস্থার পক্ষে সাফাই গাইলেন আর কি—

কেন?

এর মধ্যে গুণ্ডাদের কোন ভূমিকা আছে বলে আমার তো মনে হয় না —

কেন? এই যে কাটাকাটি খুনোখুনি হচ্ছে — ?

প্রথমটায় বিশ্বজিৎ কোন জবাব দিল না, তারপর বলল, ব্যাপারটা রাজনীতির। অনেকই জটিল। এ নিয়ে বিভিন্ন মানুষের আলাদা মত থাকবে, আলোচনার স্থান এটা নয় কারণ এখানে এসব প্রসঙ্গ আমাদের মধ্যে অবান্তর।

এমিলিরও এই সব আলোচনায় আগ্রহ তেমন থাকে না তাই বিশ্বজিৎ-এর প্রস্তাব মেনে নিয়ে বলল, তুমি বরং একটা কথা বল।

কি কথা ?

আসলে কাকা এদেশে এসেছেন তাঁর নিজের চিন্তাধারা নিয়ে। সেটা হচ্ছে উনি মনে মনে এদেশের যে ছবি এঁকে রেখেছেন তাতে এখানে সেই গুরুকুল আশ্রম, ঋষিদের তপোবন সবই এখনও আছে। এদেশটাকে ওনার বনময় প্রকৃতি রাজ্য বলেই বিশেষ ভাল লাগে। যদিও বর্তমান কালের ইতিহাস জানেন কিন্তু ওঁর সেই অতীতের স্বপ্ন কিছুতেই কাটে না।

কথাগুলো শুনতে শুনতে বিশ্বজিৎ সরাসরি এমিলির মুখের দিকে তাকাল। তার মনে হ'ল এতদিন সে ভাল ক'রে দ্যাখে-ই নি এমিলিকে। বস্তুত এমন সরল মুখ সে পৃথিবীতে আর দ্যাখে নি ! কথাগুলো না বিশ্বাস ক'রে সে পারল না। সে সহানুভূতির সঙ্গেই বলল, বাইরে থেকে যে রূপ দেখা যায় অনেকসময় আসল রূপ সেটা হয় না। প্রায়শ আসল রূপ ভিন্নই হয়ে থাকে। কাজেই একথাও সত্য যে তোমরা বাইরে থেকে যে ভারতবর্ষ কল্পনা কর আসল দেশটির থেকে পার্থক্য তার অনেক। বৈদিক যুগে এদেশ কেমন ছিল ঠিক জানি না, ভাল ছিল কি মন্দ ছিল তাও এখন কল্পিত হিসেব মাত্র। তবে বর্তমানের সঙ্গে তার মিল নেই একবিন্দুও।

এখানে কাকার একদম ভাল লাগছে না।

লাগবার কথাও নয়। কারণ তোমাদের দেশের যে কোন অখ্যাত শহরে বোধহয় তোমরা অনেক বেশী সুখের উপকরণ পাও।

না ঠিক তার জন্যে নয় — আসলে এখানে উনি মন খুলে চলাফেরা ক'রতে পারছেন না।

সে তো বটেই —

তাই সবাই ওনাকে বলছে দিল্লী হরিদ্বার ওইদিকে মুশৌরী আরও কিসব জায়গা আছে সেগুলো দেখে আসতে। বলছে সেদিকে নাকি ওঁর মনের মত পরিবেশ পেতে পারেন।

বিশ্বজিৎ শুনে চুপ ক'রে রইল।

এমিলি জানতে চাইল, তুমি কি বল ?

আমি এবিষয়ে কিছু বলতে পারি না, কারণ আমি দেশগুলো দেখিওনি তাছাড়া উনি কি চান তাও সঠিক জানি না। তবে — বলতে পারি ভারতবর্ষ তো এইটুকুই নয়। এসেছেন যখন সবদিকেই দেখুন।

ওসব দিকে নাকি এরকম গোলমাল নেই —

সেটা ঠিক। এতটা লড়াই নেই কোথাও।

লড়াই মানে ? কোথায় লড়াই ?

ও এমনি বলছিলাম আর কি — বলে নিজের হঠাৎ বলে ফেলা কথা

চাপা দিতে চাইল বিশ্বজিৎ।

এমিলি হঠাৎ খুশী হয়ে বলে উঠল, জান আমিও যাচ্ছি কিন্তু —

বাঃ ঘুরে এস। দাদাও যাবে নাকি ?

না। ও তো ছুটি পাবে না —

তাহ'লে সঙ্গে কে যাবে ?

কেউ যাবে না। আমি আর কাকা।

ভাষা বুঝতে একটু অসুবিধে হবে আর কি —।

হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল এমিলি, ছেলেমানুষের মত বলল, আমি অনেক দিন এই কথাটা ভেবেছি, আচ্ছা পৃথিবীর সব মানুষের ভাষা এক হ'ল না কেন বল তো ?

একথার কি জবাব দেবে ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেল বিশ্বজিৎ-এর। এইরকম উৎকট প্রশ্ন একমাত্র পাগলেরা ক'রতে পারে বলেই তার মনে হ'ল। এমিলির প্রশ্ন শুনে সে চুপ ক'রে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, একথার উত্তর আমার জানা নেই।

কিন্তু এই নিষ্প্রভ জবাবে নিরুৎসাহ হবার পাত্রী এমিলি নয়। সমান উৎসাহে সে বলল, সমস্ত লোকের ভাষা এক হ'লে কারও কথা বুঝতে কারও অসুবিধে হ'ত না। কত সুন্দর হ'ত বল তো ?

প্রলাপে অংশ গ্রহণ অনিচ্ছার বলেই বিশ্বজিৎ সংক্ষেপে সারল, হয়ত হ'ত।

এবারও দমল না এমিলি, নিজের চিন্তাপ্রসূত কথাগুলো আপন মনেই বলে চলল, বৈচিত্র্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে বৈচিত্র্য ভাল, যেখানে দরকার নেই সেখানেও যে কেন ভগবান আলাদা ক'রেছেন বুঝি না।

বিশ্বজিৎ রহস্য ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রল, তুমি আর তোমার ভগবান দুজন তো নিশ্চয়ই একই রকম বুদ্ধি রাখ ?

তা কি ক'রে হবে ? — বলে পরম শ্রদ্ধায় দুই হাত নেড়ে ভগবানের বিশালতা বোঝাবার প্রচেষ্টা সহযোগে বলল, ভগবান এই সবকিছুর সৃষ্টি ক'রেছেন —

তার কথা কেড়ে নিয়ে বিশ্বজিৎ বলল, তাহ'লে সেই লোকের কাজের কারণ তুমি কি ক'রে বুঝবে বল ?

এতক্ষণে যেন এক বিরাট রহস্যের উদ্‌ঘাটন হ'ল এমনিভাবে এমিলি বলল, ঠিক বলেছ। তাঁর কাজের কারণ বোঝা আমাদের কি সাধ্য ?

বিশ্বজিৎ এমিলির এই সংস্কারপন্থী মনোভাব সহ্য ক'রতে পারছিল না। সে চাইল এমিলি এবার যাক। তাই সে সমস্ত আলোচনায় ছেদ টানবার জন্যে বলল, কবে যাচ্ছ ? কিসে যাবে ?

এখনও ঠিক হয়নি। কাকাকে বরং বলি যে ওদিক থেকে ঘুরে এসে কলকাতা ভালভাবে দেখানো যাবে।

সেই ভাল। ঘুরেই এস — বলেই নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপরই বলল, আমি একটু কলঘরে যাচ্ছি।

এমিলিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, বলল, তোমার অনেকটা সময় নষ্ট ক'রে দিলাম —।

না। কিছু নয় — বলেই বিশ্বজিৎ বেরিয়ে গেল।

এমিলি বাইরে বেরোবার সময় দরজাটা টেনে বন্ধ ক'রে দিল।

সিদ্ধান্ত ক'রতেই যা সময় লেগেছিল, কার্যকর ক'রতে সময় সামান্যই লাগল। প্রসেনজিৎ এদেশের হালচাল কিছুই জানে না, তাকে মাথা ঘামাতেও হ'ল না পরীক্ষিৎ অদৃশ্য হাতে সব ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন। প্রসেনজিৎ এল শুধু স্টেশনে। পরীক্ষিৎ, সুপ্রীতি, রুমি, প্রসেনজিৎ এমন কি সৌগত পর্যন্ত এল ট্রেনে তুলে দিতে। বিশ্বজিৎ আসবে না এমিলি জানত কিন্তু তার মনের মধ্যে খুবই ইচ্ছে ছিল সে আসুক। স্টেশনে চারপাশে চেয়ে দেখল কোথাও তাকে দেখা যায় কিনা! এই অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে তার মনে হ'তে লাগল পাশের মানুষটির মুখ দেখতে পাওয়াই কষ্টকর দূরের মানুষকে দেখা যাবে কি ক'রে। এত মানুষ একসঙ্গে তার জীবনে কখনও দেখেনি বলে এমিলির মনে হ'ল। অথচ এর মধ্যে তার প্রার্থিত মুখ — হঠাৎ মনে পড়ে গেল কল্যাণের কথা। আচ্ছা এই অজস্র মানুষের ভিড়ে হঠাৎ যদি কল্যাণকে দেখা যায়! হতেও তো পারে! এটা যেহেতু স্টেশন সে তো চলতি পথে আসতেও পারে এখানে। এটা তো হাওড়া স্টেশন, প্রসেনজিৎকে জিজ্ঞাসা ক'রল মেদিনীপুরের ট্রেন কি এই স্টেশনে আসে? প্রসেনজিৎ জবাব দেবার আগেই কথাটা শুনতে পেয়ে সৌগত বলল, হ্যাঁ। এখান থেকেই মেদিনীপুর-এর ট্রেন যাতায়াত করে।

এমিলির বুকের মধ্যে হঠাৎ রক্ত চঞ্চল হ'ল। ধপ ক'রে জ্বলে উঠল যেন একটা প্রদীপ। দূর পর্যন্ত দেখতে চেষ্টা ক'রে সামনেই আটকে গেল। প্লাটফর্মের নম্বর চোখে পড়াতে বুঝল এই স্টেশন বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো অথচ সামান্য একটা প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তারা। এই সামান্য অংশটুকুতে যত লোক তাতে পুরো স্টেশনে কত লোকই না আছে! এর মধ্যে যদি কল্যাণ থাকেও তো কেউ দেখতে পাবে না কাউকে। মন কিন্তু শান্ত হয় না বলেই অসম্ভব জেনেও চোখ চারিদিকে খুঁজতে থাকে যদি দেখা যায় সেই পরিচিত মুখ। সৌগতই কথা বলার সুযোগ পেয়ে জানতে চাইল, হঠাৎ মেদিনীপুরের কথা কেন বললেন?

আমার এক বন্ধুর বাড়ী ওখানে। ঠিকানা জানি না, এমিলি অকপট সরলতায় বলল। প্রসেনজিৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল চিন্তায়। সে ভাবছিল

ওই বিদেশে একদম অপরিচিত এমিলির কোন অসুবিধে হবে কিনা। বাবা অবশ্য সাধ্যমত ব্যবস্থা ক'রেছেন। নতুন-দিল্লী স্টেশনে আসবার জন্যে তাঁর বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোককে পাকাপাকি রাজী করিয়েছেন, এখানে তাঁর পরিচিত এক শিল্পপতি দিল্লীর অফিসে খবর দিয়ে রেখেছেন এমিলিদের দেখাশোনা করবার জন্যে, ওখানে হোটেল-এর ব্যবস্থাও হয়েই আছে। কিন্তু তারপর? দিল্লীর পরবর্তী জায়গাগুলোর কারও কথাই এরা বুঝবে না, এদের কথা বোঝবার [illegible]ও ও অঞ্চলে কমই জুটবে। তা ছাড়া সে নিজেও জানে না সেইসব জায়গাগুলো কিরকম। কি অবস্থার মধ্যে যে এরা গিয়ে পড়বে সেই ভাবনাতেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল প্রসেনজিৎ। এমিলির সেদিকে নজর পড়ল। মুখ দেখেই সে বুঝতে পারল, বলল, অকারণ চিন্তা ক'রো না। আমরা ভালই থাকব। তুমি যদি ছুটি পাও চলে এসো না দুচারদিনের জন্যে।

প্রসেনজিৎ খুবই ধীরে জবাব দিল, চেষ্টা ক'রব।

তার মনটাকে হালকা করবার জন্যে এমিলি রুমিকে বলল, তুমি গেলে কত ভাল হ'ত বল তো? খুব আনন্দ হ'ত।

সৌগত বলল, তুমি যে কেন রাজী হ'লে না আমি বুঝি না।

রুমি কিছু বলল না। এমিলি তাকে যাবার জন্যে বিশেষ পীড়াপীড়ি ক'রেছিল, এমিলির কাকাও বেশ কয়েকবার বলেছিলেন, মা-ও বলেছিলেন যাবার জন্যে, বলেছিলেন, যা না! মুসৌরী — দেরাদুন খুব ভাল জায়গা। খুব ভাল লাগবে। আমরা সেই কবে গেছি — এখন না জানি আরও কত ভাল হয়েছে। — কিছুতেই উৎসাহ পায়নি রুমি। ইদানীং তার কেমন যেন মনে হচ্ছে সৌগতকে ছেড়ে থাকাটা ভাল হবে না। শুধু এই দূর দেশে যাবার জন্যেই নয়, দৈনন্দিন জীবনেও তার মনে হয় সর্বক্ষণ সৌগতর কাছে কাছেই থাকে। আগে কোন কোন দিন সৌগতর সঙ্গে দেখা না হ'লেও কিছু মনে হ'ত না। আজকাল চলে না। একদিন সৌগত না এলে বা সৌগতর সঙ্গে দেখা না হ'লে মনে হয় কি যেন একটা ক্ষতি হয়ে গেল। তার অজান্তে কি যেন একটা ঘটে যাচ্ছে, সেই ঘটনা তাকে নিশ্চিত ক্ষতির মুখে নিয়ে গিয়ে ফেলছে। এই আশংকা নিয়েই সে অহরহ অশান্তির সঙ্গে যাপন ক'রেছে বিগত কয়েকটি দিন রাত্রি। তার এই আশংকার উৎস সে নিজেও জানে না, গত কয়েক বছর ধরে যে সৌগতর সঙ্গে তার পরিচয় সেই সৌগতর মধ্যে কোন যে পরিবর্তন হয়েছে এমনও তার মনে হয় না তবু এই অহেতুক আশংকা তার বুকের মধ্যে অনড় হয়ে বসে থাকে, ভারী ক'রে রাখে সমস্ত মন, অস্বস্তিতে ভরিয়ে রাখে অনেক সুন্দর প্রহর। কতবার সে নিজেই ভেবেছে এই ভার সরিয়ে সে সহজ স্বাভাবিক হবে, পারে নি। সেই ভাবনাটা আপনা থেকেই এসে জাঁকিয়ে বসেছে, নিজের থেকে না সরলে তাকে সরাতে পারছে না সে কিছুতেই। আর এই আশংকাতেই সে কোথাও যেতে পারে না আজকাল, বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে পর্য্যন্ত

নয়। আগে কখনও একা বেরিয়ে কোন বন্ধুকে ডেকে নিয়ে সিনেমায় চলে যেত, নয়ত মাকে রাজী করিয়ে কোন দুপুর বেলা মাকে সঙ্গী করেই বেরিয়ে পড়ত চৌরঙ্গী পাড়ায় জিনিষপত্র কেনবার ভণিতায়। আজকাল তাও বেরোয় না। সব বন্ধ ক'রে ঘরের মধ্যে বসে থাকে পাছে সৌগত এসে ফিরে যায় সেই ভয়ে। সৌ[illegible] [illegible]বারে এসে ফিরে গেলেই তার যেন সমূহ ক্ষতি হয়ে যাবে এইরকম এ[illegible] কারণ শংকা তার মনে। অথচ আগেও তো কত বার ফিরেছে সৌগত, নয়ত [illegible] থেকেছে তার অপেক্ষায় — এসব স্মৃতি তাকে এখন আর সাহায্য করে না। অস্বাভাবিক এক শংকা চারদিকে অলক্ষ্য পাঁচিল তুলে তাকে আটকে রাখে।

একথা কাউকে বলা যায় না। কারও সঙ্গে আলোচনা করা যায় না। হয়ত সামান্য কিছু পরিবর্তন, যা খুব সূক্ষ্ম, নজরে পড়ে সৌগতর। সে আসল প্রশ্ন এড়িয়ে আরেঠারে এমন কথা বলে যার সরাসরি জবাব দেওয়া যায় না, অথচ মনের কথাটা মুখ ফুটে বলতেও পারে না সে সৌগতকে। তা ছাড়া চাপা একটা অভিমান তাকে সজাগ ক'রে রাখে — যে কথা অনেকবার বলা হয়েছে, যা করণীয় বলে সৌগত নিজেও বেশ ভালভাবেই জানে, তাকে এড়িয়ে যাওয়া উদ্দেশ্যমূলক ছাড়া কি হতে পারে? অথচ এই এড়িয়ে যাওয়ার কারণটা যে কি সেই কথাটাই বোধগম্য হয় না রুমির। কখনও কখনও ভাবে যে সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করে সে এ বিয়ে ভেঙ্গে দিতে চায় কিনা, সাহস হয় না। সত্যিই যদি সৌগত বলে বসে যে সে ভেঙ্গে দিতে চায়, কি হবে তাহ'লে? রুমি ভাবতে পারে না। ভাবতে গেলে তার শরীরের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। সে এক এমন ভাবই হয় যে রুমি সহ্য ক'রতে পারে না। আসলে সে যেন এক রূঢ় সত্যকে আড়াল ক'রে চলতে চেষ্টা ক'রছে।

একথা সে কাকে বলবে আর কীই বা জবাব দেবে সে সৌজন্যমূলক প্রশ্নগুলোর। সবাই বলছে গেলে ভাল হ'ত। সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে নিশ্চয়ই হ'ত, এখন নয়। নানা জনে নানা রকম ভাবছে, তার জবাব না দেবার অর্থও হয়ত রকম রকম করবে যে যার ইচ্ছা মত, তাতে তার বিচলিত হবার উপায় নেই। বিশেষ ক'রে ছোটদার কথাগুলো তার মনে আছে, সেই তীব্র কথাগুলো অপমানের মতই বিঁধেছিল তার। সরাসরি তাকে বলে নি তবে তার সম্পর্কেই সতর্কবাণী। সে অনেকদিন আগে হলেও মনে আছে এখন পর্যন্ত, আর মনে আছে ছোটদার ঘৃণা। সেই ঘৃণা উপেক্ষা প্রভৃতি যা তার আর সৌগতর প্রতি সব সময় জ্বালিয়ে রেখেছে বিশ্বজিৎ, যেগুলোকে সে নিজেও উপেক্ষা ক'রে চলতে চায়। সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। তার মনে হয় সে যদি হারে তাহ'লে আত্মহত্যা ছাড়া তার আর লজ্জা ঢাকবার উপায় থাকবে না। অতএব জিততে তাকে হবেই। ছোটদার কাছে মুখ দেখানোর দায়টাও নিজের গ্লানির চেয়ে কম নয়। তার আরও কারণ বিশ্বজিৎ এক কঠিন

মানসিকতার মানুষ। শক্ত সে চিরদিনই ইদানীং আরও যেন বেশী কঠিন হয়ে পড়েছে। কারও সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ না বললেও মাঝে মাঝে যা বলে ফেলে তার সব অর্থ বোঝা যায় না যেটুকু বোঝা যায় তা বড় সাংঘাতিক। সাধারণ একটা ঘটনার কথা বাড়ীর সকলে ভুলে গেলেও রুমি জীবনে কোনদিন ভুলবে না। বছর দুয়েক আগের ঘটনা। কে একজন বিরাট একটা মাছ আর অনেক মিষ্টি পাঠিয়েছিল বাড়ীতে। বাবাকে ভেট। বিশ্বজিৎ দেখেছিল। সেদিন দুপুরে খাবার টেবিলে বসে মাছ নেয়নি সে। মা মাছ খেতে বললে শুধু একটু আপত্তি জানিয়েছিল। মা সকলকে শোনাতে আপন মনেই বললেন, এমন মাছ আজকাল পাওয়াই যায় না খেয়ে দেখা উচিত। সে পরামর্শ গ্রাহ্য ক'রল না বিশ্বজিৎ। রুমির সহ্য হ'ল না। সে বলল, তুমি ছোটদা ঠকলে।

কেন ? — ডাল মাখা ভাত পরম তৃপ্তিতে মুখে তুলতে তুলতে জানতে চেয়েছিল বিশ্বজিৎ।

এমন মাছ খেয়ে দেখলে না ! এর স্বাদই আলাদা। এতই মাছ তো রোজ বাড়ীতে আসে এমন মাছ যেন কোনদিন খাইনি !

এবার বিশ্বজিৎ তীব্র শব্দগুলো উচ্চারণ ক'রেছিল, ঘুষের মাছ সকলের কাছে সুস্বাদু লাগে না।

ঘুষের মাছ ! — সুপ্রীতি বেশ দৃঢ়ভাবে বলে উঠেছিলেন। পরক্ষণেই প্রশ্ন ক'রেছিলেন, এটা কি ধরণের কথা বিশ্ব ?

বিশ্বজিৎ অনর্থক কথা না বাড়িয়ে আপন মনে খেতে লাগল। কিন্তু কথাটা মাকে এমনই আঘাত ক'রেছিল যে তিনি থামলেন না, আবার বললেন, তোমার মত শিক্ষিত ছেলের মুখে এ ধরণের কথা শুনতে হবে !

বিশ্বজিৎ চুপ ক'রে থাকবে ভেবেছিল, ব্যাপারটা এগোতে না দেবার জন্যে বলল, এটা রুমির সঙ্গে আমার কথা। তুমি না শুনলেও তো পারতে ! অত গুরুত্ব দিয়ো না, মিটে যাবে।

অত সহজে মেটবার মত কথা তুমি বলনি ! তা ছাড়া কথাটায় তুমি কি নিজের বাবাকেই অপমান ক'রলে না ?

ব্যস্‌। বিশ্বজিৎ এতক্ষণ যে প্রশান্তি নিয়ে ছিল তা নিমেষে কেটে গিয়ে এক ঝলক আগুন বেরিয়ে এল; ভেট বললে যার সম্মান বাড়ে আসলে সে জিনিষটার নাম ঘুষ। এটা কাজ উদ্ধারের বিনিময়ে স্বার্থান্বেষীরা ক্ষমতাবানদের দিয়ে থাকে। যারা নিতে অভ্যস্ত তারা বড়মানুষীর ওপর বসে থাকে বলে অল্পেই তাদের অপমান হতে পারে বটে তবে কাজটা তারা সম্মানের করে না। সেই অসম্মানের ভাগ যাদের বাধ্য হয়ে নিতে হয় তাদের কারও বিবেক যদি বিক্রি হয়ে না গিয়ে থাকে তবে আত্মগ্লানি তার পক্ষে স্বাভাবিক।

খাওয়া শেষ হয়েই গিয়েছিল বিশ্বজিৎ-এর, সে আর বাদানুবাদের অবকাশ না দেবার জন্যে চট ক'রে উঠে চলে গেল।

মা অপমানে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। রুমির খাওয়া শেষ হবার আগেই থেমে গিয়েছিল সেদিন।

জীবনে সেই একবারই মুখোমুখি খানিকটা ঝগড়া ক'রতে দেখেছিল রুমি বিশ্বজিৎকে এবং তারপর থেকেই বিশ্বজিৎ এবাড়ীর জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গিয়েছিল। পরিবারের ভাল মন্দের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক অতিথির জীবনে অবস্থান ক'রছে বিশ্বজিৎ সেই ঘটনার পর থেকেই। আপন ইচ্ছায় তার খাওয়া — বেশীর ভাগ দিনই একা। আর কোনদিন মাকে তার খাবার বিষয় কিছু বলতে, খাবার ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করতে বা রাঁধুনীকে নির্দেশ দিতে পর্যন্ত দেখেনি রুমি। কখনও সকলের সঙ্গে এক টেবিলে বসলেও আপন ইচ্ছায় যেটা খুশী বাদ দিয়ে যা খুশী খেয়ে নিঃসঙ্গ মানুষের মত উঠে গেছে বিশ্বজিৎ। রুমি বেশ লক্ষ্য রেখে দেখেছে যেটা বাইরে থেকে ভেট হিসেবে আসা জেনেছে বা সন্দেহ ক'রেছে সেটা বাদ দিয়েই খেয়েছে বিশ্বজিৎ। তাই এই শক্ত মনের ছোটদাকে তার দেখানো উপেক্ষার অন্তরালে ভয়টাই বড় বেশী। তার প্রধান কারণ রুমি জানে সৌগতকে সে বলে অসৎ এবং ন্যায়নীতি বর্জিত একটি লম্পট। সে আরও জানে বিশ্বজিৎ সৌগতকে ঘৃণা করে। সৌগতও বিশ্বজিৎ সম্বন্ধে কটুক্তি করে তবে তার অভিযোগগুলো এমনই জোলো শোনায় যে রুমি সৌগতর তালে তাল দিয়ে বিশ্বজিৎকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও সৌগতর কথাগুলো তার কাছে অর্থহীন মনে হয়। অবশ্য বিশ্বজিৎ-এর অভিযোগগুলোকে সে যে সমর্থন করে তা নয় বরং চূড়ান্তভাবে অবজ্ঞা করা সত্ত্বেও তার সত্য অস্বীকার ক'রতে পারে না। সে সৌগতকে বলে দুশ্চরিত্র, লম্পট। রুমি তা মনে করে না। সে নিজে একদিন সৌগতর ফ্ল্যাটে অন্য একজন মেয়েমানুষকে দেখেছে, সে জানে পয়সা দিয়ে জোগাড় করা মেয়েদের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক সৌগতর আছে — সে সব বন্ধ করার জন্যে সে সৌগতর সঙ্গে দেহদানের চুক্তিও ক'রেছে কিন্তু সব কিছুর বিনিময়েও সে পেরে ওঠেনি। অনেক চাহিদা সৌগতর দেউলিয়া হয়ে নিজের ভাণ্ডার ঢেলে দিলেও সে পূর্ণ হবে না। সে জন্যে রুমি তাকে লম্পট বলবে কেমন ক'রে? এসব চিরদিন ভেবে এসেছে। এ ভাবনাকে সাহায্য ক'রেছে সৌগতর ব্যবহার। যেখানে যা-ই করুক সৌগত রুমির সঙ্গে তার ব্যবহারে কোন ফাঁক ছিল না।

সম্প্রতি সেটা হয়েছে। সৌগত পাগল হয়ে উঠেছে আমেরিকা যাবার জন্যে অথবা জার্মানী — কোথাও এদেশের বাইরে। এমন উৎসাহ নিয়েই সে উদ্যোগ ক'রছে যে রুমির মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে সুযোগ পেলে সেই মুহূর্তেই সে বেরিয়ে যেতে পারে বিনা প্রস্তুতিতে। অথচ বিয়ের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উদ্যোগ নেই তার। উপযাচক হয়ে বলাকে রুমির হ্যাংলামী মনে হয় বলেই সে বিয়ের ব্যাপারে কিছু বলতে পারে না সৌগতকে, কারও কাছেই না। আর এই বাইরে যাবার ইচ্ছেটা, রুমি বুঝতে পারে, দাদারা এখানে

আসবার পর থেকেই হয়েছে। তাই এমিলির আর তার কাকার এখান থেকে চলে যাওয়া রুমির কাছে আরামপ্রদ-ই মনে হচ্ছে। যদিও নেহাৎই সাময়িক তবু তা মনে হয় না রুমির, এই চ'লে যাওয়া তার কাছে তৃপ্তির। মনের ভাব সব অবস্থাতেই গোপন ক'রে রাখা ভদ্র জীবনের একটা সর্ত। রুমিকেও তাই চুপ ক'রেই থাকতে হয়। অথচ এমিলি তাকে ভালবাসে। সে বোঝে। একদিন এমিলিই তাকে বলেছিল, বিয়েটা আর পেছিয়ে রেখো না, ক'রে ফ্যাল।

হঠাৎ একথা কেন বলছ? — রুমি জানতে চেয়েছিল। এমিলি তার জবাবে বলেছিল, এ প্রশ্নের উত্তর আমি নিজেই জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছে অযথা এটা আটকে না রাখা-ই ভাল। — পরক্ষণেই হালকা সুরে বলেছিল দুজন দুজায়গায় শুধু হা-হুতাশ ক'রে রাত কাটানোর কি দরকার?

অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন রুমির কথায়, — সে কি আমার হাত?

তুমি বলতে পারছ না?

আমার হয়ে তুমি বলে দ্যাখ না?

বুঝি তুমি লজ্জা কর, এমিলি হাদ্য স্বরে বলেছিল, ঠিক আছে আমি সুযোগ পেলেই একদিন বলব। —

হাতটা চেপে ধরল এমিলি। কি যেন একটা বলতে চেয়েও পরিবেশ বুঝে বলল না।

পরক্ষণেই বলল, ঠাকুরপো এল না। ও আমাকে ঠিক পছন্দ ক'রে উঠ্‌তে পারছে না। কিন্তু আমি বুঝেছি ও হচ্ছে খাঁটি মানুষ।

রুমি লক্ষ্য ক'রেছে ঠাকুমার কাছে শিখে এমিলি বিশ্বজিৎকে ঠাকুরপো বলে। এযুগে এদেশের বউরাই একথা বলে না। মা অপছন্দ করে, কিছু বলে নি এখনও কোনদিন যে বলবে রুমি সেই অপেক্ষাতেই আছে। এ বেচারীই বা ভালমন্দ বুঝবে কি ক'রে? ঠাকুমাটাও যেন কেমন বুড়োটে ধরণের কথা শিখিয়েছে বউটাকে। এমিলিকে সে বলল, তা নয়। ছোটদা আসলে ওই রকমই। তুমি নিজেই তো দেখছ ও নিজের ঘরের বাইরে পৃথিবীর কিছু আর জানে না। ও কোথাও যায় না।

এমিলি প্রথম কথাটির প্রতিবাদ ক'রে বলল, একথা ঠিক নয়। ও আমাদের চেয়ে অনেক বেশী জানে। পৃথিবীর সব খবরই যেন ওর জানা। আমি কথা বলে দেখেছি ও খুব জ্ঞানী আর সহানুভূতিশীল। অনেক মানুষের চেয়েই বেশী।

বাংলাভাষা শিখেছে এমিলি কিন্তু বলার কথাগুলো গুছিয়ে নিতে পারে না, বাক্যগঠনে কিছু বিচ্যুতি থেকে গেলেও তার মধ্যে থেকে বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিনাবাধাতেই। সে সব কথা শুনে রুমি কখনও শুধরে দেয়, ছোটখাট ত্রুটি আর শোধরায় না, শুধুমাত্র অর্থটুকু ধরে নিয়ে জবাব দিয়ে যায়। এমিলির

কথার সারমর্মটুকু নিয়ে সে প্রতিবাদ তৈরী ক'রল, যাই তুমি বল বউদি ছোটদা সৌজন্য জানে না। তোমার কথা না ধরলেও তোমার কাকার জন্যে অন্তত তার একবার স্টেশনে আসা উচিত ছিল।

এমিলি আর কথা বলল না। এ ব্যাপারটায় তার নিজেরও কিছুটা দুঃখ আছে, বিশ্বজিৎ-এর সঙ্গে তার কাকার আলাপ হোক এটা তার বিশেষ ইচ্ছে ছিল, অনেকবার সে উদ্যোগী হয়ে চেষ্টাও ক'রেছে, বিশ্বজিৎ এগোয় নি। নানা অজুহাতে মোলায়েম ভাবে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে এমিলির আগ্রহ। অথচ তার বারংবার মনে হয়েছে এমন সুন্দর একটা ছেলের সঙ্গে আলাপ না হ'লে তার কাকার এদেশ দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কল্যাণকে যে লোক জানতেন সেই লোক বিশ্বজিৎকে দেখলে বুঝতেন এদেশে অনেক কল্যাণ জন্মায়। কাকাকে সে বলেওছিল, জান কাকা, এই ছেলেটির স্বভাবও অনেকটা আমার সেই পুরাণো বন্ধু কল্যাণের মত।

স্ট্রঘাণ মেয়েকে উৎসাহিত ক'রে বলেছেন, তাই নাকি ? কল্যাণ খুব ভাল ছেলে ছিল। তার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। কোথায় আছে সে এখন ?

কি জানি, তার তো ঠিকানা জানি না। বিশ্বজিৎ-এর সঙ্গে আলাপ হলে তুমি দেখবে সে-ও কল্যাণেরই মত।

খুব সুন্দর, স্ট্রঘাণ বলেছিলেন। একদিন অনেক চেষ্টা ক'রে মামুলী একটু আলাপ করিয়ে দিয়েছিল এমিলি, বিশ্বজিৎ সেটাকে আর এগোয় নি। তাই দুঃখ একটু রয়েই গেছে। সেখানেই খোঁচা দিল রুমি। এবং সে ইচ্ছে ক'রেই দিল সৌগতকে ছোটদার তুলনায় ভাল প্রতিপন্ন করার জন্যে। কারণ সৌগত সম্পূর্ণ অযাচিতভাবেই এসেছে এবং এনেছে সুন্দর দুটো ফুলের তোড়া।

কিন্তু এত সত্বেও এমিলি সেকথা স্বীকার ক'রল না। সামান্য নীরবতার পরে সে বলল, ওকে এভাবে বিচার ক'রলে ভুল হবে। ও অন্যরকম মানুষ।

প্রসেনজিৎ ওদিকে গিয়েছিল, সে ক'টি পত্রপত্রিকা কিনে এমিলিকে দিয়ে বলল, এগুলো পথে কাজে লাগতে পারে।

এমিলি অভ্যেস বশে বলল, ধন্যবাদ।

এতক্ষণ রুমি আর এমিলি একটু আলাদা ভাবেই দাঁড়িয়েছিল। প্রসেনজিৎকে আসতে দেখে সৌগতও পরীক্ষিৎদের ছেড়ে এদিকে এসে দাঁড়াল। রুমিকেই জিজ্ঞেস ক'রল, কি কথা হচ্ছে এমন আড়ালে ? — কথাটি এমিলিকে বোঝাবার জন্যে ইংরিজিতেই বলল। প্রসেনজিৎও একটু আগে এমিলির সঙ্গে কথা বলতে বরাবর অভ্যেস অনুযায়ী ইংরিজিই বলেছিল। উভয়ক্ষেত্রেই এমিলির ইচ্ছে ছিল বাংলা বলার জন্যে অনুরোধ করে কিন্তু ক'রতে পারেনি। কারণ সে বরাবর লক্ষ্য ক'রেছে যে এরা যেন কিছুতেই মনে ক'রতে পারে না যে এমিলি বাংলা শিখে নিয়েছে। সে মাঝে মাঝে ভাবে এ ওদের পণ্ডিতমন্যতা, কখনও ভাবে তার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া। আবার কখনও ভাবে এরা হয়ত নিজেদের

ভাষা শিখতে দিতে চায় না। এর মধ্যে কোনটা যে সত্যি সে সিদ্ধান্ত ক'রতে পারে না। তবে প্রতিবাদ স্বরূপ সৌগতর কথার জবাবে সব সময়েই বাংলাভাষা ব্যবহার করে। এবারও সেইরকম বাংলাতেই বলল, না এমন কিছু গোপন কথা বলছিলাম না যার জন্যে আড়াল দরকার।

রুমি চট ক'রে বলল, আমরা ছোটদার কথা বলছিলাম। সে একবার দেখা ক'রতে পর্যন্ত এল না।

প্রসেনজিৎ অপ্রিয় প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে বলল, এখনও ট্রেন ছাড়তে বেশ দেরী আছে।

হাতঘড়ি দেখে নিয়ে সৌগত বলল, খুব বেশী সময় নেই। আঠার মিনিট।

এরা দুজনেই অচেনা। একজন কেউ সঙ্গে গেলে ভাল ছিল।

ওসব দিকে তুমি তো যাও নি। তুমি গেলেও এমন কিছু ভাল গাইড হতে পারতে না।

তা বটে — প্রসেনজিৎ সৌগতর কথা মেনে নিল, তারপর বলল, তুমি কি গেছ?

দিল্লি পর্যন্ত। ওখান থেকে রাজস্থান গেছি। এঁরা যেদিকে যাচ্ছেন সেদিকে যাইনি।

তবু তো ওদিক সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে, আমার অবস্থা তো এদের চেয়ে ভাল কিছু হ'ত না।

রুমি বলল, একটু সুবিধে এই হ'ত যে একজন এদেশী লোক সঙ্গে থাকলে উটকো ঝামেলা হবার সম্ভাবনাটা কম থাকত।

সৌগত সায় দিয়ে বলল, বাস্তবিকই আমাদের দেশের যা লোক! বীভৎস!

কেন? — এমিলি বিস্ময়ে জানতে চাইল।

নিজেই টের পাবে — রুমি বলল।

এমিলির চেয়ে ভয় বেশী পেল প্রসেনজিৎ। তার মুখে সেই ছায়া দেখে এমিলি বলল, আমার বিশ্বাস তোমরা মিথ্যেই ভয় ক'রছ। মানুষ যেমন মন্দও থাকে ভালও থাকে। মন্দেরা অকারণ মন্দ ক'রতে যেমন আসে ভাল মানুষেরা সাহায্য ক'রতেও আসে তেমনি উপযাচক হয়েই।

একথার প্রত্যুত্তর ক'রল না কেউ। এমিলিই নিল একক বক্তার ভূমিকা। খুব ধীর স্বরে সে বলল, আমেরিকাতে কি খারাপ লোক নেই? কিন্তু তারা তো কই সেন-এর কোন ক্ষতি করে নি।

সৌগত এরকম দৃঢ় কথার সামনে টিকে থাকবার চেষ্টা ক'রল শুধু মুখরক্ষার ইচ্ছাতেই, আমতা আমতা ক'রে বলতে চাইল, না ঠিক তা নয়। আসলে ভিখিরিরা বড় উৎপাত করে বিদেশী দেখলে।

তারা সেজন্যে দায়ী নয়। নিশ্চয়ই কিছু কিছু বিদেশী এদেশের টাকার মূল্য না বুঝে বেশী পয়সা দান ক'রে ফেলে সেইজন্যেই এটা হয়। আসলে সাহায্য

যাদের প্রয়োজন তারা তো চাইবেই।

প্রসেনজিৎ জানতে চাইল, আর কোন ভয় নেই তো?

সৌগত বলল, ছোটখাট চোরদের সম্পর্কে সাবধান থাকা উচিত। যা পাবে নিয়ে পালিয়ে যাবে।

এমিলি সৌগতর কথার তাৎপর্য বিশেষ বুঝল না তার অভিজ্ঞতার অভাবে। তাই বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারল না।

প্রসেনজিৎ সাবধান ক'রে দিল এমিলিকে। এমিলি শুনল কিন্তু গুরুত্ব দিল না কারণ সাবধানে কিভাবে থাকতে হবে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা তার ছিল না। সে শুধু বলল, তুমি যদি ছুটি পেতে তাহ'লে বড় সুন্দর হ'ত। একসঙ্গে দেখে আসতে পারতে জায়গাগুলো।

হেসে প্রসেনজিৎ জবাব দিল, সাধুসন্তদের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই।

আমরাই কি সাধুসন্তদের আকর্ষণে যাচ্ছি?

তোমার কাকা তো তাই যাচ্ছেন।

তুমি ভুল ক'রছ। উনি প্রকৃত ভারতবর্ষকে দেখতে চান। ভারতবর্ষের হৃদয়। যা জানেন তা দেখে নিতে চান। আর চান এখানেই থেকে যেতে।

সৌগত চট ক'রে বলল, দেখতে চান দেখুন, থাকতে যেন না চান।

কেন? — এমিলি জানতে চাইল।

কারণটা কিছুদিন থাকলেই বুঝতে পারবেন উনি নিজে। আমি তো মনে করি এই ক'দিনেই উনি কিছুটা বুঝতে পেরেছেন।

এমিলি চুপ ক'রে রইল। সে সৌগতর অনেক কথার সঙ্গেই যেমন একমত হতে পারে না এটির সঙ্গেও পারল না। নিজের অভিজ্ঞতায় যা দেখছে তা সৌগতর কথার সঙ্গে মিলছে না। বরং মিলছে কল্যাণের বর্ণনার সঙ্গে। প্রসেনজিৎ-এর বাবা-মা ভাই-বোন আর ঠাকুমাকে নিয়ে যে সংসার তাতে সত্যিই সুখ আছে। কল্যাণ তার দিদিমার কথা যেমন বলত ঠাকুমাকে দেখেছে ঠিক তেমনি — মনে হচ্ছে যে যেন কল্যাণের দিদিমাকেই দেখছে। মিলছে না শুধুমাত্র সংসারে তাঁর ভূমিকাটি। কল্যাণ যে রকম বলেছিল ঠাকুমা যেন এ সংসারে ততটা একাত্ম নন, তার কারণও অনুভব ক'রেছে এমিলি — প্রসেনজিৎ-এর মা একটু অন্যরকম মানুষ — অনেকটা পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত। কিন্তু ঠাকুমাকে সে বিশেষভাবে উপলব্ধি ক'রেছে, তিনি সম্পূর্ণরূপে ভারতনারী। কল্যাণ বলত, পৃথিবীর পশ্চিম অংশের সঙ্গে ভারতের বিশেষ পার্থক্য মেয়েরা। আমাদের দেশের মেয়েরা সম্পূর্ণ নারী। তাঁদের বয়েস অনুসারে ভূমিকা আছে বলে তাঁরা অপূরণীয়। একজন ভারতীয় নারী কৈশোরে খেলার সাথী, যৌবনে প্রেয়সী, প্রৌঢ়ত্বে মা আবার বার্ধক্যে তিনি সমগ্র পরিবারের বটগাছ — ছায়া। মৃত্যুর ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর বিশেষ ভূমিকা থাকে। — এখানে এসে এমিলি কল্যাণের কথা প্রত্যক্ষ করেছে বলেই তার বাকী কথাগুলো অনুসন্ধান করতে চায়।

সৌগতকে বিশ্বাস করতে পারে না।

প্রসেনজিৎ-এর তাড়নায় অনেকক্ষণ আগে স্টেশনে চলে আসায় প্রথমটা বুঝতে পারে নি কিন্তু ধীরে ধীরে তার চারপাশে যে বিপুল জনতা তা দেখে সে বেশ বিস্মিত হয়ে উঠল, তার পাশের কয়েকজনকে পেরিয়ে যে লোক আছে তাদের আর দেখা যায় না এমনই অবস্থা। অবস্থা দেখে সে একসময় প্রশ্ন করে ফেলল, এত লোক ?

রুমি চারদিকে তাকিয়ে তার আজন্ম দেখা শহরকে নতুন ক'রে দেখল যেন। সৌগত বলল, আমরা দুজনকে তুলে দিতে এসেছি পাঁচজন এমনি করেই ভিড় বেড়েছে।

প্রসেনজিৎ বলল, যদি একজন যাত্রী পিছু তিনজন করেও ধরি তাহ'লেও এত লোক যে অবাক হ'তে হয়।

নিজের বিস্ময় কাকার মনে সম্প্রসারিত ক'রে দেবার অভিপ্রায়ে এমিলি বলল, দেখ কি ভিড়।

মিস্টার স্ট্রঘাণ বললেন, সত্যিই ভারতবর্ষে জনসংখ্যার চাপ অনেক বেশী। আমরা এটা বুঝি কিন্তু এমন ক'রে উপলব্ধি করি না।

পরীক্ষিৎ বললেন, এই জনসংখ্যার চাপেই আমাদের প্রগতি অনেক ব্যাহত হচ্ছে।

স্ট্রঘাণ কথাটায় সায় দিয়ে শুধুমাত্র মাথা নাড়লেন। কলকাতায় যে ক'দিন আছেন জনসংখ্যার চাপ যে কি জিনিষ তা তিনি ভালভাবেই লক্ষ্য ক'রেছেন। প্রথম যে দিন চৌরঙ্গীতে গেলেন তাঁর মনে হ'ল টোকিওর চেয়ে কি বেশী মানুষ এই কলকাতায়! এত মানুষের চাপ তিনি পৃথিবীর কোন রাজপথে দেখেন নি! এ কোন উৎসবের সমারোহ! উৎসবকেও যেন ছাড়িয়ে যায়! তারপর ক্রমাগত কয়েকদিন বিভিন্ন এলাকাকে দেখে কলকাতার জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিস্ময় কেটে গেছে তাঁর। বিস্ময় কেটে গেলেও এমিলি যখন স্টেশনের ঠাসাঠাসি জনতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রল তিনি তার বিস্ময়কে প্রশ্রয়ই দিলেন।

নিজের কথার অনুকূলে বাতাস পেয়ে পরীক্ষিৎ এমনই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন যেন তিনি খোদ মার্কিন সরকারকে বুঝিয়ে ফেলতে পেরেছেন সমস্যাটা কি এবং আর দুকথা বোঝাতে পারলেই একটা মোটা রকমের দীর্ঘমেয়াদী অর্থ-সাহায্য আমাদের পরিকল্পনার জন্যে পাওয়া যাবে। এমনি ভাবেই বললেন, আমাদের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাগুলোর অগ্রগতির তুলনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি অনেক বেশী। আমরা এই অগ্রগতি রোধ করবার চেষ্টাও ক'রছি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর্থিক উন্নতি আরও জোর কদমে করা প্রয়োজন।

মিস্টার স্ট্রঘাণ পরীক্ষিতের বক্তব্যের গভীরে না গিয়ে শুধুমাত্র সৌজন্যের খাতিরেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। পরীক্ষিৎ-ও সেই একই ধরণের কথা নানা ভাবে বলে চললেন, অনেকটা সময় কাটাবার জন্যেই।

সুপ্রীতিদেবী ছাড়া প্রসেনজিৎ-ই একমাত্র নীরব ছিল কারণ তার সবসময়েই মনে হচ্ছিল একজন গাইড দিতে পারলে ভাল হ'ত ওদের সঙ্গে, আর এমনই একজন গাইড যে সমস্ত চেনে এবং জানে। সে নিজে এদেশ চেনেও না, জানেও না। তাছাড়া এমিলির কাকা যে সব বস্তু নিয়ে মাথা ঘামান সে সব ব্যাপার সে আদপে বোঝেই না। মাথা দিতেও চায় না। ফিলাডেলফিয়ায় থাকার সময় একবার দেশীয় বন্ধুদের মুখে শুনেছিল বটে একজন যোগী নাকি দেশ থেকে এসেছে খুব হৈ চৈ হচ্ছে তাকে নিয়ে; সে মাথা ঘামায় নি। বন্ধুদের দুচারজন সেখানে দৌড়ালেও সে নিজে জানতেও চায়নি ব্যাপারটা কি। এসব ব্যাপারে তার উৎসাহও নেই নিরুৎসাহ হবার প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে না। তাই এমিলিকে সামান্য একটু বোঝাতে চেষ্টা ক'রেছিল কাকাকে যাতে সে নিবৃত্ত করে। কিন্তু এমিলির উৎসাহ, সে বুঝেছিল, কাকার চেয়ে বেশী। তাই ইচ্ছায় ইস্তফা দিয়ে যা ওরা ক'রছে তাতে সহযোগিতা আপন স্বভাব অনুসারেই ক'রেছিল সে। নিজের কর্মক্ষেত্রের সহকর্মীদের কাছ থেকে যতটুকু খবর জানা সম্ভব তাই দিয়ে অভিজ্ঞ ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রেছিল সে এমিলিকে! আর সামান্য একটু অনুকূল ইচ্ছা বইছিল তার, কারণ, এখানকার পরিবেশ আদৌ সহ্য হচ্ছিল না। প্রতিদিনের খবরের কাগজ, গণ্ডীবাঁধা চলাফেরা, সকলের আতংকিত ভাব তার আদৌ সহ্য হচ্ছিল না। ওখানের এদেশী বন্ধুরা তাকে যে কেন বারংবার আসতে নিষেধ ক'রেছিল তা সে প্রতিদিন মর্মে মর্মে অনুভব ক'রছিল। নিজের দেশ এখন তার কাছে স্মৃতিমাত্র। কিন্তু যে স্মৃতি তার মনের মধ্যে এখনও আধো জাগ্রত তার সঙ্গেও কিছু মিলছে না। এই বুকচাপা গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে মানুষের বাস করা যে কিভাবে সম্ভব সেকথা ভাবতে গেলে তার কেমন মাথা গুলিয়ে যায়। ওসব দেশে এরকম অবস্থা হ'লে কবে লোকে ঘরবাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্য রাষ্ট্রে পাড়ি জমাতো। এর চেয়ে জেলখানা বোধহয় ভাল। সেখানে এমনি বন্দীত্ব কিন্তু এমন আতংক তো নেই! এখান থেকে যে ছেলেটি ও চলে আসার আগে শেষ গিয়েছিল সে তো প্রসেনজিতের চলে আসবার কথা শুনে উপযাচক হয়েই বলতে গিয়েছিল, ও কাজটি করবেন না। খবরদার নয়। ওখানে এখন একজন ভদ্রলোকের দাম একটা ছাগলের চেয়ে কম। একটা ছাগল কাটলে পয়সা দিয়ে কিনে কাটতে হয় কিন্তু একজন লোককে রাস্তায় ধরে কেটে ফেললেই হ'ল।

কথাটা শুনে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি বলে বিস্মিত হয়ে প্রসেনজিৎ জিজ্ঞেস ক'রেছিল, সে কি! পুলিশ?

পুলিশ! কোথায় পুলিশ? পুলিশই কি কম কাটা পড়ছে? রোজ অমন কত পুলিশ কেটে লাস গুম করে.দিচ্ছে তার কোন ঠিকানা আছে?

কপালে উঠেছিল চোখ, বলেন কি?

ঠিক বলছি। সদ্য আসছি, সব দেখে শুনে আসছি।

প্রসেনজিৎ হতাশ হয়ে বলেছিল, এখানকার নিউজ এজেন্সিগুলো একদম বাজে হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে টেলিভিশানে খবর বলছে বটে তবে আপনি যা বলছেন তার একশভাগের একভাগও বলছে না।

এসব খবর কি করে পাবে? — সেই সর্বজ্ঞ যুবক জানিয়েছিল, অলিগলিতে কোথায় কি হচ্ছে এদেশের টেলিভিশানে কি ক'রে তার খবর দেবে?

কথাগুলো শুনে বাড়ী গিয়ে শুনিয়েছিল সে এমিলিকে। নিবৃত্ত ক'রতে চেয়েছিল এমিলির বাসনা। বলেছিল, একান্তই যদি আমার দেশে যেতে চাও তাহ'লে পরেও তো যাওয়া যাবে! খামোকা এখন এইসব ঝামেলার মধ্যে যাওয়া ঠিক নয়। ক'দিন আগে বাবাও তাঁর মতামতে একই কথা লিখেছেন।

কিন্তু অন্য ধাঁচের রোমাঞ্চপ্রিয় মেয়ে এমিলি। তাকে থামানো যায় নি। উল্টে সে বলেছিল, ভারতবর্ষের মানুষ যেমন শান্তিপ্রিয় তাতে ওরকম দৃশ্য ভাবাই যায় না। বেশ তো নাহয় দেখা-ই গেল যুদ্ধটা কেমন হচ্ছে।

যুদ্ধ কোথায়?

যুদ্ধ নয়? তবে অকারণ অত ভয় পাচ্ছ কেন? চলই না দেখা যাক। খুব অসুবিধে হলে ফিরে আসা যাবে —। তাছাড়া আরও তো মানুষ সেখানে আছে!

এরকম আলোচনা অনেকদিনই হয়েছে একই রকম জবাব পেয়েছে প্রসেনজিৎ। বুঝেছে এ মেয়ে নিরস্ত হবার নয়।

আজ সেই কথাগুলো মনে হ'ল। দৈনন্দিন ব্যবহারে এবং প্রকৃতপক্ষে খুবই নরম মেয়ে এমিলি, নরম মনের মেয়ে। কিন্তু এমন বিস্ময়কর বৈপরীত্য আছে ওর চরিত্রে যে সময় সময় দেখা যায় সে প্রচণ্ড কঠোর। শক্ত। ভাঙে কিনা দেখা হয়নি তবে নোয়ায় না। দেখলে মনে হয় শান্ত চরিত্রের ভীরু কিন্তু সাহস অসামান্য। কাজেই দিল্লি হোক কি দুর্গম পর্বতেই হোক তাকে নির্ভর করা চলে কিন্তু জায়গাগুলো সম্বন্ধে প্রসেনজিৎ-এর ধারণা যেহেতু বিন্দুমাত্র নেই কাজেই অনুমানের চেষ্টা তাকে বিপন্নই ক'রে তোলে।

এমিলি প্রসেনজিৎকে চেনে, জানে, বোঝে। তাই বলে, তুমি ভয় পেয়ো না আমরা ভালই থাকব। বরং তুমি নিজেকে সামলে রেখো।

কথাগুলো অন্য সকলের আড়ালে হলেও বলে রুমির সামনেই। এবং সেটুকু ইংরিজী রুমি বোঝে। ঠাট্টা ক'রে বলে, এটা তুমি ভালই বলেছ, দাদা যা নার্ভাস!

প্রসেনজিৎ কাণে তোলে না কথাগুলো। চারপাশে হাজার হাজার মানুষ। হরেক রকম সামগ্রীর শত শত ফেরিওয়ালা, লাল জামা গায়ে রেলের লাইসেন্সধারী কুলিদের দৌড়োদৌড়ি — এই ব্যস্ততার মধ্যে সে নিজেকে ঢুকিয়ে ফেলতে, আসলে লুকিয়ে ফেলতে চাইছিল।

দিল্লিতে এসে স্টুঘাণ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মনে হ'ল অন্য দেশে এলেন, অন্য রাষ্ট্রে। চারদিকে চেয়ে দেখলেন এ কি তবে ভারতবর্ষ নয়? প্রথম ভারতবর্ষে পা দিয়েছিলেন বোম্বাই বিমানবন্দরে। সে ছিল নেহাৎই বিমানবন্দর — দেশ নয়। পৃথিবীর সমস্ত প্রধান বিমানবন্দরগুলোই যেন সে দেশের বাইরে। বিমানবন্দর কখনও দেশ নয়, দেশের অংশও নয়, অন্যকিছু। শুধুমাত্র বিমান-বন্দর। সে সব দেশেই একরকম, একই চরিত্রের। কাজেই সেটা ভারতদর্শন হয়নি, প্রথম ভারতদর্শন হয়েছিল উড়ন্তপথে বোম্বাই থেকে দমদম পৌঁছানোর পর; কলকাতা গিয়ে। আর এই দিল্লির রেল স্টেশন থেকে কনট সার্কাসের হোটেল-এ আসবার পথটুকুতেই চোখে পড়ল ভারতবর্ষের অন্য রূপ। একেবারে বিপরীত। কলকাতায় ঘরবাড়ীগুলো মেলায় আসা মানুষের ভীড়ের মত, একজনের গায়ে আর একজন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যেন। সব একাকার হয়ে গেছে। পুরাণো পরিবারগুলোর যেমন শাখা প্রশাখা ছড়াতে ছড়াতে ভাগ হয়ে যায় অনেক ভাগে, কলকাতার অনেক বাড়ীও তেমনি বাইরে থেকে দেখলেও বোঝা যায় আগে একই বাড়ী ছিল ভাগ হয়ে হয়ে আলাদা হয়ে গেছে, তাদের ধরণ দেখে তবু বেশ বোঝা যায় একই বাড়ী ছিল ওগুলো আগে। দিল্লিতে আলাদা। একটার সঙ্গে আর একটার মিল তো নেই-ই পরন্তু পার্থক্য এতই বেশী যে মনে হয় দুটোর মুখ দেখাদেখিও বন্ধ। সুপ্রসারিত পথের দুপাশে বাসের বাড়ীগুলোকে খুঁজে নিতে হয়। অফিস এলাকার বাড়ীগুলোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে অফিস বুক নিয়েই ওগুলোর জন্ম। দুধারে দেখতে থাকেন মিস্টার স্টুঘাণ। যে লোকটি স্টেশনে নিতে এসেছিল সে পথ চলতে পরিচিতি দিতে থাকে পথের আর এলাকার। তার কথা উনি বা এমিলি দুজনেই কিছুটা বোঝেন বাকীটা না বুঝেই সৌজন্য রক্ষা করেন ঘাড় নেড়ে। মাঝে মাঝে এমিলি কাকাকে প্রশ্ন ক'রে না বোঝাটা বুঝে নিতে চায়, কখনও কাকা ভাইঝিকে। মিস্টার স্টুঘাণ-এর ভাল লাগে পথিকের সংখ্যাল্পতা। কলকাতায় প্রতি একহাতে একজন ক'রে মানুষ, রেলগাড়ীর কামরাগুলো যেমন একটার সঙ্গে আর একটা আঁটা থাকে কলকাতার পথিকেরাও যেন তেমনি। এতদিন যা সামান্য পথ হেঁটেছেন তাতেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এখানে তো তেমন নয়।

এমনি ভাল লাগার মধ্যে দিয়ে তিনি এসে পৌঁছালেন হোটেল হারেম-এ।

সেখানেই তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা। ভেতরে পা দিয়ে বেশ লাগল মিস্টার স্ট্রঘাণের। ভাল লাগল সজ্জা। মুঘল বাদশাহদের বাসগৃহের কায়দায় সাজানো ভেতরটা। বাইরের স্থাপত্যের সঙ্গে ভেতরের মিল নেই। আধুনিক ধরণের বাড়ীর ভেতরে এরকম পরিবেশ সৃষ্টি করা থাকবে তা আগে ভাবেন নি বলেই এই ভাল লাগা। যে লোকটি স্টেশন থেকে এসে ছিল তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিতেই এমিলি মনের কথা খুলল, ট্রেনে আমাদের সাধারণ কামরায় আসা উচিত ছিল।

স্ট্রঘাণ একথার কারণ বুঝতে না পেরে বললেন, কিন্তু আমরা তো মনে হয় স্বচ্ছন্দেই এসেছি।

তা নয়। এমিলি জানাল, তুমি লক্ষ্য ক'রেছ যে সব স্টেশনে ট্রেন থামছিল প্রত্যেক স্টেশনে কত লোক অথচ আমাদের কামরায় একবারে লোক উঠছিল না।

তাতে কি? — কাকা বিস্মিত হলেন।

এমিলি বলল, একটা দেশকে দেখতে হ'লে তার মানুষকে দেখতে হবে। আমরা কিন্তু সেই সব সাধারণ মানুষকে দেখতে পেলাম না।

স্ট্রঘাণ কথাটা স্বীকার ক'রলেন, তারপর বললেন, একটা জিনিষ তুমি লক্ষ্য ক'রেছ? কলকাতার মানুষগুলোর সঙ্গে এদিকের মানুষগুলোর কিন্তু বিস্তর তফাৎ। একেবারেই অন্য রকম।

এমিলি সে পার্থক্য স্বীকার ক'রল। তার অভিজ্ঞতার পরিধি থেকে একটু কথা নিয়ে সে বলল, ওটা তো বাঙ্গলা। ওখানের সঙ্গে এদিকের অনেক তফাৎ। আবার ভারতবর্ষের অন্যদিকে গেলে তফাৎ হবে এখানের লোকের সঙ্গেও। বহু বৈচিত্র্য ভারতবর্ষের ভেতরে।

স্ট্রঘাণ বললেন, তোমার পক্ষে এদেশকে বোঝা অনেকটা সহজ কারণ তুমি এখানকার ভাষা শিখে ফেলেছ।

এমিলি বলল, তুমিও শিখে নাও। কারও সঙ্গে দেখা হলেই বলবে নমস্কার।

স্ট্রঘাণ মেয়ের কথায় শিশুর মত হেসে বললেন, আমি বলব না।

কেন?

আমি যেই একটা শব্দ বলব অমনি ওরা মনে ক'রবে আমি ওদের ভাষা জানি, ব্যস অমনি যখন নিজেদের ভাষা অনর্গল বলতে আরম্ভ ক'রবে তখন কি ক'রব? — কথাগুলো বলে মনের আনন্দে খুব হাসলেন।

হাসল এমিলিও, তারপর হাসি থামিয়ে বলল, তা ক'রবে না। কলকাতায় আমি যতই ওদের ভাষা বলি না কেন ওরা আমার সঙ্গে ইংরাজীই বলে। এমন কি সেন-ও। কিছুতেই নিজের ভাষা বলতে চায় না কলকাতার লোকেরা। তার ফলে ওদের ভাষা শিখলেও অভ্যেস করা মুস্কিল।

তুমি তো বললে কলকাতার থেকে এখানের লোকেরা আলাদা। এরা কেমন হবে কে জানে? এরাও কি তাই ক'রবে?

তা বটে — এমিলি স্বীকার ক'রল। তবু তুমি একবার আরম্ভ ক'রেই দ্যাখ না। নইলে তো আমি আছিই। আমি কথা বলব। নমস্কার বলে এমনি ক'রতে হয় — বলে হাতজোড় করা দেখিয়ে দিল।

স্ট্রঘাণ সেটার চর্চা ক'রলেন না। এ ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের প্রকাশ দেখা গেল না। কারণ একটা দেশের ভাষা শেখার কাজটা এত সহজ হতে পারে তিনি ভাবতে পারেন না। তাছাড়া তাঁর মনে এল এমিলি ভুলেই গেছে যে কলকাতা আর দিল্লি এক প্রদেশ নয়, এক ভাষাভাষী হবে না দুজায়গার লোক। তাই বললেন, তুমি বোধহয় ভূগোলের হিসেবে ভুল ক'রে ফেলছ! এখানকার লোকের বাংলাভাষা জানবার কথা নয়!

ও ঈশ্বর! এই কথাটা তো আমার একদম খেয়ালই ছিল না।

অতএব আমাদের মতই চলতে হবে। বাঁচা গেল!

কেন?

নইলে তুমি এখনই ভাষা শেখাতে বসতে!

এমিলি সস্নেহে কাকাকে জিজ্ঞেস ক'রল, তুমি কি স্কুলেও ভাষা শিখতে এমনি ভয় পেতে?

স্কুলে — শিশুর মত আনন্দে চোখ টিপে বললেন, আমি সব কিছুই শিখতে খুব ভয় পেতাম।

তাঁদের কথার মধ্যে টেলিফোন বেজে উঠল। স্ট্রঘাণ ধরলেন। স্টেশনে যারা নিতে গিয়েছিল অর্থাৎ কলকাতায় প্রসেনজিৎ-এর বাবার পরিচিত সেই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের এখানকার অফিস থেকে ফোন ক'রে জানতে চাইছে তাঁদের জন্যে গাড়ী কখন পাঠাতে হবে। স্ট্রঘাণ কি জবাব দেবেন ভেবে না পেয়ে মেয়েকে জিজ্ঞেস ক'রলেন কি জবাব দেবেন। এমিলিও কিছু স্থির ক'রতে না পারায় বললেন গাড়ীর কোন প্রয়োজন নেই।

তার ফল হ'ল বিপরীত। অল্পক্ষণ বাদেই একজন লোক এসে হাজির। তাদের ধারণা যে লোক স্টেশনে গিয়েছিল তার ব্যবহার নিশ্চয়ই উপযুক্ত হয়নি যার জন্যে সাহেব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। অনেকে বুঝিয়ে আগন্তুকের ভুল ভাঙালেন স্ট্রঘাণ। জানালেন তিনি এসেছেন বেড়াতে এবং গাড়ী না নিয়ে বেড়াতে চান যাতে দেশটাকে উপভোগ করা যায়। কিন্তু আগন্তুক নাছোড়বান্দা তার প্রতি মালিকের নির্দেশ আছে সেটুকু পালন ক'রতে হবেই তাকে। যখনই প্রয়োজন যেন ফোন ক'রে দেন গাড়ী গাইড সব সময় হাজির আছে।

অনেক কষ্টে তাকে ফেরালেন স্ট্রঘাণ। ঘন্টা চারেক বাদে গাড়ী পাঠাতে বললেন। তিনি মুগ্ধ হলেন এখানকার লোকের আতিথেয়তা দেখে।

সেইদিন বিকালেই শহরটাকে এক চক্কর ঘুরে নিলেন পরিকল্পনাহীন ভাবে। উদ্দেশ্য শহর সম্বন্ধে একটা ধারণা করা। শহরটা এখনও গড়ে উঠছে, বুঝলেন। বেশ প্রসারিত জায়গা নিয়ে হাত-পা মেলে বেড়ে উঠছে। চলতে চলতেই এমিলি

বলল, কিন্তু কল্যাণ বলত কলকাতা সব শহর থেকে আলাদা। কলকাতা শহরকে আমার গলা টিপে মারা হচ্ছে এমনি কোন মানুষের মত মনে হয়।

স্ট্রঘাণ বললেন, কলকাতা এর তুলনায় অনেক নতুন অথচ পুরাণো শহর। আসলে কলকাতা অপরিকল্পিত শহর। এই দিল্লি দেখছ না সুন্দরভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। আর কলকাতা আপন মনে গড়ে উঠেছে।

এ যে দেখছি তুমি কল্যাণের কথাগুলোই বললে।

কথাটা সবাই বলবে। সে তার নিজের শহরকে ভালবাসে।

কিন্তু সে তো শহরের ছেলে নয়।

তাতে কি? সে ওই শহরকে নিজের ভাবে। — বলেই চট ক'রে বললেন, তারই বা কি প্রয়োজন নিজের জিনিষ ছাড়া কি মানুষ ভালবাসে না? ভালবাসা তো দেখি সব সময় অন্যের প্রতি পড়ে, যা নিজের নয় তার প্রতিই। আসলে ভালবাসা নিজের ক'রে নেবার পথ।

এমিলি তৃপ্তি পেল, জবাব পেল না। সে বলল, হয়ত কিছু আছে শহরটার মধ্যে। আমরা তো ভালভাবে দেখতেই পেলাম না। বিশ্বজিৎও কল্যাণের মতই ভালবাসে তার শহরকে। অথচ ছেলেটা আশ্চর্য রকম চুপচাপ, কারও সঙ্গে কথা বলতেই চায় না। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে শুধু পড়ে। ঘর ভর্তি বই। খুব ভাল ছেলে।

আমার সঙ্গে তো আলাপই হ'ল না।

ও কারও সঙ্গে আলাপ ক'রতে চায় না। আমি অনেকদিন পরে অনেক কষ্ট ক'রে আলাপ ক'রতে পেরেছি।

ভারী আশ্চর্য!

তবে আরও আশ্চর্য কি জান আলাপ ক'রে নিতে পারলে কথা বলে খুবই সুখ পাবে তুমি। খুব শান্ত আর গভীর কথাবার্তা। এবার গিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

ভালই হবে।

সন্ধ্যে নাগাদ হোটেলে ফিরে যে ভদ্রলোক গাড়ীতে ছিল তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেদিলেন, কাল সকালে আমরা হোটেলেই থাকছি। বিকালে আমি ফোন ক'রলে তবেই গাড়ী পাঠাবেন।

আসলে তিনি মুক্তির জন্যে এসেছিলেন, তাই এভাবে ঘোরা অসম্ভব। তিনি পূর্ণ মুক্তি চান। বেড়াতে চান পরিপূর্ণ নির্লিপ্তভাবে। এবং স্বাধীনভাবে।

তাই পরের দিন সকালে উঠেই পথে বেরিয়ে পড়লেন যাতে কেউ তাঁকে হোটেলে এসে বা ফোন ক'রে না পায়। হোটেলে বলে রাখলেন তিনি সন্ধ্যের পর ফিরবেন কেউ খোঁজ ক'রলে যেন এই কথাটা ওরা জানিয়ে দেয়। কাকার পরিকল্পনায় এমিলি খুবই খুশী। তার আনন্দ তিন বছরের শিশুর মত। এমন মুক্ত উদার আকাশ অনেকদিন সে দেখে নি, এমন প্রশান্তি মনের চারপাশে সে

অনেকদিন পায় নি। পথে নেমে সে দুপাশে দেখে নিল। কাকা জানতে চাইলেন কোনদিকে যাবে?

তার হাতে একটা চিঠি ছিল যা সে পথের কোন ডাকবাক্সে নিজে দিতে চায়। সে কথা ব্যক্ত না ক'রলেও কাকা বুঝে দেখিয়ে দিলেন পাশেই একটা বাক্স। এমিলি দূরে দেখছিল, তাই কাছের বাক্সে চিঠিটা ফেলল প্রায় দৌড়ে গিয়ে। ফিরে এসে বলল, আমাদের কাছে তো সবই সমান। যেদিকে খুশী চল।

কলকাতার চেয়ে এখানকার আবহাওয়াও ভালই লাগল দ্যুম্নঘাণের। ডানদিকেই চললেন তিনি। কলকাতায় এভাবে পথ হাঁটবার সুযোগই পান নি। পেলেও হাঁটতে পারতেন কিনা সন্দেহ। সে যা পথ আর যা জনাকীর্ণ — মনে মনে ভাবলেন দ্যুম্নঘাণ। কি ঘিঞ্জি ক'লকাতা যেন একটা বাজার। সব্জী বাজারের মত। নোংরা। ওখানকার পথ চলতে হ'লে বোধহয় সঙ্গে অক্সিজেন নিয়ে নিলে ভাল হয়। অথচ ওই শহরে সত্যিই কি যেন একটা আছে যা এখানে অনুপস্থিত। সেটা যে কি তা তিনি বুঝছেন না।

ব্যাপারটা এমিলিও ভাবছিল কিন্তু অন্যভাবে। সে ভাবছিল কল্যাণ তার স্বদেশ বর্ণনায় কোনদিন তো দিল্লির কথা বলে নি। সে শুধু বলত কলকাতার কথা, তার চেনা জানা গ্রামের কথা। গ্রামের জীবন, সে বলত খুব ধীরগতি। সকাল থেকে সন্ধ্যা — সময়টা সেখানে চলে রমণীয় শান্তিতে। কলকাতায় তা নয়। কলকাতা তো দেখেছেই সে। যতটুকু দেখেছে তাতে বুঝেছে কলকাতা দ্রুতগতি। সেখানে যদি কেউ সময়কে উপভোগ করে তবে সেই সময়টুকু সে নেহাৎই ছিনিয়ে নেয় তার কাজের কাছ থেকে। সেখানে গাড়ীগুলো যেন গায়ের ওপর দিয়ে দৌড়ে যায়। পথচলা মানুষগুলোকে দেখলে মনে হয় একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন যেন জুড়ে দেওয়া আছে রেলগাড়ীর মত। আসলে রাস্তাগুলো সরু বলেও ওরকম হয়। ওখানকার পথগুলোকে এখানকার মত করা গেলে অমন গায়ে ঘেঁষে চলত না মানুষ। তবে একটা জিনিষ দেখবার যে অত ভীড়ের মধ্যেও যদি কারও সঙ্গে কারও ধাক্কা লাগে সৌজন্যবোধে দুঃখ প্রকাশ করে, এখানে সে বালাই নেই। কারণ একটু আগেই একজন লোক এই ফাঁকা পথেও তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে দিল কাকাকে, মুখে একটা শব্দ পর্যন্ত করল না চলে গেল নিজের পথে। এই সৌজন্যবোধের ঘাটতি এমিলি এখানে আরও কয়েকটি ছোট ছোট ব্যবহারে লক্ষ্য ক'রেছে এসে থেকেই।

শীতের দিন হলেও দুপুরের রোদ যখন ক্লান্ত ক'রল এমিলি বলল, চল হোটেলে ফিরে যাই।

দ্যুম্নঘাণ বললেন, কেন? . বরং চল খাবার জন্যে এখানেই যে কোন হোটেল খুঁজে নিই।

তোমার অসুবিধে হবে। তুমি এদেশী খাবার খেতে পারবে না।

কলকাতায় খেলাম না?

সে তো বাড়ীর রান্না তোমার অসুবিধে হবে না এমনিভাবে তৈরী করে দিত। এখানে হোটেলে কে তোমাকে সেরকম খাবার তৈরী ক'রে দেবে?

বিদেশে তো তুমি কখনও ঘোরো নি পথের একটা নিয়ম আছে। হোটেলেই খেতে হবে, আন্দাজে দু একটা খাবার নির্বাচন ক'রে নিতে হবে। যদি দ্যাখ সেগুলো তোমার পক্ষে ভাল তাহ'লে তো মিটেই গেল নইলে পরে আবার একটা বেছে নেবার চেষ্টা ক'রবে। তা ছাড়া একটা জিনিষ দ্যাখ সব দেশেরই বড় বড় হোটেলগুলোতে কিন্তু দেশের পরিচয় কিছু পাবে না। কোন দেশের পরিচয় পাবে সেই দেশের সাধারণ ছোট শুধুমাত্র সেই দেশেরই খাবার জায়গাগুলোয়।

এমিলি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তা ক'রে যাচ্ছিল। তাই সহজেই সায় দিতে পারল। তাতে স্ট্রঘাণ বললেন, তুমি তো বরাবরই চাইছিলে এই দেশটা দেখতে, কাজেই এসব অভিজ্ঞতা তোমারই বেশী প্রয়োজন।

যা হোক কিছু খাবার পেলেই আমার চলবে। তুমিই তো সবকিছু খেতে পার না।

আমি এখানে বাস ক'রব বলে চলে এসেছি। আমাকেও এদেশের খাবার অভ্যেস ক'রে নিতে হবে।

সে কি তুমি পারবে? বরাবর বাস ক'রতে পারবে তুমি?

না পারার মত কিছু কি এখানে দেখছ? আসলে কি জান, আমি একটু শান্তি চাই। শান্তিময় জীবন। ওই দ্রুততার যাত্রা আর ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে বিশ্রাম প্রয়োজন।

তোমার কি এতই বয়েস হয়েছে কাকু যে তুমি এসব কথা বলছ?

স্ট্রঘাণ অল্প হাসলেন, বললেন, বয়েস দিয়ে মনের হিসেব নেওয়া কি চলে? মন একটা এমনই জিনিষ যার কোন হিসেব থাকে না। তুমি একসময় চিন্তা ক'রে দেখো মন আছে বলেই পৃথিবীতে বিশেষ ক'রে মানুষের জীবনে এত বৈচিত্র্য আছে। আমার এক এক সময় ইচ্ছে করে মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের মন আছে কিনা তাই গবেষণা করি।

কাকার এইসব ছেলেমানুষী খেয়াল খুবই ভাল লাগে এমিলির। এক এক সময় এই বয়স্ক মানুষটিকে তার শিশু বলে মনে হয়। ইচ্ছে করে ছোট ছেলের মতই স্নেহ ক'রতে। তাই অনেকটা স্নেহসিঞ্চিত স্বরেই সে জিজ্ঞেস ক'রল তোমার কি মনে হয়?

আমার মনে হয় ওদের মন নেই। থাকলেও অপরিণত।

আমার কিন্তু মাঝে মাঝে অন্য রকম মনে হয়। তুমি নিশ্চয়ই জান অনেক সময় কুকুর প্রভৃতি প্রাণীরা মানুষের অনেক কথা বুঝতে পারে, আমরা কিন্তু অন্য কোন প্রাণীর ভাষা বুঝি না।

সেটা কেন হয় জান, আমরা ওদের বোঝাতে পারি, ওরা ওদের ভাষা বা মনের ভাব ঠিকমত বোঝাতে পারে না। মনই মানুষের শরীরের সবচেয়ে

শক্তিশালী প্রত্যঙ্গ। ওখানে কারও কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

তা তোমার মনেরই বা কি হ'ল?

মনে হচ্ছে আমার এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। — বলে তাঁর মনে হ'ল ঠিক কথাটি যেন বলা হ'ল না তাই আবার বললেন, ঠিক বিশ্রাম প্রয়োজন বললে ঠিক হবে না। আসলে আমি একটা প্রশান্ত পরিবেশে বাস ক'রতে চাই।

এমিলি আরও কিছু শোনবার জন্যেই চুপ ক'রে রইল। তার নীরবতার ফাঁকে কাকাই বললেন, আমার বারংবার মনে হয়েছে, ভারতবর্ষে আমার সেই শান্তির বাসস্থান পাব।

একটা সিগারেট ধরাবার জন্যে নিজেই কিছুক্ষণ থামলেন স্ট্রঘাণ, সেটি সমাধা ক'রে বললেন, ইতিহাস যতটা প্রত্যক্ষ তাতে দেখা গেছে ভারতবর্ষ বহুবার আক্রান্ত হয়েছে, লুন্ঠিত হয়েছে, পরাধীন থেকেছে, কিন্তু কোন ভারত-রাজ কোন দিন বিদেশ আক্রমণ করে নি।

এমিলির ইচ্ছে হ'ল কাকার কাছে আরও কিছু শোনে। অজানা কিছু জেনে নেয় তাঁর কাছে, তাই তর্ক করার ভঙ্গীতে বলল, তাতে কি বোঝায়?

স্ট্রঘাণ যেন একটু ভাবলেন, বললেন, বোঝায় যে এদেশের মানুষ চিরদিনই আত্মকেন্দ্রিক এবং শান্তিপ্রিয়।

এমিলি তর্ক জোরদার ক'রতে বলল, বিপরীতও তো হ'তে পারে?

কি বিপরীত?

এখানকার মানুষ ভীরু এবং দুর্বল।

আবার ভাবলেন স্ট্রঘাণ, খুব ধীরভাবেই বললেন, এ কথা ভাববার পক্ষে কি যুক্তি তুমি দেখছ?

বাইরের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রতে ভারত কখনই পারেনি!

স্ট্রঘাণ আবার কিছু ভাবলেন, শান্ত স্বরে জবাব দিলেন, কথাটা তুমি যা বলেছ তাতে ভুল নেই তবু একটা কথা এসে যাচ্ছে। একজন সাধুর বাড়ীতে যদি ডাকাত পড়ে সাধু কি পারে তাকে প্রতিরোধ ক'রতে? তাই বলে তো সাধু দুর্বল হয় না। ভারতবর্ষের মানুস আক্রমণকারীদের তুলনায় আত্মসমাহিত। দেশের এই বিশাল সীমার বাইরে যে বিশ্ব সেখানে তাদের যা দেবার বা নেবার জেনে এসেছে তার সূত্রকে বলে বিনিময়। যে গাছ পাথুরে এলাকায় জন্মায় তার শিকড়ে থাকে কঠিনকে জয় করার স্বাভাবিক ক্ষমতা। পলিমাটিতে জন্মানো গাছের চেয়ে প্রাণশক্তি বেশী তো তার হবেই! তুমি চেয়ে দ্যাখ ভারতবর্ষ আক্রমণ যারা ক'রেছে তাদের রক্তে আছে দুর্ধর্ষ যুদ্ধের আর হানাহানির চিরদিনের অভ্যাস। তাদের ধর্মেরও নাম রাজ্য বিস্তার! অন্যদিকে ভারতবর্ষের বহু পুরাতন যে জীবন তাতে আছে এক শান্তির ঐতিহ্য। — এই পর্যন্ত বলেই স্ট্রঘাণ চুপ ক'রলেন। একটানা অনেকটা পথ হাঁটার অনভ্যাস তাঁকে ক্লান্ত ক'রেছিল। তাই একটু থেমে প্রসঙ্গটা শেষ করার ইচ্ছায় বললেন, আমি তোমাকে

ভালভাবে বোঝাতে পারব না। যদি জীবনের প্রথম দিকটায় সযোগ পেতাম, হিন্দু দর্শন আর ওদের মূল ভাষা সংস্কৃত ভালভাবে পড়তাম, তাহ'লে তোমাকে হয়ত সব বোঝাতে পারতাম।

এমিলির কিন্তু শুনতে বেশ ভাল লাগছিল। সে যেন সেই ফিলাডেলফিয়ার পথ চলতে চলতে কল্যাণের কথা শোনবার আমেজ অনুভব ক'রছিল। কিন্তু কল্যাণ কখনও এসব কথা বলে নি। এইরকম ইতিহাস আর দর্শনের মিলিত বিশ্লেষণ সে করেনি কখনও। সে বরং একসময় একথাও বলেছে যে ইংরেজ-এর অধীনতা ভারতবর্ষকে যত ক্ষতিগ্রস্থ ক'রেছে তার চেয়ে অনেক বেশী মঙ্গল ক'রেছে দেশের। মধ্য যুগের অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোয় এনে দিয়েছে তারা — সে ইচ্ছাতেই হোক বা অনিচ্ছাতেই হোক।

সেই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস ক'রল কাকাকে, আচ্ছা ইংরেজরা কি কিছুই দেয়নি ভারতবর্ষকে ?

তার উত্তরে বড় অদ্ভুৎ কথা বললেন স্ট্রঘাণ, রাত্রির সঙ্গে থাকে অন্ধকার, সে এলে তাই আসে অন্ধকার আসে, দিনের সঙ্গে থাকে আলো তাই দিন হলে আলো হয়। ইংরেজদের সঙ্গে ছিল বিজ্ঞান, জ্ঞান আর মানুষের সভ্যতার সাধনা। তাই তার প্রতিচ্ছায়া ভারতবর্ষকে নতুন চেতনা দিয়েছে। ভারতবর্ষ তা গ্রহণ ক'রেছে বললেই ঠিক বলা হবে।

স্ট্রঘাণ থামলেন। সামনেই একটা ফাঁকা মত জায়গায় ত্রিপল টাঙ্গিয়ে খাবার বিক্রি হচ্ছে আর বহু লোক তার তলায় পাতা বেঞ্চিতে বসে পরম তৃপ্তিতে খাচ্ছে। সেদিকে দৃষ্টি পড়ল স্ট্রঘাণের। তিনি এমিলির দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে জানতে চাইলেন, এখানে খাবে কি ?

এমিলি ঠাহর ক'রতে চেষ্টা ক'রল লোকেরা কি খাচ্ছে। আস্তে আস্তে যেমন হাঁটছিল তেমনি এগিয়ে চলল পায়ে পায়ে। কি ধরণের খাবার এখানে বিক্রি হচ্ছে, তার কাকা খেতে পারবেন কি না সেটা পর্যবেক্ষণ না ক'রে সে মত দিতে পারছিল না। তাই কাছাকাছি পৌঁছেও সংশয় না কাটায় বলল, সব খাবার কি তুমি খেতে পারবে ?

মানুষ যখন খাচ্ছে — স্ট্রঘাণ কথা শেষ ক'রলেন না।

চল তাহ'লে চেষ্টা ক'রে দেখি — ।

হ্যাঁ, আমিও তাই বলছিলাম।

ওরা সেই পথের সস্তা হোটেলে যেতেই সবাই উৎসুক হয়ে তাকাল। অনেক লোকই খাচ্ছে। কতগুলো ইঁট রেখে তার ওপর কাঠের তক্তা পেতে অস্থায়ী বেঞ্চ তৈরী করা হয়েছে, টেবিল বলে কিছু নেই, সেই কাঠে বসে তার ওপরই খাবারের থালা রেখে একরকম না লুচি না পরটা ঘুগনি সহযোগে খাচ্ছে সবাই। এমিলি খাদ্যবস্তু হিসেবে একটাকেও চিনতে পারল না। তবু সবাই যেহেতু খাচ্ছে তাই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যেই সেই ছাউনীর তলায় ঢুকে পড়ল। কিন্তু বসবার জায়গা

নেই কোথাও। চারপাশে চেয়ে অসহায়ভাবে দেখতে লাগল। আর যে সব লোক বসে খাচ্ছিল তাদের কেউ বিস্ময়ে কেউ জিজ্ঞাসায় ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। আবার অর্থহীন চোখেও তাকিয়ে দেখছিল তাদের কয়েকজন। এছাড়াও কিছু লোক ছিল যারা অকারণ আগ্রহে বসতে দিতে চাইছিল ওদের। তারা মনের ভাব প্রকাশ ক'রতে পারছিল না ভাষার জন্যে। তাদের মধ্যেকারই কয়েকজন সরে বসে বা দাঁড়িয়ে জায়গা ক'রে দিয়ে বিদেশী আগন্তুকদের সঙ্গে ভদ্রতা ক'রল। কিন্তু আপ্যায়ন করা যার কর্তব্য সেই দোকানীর পক্ষ থেকে কোন অভ্যর্থনাই করা হ'ল না। দোকানীর হাত যদি গোটা আণ্টেক হ'ত তাহ'লে সে পয়সা নিয়ে শেষ ক'রতে পারত। অতি নোংরা যে সব লোক খাবার পরিবেশন ক'রছিল তারা সাদা চামড়ার মানুষদের এত কাছ থেকে কোনদিন দেখে নি, কাজেই ওদের কাছে ঘেঁষতে যাওয়াও সমীচীন নয় অনুমান ক'রে আপন এক্তিয়ারভুক্ত মানুষদের মধ্যেই কাজ ক'রতে লাগল। সর্বোপরি তাদের একটা যথার্থ ধারণা আছে যে এই পৃথিবীতে আংরেজী নামক একটা ভাষা আছে যা সাদা চামড়ার লোকদের ভাষা, যেহেতু জন্মসূত্রে জ্ঞাত ভাষা ছাড়া হিন্দি নামে আর একটা মাত্র খিঁচুড়ি ভাষা জানা আছে তাই সাদা চামড়ার মানুষদের কাছে পিঠে না যাওয়াই ভাল মনে ক'রেও তারা দূর দিয়ে যাতায়াত ক'রছে।

এমতাবস্থায় সামান্য সময়ের মধ্যেই এমিলিদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। কাকে ডেকে যে কি বোঝাবে বা কিছু বলবে সেটাই বুঝে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ এমিলির নজরে এল ওপাশের কোণে বেশ বড় দুটো উনুন জ্বলছে আর তারই পাশে বড় বড় ডেকচিতে নানা রকম খাবার রয়েছে সাজানো। সেখান থেকেই পরিবেশন করা হচ্ছে। সে সব লোককে পাশ কাটিয়ে সেখানটায় পৌঁছে একটা মটর ঘুগনীর ডেকচির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বাংলায় জিজ্ঞেস ক'রল, এটা কি? দিল্লির অধিবাসী সেই পাঞ্জাবীদের কাছে ইংরিজি আর বাংলায় তফাৎ সামান্যই। তাই শ্রোতারা সকলে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। এর মধ্যে একজন কিঞ্চিৎ পণ্ডিত ছিল সে-ই সাহস ক'রে এগিয়ে এল পরিত্রাতা হতে। অনভ্যস্ত আধো ইংরিজিতে জিজ্ঞেস ক'রল, কি চাইছ?

আমরা খাবার চাই — এমিলি জানাল।

নেহাৎ দর্শক নয় খদ্দের, এই বুঝে এবং অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে সময় ক'রে এগিয়ে এল দোকানীর পক্ষের একটি সুবেশ যুবক। সে এমিলির বলা সামান্য ইংরিজি 'আমরা খাবার চাই' টুকু বুঝল। দু হাতের তালুতে রুটি তৈরী করার ভঙ্গী ক'রে বোঝাবার চেষ্টা ক'রল আর হিন্দী নামই বলল, চাপাটি আর সব্জী. মটর টম্যাটো, ডাল ফ্রাই, আরও কিছু নাম আপন মনে বলে গেল। এমিলির কাণে নামগুলো শব্দ হয়েই বাজল কেবল। সে ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রল খাবারগুলো, তারপর স্টুঘাণকে ডেকে বলল, কাকু তুমি এর মধ্যে কি পছন্দ ক'রতে পার দ্যাখ।

তোমার যেমন ইচ্ছে নাও। কাকা মত দিলেন।

অনেক দেখে এমিলি রুটি আর মটর টম্যাটো ইত্যাদি ঘুগনীর জন্যে বলল। বেঞ্চির ওপর অন্য সকলের মত এবং সকলের দৃশ্য হয়ে কাকা-ভাইঝি বসে পড়লেন খেতে। স্টুঘাণ খুব উৎসাহ এবং আনন্দের সঙ্গেই আরম্ভ ক'রলেন। অভিজ্ঞতা ভালই লাগছিল। অন্য সকলে যে তাঁদের দেখছে সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। আপন মনে অল্প অল্প ক'রে খেতে লাগলেন। এমিলি কাকার মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারল তাঁর মুখে এই খাবার বিশেষ ভাল লাগছে না তাই সে বলল, তোমার পক্ষে খাবারগুলো ঠিক হয় নি।

না না ঠিক আছে — স্টুঘাণ খুবই উৎসাহ প্রকাশ ক'রলেন চোখে মুখে, তারপর বললেন, আমি বেশ উপভোগ ক'রছি।

এমিলি বিশ্বাস না ক'রে বলল, আমার তো এদেশের খাবার কিছু কিছু অভ্যেস হয়ে গেছে — তোমার কিছুটা সময় লাগবে।

কেন? খাবার তো খাবারই। এটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

এমিলি জানে অসুবিধে হচ্ছে বলে তাকে বিব্রত ক'রতে চাইছেন না কাকা। তাই সে-ও আর নিজের উপলব্ধি নিয়ে পীড়াপীড়ি ক'রল না। ভেবে নিল এখানে কাকা যতটুকু যা খাচ্ছেন খান পরে বরং অন্য কোথাও তাঁকে সে খাইয়ে নেবে।

এমনি ক'রে সারাটা দিন ইচ্ছামত ঘুরল এমিলিরা। হোটেলে ফিরল সেই সন্ধ্যে লাগিয়ে। এসে দেখল যে লোকটি তাদের তদারকি ক'রছে সে বিরস মুখে ওদের জন্যে অপেক্ষা ক'রছে। এদের দেখেই সে যেন উজ্জ্বলতা ফিরে পেল, উঠে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস ক'রল, আমাকে যা চিন্তায় ফেলেছিলেন সে বলবার নয়। সারাদিনে চারবার খবর নিয়েছি। সেই যে সকালে বেরিয়েছেন সমস্ত দিনের মধ্যে পাত্তা নেই! বিদেশ — একেবারে নতুন — আমি তো ভয় পেয়েই গেলাম পথে হঠাৎ কোন অসুবিধে হ'ল কি না!

স্টুঘাণ চট ক'রে জবাব দিলেন, না কোনই অসুবিধে হয়নি। শহরটা দেখছিলাম।

সে তো আমিই আপনাদের নিয়ে যেতাম।

তা তো যেতেনই কিন্তু আমরা যে আপন বুদ্ধিমত ঘুরলাম।

আমি তো জানিও না। তাই চিন্তা কমছে না কিছুতেই। যাকগে, শহর কেমন দেখলেন?

বেশ ভাল। বিশেষ ক'রে কলকাতার সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নেই।

কলকাতা পুরাণো শহর তো!

শুধু তাই নয়। অন্য কোন একটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য আমি দেখতে পাচ্ছি, কারণ উপলব্ধি ক'রতে পারছি না।

হবে কোন — বলে ব্যাপারটা পাশ কাটিয়ে যেতে চাইল।

এমিলি বলল, ওখানে বাস ক'রতে থাকলে তবেই সেটা বুঝতে পারা সম্ভব। আমরা হঠাৎ এসে পারব না।

সোয়াইকা কোম্পানীর দিল্লির ম্যানেজার সে একথার কোন রস গ্রহণ ক'রতে পারছিল না। কলকাতা দিল্লি দুই-ই তার দেখা। ব্যবসার প্রয়োজনে কোন শহরের কতটা গুরুত্ব সে সম্পর্কে তার যে ধারণা তাই সে এ প্রসঙ্গে ব্যক্ত করা প্রয়োজন মনে ক'রল। বলল, আগে কলকাতার কারবার বম্বের বরাবর ছিল। এখন দিল্লি ছাড়া কোন কাজ হয় না। তা ছাড়া এদিকে কাজ কারবার অনেক জোরদার হয়ে গেছে।

স্ট্রঘাণ তাঁর কথার পরিপ্রেক্ষিতে ভদ্রলোকের কথা শুনে হকচকিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন একটু। দুম ক'রে এমন একটা কথা এসে তাঁদের মাঝখানটায় লাফ দিয়ে পড়বে এ যেন তিনি ঠিক অনুমান ক'রতে পারেন নি। সামান্য একটু সময় যেতেই অবশ্য তিনি সে ভাব সামলে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ। কলকাতা দেখে মনে হয় অনেকটা ম্লান।

এমিলি শুনল, কিছু বলল না। ম্যানেজার ভদ্রলোক কলকাতা সম্পর্কে আলোচনায় আদৌ কোন উৎসাহ না থাকায় সে প্রসঙ্গ বাদ দেবার জন্যে বলল, আপনারা যা যা দেখতে চান তার কোন পরিকল্পনা যদি ক'রে থাকেন —

হ্যাঁ আমরা কাল পর্যটক বিভাগের দপ্তরে গিয়েছিলাম। তারা একটা খসড়া ক'রে দিয়েছেন। তবে আমাদের একটু হিমালয়-এর দিকে যাবার ইচ্ছে। — স্ট্রঘাণ জানালেন।

এমিলি চট ক'রে বলল, হরিদ্বার।

স্ট্রঘাণ বললেন, সেজন্যে আপনাকে কোন কষ্ট ক'রতে হবে না। তবে আমরা কাল শুনলাম ওদিকে বেশীদূর যেতে হলে অনুমতি প্রয়োজন হবে।

তার জন্যে কোন চিন্তা ক'রবেন না, আমি সেসব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমি জানতে চাইছিলাম দিল্লির মধ্যে বেড়ানোর প্রোগ্রাম বা আশেপাশের জায়গাগুলো দেখবার জন্যে যেমন চাইবেন গাড়ী পাঠিয়ে দেব।

ধন্যবাদ জানিয়ে স্ট্রঘাণ বললেন, গাড়ীর কোন দরকার নেই। আসল কথা কি গাড়ীতে সব দেখা যায় না। সেইজন্যে আমরা গাড়ী ব্যবহার ক'রতে চাই না। বরং সাধারণ বাস রিক্সা ভাল।

হঠাৎ ম্যানেজার খুব নরম সুরে বলল, দেখুন আপনারা যদি কোন সেবা গ্রহণ না করেন তাহ'লে মনোহরলালজী বলবেন কি শর্মা কোন কাজের নয়। নিশ্চয় কোন ত্রুটি ক'রেছে যার জন্যে অতিথিরা সন্তুষ্ট হন নি।

স্ট্রঘাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, ও না। এ হতে পারে না। আপনাদের আয়োজন ও বন্দোবস্তের জন্যে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। মিস্টার সোয়াইকা এবং আপনার সহযোগিতার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।

তবে দয়া ক'রে আমার ওপর মালিকের যা নির্দেশ তা পালন করবার সুযোগ

দিন। — অনুরোধের সুরে শর্মা বলল।

নেহাৎ নাছোড়বান্দা দেখেই স্ট্রঘাণ প্রস্তাব ক'রলেন, আসুন এক কাপ ক'রে কফি খাওয়া যাক সেই সময় পরামর্শ করা যাবে।

আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে শর্মা ওঁদের সঙ্গে কফির টেবিলে বসল। একটু চিন্তার অবসর পেয়ে স্ট্রঘাণ বললেন, আসলে আমি যা দেখতে চাই তা দেখতে হলে এইভাবে ঘুরে বেড়ালে চলবে না। এখানে আপনাদের মত হয়েই কিছুদিন থাকবার সুযোগ পেলে সে দেখা সম্ভব হ'ত। তবে এর মধ্যেই যা দেখলাম তাতে দিল্লিতে সেভাবে থাকা অসম্ভব।

কেন? — শর্মা জানতে চাইল।

এখানে জীবন প্রচণ্ড চঞ্চল। গতিসর্বস্ব।

সবাই বলে আমেরিকায় না কি মানুষ ছুটে চলেছে। আমরা না কি সে তুলনায় গরুর গাড়ীর যুগে আছি —

তুলনা করা অসম্ভব। আমি ক'রতে পারব না। ব্যাপার কি জানেন দ্রুততা সব জায়গাতে একরকম বেগ সম্পন্ন হবে এমন কোন কথা নেই কিন্তু দ্রুততার নাম দ্রুততা-ই। অন্য কোন নাম নেই। তার চরিত্র সর্বত্রই এক।

শর্মা এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বলল না। যদিও স্ট্রঘাণ থেমেছেন তবু সে চুপ ক'রে রইল এই কথার পরিপূরক কথাগুলো তিনি নিজেই বলবেন বলে। ঘটনাটা অবশ্য সেইরকমই ঘটল। কয়েকটি মুহূর্ত কাটিয়েই স্ট্রঘাণ বললেন, এই যে মাত্রার তারতম্য, ফল লাভের বেলায় এর প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে কিন্তু তা দিয়ে গুণগত বিচারে কোন পার্থক্য করা যায় না। আর যেহেতু একজন ক্লান্ত মানুষের পক্ষে ছুটে চলা অসম্ভব তাই আমি চাই বিশ্রাম।

শর্মা এক বিশাল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের এমন এক শাখার কর্তাব্যক্তি যে শাখাটি দেশের রাজধানীতে। তাই ক্ষুরধার ব্যবসায়িক বুদ্ধি তার নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু সেই বুদ্ধি দিয়েও সে বিশ্লেষণ ক'রতে পারল না মিঃ স্ট্রঘাণ-এর বক্তব্য। অতবড় একজন ব্যবসায়ী বলে যার পরিচয় মালিকের বার্তায় সে পেয়েছে, সেই মানুষের কথা শুনে সে যে বিস্মিত হবে তা-ও যেন ঠিকমত পেরে উঠছে না। অথচ মালিকের গোপন নির্দেশ এই ব্যক্তির যেন কোন অসুবিধে না হয়। বিশেষ নজরে রাখতে হবে। কিন্তু যে মানুষ সুবিধে নিতেই চায় না তার অসুবিধে দূর করা কার সাধ্য? কর্তা বুদ্ধিমান মানুষ, বোঝালেই বুঝবে কিন্তু তাকে বোঝাবেটা কি? কি রিপোর্ট পাঠানো যায় কলকাতায়? তা ছাড়া মালিক যদি চলেই আসে। যেমন হঠাৎ মাঝে মাঝে এসে পড়ে তেমনি যদি আসে? তবে তো দেখবে অতিথিরা নিজেদের মত পথে পথে ঘুরছে আর শর্মা কিছুই ক'রতে পারে নি। কি ক'রে সম্মানটা বাঁচাবে তখন শর্মা?

এমিলি তাকে চিন্তার অতল থেকে টেনে তুলল, আপনার অত চিন্তার কারণ নেই। মিঃ সোয়াইকা জানেন আমরা কি কারণে বেরিয়েছি। আর আপনি

আন্তরিকতা নিয়ে এসেছেন এ আমরা মিস্টার সোয়াইকাকে নিশ্চয়ই জানাব।

সবই তো হ'ল মহাশয়া কিন্তু আমার দায়িত্ব তো পালন ক'রতে পারলাম না। আপনি হয়ত জানেন না দায়িত্ব পালন করার দায় কতখানি।

সামান্য একটু হাসল এমিলি, বলল, আপনি বরং আমাদের হিমালয় যাত্রায় কিছু সাহায্য করুন।

বলুন কি ক'রতে পারি?

আমাদের কাছে এই মানচিত্র আছে। — এমিলি একটা ছোট মানচিত্র মেলে ধরল যাতে উত্তরখণ্ডের পথ ও দর্শনীয় জায়গাগুলো সব আছে। তার ওপর আঙ্গুল দিয়ে বলল, আমরা পথ চলতে যাতে কোথাও আটকে না পড়ি সেই ব্যবস্থাটা ক'রে দিন। আমরা তো সব বুঝতে পারছি না।

এজন্যে আপনারা কোন চিন্তা ক'রবেন না আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। ওদিকে আপনাদের থাকবার ব্যবস্থাও ক'রে রাখছি।

এবার আর নিজেকে সামলাতে না পেরে এমিলি, বলে ফেলল, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ মিস্টার শর্মা। কিন্তু আমরা কোথাও সেভাবে যেতে চাইছি না। আমরা নদীর মধ্যে নৌকা যেমন ভাসে তেমনি ভাবে চলতে চাইছি। দেখি না কেমন লাগে।

এবার প্রকৃতই বাক্‌রোধ হ'ল শর্মার। সে ভেবেই পেল না এর রহস্যটা কি? আমেরিকার মত দেশের একজন ধনী মানুষ বলে কি না আওয়ারার মত বেড়াতে চায়। যতক্ষণ চিন্তাটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেল সে চুপ ক'রে রইল, তারপরই বোঝাতে চাইল, পথ খুবই খারাপ। আপনাদের কষ্ট হবে।

কষ্ট। কেন হবে? — এমিলি জানতে চাইল।

সে পথে যে থাকবার জায়গা তেমন নেই। যেখানে সেখানে পাহাড়ে পর্বতে রাত কাটাতে হয়। যা দু একটা জায়গা আছে আগে থেকে ভর্তি হয়ে থাকে।

পর্যটন দপ্তর থেকে যা খবর ওরা পেয়েছিল তার সঙ্গে শর্মার কথা অনেকটাই মিলল না। বরং পুরাণো দিনের পথের সঙ্গে শর্মার বর্ণনা মিলছে। হয়ত ভদ্রলোক আগেকার পথটাই জানেন। তাই এমিলি বলল, থাকবার যা হয় হবে যাবার ব্যবস্থা না হ'লে থাকবার প্রয়োজনই হবে না।

এমিলির কথা শুনে শর্মা হেসে ফেলল, বলল, যাবার সম্বন্ধে চিন্তা ক'রছেন কেন?

স্ট্রঘাণ এতক্ষণ অন্য ভাবনায় মগ্ন ছিলেন। এবার যেন এদের কথার মধ্যে এলেন, শুধু গেলেই তো হ'ল না যেখানে যাচ্ছি সে জায়গার পরিচয়টা জেনে যাওয়া প্রয়োজন।

শর্মা পড়ল বিভ্রাটে। জীবনে কখনও এরকম পাহাড় বনে বা এমনি কোথাও বেড়াতে যাবার উদ্ভট সখ তার হয় নি। দুবছর ধরে একবার রাজস্থানে নিজের দেশে যাবার কথা ভাবছে, পেরে ওঠে নি। কাজের জন্যে যদি কোথাও

গেছে তো গেছে নইলে দিল্লি শহরের মধ্যেই কয়েক হাজারবার পাক দিয়ে তার হয়েছে কুয়োর ব্যাঙের বিশ্ব প্রদক্ষিণ। কখনও তার কাণে এসেছে বটে কোন কোন লোকে সেখানে বেড়াতে যায়, তবে সে তো কাজ না থাকা লোকে! কাজের — বিশেষ ক'রে ব্যবসায়ী লোক বিনা কাজে পাহাড়ে বনে বেড়াতে যেতে পারে এ তার চিন্তার বাইরে, কাণে এলেও বিশ্বাস সেখানে পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু এ যে জলে ভাসে শিলা! সত্যিই এরা যায় এবং শুধু যাওয়াই নয় বলে কি সেখানকার পরিচয়টা জেনে যাওয়া প্রয়োজন। পরিচয় আর কি জানবে? হিমালয় মানে পাহাড়! পাহাড়ে কিছু কিছু জঙ্গল নিশ্চয়ই থাকবে আর হ্যাঁ যে সে পাহাড় নয় ওখানে নাকি অনেক সাধু সন্ত থাকে, আছে অনেক দেবতাদের মন্দির, যেমন বদ্রী বিশালজী আছেন, আছেন কেদারনাথজী আরও কত দেবতার স্থান ওখানে আছে বলে পণ্ডিতরা বলে। এসব কি না জেনেই এসেছে সাহেবরা? আবার কি জানবে? স্ট্রঘাণের কথার সে কোন জবাব দিতে পারল না। এমিলি বলল, কাল যখন বেরোব দেখব কোন ভাল বই পাওয়া যায় কি না।

বিচক্ষণ শর্মা এসব বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল। নিজেকে সংযত ক'রে রাখল বিষয়টা সম্পূর্ণ অনুমান ক'রে নেবার জন্যে। কারণ এদের ইচ্ছার বহর দেখে ইতিমধ্যেই সে বেশ বুঝে গিয়েছিল যে এরা একটু বেয়াড়া ধরণের ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ। এদের ভাব বোঝা বিশেষ সহজ ব্যাপার নয়। অতএব চুপ করে থাকাই ভাল। কফির পেয়ালাটা খালি হতেই সে বলল, আমি তাহ'লে উঠি। ওদিকের ব্যবস্থা আমি সব ক'রে ফেলছি। কাল আপনাদের খবর দেব। প্রয়োজন হলেই আমাকে টেলিফোন করবেন।

স্ট্রঘাণ এবং এমিলি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাল।

পরের দিন পথ চলতে চলতেই বই জুটল একটা। ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা দোকান থেকে জুটে গেল বইটা। হোটেলে ফিরে স্ট্রঘাণ কিছুটা পড়েই আবিষ্কার ক'রলেন হিমালয়ের যে এলাকায় এত মানুষের মত তাঁরাও যাচ্ছেন সে এলাকাকে বলা হচ্ছে দেবালয়। অর্থাৎ দেবভূমি। পড়লেন স্ট্রঘাণ কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলেন না দেবভূমি বলা হ'ত কেন? ভাবলেন এমিলির সঙ্গে পরামর্শ করেন, পরক্ষণে ভাবলেন ও জানবে কি ক'রে? এই যে এলাকায় যাওয়া হচ্ছে এ এলাকা সম্বন্ধে এমিলির কোন ধারণা আছে এমন কথা সে কখনও তো বলে নি। যদি জানত নিশ্চয়ই সে বলত। কোন কোন জায়গা আর একবার পড়লেন, নাঃ কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না। কারণ কোথাও নেই। অনেকটা স্বগতোক্তির মতই বললেন, নাঃ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কথাটা এমিলির কাণে পৌঁছাতে সে জানতে চাইল, কিছু বলছ?

এই এলাকাকে দেবভূমি বা দেবলোক বলা হচ্ছে। এই দেখ এই বইতে আছে এখান দিয়ে স্বর্গে যাবার পথ। এখানেই না কি পথ আছে যেখান দিয়ে

পাণ্ডবরা স্বর্গে গিয়েছিল।

তারা কে? পাণ্ডব?

তুমি পাণ্ডব জান না বুঝি? মহাভারত বলে যে বই আছে এ দেশে — সেই বইতে আছে পাণ্ডবদের গল্প।

ও। আমি শুনেছি। ওরা তো পাঁচজন ভাই।

ঠিক তাই। —বলেই কথার অন্য প্রান্তে চলে গেলেন স্ট্রঘাণ, বললেন, স্বর্গ সম্বন্ধে এরা কি ভাবে কে জানে? পায়ে হেঁটে স্বর্গে পৌঁছানো —সেটা কি ব্যাপার?

এমিলি বইটা পড়েনি বা এসব কিছু সে জানেও না তাই চুপচাপ কাকার কথা শুনতে লাগল। কাকাও কথা বলছিলেন অনেকটা স্বগতোক্তির মতই। তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন এবং আপন মনে বললেন, স্বর্গ মানেটা কি? সে কি একটা দেশ?

স্বর্গে যাওয়া যখন আমরা বলি তখন সে তো একটা দেশ হবেই — এমিলি বলল।

সেটা তাহ'লে এখানেই? — স্ট্রঘাণ যেন বিরাট একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এমনিভাবে বললেন। তারপরই বললেন, আসলে কি জান একজন প্রকৃত গাইড দরকার যে সাহায্য ক'রতে পারে।

কল্যাণের নামটা এমিলির জিবের আগায় এসে পড়ল। কল্যাণের মত একজন মানুষ হলে ভাল হ'ত। নিজের দেশকে সে যেমনভাবে চেনে এবং জানে তেমন জানে কম লোকেই। কল্যাণের নাম সে বলল না। কিন্তু মন থেকেও গেল না। সত্যিই একজন সর্বোত্তম প্রদর্শক হতে পারত কল্যাণ। সে সঙ্গে থাকলে সমস্ত দেশ সব দ্রষ্টব্যই অন্য রূপ পেতে পারত। সে জানে এবং জানাতে পারে। একজন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের মত সে নিজের বোধকে অন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে পারে। আর বিশ্বজিৎ পারত কিনা কে জানে? সে এলে হয়ত হ'ত।

তার ভাবনার মাঝখানে কাকা বললেন, প্রাচীন কোন দেশকে দেখতে হ'লে সেই দেশের সভ্যতা সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা ক'রে আসা উচিত। ভারতবর্ষ হচ্ছে হিন্দুদের দেশ। হিন্দু সভ্যতা সম্পর্কে অনেক না জানলে অন্ধের মত ক'রে দেখে যেতে হয়।

জানবার মত ক'রে পড়তে হলেও তো তার জন্যে আবার গাইড দরকার।

তা তো নিশ্চয়ই।

সে আর কোথায় পেতে তুমি?

পাইনি বলেই তো এখানে এই বইটা পড়ে আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ঠিক ধরতে পারছিনা অথচ আন্দাজ ক'রতে পারছি অনেক কিছু জানবার এবং বোঝবার আছে। — থামলেন স্ট্রঘাণ, তারপর আবার সুরু ক'রলেন, ধর্ম গ্রন্থে সবকিছুই ঠিক লেখা নেই। পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘোরার মত ভুল সিদ্ধান্তও অনেকই থাকে কিন্তু সেই সব ভুল ত্রুটির মধ্যে দিয়েই সেই ধর্মগ্রন্থের জন্মস্থানটিকে

জানতে হয়। কারণ তাতে সমসাময়িক দেশটাকে আনা যায়।

সেটা কি ভুল জানা নয়?

না। কারণ আগামীকাল যদি মানুষ আরও এগোয় আজকের সিদ্ধান্ত তাহ'লে ভুল প্রতিপন্ন হতে পারে। তাই বলে আজকের মানুষদের চিনতে তো কোন অসুবিধে হবে না। যেমন ধর এই পথ দিয়ে স্বর্গে উঠতে হয় যদি লেখা থাকে তা'হলে প্রথমত এই স্থানের তখনকার অবস্থা এবং তখনকার মানুষদের চিন্তাধারা সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে নেওয়া যায়।

এমিলি শুনল। তার মনে হ'ল কাকা এমন কিছুর সন্ধান এই বইতে পেয়েছেন যা তাঁর জানার আকাংখা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ভাবনার প্রমাণ মিলল যখন স্টুঘাণ বললেন, আগে যদি এই জায়গা সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকত তাহ'লে কলকাতাতেই কিছু বই জোগাড় ক'রে পড়াশোনা ক'রে জেনে আসতাম।

এমিলি হঠাৎ আলো পাবার মত বলল, তুমি তো এদেশে থেকে যেতে চাইছ! থাকলেই জানতে পারবে।

কিন্তু এ তো বিশাল দেশ। কোন প্রান্তে থাকতে ভাল লাগবে বুঝতে তো পারছি না। অনেকদিন আগে এখানে একজন ব্রিটিশ ছিলেন চা বাগানে। তিনি একখানা অদ্ভুৎ সুন্দর বই লিখেছেন এখানকার অরণ্য আর হাতিদের সম্পর্কে। বইটা আমি পড়েছি। সত্যি বলতে কি বইটা পড়ে আমার লোভ হয়েছিল অমনি একটা চা বাগানের মধ্যে বাস ক'রতে পারলেও মন্দ হ'ত না।

চা বাগানগুলো কি খুব সুন্দর হয়?

চা বাগান সুন্দর না হলেও এদেশে পাহাড় এলাকায় যে জায়গায় চা বাগানগুলো গড়ে উঠেছে সে সবই ঘন বন। বহুরকম প্রাণীর বাস সেখানে। প্রত্যেকটি প্রাণীরই এক একটা চরিত্র থাকে। সেই চরিত্রগুলো জানতে পারার মধ্যে আনন্দ আছে। আমি সেই বইটা পড়েই প্রথম জানতে পারি হাতিদের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ মানুষের চেয়ে বেশী।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ভদ্রলোক অবশ্য মানুষের সঙ্গে তুলনা করেন নি কিন্তু তাঁর জীবনের কতগুলো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা যা লিখেছেন তাতে তুলনামলক বিচারটা আমার মনেই এসেছে।

যারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে জীবন কাটান তাঁরা অনেক কিছু জানবার এবং বোঝবার সুযোগ পান।

হ্যাঁ। আমি এমনি বেড়ানোতে বিশেষ আগ্রহী নই এই জন্যে যে সাময়িক ঘুরতে গিয়ে কোন দেশকে আদৌ জানা যায় না। কোথাও না থাকলে সমানে চলার মধ্যে দিয়ে যে দেখা সে শুধু চোখের দেখা। এই যে ধর দুপুরবেলা আমরা পার্কের মধ্যে বসে থাকায় যে লোকগুলোকে কাছে এসে কথা বলতে দেখলাম তারা পয়সার জন্যে এলেও তাদের বুঝতে পারে মিথ্যে কথার ভেতরেও

তাদের চরিত্র বোঝা গেল। ওই যে লোকটা তেল মালিশ ক'রে বেড়াচ্ছে লোকের মাথায়, সেই লোকের দেখা তুমি আর কোথাও পাবে না। এমন কি কলকাতাতেও হয়ত নয়।

ওর মধ্যে কি বিশিষ্টতা আছে?

বিশিষ্টতা ওর নয়, এই দেশের। বা বলতে পার এই অঞ্চলের। এই মালিশওয়ালা এ অঞ্চলের একটা বিশিষ্টতা। ওকে না চিনলে এ অঞ্চলের একটা বিশেষ দিক অজানা থেকে যায়।

কথাটা মনে মনে স্বীকার ক'রল এমিলি। কল্যাণও কোন দেশের বিশিষ্টতা বর্ণনা ক'রতে গিয়ে ছোট ছোট এমনি সব উদাহরণ দিত। তার দেশের কথা বলতে গিয়ে সন্ধ্যায় দরজায় প্রদীপ জালা, শাঁখ বাজানো এমনি সব ছোট ঘটনাকেই গুরুত্ব দিত। কিন্তু এই তেল মালিশ দিয়ে তো দেশের চরিত্র বোঝাতে পারে না? — কথাটা কাকাকে বলল।

স্ট্রঘাণ তাঁর স্বভাবানুগ মাথা নেড়ে বললেন, বোঝায়। এক সময় যে এই দেশে খুব আয়েসী লোকেদের সমারোহ ছিল তারই লক্ষণ এটি। সেই রেওয়াজ চলে আসছে। ধর মুসলমান বাদশাহদের আমলে যে সব রেওয়াজ ছিল তাই ভেঙ্গে ভেঙ্গে এখন এই রকম হয়েছে। আমার মনে হয় এই যে লোকগুলো তেল মালিশ ক'রে বেড়ায় ওরা সেই পুরাণো ঐতিহ্যের ধারাবাহী।

এমিলি ঠাট্টা ক'রে বলল, তুমি তো ছোটখাট একটা গবেষণার মত অনুমান করে ফেললে।

এ নিয়ে গবেষণা করা যায় — স্ট্রঘাণ বললেন। পরক্ষণেই বললেন, গবেষণার বিষয় আছে কিন্তু। তুমি দেখ আমরা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বলতে যা জানি তা কিন্তু আজ আর কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। এর কারণ কি? য়ুরোপের প্রভাবে এই সামান্য কয়েক বছরেই কি একেবারে মুছে গেল সেই সভ্যতা? না কি এর আগেই মুছে গিয়েছিল? একটা জিনিষ কিন্তু লক্ষ্য ক'রো ব্রিটিশরা এদেশে আসবার আগে সাতশ বছর রাজত্ব ক'রেছিল বাবরের থেকে আসা মুসলমান বাদশাহরা। কাজেই ওই সাতশ বছরেই ভারতের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির শেষ হয়ে গেছে।

তুমি কি ক'রে বুঝলে যে সেই সংস্কৃতি নেই?

কোথায় আছে? এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা য়ুরোপীয় পদ্ধতির, নইলে আছে কিছু মুসলমানীয় মাদ্রাসা। সেই গুরুগৃহ বা আশ্রমিক শিক্ষাপদ্ধতি কোথায়?

এমিলি সংকটে পড়ল। কাকা যে সব কথা বলছেন অত কথা তার অজ্ঞাত। তার ভারতজ্ঞানের উৎস এবং বিকাশ হচ্ছে কল্যাণ। কাকার জ্ঞানের উৎস অসংখ্য বই। কল্যাণ নিজের দেশ সম্বন্ধে যা জানিয়েছিল তা দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে ছবি মাত্র। ভারতবর্ষের ব্যবহারিক সেই জীবনকে নিজের চোখের সামনে যতটুকু দেখেছে সেইটুকুই সে বর্ণনা ক'রেছে মাত্র। কাকা বলছেন বা

জেনে এসেছেন হয়ত সেই প্রাচীন ভারতের কথা। কাকা খুঁজছেন কোথাও তার অস্তিত্ব এখনও আছে কি না? কে জানে হয়ত খুঁজে বেড়াচ্ছেন ভগ্নাবশেষ। এমিলি আজ স্পষ্ট একটা ধারণা ক'রতে পারল। কিন্তু কাকা তো থাকতে চান। থাকতে এসেছেন এখানে। তাহ'লে ভারতআত্মার কাছাকাছি থাকতে চান আর কি। এ বেশ ভালই হ'ল — মনে মনে পুলকিত হ'ল এমিলি — এ যেন সোনা খুঁজতে গিয়ে মানিক পেয়ে যাওয়া। যদি কাকার সঙ্গে তারও দেখা হয়ে যায় সেইসব পুরাণো সভ্যতা তাহ'লে তো চমৎকারই হবে। কি আনন্দই যে হবে তা আর বলবার নয়!

কাকা বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন। বোধহয় ভাবছিলেন, অতঃপর বললেন, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর স্থলভাগটুকু যেন গায়ে গায়ে মিশে গেছে। আর তার ফলেই প্রায় সব দেশেই এখন মিশ্র সভ্যতা দেখা যাচ্ছে। কোন দেশেই এখন তার প্রাচীন সভ্যতা বা সংস্কৃতি খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। এসব জানা সত্ত্বেও আমার আশা ছিল একমাত্র ভারতবর্ষে হয়ত তার প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব কিছু টিকে থাকা সম্ভব।

একথা কেন ভাবলে? এমিলি প্রশ্ন ক'রল।

ভাবলাম এ দেশের অবস্থানের জন্যে। কিন্তু এখন দেখছি অবস্থানের সহায়তা যতই থাক না কেন ক্ষত হয়ে গেছে তার বুকের মধ্যেই। এ ক্ষত সমস্ত দেহকে পচায়, এ সারে না।

তবে কি তুমি ভারতবর্ষ সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেলে?

এখনও নয়। কারণ এই বিশাল দেশের সামান্য অংশমাত্র দেখলাম। তাও ঠিকভাবে দেখা হ'ল না। কারণ এই অংশ তো প্রকৃত দেশ নয় দেশের রাজধানী।

কলকাতা তো রাজধানী নয়।

কলকাতা রাজধানী নয় এটা ঠিক, কলকাতা যে পুরাণো রাজধানী তাও আমি ধরছি না, কলকাতাকে তো দেখতেই পেলাম না! সেখানে তো প্রায় অন্তরীণ হয়ে থাকতে হল।

আমি কিন্তু এরই মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ্য ক'রছি।

কি?

কলকাতা অনেক সৌজন্যসম্পন্ন। সেখানে ট্রামে বাসে একটু গা ঠেকলেই লোকে দুঃখ প্রকাশ করে এখানে গায়ে পা লাগলেও কেউ সৌজন্য প্রকাশ করে না।

তুমি তো কলকাতায় অনেকদিন আছ, ওখানের যে জীবনস্রোত তার সঙ্গে বলতে পারি মিশেই আছ তাই তুমি একথা বলতে পার। তবে তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ। যতদূর দেখছি এখানকার মানুষেরা একটু অন্য ধরণের।

টেলিফোনটা বেজে উঠতেই আলোচনায় ছেদ পড়ল। এমিলি উঠে গিয়ে ধরে জানতে পারল একটি যুবক ওদের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রতে

চায়। নিজের পরিচয় হিসেবে বলছে স্থানীয় একটি ইংরাজী দৈনিকে সে লিখিয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে অপেক্ষা ক'রছে হোটেলের রিসেপশনে। কাকাকে জিজ্ঞেস করবার জন্যে সময় নিয়ে স্ট্রঘাণকে জানাতে তিনি বললেন, চল, রিসেপশনে গিয়েই কথা বলা যাক।

যে অপেক্ষা করছিল সে উঠে দাঁড়াল মিস্টার স্ট্রঘাণ আসতেই। এবং স্ট্রঘাণ লক্ষ্য ক'রলেন এদেশের সাধারণ লোকগুলোর তুলনায় একটু বেশী লম্বা, বেশ সুদর্শন একজন যুবক তাঁর দিকে দু পা এগিয়ে এল। স্ট্রঘাণ তাকে না চিনলেও হাত বাড়িয়ে করমর্দন ক'রলেন। এমিলি নমস্কার ক'রল ভারতীয় প্রথায়। আর প্রায় তখনই যুবকটি বলে উঠল, আপনাদের বিরক্ত করার জন্যে আমি আগেই মার্জনা চাইছি।

কোন প্রয়োজন নেই, স্ট্রঘাণ ভদ্রতা ক'রে বললেন, বসতে আহ্বান জানালেন। মুখোমুখি চেয়ারে বসে যুবকটি বলল, ক'দিন ধরে দেখছি আপনারা দিল্লিতে বেড়াচ্ছেন। তাই আপনাদের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রতে এলাম।

স্ট্রঘাণ সম্পূর্ণ অপরিচিত এই যুবককে দেখে ভেবে পাচ্ছিলেন না কি উদ্দেশ্যে এর আগমন হতে পারে। আর সেই কারণেই একটু সংশয়ী হয়ে রইলেন। মনে মনে স্থির ক'রলেন খুবই সীমিত উত্তর দিয়ে কথাবার্তা শেষ করবেন। কারণ এ যদি কোন সরকারী লোক হয় গোয়েন্দা কোন বিভাগের তাহ'লে তো ভয়ের কোন কারণই নেই যদি অন্য কোন ধরণের লোক হয় ভয় একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই। বিদেশে কতরকম বিপদই যে ওত পেতে থাকে কে জানে। ইতিমধ্যে যুবকটি পকেট থেকে ফটোসহ একটি আত্মপরিচয়পত্র বের ক'রে তাঁকে কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত ক'রল একটি সংবাদ পত্রের সঙ্গে সে জড়িত বটে। তাই তিনি বললেন, হ্যাঁ, ভারতবর্ষ দেখতে এসেছি।

নিশ্চয়ই প্রথমবার ? — যুবকটি প্রশ্ন ক'রল।

আপনার অনুমান নির্ভুল। — বলেই স্ট্রঘাণ জিজ্ঞেস ক'রলেন, আশাকরি আমার প্রশ্নে আপনি কিছু মনে ক'রবেন না, এই প্রশ্নোত্তর নিশ্চয়ই আপনার পত্রিকার কোন কাজে লাগবে না ?

ও না। এ নেহাৎই আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ। শুধুমাত্র আলাপ করবার ইচ্ছা এবং আপনাদের ইচ্ছার ওপরেই এই আলাপ নির্ভরশীল। এমিলির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার নাম হেমরাজ অরোরা। অর্থনীতির ছাত্র, দেহলী এক্সপ্রেস পত্রিকায় কাজকর্ম করি।

স্ট্রঘাণ বললেন, উনি মিসেস এমিলি মুখার্জী আমার ভাইঝি, আমি উইলিয়াম হ্যারল্ড স্ট্রঘাণ, ফিলাডেলফিয়া থেকে এসেছি। আপনি কি কখনও স্টেটস-এ গেছেন ?

হেমরাজ বলল, আমার কখনও সুযোগ হয়নি। তবে আশা রাখি হবে। আমি ওঁর জন্যেই বিশেষ উৎসুখ ছিলাম। উনি বিদেশী মহিলা কিন্তু ভারতীয়দের

মত সিঁদুর এবং শাড়ী পরা। উনিও কি, ওখানেই থাকেন?

না। আমরা কলকাতায় থাকি। ওখানেই আমার স্বামীর বাড়ী, এমিলি জানাল। কাকা আমাদের ওখানেই এসেছেন।

খুশী হয়ে হেমরাজ জানতে চাইল, ভারতবর্ষ আপনার কেমন লাগছে?

এই তো সবে এসেছি — স্ট্রঘাণ জানালেন।

অল্পক্ষণ কথা বলেই বোঝা গেল যুবকটি শুধু সপ্রতিভই নয় প্রচুর বুদ্ধিমান এবং আন্তরিকতা সম্পন্ন। ভারতবর্ষের ভাকরা নাঙ্গাল, সিন্ধ্রির কারখানা, দিল্লির কাছে ফরিদাবাদের শিল্পাঞ্চল, লুধিয়ানা প্রভৃতি হাজার জায়গার নাম সে শোনাল যা তাঁদের দেখা উচিত। যুবকটি দ্রষ্টব্য হিসেবে যা যা দেখতে বলছে সবই হচ্ছে আধুনিক জীবনের জন্যে প্রয়োজনের সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা মাত্র। বস্তু জাগতিক বিকাশের প্রচেষ্টা। স্ট্রঘাণ শুনলেন। তার কথা শেষ হলে খুব ধীর স্বরে জানতে চাইলেন, আপনি কি আমায় জানাতে পারেন এখানে কোথাও গুরুগৃহ আছে কি না?

গুরু গৃহ! যুবকটি যেন আকাশ থেকে পড়ল, পাল্টা জানতে চাইল, সে কি?

স্ট্রঘাণ হতাশ হলেন। মনে ক'রলেন তিনিই বোঝাতে পারছেন না, তবু তাঁর কেমন সন্দেহ হ'ল, উৎসাহিত যুবকটিকে আহত ক'রতে না চেয়েও নম্রভাবে প্রশ্ন ক'রলেন, আপনি কি ভারতবর্ষকে চেনেন?

কেন চিনব না? যুবকটি সপ্রতিভ উৎসাহে উত্তর দিল, আমাদের দেশ।

তাহ'লে আমাকে দয়া ক'রে একটু সন্ধান দিন বৈদিক সভ্যতা এখন কোথায় দেখতে পাব।

বৈদিক সভ্যতা? — হেমরাজ তার অতি আধুনিক মনের দিকে তাকাল তারপর জানাল, সে তো অতি পুরাণো ব্যাপার। ওসব আজকাল চলে না।

চলে না? জানেন?

হ্যাঁ খুব জানি। — বলে যুবকটি একটু উপেক্ষার হাসি মিশিয়ে বলল, আপনাদের আমেরিকা থেকে আসতে দেখে অনেক লোক এসে অনেক কিছু বুঝিয়ে যাবে। ওসব শুনবেন না।

কেন, আমেরিকা থেকে এসেছি বলে ওসব বোঝাবে কেন?

এইজন্যে বোঝাবে যে আপনারা সেইসব দেখতে গিয়ে তাদের পেছনে পয়সা খরচ ক'রবেন। এখন অনেক সাধুটাধু ধরণের লোকও এইসব কথা বলে বেশ টাকা পয়সা রোজগার ক'রছে।

সে কি! — এবার স্ট্রঘাণ কৌতুক ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন, বলেন কি?

হ্যাঁ, একটু সাবধানে থাকবেন। সকলের কথা শুনবেন না।

স্ট্রঘাণ চোখ পাকিয়ে বললেন, বেশ। শুনব না।

কাকার রকম দেখে এমিলি অনেক কষ্টে হাসি চাপছিল। কিন্তু তিনি তখন আবার বলছেন, তাহ'লে কার কথা শুনি বলুন তো। কারণ একটা কথা

আমি জানতে চাই —।

বলুন কি কথা?

আপনাদের দেশ অধ্যাত্মমার্গী। আপনাদের জীবনের সঙ্গে ঈশ্বর এবং ঐশ্বরিক প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। বহু ত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্ম আপনাদের মাটিতে হয়েছে এখন তেমন কোন যোগী বা তপস্বীর সন্ধান কি জানেন?

সে দেখতে হ'লে আপনাদের কুম্ভ মেলার সময় আসতে হ'ত। তখন বহু সাধুসন্ত এক জায়গায় হয়।

তারা কোথায় থাকেন?

হেমরাজ এ প্রশ্নে বিব্রত হ'ল। নিজেকে মুক্ত করার জন্যে সে বলল, ওই হিমালয়ে থাকে।

হিমালয় তো একটুখানি জায়গা নয়। স্ট্রঘাণ ভাবলেন। স্থির করলেন, আর এখানে সময় না কাটিয়ে হিমালয়েই যাবেন। তবে মনে মনে তিনি হতাশ হলেন এই ভেবে যে কেউই তাঁকে সাহায্য ক'রতে পারল না। ঠিক স্থানের সন্ধান দেবার লোকের সন্ধানই তিনি পেলেন না। অথচ সমগ্র ভারতবর্ষের যে শিক্ষা-ব্যবস্থা, সভ্যতা, এক কথায় বলতে ভারতবর্ষের সামগ্রিক জীবনচর্যাতেই এসেছে বিপুল এবং ব্যাপক পরিবর্তন। পরিবর্তন মানে তা এমনই যার সঙ্গে তার স্বকীয়তার কোনই মিল নেই। কিন্তু কোথাও কি অবশিষ্ট কিছু নেই? অতবড় সংস্কৃতি কি একেবারে নিঃশেষে মুছে যাবে? সে কি সম্ভব? কালস্রোত কি এমনি ব্যাপক, এত ভয়ঙ্কর?

রাতেও কথাটা ভাবলেন একা বারান্দায় বসে। দ্রুত ধাবমান গাড়ীগুলো আলোর বিন্দুর মত সরে যাচ্ছে নিচের পথ দিয়ে। ওপাশের রাস্তাটাকেও দেখা যাচ্ছে, লাল আলোর বিন্দুগুলোর ছুটোছুটি সেখানেও। এমনি ছুটোছুটি তাঁর মনের মধ্যে যন্ত্রণার মত। কলকাতায় এমন বেদনা বোধ হয় নি তাঁর। সেখানে যেহেতু পথে বিশেষ বেরোতে পারেন নি তাই আশা ছিল দেখতে ঠিকই পাবেন, কিন্তু এখানে এসে যেন নৈরাশ্য ঘিরে ধরছে তাঁকে। সে ক'জনের সঙ্গে কথা বললেন কেউ কোন সন্ধান দিতে পারল না। হোটেলের অভ্যর্থনায় একটি সপ্রতিভ মেয়ে থাকে, দেখে বেশ উৎসাহ পাওয়া যায়। তার সঙ্গেও আলোচনা ক'রে দেখেছেন। সে-ই বরং বলেছে, জীবন এখানে এখন দ্রুত। আপনাদের দিকেই ছুটছি আমরা।

কেন? শান্তির দিকে নয় কেন? — আলোচনা ক'রতে চেষ্টা করেছেন আন্তরিকভাবে। মেয়েটি বলেছে, এটা বোধহয় বর্তমান কালের বিশেষত্ব। শান্তি চায় না মানুষ, সুখ চায়।

সুখ। সুখ কি?

তা তো জানিনা।

মেয়েটির কথা ভাল লেগেছে স্ট্রঘাণের। ছেলেমানুষ বয়েস। এমিলিরই মত কিংবা তার চেয়েও কিছু কমই হবে, স্নেহের সুরে বলেছেন, সুখ যদি নিজের

ইচ্ছাপূরণের নামান্তর হয় তাহ'লে কিছু বলবার নেই। তবে যদি প্রকৃতই সুখের সন্ধান কেউ করে তবে জানবেন শান্তি ভিন্ন সুখ হয় না।

দু একটা কথা বলতে গিয়েই আপন মনের আগ্রহে আলোচনার সূত্রপাত ক'রে ফেলেছেন স্ট্রঘাণ কিন্তু মেয়েটি হোঁচট খেয়েছে। চাকরীর প্রয়োজনে তার শিক্ষা গ্রহণ, আর চাকরিকে যথাযথভাবে ক'রে যাবার জন্যে যে রকম মার্জিত কথাবার্তার প্রয়োজন সেটুকুই অভ্যাস ক'রে রেখেছে। তাই তাঁর জ্ঞান মেশানো আবেগের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে চুপ ক'রে শুনেছে তাঁর পরবর্তী কথাগুলো। তার নীরবতার অল্পক্ষণেই আত্মস্থ হয়েছেন স্ট্রঘাণ। ভেবেছেন অভ্যর্থনার জায়গায় বসে বেশী কথা বলা মেয়েটি হয়ত ঠিক মনে ক'রছে না। তাই পরক্ষণেই নিয়মমাফিক প্রশ্ন ক'রেছেন, তুমি কি আমাকে সাহায্য ক'রতে পার, বলতে পার ভারতবর্ষের পুরাণো জীবন কোথায় দেখতে পাব?

মেয়েটি ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল স্ট্রঘাণের মুখের দিকে। সে এই প্রশ্নের অর্থ খুঁজে পেল না জবাব কি দেবে। 'ভারতবর্ষের পুরাণো জীবন' কথাটা মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল, কি এর অর্থ? ব্যাপারটা কি? সেটা যে কি জিনিষ আজই ম্যানেজার সহায় সাহেবকে জিজ্ঞেস ক'রতে হবে। বিদেশীরা, বিশেষ ক'রে এই আমেরিকার লোকেরা এক একটা এমন এমন প্রশ্ন ক'রে বসে যে জবাব দেওয়া যায় না। কিন্তু দিতে হয়। খদ্দের সন্তুষ্ট রাখতে তাদের সব সময় সপ্রতিভ থাকতে হয়। হোটেল-এর চাকরি, একটু বোকামী ধরা পড়লে আর পরিত্রাণ নেই। কাজেই সামান্য ভেবেই সে বলল, দুঃখিত। দিল্লিতে ওই বস্তুটা আপনি কোথাও পাবেন না।

স্ট্রঘাণ মাথা নাড়লেন। ঠিকই বলেছে মেয়েটি। এটা তিনি নিজেও বুঝেছেন। এই না পাবার একটা কারণও আছে, স্ট্রঘাণ মনে মনে হিসেব কষতে বসলেন, দিল্লী তো পরবর্তীকালের। দখলীকৃত ভারতবর্ষের রাজধানী। প্রাচীন ভারত — সেই ঐতিহ্যময় ভারতে তো দিল্লী ছিল না। তিনি যে ভারতবর্ষের কথা পুরাণো দিনের পর্যটকদের লেখায় পড়েছেন তাতেও হিন্দুযুগের শেষের দিকে দেখা যাচ্ছে এ দেশে কোন মদের দোকান মাংসের দোকান ছিল না। চণ্ডাল জাতীয় অর্থাৎ বদপ্রকৃতির লোকেরা ছাড়া এদেশে কেউ প্রাণী হত্যা ক'রত না। এ তো মাত্র পনের ষোলশো বছর আগের কথা। এই তো ভারত। এই ভারতই তো মাত্র দেড় হাজার বছর আগে দেখেছিলেন কুঙ্গ, তাও-চিং, নিয়ারকাস, মেগাস্থিনিস, আলবেরুণী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা ও পণ্ডিতেরা। দিল্লী আধুনিক কালের রাজধানী, আধুনিক শহর। এখানে সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের বিন্দুমাত্র অবশেষ খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। সেই একই ভূখণ্ড একই ভারতবর্ষ নামে অবস্থিত আজও, তবু যেন এই দেশ সেই ভারতবর্ষ নয়।

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে। স্ট্রঘাণ এই চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চাইলেন। ভাবলেন একটা দেশের যেটা জীবনযাত্রা সেটা সমস্ত দেশ জুড়ে থাকে। তা খুঁজে

বেড়াবার বস্তু নয়। এখন কোথাও কোন সামান্য একটি অংশের মধ্যে যদি সেই ভাবনার ঐতিহ্য লুকিয়ে থাকে তাহ'লে তা যাদুঘরে রাখা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কংকালের মত। সেই প্রাণীর অস্তিত্বকে তা প্রকাশ করে না। যে প্রাণের সন্ধান চাইবে সে ওই কংকালের সামনে দাঁড়িয়ে প্রীতির চেয়ে বেদনাই অনুভব ক'রবে বেশী। স্ট্রঘাণ বেদনা পেতে চান না কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর মনে হ'ল বেদনা অবশ্যম্ভাবী। ধীরে ধীরে সে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠছে। তার উত্থানের চাপে ফুলে উঠেছে মাটি তারপর স্পষ্ট হবে তার প্রকাশ এবং তা হবে অবিলম্বেই।

তাঁকে স্থিরভাবে বসে থাকতে দেখে এমিলি প্রশ্ন ক'রল, কি ভাবছ?

স্ট্রঘাণ নিজেকে উন্মোচিত ক'রতে চাইলেন না, বললেন, ভাবনার চেয়ে বড় আয়তন আর কিছুর নেই। এই যে মহাজগৎমণ্ডল যার নাকি অন্ত নেই আমার মনে হয় ভাবনার অসীমতা তারও চেয়ে বেশী।

এটা তুমি ঠিকই বলেছ — এমিলি বলল, এক এক সময় দেখেছি ভাবনার মধ্যে ঢুকে পড়লে তা থেকে আর বেরোনোই যায় না।

তাহ'লে কি এর জবাব দেওয়া যায়?

খুবই খুশী হ'ল এমিলি। কাকা এই বৃদ্ধ বয়সেও শিশুর মত। তাঁর ব্যবহার, ভাবনাচিন্তা, কথাবার্তা এমন কি স্বপ্ন দেখাও একটি প্রাণবন্ত শিশুর মতই। তাই মাঝে মাঝে কাকাকে বন্ধুর মত পেতে ইচ্ছা করে। প্রশ্ন ক'রতে ইচ্ছা করে এই শিশুর সরলতা দীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় তাঁর অব্যাহত রইল কি ক'রে? ভোরের স্তিমিত উজ্জ্বলতার প্রশান্তি সূর্য পরিক্রমার শীর্ষবিন্দুর কাছাকাছি যেতে যেতে মিলিয়ে যায়, জীবনের মধ্যযামের খররৌদ্রও কেন ম্লান ক'রতে পারেনি জীবন প্রত্যুষের কোমলতা? কোন কারণে সম্ভব হয়েছে এটা? আরও তার জানতে ইচ্ছা করে এমন নিবিড় প্রশান্তিকে কি স্পর্শ ক'রতে পারেনি কোন নারী হৃদয়? অথবা এই মধুর হৃদয় কি স্পর্শ করে নি কোন নারীকে? কোন প্রশ্নই করা হয়নি। সম্ভব হয়নি। কিন্তু অব্যাহত ইচ্ছায় মাঝে মাঝে পীড়িত হয় সে। তখনই মনে হয় পিতৃব্য না হয়ে বন্ধু হলে জানা যেত মানুষটিকে, বোঝা যেত।

নিজের কাকা — আজন্ম আপনার মানুষটির সঙ্গে দেশভ্রমণে বেরিয়ে নতুন ক'রে দেখল এমিলি তাঁকে। যা কিছুই দ্যাখেন মুগ্ধ হয়ে দ্যাখেন। এই সরল মুগ্ধ দৃষ্টি যে তাঁকে কে দিল এমিলি ভেবে পায় না। সে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে। দৃশ্যের মধ্যে এমন বিভোর হতে পারা যে কি ক'রে সম্ভব তাও সে ভেবে পায় না। কাকার সান্নিধ্যে সবকিছুকেই সুন্দর দেখত কিন্তু এমনভাবে দেখত না সে-ও। আরও একটা পার্থক্য চোখে পড়ে। কল্যাণ যা দেখত তাকে এমনই ব্যাখ্যা ক'রত যে দৃশ্যের চেয়ে সে ব্যাখ্যা হয়ে উঠত সুন্দর। কাকা নিঃশব্দ। তাঁকে বহুবার প্রশ্ন ক'রেও সামান্যই বর্ণনা পাওয়া যায়। মনে হয় সমস্ত দৃশ্যকে তিনি এমনভাবেই হৃদয়ের ভেতরে ভরে নেন যাতে এক ফোঁটাও

কোনভাবে বাইরে যেতে না পারে। এমিলি বোঝে আসলে কাকা নিজেকে বেশী প্রকাশ ক'রতে চান না। কোনদিনই নয়। তাঁর মনের খুব কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছালে তবেই সামান্য ভাগ পাওয়া যায় তাঁর নীরব চিন্তার।

স্ট্রঘাণ তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। ঠিক দেখতে পাচ্ছিলেন না দিল্লী শহরটাকেও। চোখের দেখাই দেখা নয়, দেখা অন্য কিছু। চোখের দেখার সঙ্গে আরও কিছু। সে দেখা এমনিভাবে পথে পথে হাজার বছর ঘুরে বেড়ালেও হবে না। আসলে কিছু দেখতে হলে তার ভেতরে ঢুকতে হয়। ঢুকতে হলে তার জন্যে চাই সিঁড়ি। কোন দেশ দেখতে হলে সিঁড়ির কাজ করে সেই দেশের মানুষ। তাই বলে প্রসেনজিৎ-এর মত মানুষ নয়। প্রসেনজিৎ নামে এদেশের হলেও এদেশের মানুষ নয়। এদেশের সঙ্গে তার মানসিক যোগ নেই। নেই সামান্য বাহ্যিক পরিচয়ের সংযোগ মাত্রও। এমন মানুষের সঙ্গ চাই যার হৃদয় আছে, যে প্রাণবন্ত! নিজে যে নিবিড়ভাবে না জেনেছে তার কাছে কি আর জানা যাবে? অন্ধ কি পথ দেখাতে পারে! কিন্তু তেমন মানুষ কই? শর্মা নামক এই যে লোকটি খুবই তৎপরতার সঙ্গে যত্ন ক'রে সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছে এ তো দিল্লী বলতে চেনে কেবল দিল্লীর বাণিজ্যিক এলাকা আর বর্তমান কালের বিলাসবহুল উপকরণগুলো। এ শুধু দেখায় দোকান বাজার আর খবর বলে অর্থনৈতিক জগতের। মানুষটাকে সাথী হিসেবে ঠিক পছন্দ হয় না স্ট্রঘাণের। জীবন কি শুধু অর্থের? অর্থময় জীবন — এ যেন জীবনের এক নতুন রূপ স্ট্রঘাণ এই মানুষটার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ক'রছেন। এ তিনি কখনও দেখেন নি। অথচ মানুষটা ভারতীয়। এ ব্যক্তিও তার দেশকে চেনে না। জানে না নিজের দেশের পরিচয়। একজন অচেনা লোকের সঙ্গে কি দেখবেন তিনি? কি চিনবেন তার কাছ থেকে? কাজেই এর কাছে কোন রকম সাহায্য নিতেই তাঁর অনিচ্ছা। জীবনে কারও কাছে হাত পেতে কিছু গ্রহণ ক'রতে হয়নি তাঁকে, কারও কাছে চানও না। যেখানে দেওয়া যায় সেখানে নেওয়া যায়। এই লোকটিকে অথবা এর নিয়োগকর্তাটিকেই বা কি দেবেন তিনি? তাই নিতে চান না।

কিন্তু একেবারে অপরিচিত এই দেশে কিছু সাহায্য নিতেই হ'ল। প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র এবং অন্যান্য ব্যবস্থা অস্বাভাবিক দ্রুত ক'রে দিল শর্মা। হিমালয়ের কিছু অংশ ভ্রমণের কার্যসূচী ক'রে দিল। স্ট্রঘাণ যাবেন বিখ্যাত রুদ্রপ্রয়াগ এবং সেখান থেকে শোনপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ হয়ে নন্দনকানন। যাকে বলে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স। ফেরবার পথে গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর। হিমালয় থেকে নেমে ক'দিন থাকবেন ঋষিকেশ আর হরিদ্বারে। পর্যটন বিভাগ থেকে একখানা চমৎকার মানচিত্রও শর্মা জোগাড় ক'রে দিল যাতে হিমালয়ের বিস্তীর্ণ স্থান নির্দেশ করা আছে। কিন্তু মানচিত্র দেখে স্থান সম্পর্কে কোন ধারণাই ক'রতে পারলেন না স্ট্রঘাণ। পর্যটন দপ্তরে একজন লোক জানাল, হরিদ্বার হচ্ছে সাধু সন্যাসীদের দেশ। সেখানে বহু আশ্রম। প্রাচীন কাল থেকে বহু মুনি ঋষি এবং সাধুরা

ওখানেই বসবাস করেন। ঋষিকেশও তাই। দুটো স্থানই আশ্রম-মঠ-মন্দিরে ভর্তি। স্ট্রঘাণের আগ্রহে সে জানাল কিছু কিছু বেদ-এর চর্চা এখনও ওখানে হয়। বৈদিক বিদ্যালয়ও এখন পর্যন্ত কিছু কিছু ওখানেই আছে।

এটাই চাইছিলেন স্ট্রঘাণ। এতদিনে একটু আলোর আভাস তাঁর সামনে যেন ফুটছে। কিন্তু একজন দোভাষীর বড়ই প্রয়োজন। এমিলি বাংলা ভাষা শিখেছে কিন্তু এখানে বাংলা কেউ জানে না। এখানে যে ভাষা চলে তার একবর্ণও ওঁরা কেউ বোঝেন না। এই ভাষা না বোঝার জন্যে কিছুই বুঝতে পারেন না তাঁরা। স্থানীয় মানুষদের নিজেদের মধ্যে বলা কথা কানে এলেই না দেশটা সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠা সম্ভব। সেটা হয়ে উঠছে না। কে যে তাঁর ভাষা বুঝবে এই সংশয়ে কারও সঙ্গেই কথা বলা হয়ে উঠছে না। দৈবাৎ তেমন লোক পেলে তবেই বোঝাতে পারছেন মনোভাব। বড় আফশোষ হতে লাগল তাঁর এভাবে আসার জন্যে। ইতিহাস একটা দেশের সব নয়, বর্তমানটাই বর্তমানের সব। তাই ইতিহাস জানার সঙ্গে চাই বর্তমানের সঙ্গে সংযোগ। আর সে সংযোগ যে ভাবে সম্ভব সে পথ স্ট্রঘাণের বন্ধ। উপায় নেই। তাই কি একটা বোবা যন্ত্রণা মনের মধ্যে ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগল। পর্যটন দপ্তরের ভদ্রলোক অবশ্য বলেছিলেন যে ওইসব দিকে কিছু কিছু প্রদর্শক পাবেন যারা সব দেখিয়ে দিতে পারবে, তবে সাবধান বাজে লোকও জুটে যেতে পারে। বাজে লোক সম্বন্ধে স্ট্রঘাণ-এর কোন ধারণা নেই। তিনি বাজে বলতে ভাবলেন হয়ত তেমন লোক যে ভালভাবে সব জানে না।

হিমালয় যাত্রার আগে স্থির হ'ল আগ্রার তাজমহল, সম্রাট আকবর-এর প্রাসাদ ইত্যাদি সব দেখে নেবেন। এরই মধ্যে বিভিন্ন ভ্রমণ সংস্থার বিজ্ঞাপনের পত্রে জানতে পারলেন ভারতবর্ষের প্রাণ পুরুষ লর্ড কৃষ্ণের জন্মস্থান এবং কর্মস্থলও ছিল ওরই কাছাকাছি বৃন্দাবন এবং মথুরা নামক অঞ্চলে। একই যাত্রায় সেগুলোও দেখে নেওয়া সম্ভব। মধ্যকালীন ভারতীয় ধর্মের সবটুকুই যে এই কৃষ্ণ নামক ব্যক্তিত্বটিকে কেন্দ্র ক'রে সেকথা স্ট্রঘাণের কিছুটা জানা। তাই পরামর্শ চাইলেন এমিলির কাছে। তার আপত্তির কারণ থাকবে কেন? সে তো দেখবে বলেই বেরিয়েছে। বিশাল এই বিশ্বের প্রতি কোণেই যেন রহস্য লুকিয়ে আছে। তবে এ সকল দেখার মধ্যে সে-ও খুব একটা আকর্ষণ খুঁজে পায় না। এই স্কুল বাড়ী ঘর বাজার দোকান নিশ্চলতা চঞ্চলতা সবই একই অর্থদ্যোতক। মানুষের মনের সন্ধানই প্রকৃত বৈচিত্র্য সন্ধান, এমিলি সেটাই চায় কিন্তু এখানে তা আদৌ হচ্ছে না। আরও একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য ক'রছে কল্যাণের বর্ণিত ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার কোন মিলই নেই। তা নেই বলেই যেন সে এদিক সম্বন্ধে মনের গভীরে অনেকটা নিরুৎসাহ। তবে তার উৎসাহহীনতা পাছে তার কাকাকে স্পর্শ ক'রে অস্বস্তির কারণ হয় তাই সে আত্মগোপন ক'রে আপাত উৎসাহকেই প্রাধান্য দিয়ে কাকাকে চাঙ্গা ক'রে রাখে। তাই কাকা যখন বললেন, বৃন্দাবন — সে সোৎসাহে বলল,

খুব ভাল।

কিন্তু বৃন্দাবনে ভাল লাগবার মত কিছুই দেখতে পেল না এমিলি। এমন কোন স্থাপত্যের নিদর্শনও নেই যার ছবি তুলে নিয়ে দেখাতে পারে লোককে। তবু এখানে সেখানে যা পেল তারই ছবি তুলল। বিশাল একটি মন্দির তৈরী হচ্ছে দেখল। সেখানে আর একটা পুরাণো মন্দিরের সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা ক'রে শোনাতে লাগল একজন সাধারণ বুদ্ধির প্রদর্শক যার শব্দগুলো ইংরাজী হলেও বস্তুটা বর্ণমাত্র বুঝল না কেউ। শুধুমাত্র কংস, প্রভুকৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দগুলো ঠংঠং ক'রে পড়তে লাগল কাণের মধ্যে। মথুরাতে গিয়ে আর বাস থেকে নামবার উৎসাহ পেল না এমিলি। স্টুঘাণ-এরও খুব উৎসাহ ছিল না তবু নামলেন, ঘুরলেন, দেখলেন অন্য সব যাত্রীর মতই। দুঃখিত হলেন কোন স্মৃতিই ঠিকমত ধরে রাখা হয়নি। অতবড় একটা ব্যক্তিত্বকে আজ কল্পনা ছাড়া কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যায় না এই গ্রামের মধ্যে। আর সে কল্পনা কোন বিদেশীর পক্ষে করা আদৌ সম্ভব নয় বলে বাস্তবের মথুরা থেকে কোন রস গ্রহণ ক'রতে পারলেন না। শুধু এক গা ধুলো মেখে প্রদর্শক বাসের অন্যসব যাত্রীদের পেছনে ঘুরলেন। এমিলি বাসের মধ্যেই বসে রইল উনি না ফেরা পর্যন্ত। কাকা ফিরলে এমিলি জানতে চাইল, কিছু দেখতে পেলে?

স্টুঘাণকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তিনি অনেকটা স্বগতোক্তির মতই বললেন, আমি ভাবছি মানুষের কোন চিহ্নই মানুষ রেখে যেতে পারে না। এই যে জায়গাটা এখন একটা অতি সাধারণ জনপদ মাত্র একদিন তো এইখানেই ঘটে গেছে কত জমজমাট ঘটনা। কি অসাধারণ মানুষ এখানে বাস ক'রে গেছে — অথচ আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছে সব কিছু।

এমিলি কাকার কথায় উৎসাহিত হয়ে বলল, আমার এক এক সময় সন্দেহ হয় অতীতের যে সব ঘটনা তা সত্য তো? যদি একবার চোখের সামনে দেখতে পেতাম। যদি হঠাৎ দেখতাম সব ঘটছে।

স্টুঘাণ সস্নেহ প্রশ্রয়ে হাসলেন, বললেন, ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে কল্পনাকে তেমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে যদি পৌঁছোতে পার তাহ'লে দেখতে পাবে। চোখের সামনে না হ'লেও মনের সামনে দেখবে সবই ঘটছে।

তাজমহলের সামনে এসে আর সেকথা মনে হ'ল না এমিলির। এ যেন স্তব্ধতার প্রতিমূর্তি। এখানে ঘটনা নেই গভীর নৈঃশব্দ জমাট বেঁধে আছে এই বিশাল সৌধের সমস্ত অঙ্গে। অমন সুন্দর স্মৃতিমহলের সামনে দাঁড়িয়ে হারিয়ে গেল এমিলির সব চিন্তা। কিছুক্ষণ সে কিছু ভাবতে পারল না। তার যেন মনে হ'ল চারিদিকে — সব শ্বেত পাথরের গায়ে গায়ে, বাগানের গাছের গায়ে গায়ে, মাটিতে ঘাসের ওপরে — সব কিছুতে জড়িয়ে আছে চাপ চাপ বেদনা। কিসের

যেন স্মৃতিময় ব্যাথা সমগ্র আবহমণ্ডলে মিশে আছে। শুধু এক অবাঙময় অনুভব সত্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে সামনে — তার নাম তাজমহল।

স্ট্রঘাণ প্রথম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মনে পড়ল ক্যামেরার কথা। ছবি তুললেন। জীবনে বহুবার এই অনির্বচনীয় স্তব্ধতার ছবি দেখেছেন, তবু তুললেন। অটল গাম্ভীর্য নিয়ে যে প্রাসাদ যুগান্তরের বার্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই নির্বাক বার্তাবহকে সঙ্গী ক'রে রাখতে চাইলেন বিস্ময়ের মূর্তি হিসেবে। এমিলিকে বললেন, এই প্রাসাদের গঠন শৈলীতে এমন কিছু আছে যা এর ইতিহাস বহন করে।

এমিলি ভাবনার রাজ্যে ছিল। অন্যমনে প্রশ্ন ক'রল, কি রকম?

তুমি কি অনুভব ক'রছ না সমস্ত আবহমণ্ডলে কেমন একটা নিঝুম বেদনা?

এমিলি দপ ক'রে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ঠিক এই কথাটাই আমি ভাবছিলাম। মনে হচ্ছে এটা শুধুমাত্র একটা সুন্দর প্রাসাদ নয়। এটা অন্য কিছু। নিছক একটা সমাধিও নয়, বেশী কিছু।

স্ট্রঘাণ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন কারণ তিনি তখন গভীর চিন্তার মধ্যে। এমিলির কথাগুলো তাঁরও মনের প্রতিধ্বনি বলে মনে হ'ল। সেই গাম্ভীর্যের মধ্যেই গোটা প্রাসাদটা ঘুরলেন, নীচে যেখানে কবর সেখানে নামলেন। উঠে এলেন, গেলেন পেছন দিকটায়। নদী একেবারে নিচেটায় চলে এসেছে, একেবারে পাশে। রেলিং ধরে নিচের দিকে চেয়ে দেখলেন নদীকে। ভয় হ'ল যেভাবে সরে এসেছে — একদিন এই নদী গ্রাস ক'রবে না তো এই সৌধ? মানুষের তৈরী সভ্যতা কতবার কতভাবে নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে ধ্বংস হয়েছে তার ইতিহাস লেখা নেই। মানুষ গড়ে ইমারত প্রকৃতি ভাঙে, প্রকৃতি গড়ে তার বনভূমি, মনোভূমি অরণ্য। মানুষ উচ্ছেদ করে সেই অরণ্য —। এইভাবেই চলছে! চলবে। কতদিন চলবে কে জানে? তার চেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে চলা ভাল। ভারতবর্ষের সভ্যতায় তো সেই নিবিড় বোঝাপড়াই ছিল, আর তাই তিনি এসেছিলেন এই পরিবর্তিত পৃথিবীতে সে বোঝাপড়া কিভাবে টিকে আছে দেখবার জন্যে। কিন্তু এই দীর্ঘ পথ এলেন, যতদূর দেখলেন কোথাও সেই বোঝাপড়ার চিহ্ন নেই। মানুষ যেন প্রকৃতিকে জয় ক'রতে চাইছে। অতিক্রম ক'রতে চাইছে নিজের সাধ্যের সীমা। সেখানেই তাঁর আপত্তি। কারণ এই যে সভ্যতা যা মানুষ আয়ত্ত ক'রেছে তার বিনিময়ে বিলিয়ে দিয়েছে তার শান্তি। এই মানসিক শান্তির মূল্যে দৈহিক সুখ — এ তাঁর অনভিপ্রেত। এ জীবন তিনি দেখেছেন। তিনি দেখেছেন লোভের মূর্তি, লালসার রূপ, কামনার ক্ষুদ্রতা। মানুষ একদিকে যেমন নিজেকে প্রসারিত ক'রে দিতে পেরেছে চাঁদের মরুভূমি পর্যন্ত অন্যদিকে সে-ই আবার সংকীর্ণ হয়ে গেছে তার মনের মধ্যে। সেখানে সে ছোট, নীচ, তার মমতা নিজেকে নিয়ে, তার ব্যস্ততা নিজের দেহটুকুকে ঘিরেই। সেই বাণী কেন শাশ্বত হ'ল না যা

বলে সমগ্র বিশ্বই তো আমি, সবই আমার ঠিকানা, সবকিছুর সঙ্গে আমার অস্তিত্ব ওতপ্রোত। এই চিন্তার বিকাশেই তো মনুষ্যত্বের বিকাশ।

তাঁর ভাবনার মধ্যে হঠাৎ আবির্ভাব হল একজন বৃদ্ধের। চেহারা এবং পোষাকআষাক থেকে স্টুঘাণ বুঝলেন লোকটি মুসলমান। যেমন আকস্মিকভাবে সামনে এসে সে দাঁড়াল তেমনিভাবেই ইংরাজীতে বলে উঠল, আমি ভিক্ষে চাই না। না। কখনই নয়। — বলতে বলতেই উত্তেজিত হয়ে বৃদ্ধ বলে উঠল, নাশির উলমুল্ক শমশের মীরজা জংবাহাদুর — বৃদ্ধের চিৎকারের আকস্মিকতায় চমকে উঠলেন স্টুঘাণ আর এমিলি ভয় পেয়ে কাকার পেছনে সরে দাঁড়াল। লোকটির পরণে তালি দেওয়া পাজামা, গায়ে লম্বা সার্টের ওপর অসংখ্য তাপ্পি দেওয়া কোট। য়ুরোপীয় কোট নয়, অন্য ধরণের। স্টুঘাণের ভাব লক্ষ্য না ক'রেই সে আবার চেঁচিয়ে উঠল, এই তোমরা — তোমাদের জন্যেই আমার সব হারিয়েছে আজ নইলে আমি হতে পারতাম এই হিন্দুস্তানের শাহেন শা — খুদা-ই-হিন্দ। তোমরা — এই তোমরা আমার দেশ, রাজ, ইজ্জৎ সব খতম ক'রে দিয়েছ —। তোমরা তোমরা তোমরা —

হকচকিয়ে গেলেন স্টুঘাণ। হঠাৎ তাঁর প্রতি এ অভিযোগের কারণ কি? এই লোকটিকে তো তিনি জীবনে আর কখনো দেখেছেন বলে মনে পড়ে না! তবে কেন আজ অকস্মাৎ তীব্রভাবে অভিযোগ করছে লোকটি পথের মাঝে? অস্বস্তি আরও বাড়ল যখন দেখলেন তাঁদের চারপাশে প্রচুর স্থানীয় লোক জুটে গেছে মজা দেখতে। অথচ কিছু করবার পর্যন্ত নেই।

যাই হোক তক্ষুণি তাঁদের বাসের প্রদর্শক ভদ্রলোক এসে বৃদ্ধ লোকটিকে তাদের ভাষাতেই কি সব বলে ইংরিজিতে বলল, উনি ইংরেজ নন, আমেরিকান।

শোনামাত্রই সেই বৃদ্ধ তেমনি আকস্মিকভাবে সামনে এসেই বলল, তাহ'লে আমি সাহায্য চাই। আমার রাজ্য ফিরে পেতে চাই আমি। আমি ভিক্ষে চাই না। তোমরা সাহায্য কর রাজ্য ফিরে পেলে আমি তোমাদের অনেক পুরস্কার দেব।

আবার মাথা গুলিয়ে গেল স্টুঘাণের। কি ব্যাপার কিছুই বুঝছেন না। শুনলেন প্রদর্শকটি সেই বৃদ্ধকে বলছে, উনি তো তোমাকে দেখে গেলেন দেশে ফিরে গিয়ে এর ব্যবস্থা ক'রবেন। অনেক লেখা-লিখি ক'রতে হবে তো। সময় লাগবে।

ঠিক ঠিক — ইংরিজিতে বলে তার নিজস্ব ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল বৃদ্ধ। প্রদর্শক স্টুঘাণকে বলল, কিছু মনে ক'রবেন না, লোকটা পাগল। ও নাকি দিল্লীর বাদশাহদের বংশধর। ইংরেজরা দখল ক'রে না নিলে এ দেশের মসনদ ওরই প্রাপ্য ছিল। পশ্চিমের কাউকে দেখলেই ইংরেজ বলে ভুল ক'রে বকাঝকা করে। আপনি আমেরিকান বলে আপনাকে মধ্যস্থতা করবার জন্যে অনুরোধ ক'রল যাতে ওর রাজ্য ফিরে পায়।

স্টুঘাণ হাসলেন না। হাসি পেলেও চেপে রাখলেন। এমিলি সবিস্ময়ে

জানতে চাইল, ঘটনা কি সত্যি ?

কে জানে বলুন ? — প্রদর্শক যুবকটি জানাল, এমিলির কৌতূহল নিরসনের জন্যে বলল, ওইসব বাদশাদের যত বেগম আর বাঁদী ছিল সবের সুবাদেই কিছু কিছু বাচ্চা জন্মেছিল। তাদেরও বংশধরেরা তো সেই বাদশা বংশেরই মানুষ। সংখ্যাতেও তারা বেশ কয়েক হাজার। তার মধ্যে দুচারজনের, নিদেন পক্ষে একজনের পাগল হতে বাধা কি ?

কথাগুলো খুবই হালকা সুরে বলছিল যুবকটি। কিন্তু কথাগুলো যে সত্য এমিলির তাতে অবিশ্বাস হ'ল না। প্রদর্শক ভদ্রলোক তা বুঝেই বলল, তাই বলে সেই দিন থাকলে যে এই লোকটিই বাদশা হ'ত এ কথা বিশ্বাস ক'রলে কিন্তু ঠকবেন। কপালের খুব জোর থাকলে এ লোকটি হয়ত হতে পারত বাদশার অশ্বশালার প্রধান বা বড়জোর হাতীশালার হিসাব রক্ষক।

এবার স্ট্রঘাণ স্মিতভাবে হাসলেন। দু চোখ পাকিয়ে কপালে তুলে বললেন, তুমি তো বড় রসিক মানুষ হে! ভারতবর্ষের সিংহাসনের একজন দাবীদারকে ঠাট্টা ক'রছ!

কি ক'রব বলুন ওই মিয়ারও বদনশীব, আমারও।

তোমার কেন ?

ইংরেজরা এল বলেই ও দিল্লির মসনদ পেল না আর ইংরেজরা চলে যাবার সময় বদান্যতা ক'রে আমার দেশ ঘরবাড়ী সব পাকিস্তান ক'রে দিয়ে গেল!

কোথায় তোমার বাড়ী ছিল ?

পাঞ্জাব।

স্ট্রঘাণ যুবকটির কথায় মজা পেলেন। তার সঙ্গে মজা জমাবার জন্যেই বললেন, তোমার দেশ পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে বলে তুমি অসন্তুষ্ট। তাহ'লে যারটা পড়ত সেই তো অসন্তুষ্ট হ'ত!

হ'তই তো! মোঘলরা কোন দেশ থেকে এসে রয়ে গেল, কিছু লোককে দলে ভিড়িয়ে নিল তার জন্যে তাদের জমি ভাগ ক'রে দেশের অংশ দিয়ে দিতে হবে ? তাহ'লে ইংরেজ আসার পর যারা খ্রীস্টান হয়েছে তাদেরও আবার একটা অংশ ভাগ ক'রে দিয়ে দেওয়া উচিত!

স্ট্রঘাণ দেখলেন যুবকটির হালকা কথার আড়ালে বেশ বড় ক্ষত আছে। তাই কথা চাপা দিলেন, বললেন, যুবক তোমার কথা অস্বীকার ক'রার ক্ষমতা আমার নেই। স্বীকার ক'রেও লাভ নেই। অতএব এ প্রশ্ন থাক।

হ্যাঁ বরং তাজমহল দেখতে এসেছেন তাই দেখুন। শাহজাহান যে কেমন শোষক ছিল তা এই তাজমহলেই লেখা আছে।

কি রকম ? — আর একবার বিস্মিত হলেন স্ট্রঘাণ।

সামনের দিকেই যে ফলক আছে সেটা দেখাল প্রদর্শক, ওই দেখুন লেখা আছে

মমতাজকে ভালবাসার এমনই চোট যে সতের বছরের বিবাহিত জীবনে ষোলটা সন্তান জন্ম দিতে হয়েছে বেচারীকে আর সেই ধাক্কাতেই তার মৃত্যু। মানে কি? মানে নিজের ভোগ ওই মহিলার ওপর দিয়ে চরম ক'রে নিয়েছে শাহজাহান, তাতে সে মরে মরুক।

ঘ্রাণ কথাটিকে রসিকতা হিসাবেই ধরলেন এবং উপভোগ ক'রলেন। বাস্তবিকই যুবকটি রসিক। নিজের কর্তব্য এমন সুন্দরভাবে ক'রে যাচ্ছে যে ইতিহাসের মত বিষয়কে নিয়েও সে যেন খেলা ক'রছে। তবে সেই সব কথার সরসতা উপলব্ধি ক'রলেও নিজে কিছু বললেন না। তাঁর মুখভঙ্গী থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি কথাগুলো উপভোগ ক'রছেন। সেই উৎসাহে পরিদর্শক যুবকটি বলতে লাগল, এতবড় একটা দেশের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে বাদশাহরা ভোগ যতদূর পেরেছেন ক'রেছেন। বিবির তো তবু কিছু হিসেব নিকেশ ছিল বাঁদীর তো আর হিসেব রাখতে হ'ত না বাদশাহ আর বাচ্চা বাদশাহদের তাই বাঁদীর ব্যবহারটা যথেচ্ছই ক'রতেন। ফলে রাজবংশ বাড়তে আর কদিন? হিসেব ক'রে দেখলে পরে আমাদের নসিরুদ্দিন মিয়া — যে বিড়ি বাঁধে তার দেহেও হয়ত রাজরক্ত পাওয়া যাবে। আমাদের দিল্লী আগ্রা হ'ল রাজধানী অঞ্চল। এখানে রাজকীর্তিও যেমন চারিদিকে দেখবেন রাজবংশও দেখবেন পথে ঘাটের সর্বত্র। তবে এর মত উন্মাদ সবাই হয়ে যায়নি ব'লে ভারতের দাবী ক'রে এমনভাবে আত্মপরিচয় আর সবাই দেবে না। নইলে অনেককে চিনতে পারতেন। — বলেই যুবকটি সামান্য হেসে বলল, অবশ্য লাভ হ'ত না। কারণ সম্রাট জাহাঙ্গীর বা শাহজাহান-এর ঐতিহ্য তো আর নেই যেখানে য়ুরোপের বৈদ্য ব্যবসায়ী সব এসে দাঁড়ালে কদর পেত। কালের কি মহিমা দেখুন যে বাদশার সামনে দাঁড়াতে হলে বড় বড় রাজাকেও কুর্নিশ ক'রতে হ'ত আজ সেই বাদশার বংশধরেরা আপনাকে দেখলে সালাম জানাবে।

ঘ্রাণ একথার সৌজন্যমূলক জবাব দিতে পারতেন কিন্তু দিলেন না। বিদেশে বাকসংযম বিশেষ প্রয়োজন। অপরিচিত স্থানে কম কথা বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভাল বা মন্দ কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ নিজেদের মধ্যেই ক'রছিলেন তিনি। মতপ্রকাশ বা মন্তব্য বাইরে ক'রে লাভও তো কিছু নেই।

কিন্তু মন্তব্য আপনি এসে পড়ল ফতেহপুর সিক্রিতে গিয়ে। বাদশাহ আকবরের সেই মৃত প্রাসাদে গিয়ে তাঁর মনের অবস্থা এমনই হ'ল যে আত্মস্থ থাকতে পারলেন না। প্রদর্শক বলে যেতে লাগল এইখানে বাদশাহ বসতেন সকালের দিকে, শুনতেন রাজ্যের খবরাখবর, এই সেই ঘর যেখানে থাকতেন তাঁর হিন্দু মহিষী যিনি প্রত্যেকদিন সকালে সূর্য প্রণাম ক'রতেন এই উচ্চতম মহলে দাঁড়িয়ে। এই হচ্ছে তাঁর খ্রীস্টান বেগমের বাসগৃহ। এই রকম সব বর্ণনা শুনতে তাঁর যেন মনে হতে লাগল এই প্রাসাদ জীবন্ত হয়ে উঠছে। তিনি সেই জীবন্ত প্রাসাদের ভেতরেই দাঁড়িয়ে আছেন যে কোন মুহূর্তে সম্রাট আকবর

এসে হাজির হতে পারেন। স্পষ্টই তিনি প্রকাশ ক'রে ফেললেন, কাল সব কিছু বদলে দেয়। কত সহজে আমরা এখন বাদশাহ্ আকবরের প্রাসাদের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অথচ এই সুন্দর জায়গায় একদিন কত ঘটনাই না ঘটে গেছে! সেদিন আমরা কেন একটা অবোধ জন্তুর পর্যন্ত ঢোকবার ক্ষমতা ছিল এই প্রাসাদে?

প্রদর্শক ভদ্রলোক তাঁর কথা শুনে উৎসাহিত হলেন এবং বলতে আরম্ভ ক'রলেন, মনে করুন এই প্রাসাদের চারপাশে অশ্বারোহী প্রহরীরা ঘুরছে। ভেতরে ভেতরে হাবসী প্রহরীরা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে সব সময়। দাসী বাঁদীরা এঘর থেকে ওঘরে নিয়ে যাচ্ছে গোলাপ জল, আতরদান বা পারস্যের গালিচা। মনে করুন সম্রাট তাঁর শোবার ঘর থেকে বাইরে আসছেন দেখে আনত হয়ে কুর্নিশ ক'রছে প্রহরী দাস-দাসীরা। এই যে শক্ত শুকনো পাথরের ওপর পা দিয়ে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন এসব দামী গালিচায় মোড়া। এই যে শূন্য গবাক্ষ দেখছেন এসব গবাক্ষে ঝুলছে মূল্যবান রেশমের পর্দা। মনে করুন দিল্লির পথ ধরে ছুটে আসছে সম্রাটের অশ্বারোহী বাহিনীর কয়েকজন প্রধান সংবাদ নিয়ে আসছে হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে রাজপুত বাহিনী। সেই অশ্বক্ষুরধ্বনি এখান থেকে শোনা যাচ্ছে বলে সামান্য একটু উত্তেজনায় সম্রাট উৎকর্ণ হয়ে রয়েছেন।

চমক ভাঙ্গতে চেয়ে দেখলেন সব ফাঁকা। এদিক সেদিক ঘোরা ফেরা ক'রছে দর্শকেরা কাক এসে বসেছে উঁচু ছাদটায়, নিচের দিকে চেয়ে সে দর্শকদের দেখছে। শত্রুঘ্ন ভাবলেন কি জমাট জনপদই না একসময় ছিল অথচ আজ প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে গেছে। মনে হচ্ছে সমস্ত পাষাণভূমি স্তব্ধ হয়ে আছে সেই একটি অমোঘ ব্যক্তিত্বের অপেক্ষায় যে পদার্পণ ক'রলেই ঘুমন্ত পুরী জেগে উঠবে কলরোলে, চারিপাশে গাছগাছালিগুলো নিমেষের মধ্যে মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সমস্ত বিজন শূন্যভূমি ভরে উঠবে পদচারণায়। আসবে হাতী ঘোড়া উট রথ — চক্রযান নানা রকম। শুধু সেই একটি মানুষের প্রতীক্ষা। যার ছায়ার আগে চলে নকীবের হুঁসিয়ারী, প্রজাদের জয়ধ্বনি।

হঠাৎ এমিলি প্রশ্ন ক'রে বসল, কাকা, চুপচাপ কেন?

দেখছি — শত্রুঘ্ন জানালেন।

কি দেখছ?

মনে হচ্ছে সেই অতীতকে যদি হঠাৎ এখন একটিবারের জন্যে জীবন্ত দেখতে পেতাম?

সত্যিই তুমি ভাবুক। কবি।

কবিরা কি দেখতে পায়?

তারা তো শুনি অতীত — বর্তমান — ভবিষ্যৎ সবই দেখতে পায়।

আমি তেমন মনে করি না, বলে প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা ক'রলেন শত্রুঘ্ন। বললেন, এরকম একটা ইতিহাস না থাকলে কোন দেশকে দেশ বলেই মনে হয় না।

এই ইতিহাস দর্শনের পূর্ণ মানসিকতা নিয়েই আগ্রা, দিল্লি, মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি দেখা শেষ ক'রলেন স্টুঘ্রাণ। তারপর শর্মার কাছে বিদায় নিয়ে হরিদ্বারের বাসে চেপে বসলেন। শর্মা অনেক বলেছিল, গাড়ীতে পৌঁছে দেবে হরিদ্বার, কিছুতেই রাজী হননি। মনের কথা গোপন রেখে শর্মাকে বলেছিলেন, যথার্থ ভ্রমণকারীর মতই চলা উচিত কারণ এইভাবে না গেলে অনেক কিছুই না দেখা রয়ে যায়। যেখানে যেসব বাধা আসতে পারে সেসব ব্যবস্থা তো আপনি ক'রেই দিয়েছেন, ধন্যবাদ। যদি কোথাও তেমন বিপদে পড়ি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ ক'রব।

বাস পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে শর্মা বলল, আমি হোটেল রাজ-এ আপনার থাকবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি। তাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর রাখা আছে বাস কণ্ডাক্টরকে বলে দিলাম আপনাদের হোটেলের সামনে নামিয়ে দেবে।

স্টুঘ্রাণের ইচ্ছা ছিল না এরকম ব্যবস্থার। তবু ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দিলেন। এমিলি জোড়হাতে বিদায় নমস্কার জানাল শর্মাকে।

অভিভূত শর্মা আবেগে হিন্দি বলে ফেলল, আরে কি ব্যাপার! আপনি একেবারে ভারতীয় হয়ে গেছেন দেখছি!

তার স্বগতোক্তির মত কথার শব্দ মাত্র বুঝল না এমিলি। স্টুঘ্রাণও শব্দগুলোর আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্যে।

হরিদ্বারে বাস থামতে স্টুঘ্রাণ বেশ একটু অবাক হয়ে গেলেন। এত খ্যাত সেই তীর্থ নাকি এই? এ তো একটা শহর। রীতিমত ঘিঞ্জি। কলকাতার চেয়ে বেশী ঘিঞ্জি। যেখানটায় বাস দাঁড়িয়েছে এবং তাঁদের উদ্দেশ্য ক'রে কণ্ডাক্টর শুধু বলে যাচ্ছে 'হোটেল রাজ' সেখানটায় পথে পা দিয়েই দেখলেন অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ির মতই অবস্থা স্থানটার। বাস থেকেই আর একবার চেঁচিয়ে উঠল কণ্ডাক্টর, হোটেলরাজ। তিনি তাকাতেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সামনেই একটা নতুন বাড়ীর দিকে। দেখলেন, বাড়ীটার সামনেই বিশাল অক্ষরে ইংরিজিতে লেখা আছে, হোটেল রাজ। হাতে হাতে জিনিষপত্র বয়ে তাঁরা হোটেলে উঠলেন।

সামনেই কাউন্টার। অভ্যর্থনা। একজন ভদ্রলোক বসে আছে, স্টুঘ্রাণ আর এমিলিকে দেখেই উঠে দাঁড়াল, অশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরিজিতে পরিচ্ছন্নভাবেই জিজ্ঞেস ক'রল, কোথা থেকে আসছেন?

দিল্লি —

জবাব শোনামাত্রই জানতে চাইল, আপনি কি মিস্টার ডব্লু. এইচ স্টুঘ্রাণ?

উনি আপনার ভাইঝি মিসেস এমিলি মুখার্জী ?

ঠিক তাই — স্ট্রঘাণ একটু বিস্মিত এবং প্রীত হলেন।

অভ্যর্থনার লোকটি জানাল, দিল্লি থেকে মিস্টার শর্মা, সোয়াইকা ইণ্ডাস্ট্রীজ-এর ম্যানেজার আপনাদের জন্যে জায়গা রেখেছেন।

স্ট্রঘাণ শর্মার ব্যবহারে মনে মনে খুশীই হলেন। যাক ভদ্রলোক চেষ্টা ক'রেছেন যাতে কোন অসুবিধে না হয়। ভদ্রলোককে তাঁর এই আন্তরিকতার জন্যে মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন।

অভ্যর্থনাকারী বলল, আপনাদের জিনিষপত্র দয়া ক'রে ওর হাতে দিন এবং ওর সঙ্গেই আপনাদের ঘরে যান।

স্ট্রঘাণ দেখলেন, উর্দি পরা একটি লোক কখন নিশব্দে তাঁদের পেছনটায় এসে দাঁড়িয়েছে। অভ্যর্থনার ভদ্রলোক নিজেদের ভাষাতে লোকটিকে কি সব বলতেই সে জিনিষগুলো তুলে নিয়ে চলতে সুরু ক'রল।

স্ট্রঘাণ দেখলেন তিনতলায় অর্থাৎ বাড়ীর সব চেয়ে ওপর তলাতে ছোট হলেও বেশ সুন্দর দুখানি ঘর তাঁদের দিয়েছে। পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো গোছানো এবং আধুনিকভাবে রঙ করা। ঘরের মধ্যে টেলিফোন পর্যন্ত আছে। দু ঘরের মধ্যে একটা দরজাও আছে, বন্ধ। উনি ভাবলেন দরজাটা খোলা থাকলে সুবিধে হ'ত, একঘরের মতই মনে হ'ত। ভেবে দরজায় হাত রেখে দেখতেই পরিচারকটি সেটা খুলে দিল। স্ট্রঘাণ মাথা নেড়ে ইসারায় তাকে ধন্যবাদ জানালেন।

লোকটি চলে গেল।

রাস্তায় আসতে যা ধুলো লেগেছে — বলতে বলতে এমিলি ঘরের সঙ্গের কলঘরে ঢুকল। স্ট্রঘাণও সায় দিলেন সত্যিই সারাটা পথ লক্ষ্য ক'রেছেন প্রচণ্ড ধুলো ওড়ে এদিকের রাস্তায়। এক এক জায়গায় তাঁর তো খুব খারাপই লাগছিল। তিনি লক্ষ্য করছিলেন ঘোড়ার বিষ্ঠা শুকিয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। দুনিয়ার পরিষ্কার না করা আবর্জনা মিশেছে — তার সঙ্গে। সব উড়ে উড়ে সারা গায়ে মুখে জমেছে। দিল্লি থেকে আসবার পথে কয়েক জায়গায় থেমেছিল বাসটা — স্টেশনের মত জায়গায়। স্ট্রঘাণ অনুমান ক'রতে চেষ্টা ক'রেছেন সেগুলো নিশ্চয়ই কোন ছোটখাট শহর হবে। কোথাও এক বর্ণ ইংরিজি না থাকায় নিশ্চিত হতে পারেন নি, সেই স্টেশনগুলোতেই এই ধরণের নোংরা ধুলো বেশী। স্ট্রঘাণও তাঁর ঘরের সংলগ্ন কলঘরে ঢুকে সেই ধুলো ময়লার গ্লানি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন।

গরমজল ঠাণ্ডাজল দুরকমেরই কল আছে, ধারা স্নানের কল আছে, সবই ঠিক আছে শুধু নেই ডুবে স্নান করবার চৌবাচ্চা, বাথটপ। এদেশে বোধহয় প্রচলন নেই, মনে মনে ভাবলেন। সাবানটাও ভালই। বিশেষ ক'রে এই ক্লান্তিকর বাস যাত্রার পর সাবানের গন্ধটা প্রীত ক'রল তাঁকে। কলঘরের বাইরে আসতেই দেখলেন তাঁর ঘরের খোলা দরজার সামনে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

ভদ্রলোক বেশ সুন্দর চেহারার এবং সুন্দর পোষাকে উজ্জ্বল। স্টুঘাণকে দেখা মাত্র ভদ্রলোক সৌজন্য প্রকাশ ক'রে আত্মপরিচয় দিল, পি, কে, সাহি, আমি এই হোটেলের ম্যানেজার। আপনাদের সেবার সুযোগের জন্যে এলাম।

ভদ্রলোকের গায়ের রং এবং চেহারার গঠন দেখে স্টুঘাণের মনে হয়েছিল য়ুরোপের কোন দেশের লোক হবেন। কথা শুনে বুঝলেন তা নয়। অভ্যর্থনা ক'রে ঘরের মধ্যে ডাকলেন, বসতে বললেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকল ভদ্রলোক, বসবার পরিবর্তে দাঁড়িয়েই বলল, শর্মা আমার বন্ধু লোক। সে আমাকে বিশেষ অনুরোধ ক'রেছে আপনার সুবিধে অসুবিধের ওপর নজর রাখতে। কোন অসুবিধে হ'লে আপনি আমাকেই বলবেন।

শর্মাকে ধন্যবাদ জানালেন এবং ধন্যবাদ দিলেন সাহিকেও, বললেন, অসুবিধে হবার কোন কারণই দেখছি না।

সাহি বলল, বেড়াতে যখন এসেছেন চণ্ডীগড় দেখে যাবেন। ভারতবর্ষে অত সুন্দর শহর আর পাবেন না। চণ্ডীগড় নতুন শহর তো, পরিকল্পনা ক'রে বানানো। আর এসব শহর পুরাণো, নিজের ইচ্ছামত গড়ে উঠেছে।

স্টুঘাণ বললেন, আমি চণ্ডীগড়ের কথা শুনেছি। পৃথিবীর বিখ্যাত স্থপতির করা শহর।

কার করা অত খবর সাহি রাখে না, কোনরকমে হ্যাঁ হ্যাঁ ক'রে জবাব দিল। জানতে চাইলেন, আচ্ছা এই হরিদ্বার কত পুরাণো?

বহু পুরাণো। তবে এখানকার যা উন্নতি তা এখনই হচ্ছে।

কি রকম?

এই ধরুন কলকারখানা, বড় বড় হাসপাতাল এসব হালফিল তৈরী হচ্ছে। এই বিশ বছরের মধ্যে এসব হয়েছে এখানে। আমি যখন এখানে আসি আমার দেশ মুসলমানরা পাকিস্তান ক'রে নেবার পর, তখন এখানে অর্ধেক লোকও ছিল না। শুধু তীর্থ যাত্রীদের জন্যে যা দোকান বাজার এইসব ছিল। চারপাশে অনেক বনজঙ্গল ছিল, এখন সব সাফ হয়ে গেছে — কিছু নেই। — সাহি খুব গরিমা প্রকাশ ক'রে বলল। স্টুঘাণ জানতে চাইলেন, বনজঙ্গল নেই? কোথাও নেই?

নাঃ। সব সাফ ক'রে ফেলা হয়েছে।

নিজেকেই যেন প্রশ্ন ক'রলেন স্টুঘাণ, নিজের মনেই, ভাল হয়েছে কি? অরণ্য পৃথিবীর প্রাণ। তার স্পন্দনের পরিচয়। কাজেই অরণ্যহীন পৃথিবী — না ব্যাপারটা বোধহয় ভাবা উচিত নয়।

কিন্তু এ ব্যক্তির সঙ্গে সে আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। তাই তার বক্তব্য শোনবার জন্যে নীরব রইলেন। সাহি সেই নীরবতার অবসরে জানাল, আগেকার কথা যদি ধরেন তবে এদেশে তো মানুষ বলে কিছু ছিল না। এদেশের আদি বাসিন্দা হচ্ছে হনুমান আর ভালুক।

অর্থাৎ প্রকৃতির পুত্রেরা — স্ট্রঘাণ মনে মনে বললেন। অরণ্য উৎসাদিত ক'রে তাদের উৎখাৎ করা হয়েছে। শুধু একটুখানি প্রশ্ন ক'রলেন, তারা এখন কোথায়? সেই বাঁদর আর ভল্লুকেরা?

ভল্লুকেরা সব মরে গেছে। প্রথমে সরে গিয়েছিল। বদ্রীনারায়ণ যাবার পথে অসংখ্য ভল্লুক ছিল একসময়। মানে যাত্রীদের যেতে হ'ত দল বেঁধে। এখন সেইসব ভল্লুকও নেই। জঙ্গলই তো নেই।

সংবাদগুলো ভাল লাগল না শুনতে তবু স্ট্রঘাণ চুপ ক'রে রইলেন। বদ্রী-নারায়ণ যাবার একটা মানচিত্র তাঁকে জোগাড় ক'রে দিয়েছে শর্মা। পরে দেখে নেবেন। সেই পথ সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকা সত্ত্বেও সংবাদটি তাঁকে ব্যথিত ক'রল যে সে অঞ্চলের বন আর নেই, নেই সেই বনবাসীরাও। মনের মধ্যে সংশয় এল তবে কি কোথাও নেই সেই শান্তিবন, সেই ঋষি হিসেবে বর্ণিত আত্ম মুগ্ধ জনগণের সরল শান্তির জীবন? সে কি তবে কোথাও নেই? এই নগর সভ্যতা কি গ্রাস ক'রেছে সমস্ত দেশ, সমস্ত সমাজ? তাঁর তো তাই মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোকের কথা শুনে। একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন তবু দেখা যাক —

তাঁর মনের কথা সাহির পক্ষে জানা সম্ভব নয় বলেই জানাল, হরিদ্বার খুব ছোট শহর। দেখবার জন্যে বহু মন্দির আছে, আশ্রম আছে। গঙ্গা আছে। এখান থেকে হৃষিকেশ যাবেন। — বলতে বলতেই তার খেয়াল হ'ল জানতে চাইল, আপনি কি কোন প্রোগ্রাম ক'রে এসেছেন?

স্ট্রঘাণ বললেন, আমার একটা ম্যাপ আছে। আমি আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা ক'রতে চাই।

ঠিক আছে আপনি বিশ্রাম ক'রে নিন, আমি কিছুক্ষণ বাদে আবার আসব। মনে রাখবেন আমি পি, কে, সাহি। কোন প্রয়োজনে আমাকে ডাকবেন। বিদেশী অতিথিরা এলে আমার এই হোটেলেই ওঠেন। সেইজন্যে আমার হোটেলের বেহারারা একটু ইংরিজি জানে। ওদের বললেই ওরা আমাকে ডেকে দেবে।

সাহি চলে যাওয়ামাত্র পেছন থেকে এমিলি প্রশ্ন ক'রল, আমরা কখন বেরোব?

আমরা তো এখনই বেরোতে পারি। মিস্টার সাহি বললেন এখানে অনেক আশ্রম আছে। সেগুলো একবার দেখতে হবে।

মিস্টার সাহিকে আমরা একজন প্রদর্শক ঠিক ক'রে দেবার জন্যে অনুরোধ ক'রতে পারি —

সেটাই বোধহয় ভাল হবে। তার আগে এই সহরের একটা মানচিত্র জোগাড় করবার চেষ্টা ক'রতে হবে। ভুল হয়ে গেল মিস্টার সাহির কাছে সেটা বললে ভাল ছিল।

সময় নষ্ট না ক'রে দুপুর বেলাই বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। হোটেলের বাইরে পা দিতেই একটি লোক এসে ধরল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজিতে নিবেদন ক'রল, ভাল গাড়ী আছে, নতুন গাড়ী, হরিদ্বার দেখিয়ে দেব। সমস্ত ঘুরিয়ে দেখাব।

অর্ধেক কথা স্ট্রঘাণ বুঝলেন বাকী অর্ধেক বুঝলেন না। এমিলিও কাকার চেয়ে বেশী বুঝল না এক বর্ণও। সে চুপি চুপি কাকাকে বলল, আমার মনে হয় আগে এখানকার পর্যটন অফিসে যাওয়া ভাল হবে।

তার প্রস্তাব মেনেই কাকা লোকটিকে বললেন, ধন্যবাদ। — অর্থাৎ প্রয়োজন নেই।

লোকটি সেকথায় আদৌ কাণ না দিয়ে গরমকালের মাছির মত সমানে ভ্যান ভ্যান ক'রতে লাগল। পথ চলতি দর্শকদের অনেকে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে যাচ্ছে এটাই খারাপ লাগছিল স্ট্রঘাণের। অথচ লোকটি কিছুতেই যাচ্ছে না এবং একই কথা অনবরত বলে বিরক্তি উৎপাদনের চেষ্টা ক'রে চলেছে দেখে ফিরে গেলেন হোটেলেই। সামনে পেলেন একজন বেয়ারাকে, জিজ্ঞেস ক'রলেন, পর্যটন বিভাগের অফিস এখানে কতদুর ?

হ্যাঁ, না এবং কয়েকটি জিনিষের নাম ছাড়া ইংরিজি জানা না থাকায় সে হাতের ইশারায় দাঁড়াতে বলে প্রায় দৌড়ে গিয়েই ডেকে আনল আর একজনকে। লোকটি এসে জানতে চাইল, কিভাবে আপনাকে সাহায্য ক'রতে পারি ?

সেই একই প্রশ্ন ক'রতে সে জানাল, দূর সামান্যই। কিন্তু আপনি সদ্য এলেন আপনি তো গলির পথ চিনবেন না কাজেই ঘুরে যেতে হবে। দাঁড়ান— বলে পথে নেমে অদূরে দাঁড়ানো একজন টাঙ্গাওয়ালাকে হাতের ইশারায় ডেকে গন্তব্যস্থল বুঝিয়ে দিয়ে স্ট্রঘাণকে বলে দিল, ওকে একটা টাকা দিয়ে দেবেন।

একটিমাত্র ঘোড়ায় টানা দেখতে অদ্ভুৎ গাড়ীটা সামনে আনতেই অনেক কসরৎ ক'রে স্ট্রঘাণ এমিলিকে ওঠালেন তাতে। নিজেও উঠে বসলেন।

টাঙ্গাওয়ালা সামান্য সময়ের মধ্যেই তাঁদের নিয়ে হাজির ক'রল পর্যটন দপ্তরের সামনে। খবরাখবর নিয়ে বাইরে এসে আর গাড়ীতে উঠলেন না লব্ধজ্ঞানের পরীক্ষা করবার জন্যে পায়ে হেঁটেই রওনা হলেন গঙ্গার উদ্দেশ্যে। ঘিঞ্জি রাস্তা, মধ্যে দিয়ে বাস চলছে, মোটর চলছে, টাঙ্গা নিয়ে ঘোড়া দৌড়োচ্ছে পায়খানা ক'রতে ক'রতে, আর ঘন্টা বাজাতে বাজাতে প্রায় গায়ের ওপর দিয়েই ছুটছে রিক্সাগুলো। দুপাশে পুরাণো দিনের বাড়ী আর সারি সারি দোকান। এমন একটা বাড়ী তাঁরা দেখছেন না যার সামনে কোন দোকান নেই। মনে হচ্ছে গোটা শহরটাই একটা বাজার আর তাঁরা বাজারের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। যেভাবে পর্যটন দপ্তরের ভদ্রলোক বুঝিয়েছে ঠিক তেমনিভাবেই চলবার চেষ্টা ক'রছেন। শুনে নিয়েছেন এই রাস্তাটাই সোজা যেতে যেতে ডান দিকে বাঁক নিয়ে গঙ্গার ধারে মিশেছে। এই রাস্তা যেন তাঁরা না ছাড়েন। ঠিক বাঁকের মুখে পৌঁছে দেখলেন রাস্তাটা হঠাৎ অনেক বেশী সংকীর্ণ হয়ে গেছে। দোকান গুলোও যেন দুপাশ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এই সরু রাস্তাটার ওপরেই। এমন বিচিত্র সব সামগ্রীর দোকান যে অনেকগুলো জিনিষের ব্যবহারই তাঁরা জানেন না। সেই সরু পথের গতিশীল রেখা ধরে অতি সন্তর্পণে রিক্সা, ষাঁড়, যেন

ভুল ক'রে ঢুকে পড়া মোটরগাড়ী, চলমান জনতা — সব কিছু থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এসে এমন এক ত্রিমুখী পথের মোড়ে পড়লেন যেটা সম্পূর্ণভাবেই একটা বাজার ছাড়া কিছুই নয়। মুহূর্তের দ্বিধা অতিক্রম ক'রলেন নির্দেশ স্মরণ ক'রে আর চকিতে দেখলেন সত্যিই তাঁরা এক অদ্ভুৎ জায়গায় এসে পড়েছেন। এভাবে হঠাৎ একটা ঘিঞ্জি জমাট বাজারের গায়েই গঙ্গা একটা মাত্র বাড়ীর বাঁক ঘুরলেই — যেন এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হ'ল তাঁদের কাছে। এখানে আবার বিচিত্রভাবে নদীর মাঝ পর্যন্ত একটা বাঁধানো বিরাট দ্বীপ করা হয়েছে। বাঁদিকে একটা সেতুর মত। তার ওপর দিয়ে লোকেরা যাচ্ছে মাঝের দ্বীপে। কাকা এমিলিকে বললেন, চল আমরাও ওই দিক দিয়ে যাই।

এমিলি দ্বিমতের কারণ পেল না। সেতুর সিঁড়িতে উঠেই এমিলি উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল, দেখ দেখ কাকা!

ধারেই রেলিঙের ওপাশে একটা হনুমান পরিবার বসে আছে। এমিলির দৃষ্টি এবং সংকেত অনুসরণ ক'রে স্টুয়ার্ট দেখলেন সত্যিই কয়েকটি হনুমান, তাদের একজন ছোট একটি বাচ্চাকে বুকের মধ্যে নিয়ে বসে আছে। স্টুয়ার্টও তাদের দেখে খুব আনন্দ পেলেন। দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। হনুমানেরা কারও দিকে ভ্রুক্ষেপও ক'রছেনা। একজন পথচারী কতগুলো বাদাম নিয়ে এসে ডাকাডাকি ক'রতে একটি অল্পবয়স্ক হনুমান প্রলুব্ধ হয়ে সামনে এল। রেলিঙ-এর ওপরে বসে হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর প্রতি পরম ঔদাসীন্য সহকারে বাদাম ভেঙে ভেঙে খেতে লাগল।

স্টুয়ার্ট লক্ষ্য ক'রলেন অন্যান্য হনুমানেরা একজনও এল না। এবং দাতা পথচারীটিই অবশেষে তাদের বাদাম পৌঁছে দিতে বাধ্য হ'ল। স্টুয়ার্ট তাদের এই নির্লিপ্ততার কারণ খুঁজে পেতে চাইলেন। ভাবলেন বাদামের চেয়ে আকর্ষক কিছু পেলে ওদের প্রলুব্ধ করা যায় কি না একবার দেখবেন। দেখলেন অল্প দূরেই একজন লোক কলা নিয়ে বসে আছে। তার সামনে গিয়ে একটা টাকা বাড়িয়ে ধরে তর্জনী দিয়ে কলার ঝুড়ি দেখালেন। লোকটি ছটি কলা এগিয়ে দিল তাঁর কলাকেনা লক্ষ্য ক'রেছিল হনুমানগুলো। তিনি আসবার আগেই বাচ্চা কোলে হনুমানটা উঠে পড়ল রেলিঙের ওপর। তার হাতে এবং তরুণ হনুমানটির হাতে দুটো কলা কোনক্রমে দেওয়ামাত্রই সকলের অলক্ষ্যে থেকে একটা বিশাল হনুমান হঠাৎ যেন আবির্ভূত হ'ল। অকস্মাৎ তাকে গায়ের ওপর এসে পড়তে দেখেই আঁতকে উঠল এমিলি। আর সেই হনুমান কিছুকে গ্রাহ্য না ক'রেই এক ঝটকায় স্টুয়ার্টের হাত থেকে বাকী কলাগুলো কেড়ে নিয়ে সেখানেই বসে খেতে লাগল। স্টুয়ার্ট প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও তার খাওয়ার দৃশ্য উপভোগ ক'রতে লাগলেন। ইতিমধ্যে একে একে প্রায় সব ক'জনই উঠে এসে সারি দিয়ে রেলিঙ-এর ওপর বসেছে প্রত্যাশায়। আবার কিছু কলা কিনে সেই বিরাট হনুমান থেকে সাবধান হয়ে বিলি

ক'রতে লাগলেন দুজনে। অনেক লোকই সেই দৃশ্য উপভোগ ক'রছে হঠাৎ দেখলেন দুটি অল্প বয়স্ক য়ুরোপীয় ছেলেমেয়ে সেতুর ওপার থেকে আসছে। তারা কাছে আসতেই চোখের ইশারায় স্টুয়ার্ট থামালেন। ছেলেটি অমনি বলে উঠল, গতকাল এদেরই একটা হনুমান তার সঙ্গিনীর স্কার্ফ নিয়ে পালিয়েছিল। কলা দিয়ে ফেরৎ নিতে হয়েছে।

ব্যাপারটা খুবই ভাল লাগল এমিলির, সে বলল, তাই নাকি?

মেয়েটি জানাল, মাথার ওপর বাঁধা স্কার্ফ হঠাৎ একটানে নিয়ে পালিয়ে গেছে। অন্যান্য লোকেরা কলা কিনে এনে দিয়ে ফেরৎ নিয়েছে।

এমিলি মেয়েটির অভিজ্ঞতার কথা বেশ প্রীতির সঙ্গে উপভোগ ক'রল। প্রশ্ন ক'রল, ছিঁড়ে দেয়নি তো?

মেয়েটি উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে জানাল, কিচ্ছু করেনি শুধু ওটা নিয়ে ওই উঁচু লাইটপোস্টে উঠে বসেছিল। কলা দেখেই নেমে এসে স্কার্ফটা হাতে দিয়ে দিল।

এমিলি আর একবার হনুমানগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল স্থির, শান্ত এবং বেশ গম্ভীর মুখ সবগুলোরই। কারও মুখমণ্ডলের ওপর চপলতার চিহ্নমাত্র নেই। এরাই যে এমন কাণ্ড ক'রতে পারে মুখ দেখলে তা বিশ্বাসই হবে না। হাতের কলা শেষ ক'রে সবাই চারপাশে চেয়ে দেখছে কিন্তু কোন মানুষের মুখের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। এমিলির খুব মজা লাগল ওদের দেখে।

হনুমানের সুবাদে স্টুয়ার্ট লাভবান হ'লেন ছেলেটির সঙ্গে আলাপ ক'রতে পেরে। বিদেশে কাজ চালানোর মত ইংরিজি বুঝতে বলতে পারে। হল্যাণ্ডের ছেলে। জীন শ্রিভার। মেয়েটি অস্ট্রেলিয়ার। এমনি পথ চলতেই আলাপ হয়েছিল গত বছর ডেনমার্কে। এবার একসঙ্গে ভারত এবং দূরপ্রাচ্য ভ্রমণে এসেছে। হংকং থেকে দুজনে একসঙ্গে হয়েছে চিঠি লিখে যোগাযোগ ক'রে। আজই ওরা হরিদ্বার ছেড়ে চলে যাবে দেরাদুন।

ওর কাছ থেকেই স্টুয়ার্ট হরিদ্বারের পথঘাট জেনে নিলেন। জেনে গেলেন এখানকার চেয়ে হৃষিকেশ অনেক মনোরম। এখানে এই নদীর ধার ছাড়া আর কিছুই ছেলেটির ভাল লাগে নি। ওদিকে ছেলেটি লক্ষ্মণঝোলা পর্যন্ত গেছে। সেখান থেকে গতকাল ফিরেছে ইত্যাদি—সব সংবাদ সে জানাল।

বেশী লোকজন জমে যাওয়া ভাল না লাগায় হনুমানগুলো একে একে সরে যেতেই ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল। হল্যাণ্ডের ছেলেটি এবং তার বান্ধবী চলে গিয়েছিল আগেই। স্টুয়ার্টরা সেতুর ওপর আর কিছুটা গিয়ে দাঁড়ালেন। ওপাশেই সবুজ পাহাড়। পর্বতমালা। ভারী চমৎকার লাগল। এমিলিও একমনে তাকিয়েছিল সেই পর্বতমালারই দিকে। এমন বর্ণময়তা ভারী আরামদায়ক। এরই পট-ভূমিকায় ওই দূর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী। সেতুর নীচে দিয়ে যে জলধারা যাচ্ছে সে অতি সামান্য। কিন্তু বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে স্বচ্ছ জলের অবিরাম ছুটে চলা দেখতে দেখতে এমিলি বলল, চল কাকা, ওপারে ওই নদীর মধ্যে যাই।

সত্রঘাণ তন্ময় হয়ে দূরের ওই ঘন সবুজ নীলছায়াচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণীকে দেখছিলেন। তাঁর পায়ের তলা দিয়ে বয়ে হাওয়া আংশিক নদীর মূল ধারাটিও উপদৃষ্টিতে পড়ছিল কিন্তু সেদিকে তাঁর মন ছিল না। এমন গভীর সবুজ, এমন শ্যামলিমা — কি এক গভীর প্রশান্তির স্পর্শ পাচ্ছিলেন তিনি আপন অন্তর্লোকে। এমিলির কথায় ভাবলোক থেকে ফিরে এসে বললেন, সত্যিই বড় মনোরম এই স্থান। আমার মনে হচ্ছে শুধুমাত্র এই দৃশ্যটুকুর জন্যেই এই স্থানের এত গুরুত্ব।

কাকার কথায় সায় দিয়ে এমিলি জানাল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। আচ্ছা কাকা, জলটাকে এভাবে ভাগ ক'রেছে কেন বল তো?

জানতে হবে। তবে আমার মনে হচ্ছে তীব্র স্রোত থেকে এই তীর ভূমিকে বাঁচবার জন্যেই। ব্যাপারটা এখানে কাউকে প্রশ্ন ক'রে জানতে হবে।

ওপাশে নদীর দিকে চল যাই।

এখান থেকে দৃশ্যটা ভাল লাগলেও মেয়ের কথায় যেতে হ'ল তাঁকে। সেতু পেরিয়ে যেখানে পৌঁছোলেন সে একটা কৃত্রিম দ্বীপ। পাথর সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে মানুষের তৈরী করা। সেখানে নেমে দেখলেন, খরস্রোত নদী বয়ে যাচ্ছে তবে যে জলধারাটি দূর দিয়ে সবুজের পটভূমিকায় বয়ে যাচ্ছে তার কাছে যাবার পথ নেই। তীব্র স্রোতে স্নান করবার জন্যে জাল দিয়ে ঘেরা ঘাট আছে, সেখানেই লোকেরা অসীম ক্লেশে স্নান ক'রছে। কিন্তু তাদের চোখে আনন্দ। স্রোতের বেগ এবং স্নানরতদের শারীরিক অবস্থান দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে দৈবাৎ যদি হাত ফস্কে যায় তাহ'লে মানুষটাকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সদ্য পাহাড় থেকে নামা এই জলধারা। কিন্তু লোকেদের আনন্দ তাঁর মনেও প্রতিআনন্দের সঞ্চার ক'রল। তিনি দৃশ্য হর্ষে পুলকিত হয়ে এমিলিকে জিজ্ঞেস ক'রলেন, তুমি কি স্নান ক'রতে চাও?

আনন্দ এমিলির অন্তরেও প্রতিভাষিত হচ্ছিল যার প্রকাশে ঘটল তার স্বরে আমার তো খুবই ইচ্ছে ক'রছে —

আজ আর হবে না। কাল চেষ্টা ক'রে দেখা যাবে।

কিন্তু কি স্রোত দেখছ? কোন মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে না।

অথচ জল এক কোমরের বেশী নয়। নীচের পাথরগুলোকে কেমন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। —

দুজনের কেউ আর কোন কথা না বলে জলের ধারে ধারে বাঁপাশের নির্জন দিকে হেঁটে চললেন। ওই দিক থেকেই নদী আসছে। কিছুটা দূর গিয়ে যেখানে এই ভূমি শেষ সেইখানে দাঁড়িয়ে নদীরেখা ধরে যতটা দূর সম্ভব দেখতে লাগলেন। সেদিকেও সবুজ। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলেন শহর। সারি সারি বাড়ী। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল এমন একটি সুন্দর জায়গায় এই জনপদ না হ'লেই ভাল হ'ত। ওপাশের পাহাড়কে যেমন সুন্দর দেখাচ্ছে তেমনি বেমানান মনে হচ্ছে এই শহরটিকে। তিনি আবার ওপারের ওই গিরিশ্রেণীর দিকে তাকালেন। মানচিত্রে

নাম আছে শিবলিক পর্বতমালা। মাথার ওপরে মধ্যদিনের সূর্য। প্রচণ্ড তাপ কিন্তু শীতল বাতাস বইছে বলে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে। স্ট্রঘাণ তাই দাঁড়িয়েই রইলেন। ধীরে ধীরে তাঁর নজর পড়ল ওপারে ওই সবুজ শ্যামলিমার মধ্যে সাদা সাদা বিন্দুর মত সব বাড়ীঘর। মনে হ'ল ওগুলো না থাকলেই ভাল ছিল। ওই সবুজ সৌন্দর্যের মধ্যে কি প্রয়োজন ছিল ঘর করবার? শুধু শুধু যেন ওই সৌন্দর্যকে ব্যাহত করা হয়েছে।

হঠাৎ আবিষ্কার ক'রলেন কিছুটা দূরে ডান দিকে আর একটা সেতু অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে ওই ওপারে গেছে যেখানে সবুজের সমারোহ। এমিলির দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলেন, বললেন, চল আমরা ওই সেতু পার হয়ে যাই।

আবিষ্কারটা উৎফুল্ল ক'রল এমিলিকেও। সে বলল, এই দ্বীপটা অতদূর নেই। তাহ'লে এই শহরের অন্য দিক দিয়ে যেতে হবে।

স্ট্রঘাণ বললেন, অন্যদিন ওখানে যাব। আজ এদিকটাই দেখে নিই। জায়গাটা খুবই সুন্দর।

চল আমরা ওখানটায় বসি — কয়েকজন লোক বসেছিল সেতুর ওপরে ওঠবার প্রথম সিঁড়িটায়। সেখানেই বসতে চাইল এমিলি।

যে দিকটায় ছায়া পড়েছে ওঁরা বসলেন। আসেপাশের লোকেরা যে কথা বলছে জলস্রোতের শব্দে তার কিছু শোনা যাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ শুনতে শুনতে জলের শব্দ অভ্যাস হয়ে গেলে মনে হচ্ছে সমগ্র এলাকাটা শব্দহীন। শহরের কলতান নেই, যানবাহনের শব্দ নেই, ব্যস্ততা নেই। চুপচাপ বসে থাকতে ভালই লাগছে। স্ট্রঘাণ এবং এমিলি কেউ কোন কথা না বলে শান্তির স্বাদ গ্রহণ ক'রতে লাগলেন। অনেকটা সময় কেটে যাবার পর স্ট্রঘাণের মনে হতে লাগল সামনের সবুজ পাহাড়ের মধ্যে এমন কিছু আছে যা তাঁকে আকর্ষণ ক'রছে। ওই পাহাড় আর এই নদী মিলে তাঁকে এক অভিনব পটভূমির সামনে এনে দিয়েছে যেখানে বসে তিনি যেন নিজের অস্তিত্বের রূপ দেখতে পাচ্ছেন। এই পর্বত কি ক'রে পর্বত হ'ল, এই জলধারা কিভাবে এমন অবিরাম বয়ে চলেছে কিভাবেই বা অনন্ত কোন কাল থেকে চলেছে প্রাণের আনাগোনা সবই যেন এক বিরাট প্রশ্ন। এই বিশাল পৃথিবী এই মুহূর্তে তার কোন প্রান্তে কি ঘটছে, কত কি ঘটছে কি তার ঠিকানা। এই পৃথিবীর বুকে এমনি কত নদী অবিরাম বয়ে চলেছে। প্রতিদিন কত গাছে কত ফুল ফুটছে ঝরে যাচ্ছে এর মধ্যে কি তাঁর ভূমিকা? কি ভূমিকা একজন মানুষের? একদিন নিশ্চয়ই এই অঞ্চল বিজন বন ছিল, সেদিন অন্য প্রাণী এখানে বাস ক'রত। কোথায় তারা? এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডলোকে কোন প্রাণীরই নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই। জাগতিক চেতনার বিকাশ একান্ত ভাবেই সাময়িক এবং সেটা প্রক্ষিপ্ত। সেই অবস্থার সে অধিকারীমাত্র, নিয়ন্ত্রণ নেই তার। যেমন এই জলধারা — বয়ে চলেছে নির্ধারিত বেগে। এখানে কিছু নিয়মতান্ত্রিকতা আছে যে নিয়ম প্রাকৃতিক। সব কিছুই সেই প্রাকৃতিক নিয়মে

চলছে মাত্র। স্ট্রঘাণের মনে হতে লাগল এই পটভূমিকায় এই বাড়ীঘর সভ্যতা সবই অর্থহীন। শুধু অর্থহীনই নয় বেমানান।

এমিলি দেখছিল একজন বৃদ্ধা একটি অল্প বয়স্ক ছেলের সাহায্যে স্নান করবার চেষ্টা ক'রছেন। ছেলেটি ছাড়াও ক'জন মহিলা ও মাঝবয়সী পুরুষ সঙ্গে আছে। সবাই যে যার স্নান ক'রছে, একজন মহিলাও উঁচুতে বসে ঘটি ক'রে জল তুলে ঢালছেন নিজের মাথায়। এই স্রোতে নামতে ভয় পাচ্ছেন। দৃশ্যটি বেশ উপভোগ্য এবং ভাল লাগছিল এমিলির। ছেলেটির মা-র মা বা বাবার মা হবেন ওই বৃদ্ধা, এমিলি কল্পনা ক'রে নিল। কল্যাণের কথা মনে হ'ল, ঠিকই বলেছিল কল্যাণ। এ যদি তাদের দেশ হ'ত তাহ'লে দেখা যেত ওই ছেলেটি আর একটি কাছাকাছি বয়সের মেয়েকে নিয়ে স্নান ক'রছে। কিন্তু এদৃশ্য অনেক মনোরম মনে হ'ল এমিলির। সে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল। ওই তীব্র স্রোতে খুবই যত্ন ক'রে স্নান করাচ্ছে ছেলেটি। ওপর থেকে একজন মাঝবয়সী পুরুষ কি যেন বলছেন। বোধহয় কোন নির্দেশ দিচ্ছেন ছেলেটিকে। সত্যিই এই স্নেহ, এই ভালবাসা তাদের দেশে দেখতে পাওয়া যায় না, এমিলি ভাবল। সে যেন ওই স্নেহের স্পর্শ পাচ্ছিল। ওই বৃদ্ধা যেন কল্যাণের দিদিমা আর ওই ছেলেটি কোন এক কিশোর কল্যাণ। এমিলির বড় আফশোষ হচ্ছিল ওদের কাছে গিয়ে কথা বলবার উপায় নেই বলে। কোন গাইড নয়, দোভাষীর মাধ্যমে নয়, সরাসরি কথা বলে মনের ভাবের আদানপ্রদান ক'রতে পারলে মনের শূন্যতা ভরতে পারত।

হঠাৎ একটি কথার শব্দে চটক ভাঙ্গল। কে একজন খুব কাছে এসে জানতে চাইছে, গাইড বই চাই ?

কাকা-ভাইঝি দুজনেই এক সঙ্গে তাকাল আগন্তুকের দিকে। একটি কিশোর কতগুলো ছবি আর পাতলা বই হাতে ক'রে পেছনটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। স্ট্রঘাণ হাত বাড়াবার আগেই ছেলেটি একটি পাতলা ইংরিজি বই তাঁর দিকে এগিয়ে দিল। উল্টে স্ট্রঘাণ দেখলেন এর চেয়ে ভাল বই দিল্লি থেকে সঙ্গে এনেছেন তিনি। ফেরৎ দিতে চাইলেন। ছেলেটি তার জানা দু'একটি মাত্র ইংরিজি শব্দ দিয়ে নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি ক'রতে লাগল। এটা নেহাৎই অপ্রয়োজনীয় এবং বোঝা। ছেলেটি সে সব কিছু বুঝতে চায় না। মাত্র দুটো টাকা দাম দিয়ে বইটা সাহেবরা কেন নেবেন না এটাই তার বিস্ময়। স্ট্রঘাণ বড়ই অস্বস্তি অনুভব ক'রতে লাগলেন। এদেশে এই এক দোষ। ফেরিওয়ালারা এমনই নাছোড়বান্দা যে তারা তাদের উপস্থিতির সমস্তটুকুকে বিরক্তিকর ক'রে তোলে। দিল্লিতেও এটা তিনি লক্ষ্য ক'রেছেন। এই ফেরিওয়ালাকে নিজের মনোভাব বোঝাতে না পেরে তিনি এমিলিকে বললেন, চল আমরা এখন হোটেলে ফিরি। প্রথম দিনের পক্ষে বেড়ানোটা অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ চল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল এমিলি। উঠে দাঁড়াল।

হোটেলে ফিরতেই ম্যানেজার জানাল, মিসেস মুখার্জী, আপনার টেলিফোন এসেছিল ক'লকাতা থেকে।

কোন খবর আছে? এমিলি জানতে চাইল।

না। আবার ক'রবে। মিস্টার পি মুখার্জী ক'রেছিলেন।

ধন্যবাদ জানাল এমিলি সংবাদটার জন্যে। এমিলি বিশেষ গুরুত্ব দিল না। ক'লকাতা ছাড়বার পর এই নিয়ে তৃতীয় টেলিফোন পেল প্রসেনজিৎ এর। প্রসেনজিৎ নিজের কাণে শুনতে চায় এমিলি কেমন আছে, এবং শুনতে চায় এমিলির কাছ থেকেই। গত দুদিন দিল্লির হোটেলে তাই চেয়েছে। দিল্লির হোটেলের ফোন নম্বর পেয়েছিল সোয়াইকা কোম্পানীর কাছ থেকে এবং আজ ওরা এসে পেঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার নম্বরও নিশ্চয়ই সেখান থেকেই পেয়েছে এমিলি অনুমান ক'রল। সোয়াইকাদের দিল্লির অফিস থেকে সব সময় টেলেক্স সংবাদ যাচ্ছে কলকাতার অফিসে। ওরা যে সমান গুরুত্ব দিয়ে ওদের সংবাদও পাঠাচ্ছে এর জন্যেই মনে মনে বিশেষ কৃতজ্ঞতা বোধ ক'রল এমিলি। কাকাকে বলল, বাস্তবিক মিস্টার শর্মা অত্যন্ত ভাল লোক। আমাদের জন্যে হোটেল ঠিক ক'রেই কলকাতায় সব জানিয়ে দিয়েছেন।

স্টুঘাণ বললেন, খুবই দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ।

খাবার টেবিলে বসে স্টুঘাণ বললেন, আমি বুঝছি না কেন, এই জায়গাটার কিছু আকর্ষণ আছে। ভাবতে লাগলেন, জায়গাটা কিন্তু কলকাতার মত। বরং সেখানকার চেয়ে ঘিঞ্জি। নোংরা জমে আছে পথের ওপর যেখানে সেখানে, সরু সরু পথ — মানুষের গায়ে গা লাগিয়ে সেখান দিয়েই চলছে যত গাড়ী ঘোড়া। তবু রাশি রাশি মানুষ এসে কিসের আকর্ষণে যেন জড় হচ্ছে।

এমিলি কাকার কথাটা শুনল, মন্তব্য ক'রল না। সে আরও ভাল ক'রে দেখতে চায় তারপর ভাববে এবং বলবে। অন্য কথা পাড়ল সে, খেয়ে উঠে কি বিশ্রাম ক'রতে চাও কাকা?

আমরা বিশ্রাম ছাড়া অন্য কোন কাজ ক'রছি কি? আসবার সময় একটা ফলের দোকান দেখেছিলাম। বেশ সুন্দর আপেল বিক্রি হচ্ছে। চল বেরিয়ে আপেল কিনব।

তুমি কি ছোট ছেলেদের মত রাস্তায় আপেল খাবার কথা ভাবছ? এদেশে রাস্তায় চলতে চলতে বড়মানুষরা কিছু খায় না তা জান?

তাই না কি? তাহ'লে ফেরবার সময় হোটেলে নিয়ে আসব।

সেই ভাল। এখন বেরোলে অন্য দিকটায় যাব।

কিন্তু টেলিফোনটার জন্যে অপেক্ষা তো ক'রতে হবে?

এমিলি চুপ ক'রে রইল। সে ভাবতে চেষ্টা ক'রল এমন কোন প্রয়োজনীয় কারণে নিশ্চয়ই ফোন ক'রছে না প্রসেনজিৎ, বরং আগের দুদিন যেমন অকারণে ক'রেছে — তেমনি ক'রছে আজও। তবু এই আগ্রহকে মূল্য দিতে হবে

বৈকি। জীবনে অনেক ছোট ঘটনাকেই গুরুত্ব দিতে হয়, মাধুর্য বজায় রাখতে এমন অনেক ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিতে হয় যা নেহাৎই শিশুসুলভ। তাতে কিছু এসে যায় না, বরং সমস্ত কিছু মিলিয়ে নিয়ে একটা অখণ্ড রূপ ধরে নিলে দেখা যায় তা একটি সুন্দর দর্পণ যেখানে জীবনের ছায়া পড়ে নিটোলভাবে। তা ছাড়া প্রসেনজিতের আবেগের প্রকাশ কোন কোন সময় এমন সরলতাকে আশ্রয় করে যে তা বুদ্ধি বা ব্যক্তিত্বের পরিমাপক দাগটাকে অনেকটা নীচে নিয়ে আসে। অবশ্যই তাতে দোষের কিছু থাকে না যা থাকে তা স্থানান্তরে হাসির সূত্র হয়ে উঠতে পারে মাত্র। তবে তেমন পরিবেশ পড়ে না বলেই যা রক্ষা এবং এমিলির কোন অসুবিধা হয় না। তবু কাকার সামনে প্রসেনজিতের এই দুর্বলতার বাড়াবাড়িতে লজ্জার কারণ ঘটল বলেই সে বলল, আমার তো মনে হচ্ছে না এমন কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে টেলিফোনটার —

তবু — কাকা বললেন, সেটা পাওয়াটাই প্রয়োজন।

এমিলি প্রত্যুত্তর ক'রল না। কাকা প্রসঙ্গান্তরে গেলেন, কি করা যায় বলত, একটা গাড়ী ভাড়া ক'রে নেব ?

তুমিই না বল দেখার অর্থ গভীর ভাবে দেখা ? গাড়ীর বেগে কি গভীর ভাবে দেখা সম্ভব ?

ঠিক বলেছ খুকু — চন্দ্রঘাণ কথার সঙ্গে মাথা নাড়লেন এবং বললেন, এলাকাটা খুব বড় নয়, আস্তে আস্তে দেখা যাক।

এখানে দেখবার কি কি আছে ?

অনেকগুলো আশ্রম আছে পুরাণো সাধুদের, যাদের ঋষি বলত।

সেগুলো কোথায় ?

নিশ্চয়ই নদীর ধারেই হবে। পুরাণো পৃথিবীতে জনবসতি সব সময় জলের ধারে হ'ত। কেন জান ? স্থলপথ আর এই সব যানবাহন বিজ্ঞানের অবদান। আগেকার দিনে নদীপথই ছিল যাতায়াতের পক্ষে সহজতম।

সেইসব আশ্রমে কি আছে ?

ওইসব আশ্রম হচ্ছে ভারতবর্ষের আসল। জ্ঞানপীঠ। ভারত সভ্যতার মূল হচ্ছে এই আশ্রমগুলো।

তবে কি আগেকার দিনে ভারতবর্ষের লোক মানেই সব সাধু ছিল ?

তা নয়। শিক্ষার কেন্দ্র ছিল ওই আশ্রম। রাজপুত্র থেকে আরম্ভ ক'রে সাধারণ মানুষের সন্তানেরা পর্যন্ত সবাই ওই আশ্রমে শিক্ষা লাভ ক'রত। সব রকম শিক্ষার ব্যবস্থাই ছিল ওই আশ্রমগুলোয়। এমনকি অস্ত্র শিক্ষা পর্যন্ত।

আশ্রমগুলো কি তাহ'লে স্কুল ?

বলতে পার। তবে অনেক উন্নত ধরণের স্কুল অথবা বলতে পার প্রকৃত স্কুল।

এমিলি ঠিক বুঝল না কাকা এই আশ্রমগুলোকে অত গুরুত্ব দিচ্ছেন

কেন। আশ্রমগুলোর কথা সে শুনছে বটে কিন্তু ওগুলো সম্পর্কে তার কোন ধারণাও নেই। কাকা ভারতবর্ষ বিষয়ে বেশ কিছু পড়াশোনা ক'রেছেন, সে কিছু করেনি। তার ভারতজ্ঞান সমসাময়িক কালের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কল্যাণের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। তাই দুজনের চিন্তায় মেলে না বিনিময়ও চলে না কালের পার্থক্যের জন্যে।

স্ট্রঘাণ সকালে পাওয়া শহরের মানচিত্রটা খুলে ধরলেন। এমিলিও সেটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। কাকা বললেন, এই দেখ এই দিকে নদীর ধারে ধারে গেলে পড়বে ঋষিকেশ। আর এই সমস্ত এলাকাটা জুড়ে সাধুদের আশ্রম। — বলেই হঠাৎ তাঁর একটা সংশয় এল নিজেই নিজের ভুল ধরলেন — সাধুদের আশ্রম আর সেই ঋষিদের আশ্রম তো এক নয়! তাহ'লে? আত্মবিস্মৃত হয়ে চারপাশে তাকালেন যেন কেউ আছে যাকে জিজ্ঞেস ক'রে সন্দেহ ভঞ্জন ক'রবেন। নিমেষেই হোটেলের ঘরের নির্জনতা তাঁকে নিরাশ ক'রল। একজন প্রদর্শক যে প্রয়োজন তা মনে ক'রলেন। যে প্রদর্শক পেশাদার নয়, সে হবে শিক্ষক, ইতিহাস, দর্শন এবং ভূগোলের জ্ঞান যার আয়ত্ত হবে আপন আগ্রহের চাপে। কিন্তু সে প্রদর্শক কোথায় পাওয়া যাবে? কলকাতায় যাদের সঙ্গে আসবার বিষয়ে কথা বলেছিলেন তারা একজনও পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে বা আপন দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে উৎসাহী নয়। প্রসেনজিৎ বা তার পরিবারে কেউই খোঁজ রাখে না নিজের দেশের, এখানেও যাদের সঙ্গে সংযোগ হ'ল সবাই যেন আপন দিন যাপনের ব্যবস্থাপনাতেই বিভোর। জীবিকার বাইরেও যে একটা জগৎ আছে সে সম্বন্ধে কারও কোন ধারণা নেই। অথচ এই ভারতবর্ষের মানুষই না বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাধারা সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে জ্ঞানের বিস্তার ক'রেছিল শুধুমাত্র মানসিক জগতে? এই ভারতবর্ষেরই না জিজ্ঞাসা ছিল পরম কি, চূড়ান্ত কে? এই ভারতবাসীই না তপস্যা ক'রত অমৃতের?

এমিলি কাকাকে আবিষ্ট দেখে জানতে চাইল, কি ভাবছ কাকা?

স্ট্রঘাণ বললেন, ভাবছি এভাবে আমরা শুধু চোখের দেখাটাই দেখতে পাব আসল যে দেখা যা অতি গভীরে না গেলে হয় না, তা হয়ত হয়ে উঠবে না। আর গভীরে যেতে না পারলে কোন কিছুকেই জানা যায় না! যে কোন একটা ফলের কথাই ধর তার বাইরে থাকে খোসার আবরণ। যদি সেই আবরণ সরিয়ে ভেতরে না দেখতে পাও তবে কি পাবে তার আসল পরিচয়?

এমিলি কাকার কথা মন দিয়েই শুনল। ভাবল। তারপর বলল, সে দেখা ক'জনের পক্ষে সম্ভব?

কাকা জবাব দিলেন না। ক'জনের পক্ষে সম্ভব সে তাঁর চিন্তার বিষয় নয়, তিনি সেইভাবেই দেখতে চান এটাই তাঁর কাছে বড় কথা।

এমিলি কাকার কথা শুনে একটু বিস্মিত হ'ল, বলল, তোমাকে এত নিরাশ হতে তো কখনও দেখি নি? তুমি হঠাৎ এমন নেতিবাচক ভাবনার

মধ্যে পড়ে গেলে কি ক'রে?

স্ট্রঘাণ প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন, পৃথিবীময় বাণিজ্যের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। কিন্তু মানুষের বা দেশের পরিচয় জানবার কাজ সে ভাষা দিয়ে চলে না। তার জন্যে সে দেশের নিজস্ব ভাষা জানতে হয় আর এদেশের ভাষা আমার একেবারেই অজানা তাই শঙ্কিত হয়ে পড়ছি।

ভাষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি এমিলি এদেশে এসে নিজেও প্রথমদিকে ক'রেছে তাই কাকার কথার মর্ম উপলব্ধি ক'রতে পারল সহজেই। কোন বাদপ্রতিবাদ না ক'রে মেনে নিল কাকার কথা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্ট্রঘাণ বললেন, তবু দেখা যাক কতদূর কি হয়।

সে তো নিশ্চয়ই। এসেছি যখন দেখতে তো হবেই।

টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা ক'রতে ক'রতে সন্ধ্যে হয়ে গেল কিন্তু কলকাতার ফোন আর এল না। তখন স্ট্রঘাণ নিরাশ হয়ে বললেন, আরও অপেক্ষা করা আমাদের বোকামী হবে। — অভ্যর্থনায় যে লোকটি বসে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন দুজনে, প্রশ্ন ক'রলেন, এখন কি আমরা বেরোতে পারি?

নিশ্চয়ই। এখানে কোন রকম ভয় নেই। এই শহরটাই চিরদিন যাত্রীদের টাকায় চলে এসেছে এখানে আপনারা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা ক'রতে পারেন।

এখন কি দেখতে যেতে পারি?

এখানে সব সময়েই গঙ্গা।

মানে নদীর ধারে? — এমিলি জানতে চাইল।

হ্যাঁ। আপনি এই গঙ্গার ধারে সকালে একরকম দৃশ্য দেখবেন, দুপুরে আর একরকম, সন্ধ্যায় দেখবেন সম্পূর্ণ অন্য এক দৃশ্য।

তাই নাকি? — স্ট্রঘাণ বেশ একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন ক'রলেন।

যান না, গিয়ে দেখেই আসুন — বলেই একজন বেয়ারাকে ডেকে লোকটি নির্দেশ দিল এঁদেরকে হর-কি-পৌড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে একটা রিক্সা ক'রে দাও।

সেই ওবেলা দেখা ঘাটটিতেই নিয়ে এল রিক্সাওয়ালা। দুধারে পথের ওপর ঝুঁকে পড়া দোকানগুলোয় তীব্র আলো জ্বলছে, গমগম ক'রছে লোকে। ভীড়। তবু এ ভিড় মন্দ লাগল না। অনেক রকম পোষাক পরা লোকেরা সব। স্ট্রঘাণ লক্ষ্য ক'রে দেখলেন কিছু লোক দোকানের ভেতরে হয়ত জিনিষ কিনছে, কিছু লোক বাইরে দাঁড়িয়ে দর ক'রছে, কিছু কিছু লোক দূর থেকে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছে জিনিষগুলো —। বিচিত্র সমাবেশ। স্ট্রঘাণ রিক্সা থেকে নেমে সেই সমাবেশ দেখতে দেখতে চললেন। এই যে কেউ

কিনছে, কেউ দাঁড়িয়ে দেখছে, কেউ পরখ ক'রছে দাঁড়িয়ে —, সবাই বিরতিতে তবু স্টুঘাণের মনে হ'ল সবাই মিলে যেন চলছে। চলছেই ! সব মানুষ একটা গতিরই অংশ যেন। মনে হচ্ছে পথটাই যেন গতিময়।

এমিলি লক্ষ্য ক'রে দেখছিল বৈচিত্র্য। এক এক দলে এক এক রকম পোষাক পরা মহিলা। অনেকেই ওর দিকে দেখছে। একটা অল্প বয়স্ক বউ তো পথের ওপর হাঁ ক'রে দাঁড়িয়েই পড়ল ওর মুখের দিকে চেয়ে। তার এক বয়স্কা সঙ্গিনী ওর দুর্বোধ্য ভাষায় তাকে কি যেন বলাতে ওর দিকে তাকাতে তাকাতে বিপরীত দিকের ভিড়ে মিশে গেল। মেয়েটি ছোট। তবু তার সিঁথিতে সিঁদুর দেখে এমিলি বুঝল সে বিবাহিতা। বউ। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল অতটুকু মেয়ে বউ হওয়ায়। কেমন পুতুল পুতুল দেখাচ্ছিল। পোষাকটাও এমন পরেছিল যা কোনদিন দেখেনি এমিলি। সঙ্গে যে বয়স্কা মহিলারা ছিল তারাও ঠিক একই ধরণের পোষাক পরেছিল। বড় জানতে ইচ্ছে ক'রছিল এরা কোথাকার, কে বলবে ? কল্যাণ থাকলে বলত। ওর মত একজন ভ্রমণ সঙ্গী পেলে সুখ ছিল।

রাস্তাগুলো সরু সরু গলি হলেও হাঁটতে বেশ ভালই লাগছে এমিলির। প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে চলতে হচ্ছে কিন্তু তাতে কোন বিকার নেই। যে যার চলেছে কার সঙ্গে ছোঁয়া লাগল বা কে গেল পাশ দিয়ে চেয়েও কেউ দেখছে না। সবাই যেন ব্যস্ত। এত লোক কিসের টানে বা কিসের জন্যে যে এখানে এসেছে এমিলির বোধগম্য নয়। মাঝে মাঝে অনুমান করবার চেষ্টা ক'রে সে ঘুলিয়ে ফেলছে। তারাই বা কিসের আকর্ষণে এসেছে ? জিজ্ঞেস ক'রলে কেউই বোধহয় কোন জবাব দিতে পারবে না।

এমিলির ইচ্ছে হচ্ছিল যারা পথের ওপর দাঁড়িয়ে দোকানের জিনিষগুলো দু চোখ ভরে দেখছে তাদের মতই দেখতে থাকে। কিন্তু সে লক্ষ্য করেছে তারা কোন কিছু দেখলেই দোকানদার কেনবার জন্যে বা ভালভাবে দেখবার জন্যে ডাকে। না কিনলে তখন বড়ই লজ্জা লাগে। তাই বহু কিছু দেখবার ইচ্ছা হলেও দেখতে পারে না তারা। তবু সে কাকাকে বলল, একটু আস্তে চল কাকা, দেখতে দেখতে যাই কতরকম জিনিষ —

স্টুঘাণ বললেন, এদিকে তো বেশ ঠাণ্ডা। হোটেলের ম্যানেজার বলছিল পাহাড়ের ওপরে গেলে খুব ঠাণ্ডা। আমাদের বেশী গরম কাপড় থাকা দরকার। ভাবছি কাল দুখানা কম্বল কিনে নেব।

কেনবার কথায় খুবই খুশি এমিলি। সে পথের ধারে বসে থাকা ভোটিয়া ফেরিওয়ালাদের দেখিয়ে বলল, ওরা সব কি সুন্দর সুন্দর সোয়েটার স্কার্ফ বিক্রি ক'রছে দেখ। ওরই দুএকটা কিনলে হয়।

দেখ যদি পছন্দ হয় — কাকা বললেন।

অন্যদিন কেনাকাটা করা যাবে। আজ চল বেড়িয়ে নিই — এমিলি মত

প্রকাশ ক'রল।

সে তো বটেই — ওই দ্যাখ — স্ট্রঘাণ সামনে দেখালেন।

সেই নদী। গঙ্গা। সেই ঘাটটাই। দুপুরবেলা যে ব্রিজটার ওপর উঠেছিল সেখানে তীব্র বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। মাঝখানটায় সেই যে দ্বীপের মত, আলো জ্বলছে সেখানেও। আর সেই উজ্জ্বল আলোর সামান্য শূন্য এলাকা পেরিয়ে অসীম অন্ধকার সমস্ত দিকদিগন্ত জুড়ে, মনে হচ্ছে এইদিকে মুখ ক'রেই বসে আছে এটুকুকেও গিলে ফেলবার অপেক্ষায়। আর সেই অসীম তমসার স্তব্ধতা ভেদ ক'রে জলের শব্দ অবিরাম! সে যেন দিনের বেলাকার চেয়ে বেশী। অন্তত পটভূমির স্তব্ধতার জন্যে বেশী শোনাচ্ছে। একদিকে অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার আর একদিকে একটানা শব্দ এই দুয়ের গভীরতায় এমিলি নিজের মনকে হারাল। মুগ্ধতার পথ ধরে সে চেতনলোকের বাইরে গিয়ে পড়ল।

আর স্ট্রঘাণ। জীবনের এতগুলো কাটিয়ে আসা রাতে অনেক অন্ধকার দেখেছেন কিন্তু আজকের এই অন্ধকার দেখে তিনি মোহিত হলেন। তাঁর মনে হ'ল এ এক অন্যরাত্রি অন্য অন্ধকার। হয়ত বা বিশ্বের বাইরে অন্য জগতের তমিস্রার মধ্যে তিনি কোন শুভক্ষণের যাত্রী। জীবনে আলোর বিশেষ ভূমিকা আছে যা তিনি বারংবার দেখেছেন, আজ মনে হ'ল অন্ধকারেরও ভূমিকা থাকে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হতে লাগল শিবলিক পর্বতমালার ওই অদ্ভুৎ অন্ধকারে জীবন প্রতিফলিত হচ্ছে, প্রতিবিম্বিত হচ্ছে আত্মার মূর্তি। তাকে তিনি চেনেন না, জানেন না, দেখেন নি, তবু মনে হচ্ছে বহু দেখা অপরিচয়ের সলজ্জ অস্তিত্ব! এবং সে অস্তিত্ব তাঁরই, আপনার, তবে সে চেতন লোকের তিনি নন, তিনিই তবে অন্য তিনি।

ধীরে ধীরে এগিয়ে কিছুটা নেমে একটা সিঁড়ির ওপরেই বসে পড়লেন দুজনে। সে সময় একবারও তাঁর ব্যক্তিত্ব এসে এভাবে পথে বসতে বাধা দিল না। আরও বহু মানুষ যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে আপন আনন্দে, তেমনি তিনি বসলেন। তবে তিনি রইলেন বহুর মধ্যে একা। এমনকি তাঁর সঙ্গে যে এমিলি আছে তার অস্তিত্বও তখন তাঁর কাছে সত্যি নয়। নিজের মুখোমুখি বসে তিনি দূরলোকের ধ্বনি শুনতে লাগলেন জলস্রোতের শব্দ তরঙ্গে।

এমিলি চারপাশে চেয়ে চেয়ে দেখছিল অনেক লোক সেই দ্বীপের মত বাঁধানো বিরাট চাতালটায় বসে আছে। ঠাণ্ডা বেশ ভালভাবেই আত্মপ্রকাশ ক'রেছে! শীত শীত ক'রছে তারও। পেছনে ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখল বেশ কিছু লোক ছোট ছোট জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে ছেলেরা যেমনভাবে আগুন পেলে খেলা করে তেমনিভাবে নাড়ছে। দেখতে বেশ লাগছে। আর ইচ্ছে হ'ল সেই ঘাটে গিয়ে দেখে ওরা আসলে কি ক'রছে বা কেন অমন ক'রছে। কিন্তু কাকা চুপচাপ বসে আছেন বলে তারও কথা বলতে ইচ্ছে ক'রল না। মনে হ'ল কথা বললে

সমস্ত পরিবেশেই যেন বিরক্ত হবে। সহসা তার মনে হ'ল ওই বাঁ দিকে যেদিক থেকে এই জলধারা গড়িয়ে আসছে এই জলরেখা ধরে চলতে পারলে মন্দ হয় না। এমন যদি কোন জলযান পাওয়া যেত যা এই উদ্দাম স্রোত আর প্রচণ্ড পাথরের বাধা ডিঙ্গিয়ে চলতে পারবে তাহ'লে বেশ হ'ত। এ জলধারা কোথা থেকে কেন নামছে? কি উদ্দেশ্যে? এসব কি ভাবছে সে? নিজের মনেই হাসল আপন ভাবনা দেখে। উদ্দেশ্য আবার কি? জল নামছে যেদিকে ঢালু সেইদিকে, এর মধ্যে উদ্দেশ্যের কি কথা? কার বা উদ্দেশ্য থাকবে? বরং কোথা থেকে আসছে, সেখানেই বা এত জলের উৎপত্তি কি? কত কাল ধরে এই জল নেমে আসছে? — নিজের মনেই প্রশ্ন ক'রল, কাকে ক'রল সে নিজেও জানে না। পৃথিবী সুরুর দিন থেকে? কতদিন এ জলস্রোত চলবে? চিরকাল? চিরকাল কি কিছু চলে? সবেরই তো শেষ আছে শুধুমাত্র কাল নিরবধি, তার সুরু এবং শেষ কোনটাই নেই। অতএব চিরকাল কিছুই চলতে পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদ এমিলি অনুভব ক'রল শীতল একটা অনুভূতি যেন তাকে জড়িয়ে ধরেছে। এবং সেই অনুভূতি বেশ কষ্ট দিচ্ছে তাকে। কাকাকে সে বলল, বেশ ঠাণ্ডা লাগছে কাকা। চল উঠে পড়ি। ওই দেখ প্রায় সব লোকই চলে গেছে।

স্ট্রঘাণ যেন আত্মস্থ হলেন। সত্যিই একদম ফাঁকা। যখন এসেছিলেন বেশ কিছু লোক ছিল চারপাশে এখন দুএকজন মাত্র এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। কাকা সম্বিৎ ফিরে পেতে বুঝলেন তাঁরও মাথার ওপর এবং মুখমণ্ডল প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এমন কিছু নয় তবু বললেন, চল ফিরি।

প্রায় ফাঁকা সাঁকোটার ওপর উঠে এমিলিকে বললেন, সত্যিই জায়গাটা সুন্দর। খুব সুন্দর। আমি এইরকম নদীর পথ, জলপ্রপাত অনেক দেখেছি তবে এখানে মনে হচ্ছে আলাদা একটা সৌন্দর্য আছে।

আলাদা কি রকম? এমিলি ব্যাখ্যা চাইল।

তা ঠিক বুঝাতে পারছি না —। কি কারণে অন্যরকম বা পার্থক্যটা কি সে ব্যাখ্যা ক'রতে পারব না আমি, উপলব্ধি ক'রছি মাত্র। — স্ট্রঘাণ থামতে কথা বন্ধ হ'ল। নিঃশব্দে কয়েক পা চলে আবার তিনি বললেন, এখানে কেমন একটা গম্ভীরতা আছে। জলপ্রপাত দেখেছি সে শুধু জলপ্রপাতই। সেখান থেকে নদী বা ঝরণা! এখানে নদীর গতিময়তাকে যেন মনে হচ্ছে আবির্ভাব। মনে হচ্ছে একটা কিছু হ'ল। একটা ঘটনা।

এমিলি চুপচাপ শুনতে লাগল। স্ট্রঘাণ কথাগুলো থেমে থেমে কেটে কেটে বলছিলেন তাঁর স্বাভাবিক কথাবলার থেকে আলাদা ভঙ্গীতে। যেন প্রতি মুহূর্তে যা বুঝছেন, বোঝাচ্ছেন। মনযোগ দিয়েই শুনছিল এমিলি. স্ট্রঘাণ বলছেন, সেইজন্যেই বোধহয় স্থানটা এত গুরুত্ব পেয়েছে।

অনেক মানুষ এখানে আসে, এমিলি বলল।

আসে বললে ঠিক বলা হবে না বহু যুগ ধরে প্রত্যেক দিন আসছে। জলস্রোত যেমন বিরামহীন তেমনি এই জনস্রোতও। ধর এই নদীর ঘাটে দোকান করে যে বৃদ্ধ, কবে সেই যৌবনে এসে বসেছেন, তিনি এই জনস্রোতকে যেমনভাবে প্রত্যক্ষ ক'রতে পেরেছেন, তেমনভাবে আর কেউ নয়। — বলে কিছুক্ষণ থেমে স্ট্রঘাণ বললেন, মন্দ নয়। কি বল এইরকম একটা ছোট্ট দোকান খুলে জীবনভোর চুপচাপ বসে থাকা বেশ শান্তির, তাই না?

উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাশূন্য জীবন আছে কি?

স্ট্রঘাণ শব্দ ক'রলেন না, যেন মনে মনেই উত্তর দিলেন, যাতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা হয় তেমন কাজগুলো বাদ দিয়ে গেলেই হ'ল। এমিলি ভাবল কাকা তার কথা মেনে নিয়েছেন। তাই সে বলার কথা না পেয়ে নিঃশব্দে চলতে লাগল। সিঁড়ি বেয়ে পথের ওপর এসে দাঁড়াতেই আবার সেই মানুষ। পর্ণ লোকালয়। একটা গরু সেই ভিড়ের মধ্যে বেশ দ্রুত এগিয়ে আসছে নিজেকে মুক্ত ক'রতে। তাকে দেখে সরে দাঁড়ালেন।

হোটেলে এসে পৌঁছোতেই অভ্যর্থনার সেই ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, কেমন লাগল?

সুন্দর। খুবই সুন্দর। আপনাকে ধন্যবাদ। — স্ট্রঘাণ বললেন।

আমি ধন্যবাদ পাবার কাজ করিনি। এখানে ক'দিন থাকবেন তো?

সেই রকমই ভেবেছি।

ঠিক ক'রেছেন। অনেকে আসে একদিন থেকেই চলে যায়। তাতে কোন জায়গাকে ঠিকমত দেখা হয় না। কাল সকালে আমি আপনাকে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

তিনি কে?

একজন মানুষ। সাধারণ মানুষ কিন্তু আলাপ ক'রলে ভাল লাগবে।

বেশ। আপনার এই সহৃদয়তার জন্যে ধন্যবাদ।

পরের সকালেই ভদ্রলোক মিস্টার স্ট্রঘাণের ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। দরজা খুলেই অভ্যর্থনা ক'রলেন স্ট্রঘাণ। ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, আপনি কি বাইরে যেতে রাজী — ?

এখনই রাজী, স্ট্রঘাণ জানালেন।

তাহ'লে চলুন। এবেলা আমার ডিউটি নেই। আপনাদের সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

খুব আনন্দের সঙ্গে, বলেই স্ট্রঘাণ এমিলিকে ডেকে নিলেন। সামান্য সময়ের মধ্যেই বেরিয়ে এলেন তিনজনে। স্ট্রঘাণ প্রশ্নও ক'রলেন না কোথায় কতদূরে যেতে হবে। প্রদর্শক নিজেই বললেন,সামান্য পথ, চলুন পায়ে হেঁটেই যাই।

ব্রহ্মকুণ্ডের অনেকটা দক্ষিণে একটা বড় বাড়ীতে ছোট্ট একটা ঘরে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে কি একটা বই পড়ছিলেন তিনজনকে দেখে বেশ কিছুক্ষণ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। প্রদর্শক ভদ্রলোক একটু এগিয়ে গিয়ে আপন ভাষায় কি বলতেই গৃহস্বামী ভদ্রলোকও তার জবাব দিলেন। প্রদর্শক এমিলিদের দিকে দেখিয়ে কি বলতে বৃদ্ধ ইংরিজীতে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, অনুগ্রহ ক'রে ঘরে আসুন।

স্ট্রঘাণ লক্ষ্য ক'রলেন হোটেলের ভদ্রলোক পায়ের জুতোটা বাইরে খুলে রেখে ভেতরে ঢুকেছেন। তিনিও জুতোটা খুললেন। ভেতরে ঢুকে দেখলেন বড় একটা সতরঞ্চি মাটিতে বিছিয়ে বসে আছেন বৃদ্ধ। এককোণে একটা চাদরবালিশ পাতা। বিছানা। আর একদিকে এটা সেটা দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামগ্রী আর বই সারা ঘরে কিছু কিছু ছড়ানো। সবাই ঘরে ঢুকতেই বৃদ্ধ বললেন, আপনারা আসায় আমি অত্যন্তই আনন্দিত বোধ ক'রছি আপনাদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে পেরে। আমার একটা সামান্য পরিচয় পবিত্র মৈত্র নাম। আর কিছু নেই।

আত্ম পরিচয় দিলেন স্ট্রঘাণ — আর বললেন, এ আমার ভাইঝি শ্রীমতী এমিলি মুখার্জী। কলকাতা থেকে এসেছি।

মুখার্জী? তুমি কি মা কোন বাঙ্গালী ছেলের ঘরণী হয়েছ?

হ্যাঁ, এমিলি বলল।

পৃথিবীর আয়তন খুব ছোট হয়ে গেছে। এখন আমেরিকা ভারতবর্ষে বৈবাহিক সম্পর্ক হচ্ছে সহজেই, আগে হতে পারত না। বেশ বেশ ভারী সুন্দর। — তারপরই স্ট্রঘাণকে বললেন, এখানে এভাবে বসতে হয়ত আপনার কষ্ট হবে কিন্তু আমার কাছে অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে তো কেউ আসে না —

স্ট্রঘাণ ভদ্রলোক সম্বন্ধে কিছু জানেন না, আচমকা এসে পড়েছেন তাই তাঁর কথা শুনে কেবল মাথা নাড়লেন ওপর নীচে। মুখে কিছু বললেন না। কি বললে যে ঠিক হ:ব বুঝতে পারছেন না।

সংযোগকারী বললেন, আপনি সে জন্যে কিছু ম:ন ক'রবেন না। আমরা এখানেই বসছি। —ব:ল বৃদ্ধের সামনে সতরঞ্চির ওপরেই বসে পড়লেন ভদ্রলোক। স্ট্রঘাণ এবং এমিলিও ও'র দেখাদেখি বসে পড়ল। বৃদ্ধ বললেন, আসলে কি জানেন যতই আয়োজন ক'রবেন ততই বোঝা বাড়বে। আর সে বোঝা বইতে হবে নিজেকেই। সামান্য এই কিছুটা সময়ের জীবনটা নিজেই একটা বিরাট বোঝা এর ওপরে সখ ক'রে আর আবর্জনা বাড়াই কেন?

স্ট্রঘাণ কথা শুনে ভালভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখলেন সাদা একখানা ছোট্ট কাপড়, বোধহয় লুঙ্গি বৃদ্ধের পরণে আছে, গায়ে আছে সাদা একটা ফতুয়া। সত্যিই সামান্য আয়োজন। ঘরের মধ্যেও সামগ্রী অত্যন্ত সামান্য।

হঠাৎ একটু হাসলেন বৃদ্ধ, স্নিগ্ধ সুন্দর সেই হাসিটুকুর সঙ্গে মিশিয়ে বললেন, সেই যে কবে কলকাতা ছেড়েছি তারই হিসেব মনে নেই অন্য তো দূরের কথা। আসলে মানুষের কোন হিসেব থাকবার কথা নয় — কোথা থেকে এসেছি তাও যেমন নয় কোথায় যেতে হবে তা-ও নয়। যত বাজে হিসেব নিকেশ করি মাঝখানের এই সময়টুকুতেই।

এমিলির মুখ ফসকে বাংলা বেরিয়ে গেল, কলকাতা? আপনি কলকাতার লোক?

বৃদ্ধ ঈষৎ উদ্ভাষিত হয়ে উঠলেন বিস্ময়ে, বাংলাতেই বললেন, তুমি বাংলা শিখেছ?

হ্যাঁ।

তোমার কাকা আর এই যোগীন্দ্র — এঁরা জানেন না। অতএব পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। — বলেই ইংরিজীতে বলতে লাগলেন, প্রথম যখন এখানে আসি চারিদিকে কি ভীষণ জঙ্গল। নদীর ওপারে বিশাল বিশাল সব গাছ যাকে আমরা বলি মহাবৃক্ষ। কিছু ধর্মশালা আর গুটিকয়েক আশ্রম নিয়ে এই হরিদ্বার। কয়েকজনমাত্র দোকানদার হরেকরকম পসরা নিয়ে এসে যাত্রীদের সেবা ক'রছে। চাল ডাল তেল নুন ইত্যাদিই প্রধান। শান্তি — নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। কি অপূর্ব সেই হরিদ্বার।

এবার বেশ তৃপ্তি পেলেন চট্টঘাণ। মন যেন নড়ে চড়ে বসল। সেই পুরানো দিনের কথা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। মৈত্র মশায় কি যেন ভাবলেন তারপর বললেন, একদিক দিয়ে বলতে আজকালকার ছেলেমেয়েরা, যেমন এই এমিলি, এরা অশান্তিতে ভোগে না। এরা সব কিছুকেই চোখের দেখা দ্যাখে, মনের চোখ দিয়ে দেখতে গেলে অশান্তি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। কারণ মনের সঙ্গে কখনও কোন কিছু মেলেনি, মেলে না। — বৃদ্ধ থামলেন। আবার আপন মনেই আরম্ভ ক'রলেন, মন চায় সব কিছু নিজের ইচ্ছামত দেখতে, চোখ দেখতে চায় সেটা যেমন আছে ঠিক তেমনি।

চট্টঘাণ হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসলেন, এইসব স্থানকে দেবলোক কেন বলা হয়েছে বলুন তো?

মৈত্র মশায় প্রশ্ন শুনে সরাসরি মিস্টার চট্টঘাণের চোখের দিকে তাকালেন, বললেন, ধর্মীয় ব্যাখ্যা আছে। সেটা বিশ্বাসের ব্যাপার। সাধারণ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন মানুষ তার আপন প্রাপ্তির মধ্যে যা কিছু ভাল সবকিছু দেবতার ওপর আরোপ ক'রেছে। যেমন ধরুন সৌন্দর্য — মানুষকে যে সৌন্দর্য প্রকৃতি দিয়েছে তা দিয়ে মানুষ গড়েছে দেবতা, দেবতা মাত্রই সুন্দর। মানুষের যা গুণ তা সে দেবতাতে উৎসর্গ ক'রেছে, বলে এ গুণ নাকি দেবসুলভ। এমনি ক'রে জ্ঞাত সমস্ত সৌন্দর্যকেই মানুষ দেবতার হাতে তুলে দিয়েছে। এই যে অতি মনোরম স্থান, একেও। বলেছে দেবলোক। সেটা হয়ত আরও সম্ভব হয়েছে

সেকালের ভারতবর্ষের দুর্গম এই পাহাড়ী এলাকার লোকদের শারীরিক সৌন্দর্য আর তাদের স্বভাবজাত সততা ঔদার্য প্রভৃতি গুণের জন্যে।

যে মানুষেরা এত জ্ঞানী তাঁরা কি এত ক্ষুদ্র কারণে এতবড় একটা সিদ্ধান্ত ক'রবেন? স্ট্রঘাণ জানতে চাইলেন।

মৈত্র মহাশয় মনে মনে বিশেষ প্রীত হলেন। একজন বিদেশী মানুষের মুখে এ প্রশ্ন তিনি আশা করেন নি। স্ট্রঘাণের চোখের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন নিজের চোখ কুঁচকে, তারপর বললেন, ব্যাপারটা আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম কারণ কেউই আজকাল গভীরে যেতে চায় না। তাছাড়া এর নানা রকম ব্যাখ্যা আছে। সময় সাপেক্ষ। যদি আপনি উৎসাহী হন আর একদিন সময় ক'রে বসে আলোচনা করা যাবে। আমার ক্ষুদ্র জীবনে দেখলাম জ্ঞান নিরবধি।

যোগীন্দ্র হঠাৎ কথার মধ্যে পড়ল, স্ট্রঘাণকে বলল, আমি মার্জনা চাইছি হঠাৎ একটা প্রশ্ন মনে এল জিজ্ঞেস করে নিই —

নিশ্চয়ই, উৎসাহিত ক'রলেন স্ট্রঘাণ। যোগীন্দ্র পবিত্র মৈত্রকে ইংরিজীতেই প্রশ্ন ক'রল, সেদিন পণ্ডিতজী যে প্রশ্নটা জানতে চেয়েছিলেন তার জবাবটা অন্য কথায় ভুলে গিয়েছিলেন। সেকথা মনে আছে?

আবার একবার বলো। ভুলে গেছি। মৈত্র মহাশয় বললেন।

পণ্ডিতজী জানতে চেয়েছিলেন 'ধ্রুব কি'?

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন, বললেন, বিনাশ। এছাড়া পৃথিবীতে ধ্রুব কিছু নেই।

উত্তর শুনে তা হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে চুপ ক'রে রইল যোগীন্দ্র। স্ট্রঘাণ এবং এমিলিও যেন মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াতে লাগল জবাবটা যাচাই-এর জন্যে। বেশ কিছুক্ষণ কোন শব্দ হ'ল না ঘরে। মৈত্র মশায় যোগীন্দ্রকে বললেন, এ কেবল আমার উপলব্ধির কথা তোমাকে বললাম। এর মধ্যে ভুলও হতে পারে, আমার বোঝার ভুল। যদি দেখ ভুল হয়েছে আমাকে অবশ্যই বলে যেয়ো। — তারপর স্ট্রঘাণদের উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, এ অনুরোধ আপনাদেরও ক'রলাম কারণ জ্ঞান তো অনন্ত, এক কণিকাও লাভ হয়নি এই সামান্য জীবনে। — একটু থেমে বললেন, আমরা হিন্দুরা বিশ্বাস করি এ জীবনের কর্মফল পরজন্মেও পাওয়া যায়। রাত্রে ঘুমের পর সকালে জেগে উঠে যেমন আগের দিনের আরব্ধ কর্ম ক'রে থাকি, মৃত্যু নামক মহানিদ্রার পরও তেমনি আগের জন্মের কৃত অংশটুকুর পর থেকে আরম্ভ করি সে জন্মের কাজ; সেই বিশ্বাস অনুসারেই চেষ্টা ক'রছি যতটুকু এ যাত্রায় পাই —

স্ট্রঘাণ মনে মনে কিছুটা শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়লেন, কিঞ্চিৎ কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি।

নিশ্চয় ক'রবেন, বৃদ্ধ জবাব দিলেন, মনে ক'রব কেন বলুন? এঁ তো আলোচনা। আলোচনা তো জ্ঞানেরই একটা পথ।

তবু কুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলেন, আপনি কি সুখী?

বৃদ্ধ আবার যেন একটু ভাবতে চেষ্টা ক'রলেন, তারপর বললেন, এ বড় কঠিন প্রশ্ন ক'রেছেন। এক কথার প্রশ্ন কিন্তু উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। প্রসঙ্গত একটা প্রশ্ন আমি আপনাকে ক'রতে চাই, সুখ বলে চূড়ান্ত কোন অবস্থাকে কি আপনার জানা আছে? আপনি কি আমাকে এ বিষয়ে আলোকপাত ক'রতে পারেন মনের কোন অবস্থাকে সুখ বলে?

সৃষ্টিঘ্রাণ চুপ ক'রে রইলেন। কিন্তু দমলেন না, প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে ধরলেন, আপনার মনে কি কোন অভাববোধ বা অশান্তি নেই?

দিন কাটাবার জন্যে বসে আছি ঠিকই কিন্তু অভাববোধ না থাকলে এই সব বইপত্রের কোন প্রয়োজনই তো ছিল না। অভাববোধ বা অশান্তিশূন্য মানুষের কথা তো কল্পনা ক'রতে পারিনি, কোন প্রাণী আছে কিনা এখন ভেবে পাচ্ছি না।

কথায় কথায় অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিল। যোগীন্দ্র ওঠবার কথা মনে করিয়ে দিতে এমিলি বলল, যদি অনুমতি দেন তো আপনার একটা ছবি তুলি।

হাসলেন বৃদ্ধ। খুব স্নিগ্ধ সেই হাসির সঙ্গেই বললেন, কোন স্মৃতিই কি দীর্ঘস্থায়ী হয় না? স্মৃতি যে ক'দিন থাকবার মনের মধ্যেই সবচেয়ে যত্নে থাকে। —হাতের বইটা একপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, বাহ্যিক বস্তুর সংগ্রহ যত বাড়াতে থাকবে তোমার বোঝা ততই বেড়ে যাবে। তারা তোমাকে ক্রমাগত বিব্রত ক'রতে থাকবে। অন্তরে যদি কিছু সংগ্রহ ক'রতে পার তাহ'লেই বেড়ে যাবে তোমার ঐশ্বর্য। কাজেই মানুষের প্রকৃত ঐশ্বর্য হ'ল জ্ঞান।

বিদায় নিয়ে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। জুতো পরাও হয়ে গেছে এমন সময় মৈত্র মশায় সৃষ্টিঘ্রাণকে বললেন, শান্তি পেতে চান তো এই হরিদ্বারেই দিন কয়েক থেকে দেখুন না?

সৃষ্টিঘ্রাণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ঠিক এই থাকার কথাটাই তিনি সেই মুহূর্তে ভাবছিলেন। এই বৃদ্ধ মনের কথাটি জানলেন কি ক'রে? ব্যাপারটা মনে ধরল কিন্তু আর কোন কথা বললেন না। বাইরে এসে হেমরাজকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, ইনি কি সাধু?

কি মনে হ'ল — পাল্টা প্রশ্ন ক'রল হেমরাজ।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

হেমরাজ খুব শান্ত ও গম্ভীর ভাবে বলল, আমিও ঠিক জানি না। হয়ত জানিই না সাধু কাকে বলে।

কেন?

চরিত্র দিয়ে বিচার ক'রলে তো ইনিই প্রকৃত সাধু কিন্তু আকৃতি দিয়ে বিচার

ক'রলে এঁকে সাধু বললে অন্য লোকে মানবে না।

এখানে উনি কি করেন?

ওই তো দেখলেন। পড়াশোনা।

দিন রাত?

তাই তো মনে হয়।

এমিলি জানতে চাইল, উনি তো কলকাতার লোক। এখানে কতদিন আছেন?

কতদিন বলতে পারব না তবে আমি প্রায় বছর বিশেক দেখছি। ওটা একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বাড়ী। ওই প্রতিষ্ঠানই ওঁকে ওই ঘরটায় থাকতে দিয়েছে তাই আছেন।

খান কোথায়?

সামনেই সাধুদের একটা আশ্রম আছে, সেখানে। তাছাড়া দুচারজন লোক যাঁরা ওঁকে চেনে তারাও মাঝে মধ্যে খাবার এনে দেয়।

এই ভাবেই আছেন? — এমিলি যেন বিস্মিত হ'ল।

উনি যদি নিজেকে সাধু সাজাতেন তাহ'লে বহু লোকের ভিড় হ'ত। কিন্তু উনি হলেন খাঁটি মানুষ। ভিড় পছন্দ করেন না শান্তি নষ্ট হবে বলে। আমরা দুচারজন কখনো কখনো যাই সেটুকু সহ্য করেন।

রুদ্রঘাণ নিঃশব্দে চলছিলেন। মানুষটি জ্ঞানী। কিন্তু সেখানেই শেষ। তিনি যেন আরও কিছু আশা করেন। অন্য কিছু কিংবা আরও অনেক কিছু। কিন্তু সে প্রত্যাশা কিসের তা তিনি নিজেও জানেন না। এবং তিনি যে আরও বেশী কিছুর আশা করেন সেটাও জানলেন আজ এই মানুষটির সামনে এসে। নইলে তিনি নিজের প্রত্যাশার স্বরূপ জানতেন না। তিনি যে শান্তিময় জীবনের স্বপ্ন দেখছিলেন তা তো ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মধ্যে প্রতিফলিত। রুদ্রঘাণ নিজেই দেখলেন তা, তবু যেন কি একটা খুঁত রয়ে গেছে, তাঁর মনে হ'তে লাগল ঠিক এই রকম জীবন নয়। শান্তি তবে এই শান্তি নয় যা তিনি চান। এভাবে একা বেঁচে থাকা নয়, অনেকের মধ্যে একা থাকা। তাঁর মনে খুঁত খুঁত ক'রতে লাগল। এভাবে একা নিঃসঙ্গ এই বৃদ্ধ একান্তে পড়ে আছেন — ব্যাপারটা মনঃপুত হ'ল না রুদ্রঘাণের। অথচ এখানে তাঁর কোন ভূমিকা নেই, কিছু করণীয় নেই, তাঁর এ নিয়ে ভাবনারও কোন অর্থ হয় না, তবু তিনি ভাবতে লাগলেন। একা এভাবে কতদিন আছেন কে জানে কিন্তু জীবন সম্পর্কে দৃষ্টি কি স্বচ্ছ! জ্ঞান কত তীক্ষ্ণ? আরও বিস্ময়কর মনে হ'ল ওঁর অন্তর্দৃষ্টি! মানুষের ভাবনা পর্যন্ত কি দেখতে পান? এই বিজ্ঞানের যুগে এ ঘটনাও তাঁকে বিশ্বাস ক'রতে হচ্ছে যে এমন জ্ঞান আয়ত্ত করা সম্ভব যার দ্বারা মানষের ভাবনাকে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করা যায়। রুদ্রঘাণ স্থির ক'রলেন, এখন দিন কয়েক হরিদ্বারেই থেকে যাবেন। এখান থেকে যাবেন ঋষিকেশ সেখানেও যে ক'দিন

ভাল লাগে থাকবেন তারপর ওপরের দিকে উঠতে থাকবেন। আরও একদিন আসবেন এই বৃদ্ধের কাছে, শুনবেন পুরাণো দিনের কথা, অভিজ্ঞতার কথা।

রাত্রিবেলায় হোটেলে বসে এমিলি স্থির ক'রল আজকের অভিজ্ঞতার বর্ণনা ক'রে বিশ্বজিৎকে চিঠি লিখবে একটা। এ কদিনে প্রসেনজিৎকে, শ্বাশুড়ীকে এবং রুমিকে রঙীন পোস্টকার্ড আর চিঠি পাঠিয়েছে। ভাল লাগছে লিখেছে, কিন্তু এই জ্ঞানী বৃদ্ধের কথা লিখলে ওরা কেউই গুরুত্ব দেবে না। অমনি পড়াশোনা করে বিশ্বজিৎ নিজেও। কাজেই বৃদ্ধের কথা শুনলে তার ভাল লাগবে। তার নিজেরও ভাল লেগেছে বৃদ্ধকে, বড় পবিত্র চোখ দুটো, মনে হচ্ছে যেন মোমের কোন স্তিমিত শিখা, যা গির্জার বিশাল একাকীত্বে নির্জনে সারারাত জ্বলছে। সব প্রার্থনা শেষ হয়ে গেছে, বহুক্ষণ থেমে গেছে শেষ অর্গানের সুর, বাইরে কোথাও শীতল হাওয়ায় ঝড়ে পড়ছে চেরীফুল, মোম জ্বলছে। নিজের কথাগুলো খুব ধীর স্বরেই বলেন বৃদ্ধ, অনেকটা প্রার্থনার মতই শোনায়। — কথাগুলো সব গুছিয়েই লিখল এমিলি। সব বর্ণনার শেষে লিখল তোমার বয়স যখন অমনি হবে তখন তুমি কেমন হবে এখনই তোমাকে তা দেখাতে পারতাম যদি বৃদ্ধ তাঁর ছবি তুলতে দিতেন। দীর্ঘ চিঠি লিখে গভীর তৃপ্তি পেল। এমনভাবে মনের কথা লেখার মত বন্ধু নেই তার, ছিল একমাত্র কল্যাণ, তাকে কোন দিন লেখা হয়নি। প্রসেনজিৎকে লেখা চলে কিন্তু সে এসব ভাবনার মানুষ নয়, তার ভাল লাগবে না, একমাত্র বিশ্বজিৎ, কল্যাণের বর্ণনা মত ভাই এবং বন্ধু। তার মনে অফুরন্ত আবেগ, ভাবুকতা আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ। সে বুঝবে, মূল্য দেবে। অথচ আবেগপ্রবণ হবার কথা ছিল রুমির, সে কেমন যেন কুঁকড়ে গেছে বলে এমিলির মনে হয়। কেন যে এমন কুঁকড়ে গেল তা বুঝতে পারে না কারণ জীবনে অপ্রাপ্ত তো তার কিছু নেই। তবু কেন এমন হয়ে গেল এমিলি ভেবে পায় না। এই তো ক'দিন মাত্র সে এসেছে এর মধ্যেই — তার চোখের সামনে বদলে গেল রুমি। এবার একদিন সে জিজ্ঞেস ক'রবে, জানতে চাইবে, কি হয়েছে যার জন্যে তার মুখের ওপর কিসের একটা ছায়া ভাসছে যেন — ? হয়ত রুমি রাগ ক'রবে, তা করুক, বলতে হয়ত চাইবে না, তা না চাক, তবু এমিলি জিজ্ঞেস ক'রবে এবং জানবে, সাধ্যের মধ্যে থাকলে প্রতিকার ক'রবে। কিছুতেই সে এভাবে শুকিয়ে যেতে দেবে না মেয়েটিকে। সৌগত তো নিয়ম মতই আসে, ওর সঙ্গে কোন মনোমালিন্যও তো হয়নি, তবে কি কারণ থাকতে পারে? এমন কি গূঢ় কারণ আছে যার জন্যে রুমির এমন পরিবর্তন? কলকাতায় থাকাকালীন ভাবতেও সংকোচ হয়েছে। দ্বিধা ক'রেছে বাড়ীর পরিবেশের জন্যে, এখানে এই হোটেলের ঘরে একা নিজের মুখোমুখি বসে সব দ্বিধা সংকোচ অতিক্রম ক'রল এমিলি। অতিরিক্ত গাম্ভীর্যের ভারে সব সময় কেমন যেন থমথম করে বাড়ীটা। সেখানে হাসির শব্দ হয় না,

আনন্দের বাতাস বয় না, অল্পবয়সের মানুষগুলো সবাই যেন কি এক ভারী বোঝা পিঠে ক'রে বয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ তার কোন কারণ খুঁজে পায় না এমিলি। দৈবাৎ খাবার টেবিলে বসে রসিকতা করেন পরীক্ষিৎ। সামান্য, হয়ত এক কথায় কোন রসিকতা। তারপরই প্রয়োজনের কথা প্রয়োজনীয় কথা। আরও একটা অদ্ভুৎ জিনিষ লক্ষ্য করেছে এমিলি যে ওবাড়ীতে কখনই অন্য কারও প্রসঙ্গ আলোচিত হয় না, কোন আত্মীয় স্বজন বা অন্য কোন পরিবার প্রসঙ্গও নয়। সুপ্রীতি তা নাকি অপছন্দ করেন। কিন্তু এমিলির মনে হয় অন্যলোকের প্রসঙ্গ আলোচনা করারও কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকে। না করার অর্থ সবাইকে অস্বীকার করা। অবশ্য আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব কিছুই স্বীকার সুপ্রীতি করেন না। ক'রলে এমিলি দেখতে পেত। কোন আত্মীয় বন্ধুরই যাতায়াত নেই ওবাড়ীতে। ওঁরাও কোথাও যান না। প্রসেনজিৎ তো খুব স্বাভাবিকভাবেই বলে সে কোন আত্মীয়স্বজনকে চেনেই না। চেনবার কথাও অবশ্য নয় কারণ সে তো চিরদিনই পরিবারের বাইরে। ছেলেবেলা কেটেছে হোস্টেল-এ, বড় হয়েই বিদেশ।

কাল সকালে উঠেই নদীর ধারে যাবে। খুব ভোরে। দেখবে ওপারের গাছগাছালির মধ্যে থেকে কেমন ক'রে বেরিয়ে আসে পাখির ঝাঁক, কেমন ক'রে তারা ছিটিয়ে পড়ে নীল আকাশের গায়ে। প্রথম সূর্যের আলো যখন পাথর ভিজানো জলবিন্দুগুলোকে ছোঁয় কেমন দেখায় সেই মুহূর্তের প্রতিবিম্ব। বিশাল পর্বতমালার মাথার ওপর স্থির হয়ে থাকা রাতের আকাশ ভোরের আলোয় কি রূপ ধরে সেটাও দেখার আগ্রহ তার। কিন্তু হোটেলটা হয়েছে একেবারে শহর এলাকার মধ্যেখানে। অনেক বাড়ীর অস্তিত্ব দৃষ্টিকে আড়াল ক'রছে মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে পড়ে। কাল কাকাকে বলবে নদীর ঠিক কিনারায় যে সব হোটেলগুলো আছে তারই একটায় উঠে যাবার জন্যে। আজ সে দেখেছে অনেক ক'টি হোটেল আছে। হয়ত এত ভাল নয়, নাই বা হ'ল, কি হবে এত ভাল দিয়ে। তাপ নিয়ন্ত্রিত না হলেই বা কি? এখানকার মত জায়গায় তাপনিয়ন্ত্রিত হোটেল শুধুমাত্র মর্যাদাকে ওপরে তোলে। এমিলি জানে কাকা ওসব ফাঁকা মর্যাদার তোয়াক্কা ক'রবেন না। তাছাড়া এখানেই যদি থাকা হয় তবে নদীর কিনারা ছেড়ে এমনি ঘিঞ্জি পল্লীতে কি লাভ? এখানে পথে পা দিলেই ঘোড়ার মলের গন্ধ, নোংরা নর্দমার গন্ধ, চলতি পথের আবর্জনার ধুলো —। অথচ পাশেই নির্মল নীল আকাশ, তার প্রতিচ্ছায়ে স্নিগ্ধনীল জল, দূরে ঘন বনরাজি কৃষ্ণাভ নীল। ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ল এমিলি।

ঘুম ভাঙল দরজায় কার যেন করাঘাত শুনে। উঠে দরজা খুলেই দেখল কাকা। সুপ্রভাত জানিয়ে বললেন তুমি এতক্ষণ উঠছ না দেখে ভাবলাম কি হ'ল শরীর খারাপ হ'ল কি না।

বেলা হয়ে গেছে বুঝি? এমিলি অপ্রতিভ হয়ে জানতে চাইল।

বেলা হয় নি তবে কথা ছিল ভোরে উঠে বেরোব। তা আজ হ'ল না।

তার তুলনায় বেলা হয়ে গেছে।

দুঃখ প্রকাশ ক'রল এমিলি। কাকা বললেন, ও কিছু নয়। কাল গেলেই হবে।

তুমি একটু বোস, আমি আসছি, বলেই কলঘরে ঢুকে গেল এমিলি। মুখ হাত ধুয়ে একটু পরেই বেরিয়ে এসে বলল, কাকা, আমরা যখন দুচারদিন থাকব ভাবছি তখন নদীর ধারেই যে হোটেলগুলো আছে চল না তারই একটায় যাই।

স্টুঘাণ ঈষৎ চিন্তা ক'রে বললেন, মন্দ বল নি।

উৎসাহিত হয়ে এমিলি বলল, ওখানে এমন ঘর আছে যেখানে বসে সবসময় নদী দেখা যায়।

এবার সত্যিই অবাক হলেন স্টুঘাণ, প্রশ্ন ক'রলেন, কি ক'রে দেখলে?

দেখলাম কয়েকজন লোক বসে আছে। নদীর ধারের রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছিল।

কিন্তু ওখানে যদি কেউ আমাদের কথা না বোঝে?

কেউই কি বুঝবে না? দু একজন নিশ্চয়ই বুঝবে কারণ একটা হোটেলের ভেতরটায় ইংরিজিতে সব লেখা ছিল।

একটু চিন্তা ক'রে স্টুঘাণ বললেন, বেশ, মিস্টার হেমরাজকে বলছি আমাদের পক্ষে কথাবার্তা বোঝানো সম্ভব এমন একটা হোটেল দেখে দিতে।

এমিলিদের ট্রেন চলে যেতে বাড়ী ফিরেই প্রসেনজিৎ-এর মনে হ'ল ঘরে যেন কি একটা নেই। চারদিকে চেয়ে ভাল ক'রে খুঁজতে লাগল সে। রাত একটু বেশী হতে মনে হ'ল সমস্ত ঘরটাই ফাঁকা, ঘরে কিছুই নেই। সে এক শূন্যতার মধ্যে শুয়ে আছে। একবার উঠে পড়ে ঘরের আলোটা জ্বালল। অকারণেই সারা ঘরটা ঘুরে নিল, আবার এসে শুয়ে পড়ল। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হ'ল সে নির্বুদ্ধিতাই ক'রেছে, অফিসে একবার দরখাস্ত ক'রে দেখা উচিত ছিল ছুটি পাওয়া যায় কিনা। হয়ত পাওয়া যেত, না হয় সাত দিনের ছুটিতেই যেত ওদের সঙ্গে, ওদের রেখে চলে আসত। — সেটাই হ'ত ঠিক, না ক'রে ভুল হয়ে গেছে। অজানা অচেনা দেশে কোথায় যাবে কি ক'রবে তার ঠিকানা নেই। সবচেয়ে মুস্কিল দুজনেই বিদেশী। সে ওসব জায়গা না চিনলেও দেশের মানুষ হিসেবে কিছু সুবিধে তো আছেই। সাতদিনের ছুটির দরখাস্ত অনায়াসেই ক'রতে পারত সে। বার বার সেই একটা কথাই মনে হতে লাগল।

তার বিমর্ষতা প্রথম লক্ষ্য ক'রল বাড়ীর পরিচারিকা। তার ঘর পরিষ্কার

ক'রে রুমির ঘরে ঢুকেই মুখ খুলল সে, কি হয়েছে মিসিবাবা, বড় সায়েব-এর ?

কি হয়েছে ? জানতে চাইল রুমি, কারণ যা-ই হয়ে থাক তার জানবার কথা সেটা নয়।

পরিচারিকা জানতে চাইল, সকাল থেকে তাকে দ্যাখ নি বুঝি ?

কি ক'রে দেখব, আমি তো আমার ঘরে —

মনে হচ্ছে তার কোন অসুখ হয়েছে —

ভারী অসুখ ! শুয়ে আছে নাকি ?

না। দাড়ি কামাচ্ছে। কিন্তু মুখ দেখে তাই মনে হয়। —

মনে সেরকম রুমিরও হ'ল কিছুক্ষণ বাদে কলঘরের সামনে প্রসেনজিৎকে দেখতে পেয়ে। সত্যিই তার দাদার ওইরকম প্রশান্ত মুখের ওপরে কিসের যেন একটা গভীর ছায়া। দুজন বিপরীত মুখে বলে কিছু না বলেই রুমি চলে গেল নিজের ঘরে। কথা তুলল চায়ের টেবিলে। প্রসেনজিৎ তখন স্নান ক'রছে। মা-র মুখোমুখি জলখাবার খেতে বসে রুমি প্রশ্ন ক'রল, দাদার কি হয়েছে জান ?

কি হবে ! — সুপ্রীতি যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

দাদাকে কলঘরে ঢুকতে দেখলাম মনে হ'ল কিছু যেন একটা হয়েছে। তুমি একবার জিজ্ঞেস ক'রো তো।

কিছু হয়ে থাকলে নিজেই বলবে। তাছাড়া রাতে তো খেয়ে শুতে গেল, সবে সকাল হয়েছে এর মধ্যে আবার কি হতে পারে ? — মেয়ের কথাকে আমলই দিলেন না সুপ্রীতি।

ঠিক আছে তুমি দেখো — রুমি থামল।

সুপ্রীতি জানেন কারও যদি তেমন কিছু হয়েই থাকে তাহ'লে সে নিশ্চয়ই নিজের ব্যবস্থা ক'রবে। শরীর খারাপ হয়ে থাকলে ডাক্তার বসু আছে বাড়ীর জন্যে, ফোন ক'রে ডেকে নেবে তাকে, কোন খাবার অপছন্দ হ'লে বাবুর্চিকে বলবে কি তার চাই। কোন জিনিষ আনাবার দরকার হলে বসুদেবকে ডেকে বললেই সে গৃহিণীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে এনে ঠিক পৌঁছে দেবে। এর জন্যে আবার উদগ্রীব হবার কি আছে ? একমাত্র যদি হঠাৎ কারও এমন কিছু হয়ে যায় যে তার নিজের কিছু করবার ক্ষমতা না থাকে তাহ'লে তখন দেখতে হবে। কিন্তু তেমন কিছু তো ওখনও কারও হয়নি এ বাড়ীতে।

অকারণ মাথা ব্যথা না ক'রে সুপ্রীতি পাউরুটিতে মাখন মাখাতে লাগলেন। কর্তার ইচ্ছা অনুসারে বসুদেবকে ডেকে বললেন, সায়েব-এর চা-টা ঘরে দিয়ে এস।

বড় ছেলেকে ঘণ্টা দুয়েক বাদে দেখলেন খাবার টেবিলে। তাকে কাজে যেতে হয় অনেকটা আগে, তাই সকালে সে একাই খেতে বসে। সুপ্রীতি তদারক ক'রতে এসে দেখলেন ছেলের মুখ অস্বাভাবিক রকম থমথমে। মনে হচ্ছে দুশ্চিন্তায় সে যেন ভাদ্রের মেঘ হয়ে আছে। প্রথমটা আড়চোখে দেখে নিলেন, তারপর প্রশ্ন ক'রলেন, তোর কি হয়েছে রে খোকা ?

নিজেকে গোপন ক'রতে শেখেনি প্রসেনজিৎ, সরাসরি মুখ তুলে বলল, কিছু হয়নি তো ?

কিছু ভাবছিস মনে হচ্ছে ?

হ্যাঁ ভাবছি ওরা যে কোথায় গেল ঠিকমত পৌঁছতে পারবে কিনা —

ছেলের ভাবনার চেহারা দেখে একটু যেন বিরক্ত হলেন সুপ্রীতি। বললেন, মিস্টার স্ট্রঘাণ তো বার কয়েক পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরেছেন বলে শুনলাম আর এমিলিও আমেরিকার মেয়ে, আমাদের দেশের মেয়েদের মত বোকা হাঁদা নয়।

না দুজনেই বিদেশী তো —

তার কি করা যাবে কত বিদেশীই তো অমন ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেশেও তারা আবার ঠিক ফিরে যাচ্ছে।

মা-র শক্ত মনোভাব দেখে প্রসেনজিৎ আর কোন কথা বলল না। তার ইচ্ছা ছিল মা তার মনের অনুকূলে কথা বলে, তা হ'ল না দেখে সে বেশ একটু নিরাশ হয়ে পড়ল। সে কথা সুপ্রীতি অনুমান ক'রে বললেন, ওরা দিল্লীতে কোন হোটেলে উঠেছে তা তো জানিস। সোয়াইকা সায়েব ব্যবস্থা ক'রেছেন—

প্রসেনজিৎ জবাব দিল না। সুপ্রীতিই আবার বললেন, সেখানে বরং সন্ধ্যের দিকে একবার টেলিফোন ক'রে দেখতে পারিস —

এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতেও কিছু বলল না প্রসেনজিৎ। নিঃশব্দে খাওয়া সেরে উঠে গেলেন সে। সুপ্রীতি কিছু বুঝলেন না। কিছুক্ষণ শুধু চেয়ে রইলেন পেছন ফেরা প্রসেনজিৎ-এর দিকে, সে তখন যাচ্ছে। নিজের ছেলেকে নিজেই যেন বুঝে উঠতে পারলেন না সুপ্রীতি। তাঁর একটু অসন্তুষ্টিও এল বিয়ে ক'রে এনেছিস ঠিক আছে তাই বলে এ কি আদিখ্যেতা যে চোখের আড়াল ক'রতে পারব না। চোখের আড়াল হয়েছে কি ছেলের এই অবস্থা, বাকী দিনগুলো তাহলে কাটবে কি ক'রে ? এ যেন বাড়াবাড়ি। আর এই বাড়াবাড়িই তিনি দেখতে পারেন না, মনে মনে ভাবলেন সুপ্রীতি। বাপ-মা-ভাই-বোন তাহ'লে সংসারে কেউ নয় ? এক বউ-ই সব ? তাঁর আত্মসম্মানে বেশ বড় রকম আঘাত লাগল বলে তিনি মনে ক'রলেন। এ যেন তাঁকে এবং নিজের বাবাকে পর্যন্ত অপমান করা হ'ল। এত কষ্ট ক'রে যে ছেলেকে মানুষ ক'রলেন তার কাছে তাঁদের কোন মূল্য নেই ? বউ-ই সব।

আসল ঘটনা কিছু না ভেঙ্গে পরীক্ষিৎকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, ওদের তো দিলে কোন অচেনা মুল্লুকে পাঠিয়ে, যোগাযোগের ব্যবস্থা কিছু আছে না তাদের চিঠির ওপর নির্ভর ?

পরীক্ষিৎ সরলভাবেই উত্তর দিলেন, তাই কি এইভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় ? আসলে মনোহরলালজীই তো সব ব্যবস্থা ক'রেছেন। কি চমৎকার ওদের ব্যবস্থা সরকারী ব্যবস্থার চেয়ে অনেক ভাল আর কত তৎপরতা। এর জন্যেই ওরা এত উন্নতি করে।

তা তো হ'ল কি ব্যবস্থাটা আছে শুনি?

ওদের দিল্লী অফিস থেকে সেখানকার ম্যানেজার হোটেল ঠিক ক'রেছে, এরা গেলে এদের দেখা শোনা ক'রবে। ওদের রোজ টেলিফোন হয় কিছু দরকার হলে খবর দেবে, টেলেক্স আছে তাতে খবর পাঠাবে পৌঁছোলে — ফিরিস্তি দিয়ে বোঝালেন পরীক্ষিৎ।

তাহ'লে পৌঁছান মাত্র খবরটা যেন আমাকে ব'লো। আমার বিশেষ চিন্তা হচ্ছে। অমনিভাবে একা ওদের ছেড়ে দেওয়াটা বোধহয় খুব বুদ্ধির কাজ হয় নি।

কে যাবে বল? এক তুমি যেতে পারতে দিন কয়েক ঘুরে আসতে পারতে। তুমি গেলে মুসৌরী-সিমলা-আলমোড়া-এই সব জায়গাগুলো আর একবার ঘুরে আসতে।

সামনে মেয়ের বিয়ে ঘুরে আসতে বললেই যাওয়া হয় নাকি? কতগুলো পয়সা লাগত হিসেব ক'রে দ্যাখ তো?

আরে দূর। তুমি যাবে শুনলে বাগডোরিয়া, টোডি সবাই ফিরতি টিকেট কেটে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

দরকার নেই। ওরা মেয়ের বিয়ের সময় যেন একটু দাঁড়ায়।

পরীক্ষিৎ একথার কোন জবাব না দিয়ে বললেন, আমি আজ সন্ধ্যের পরই ওদের পৌঁছানর খবর পেয়ে যাব।

যদি অফিসে থাক আমাকে একবার ফোন ক'রে ব'লো।

বলব।

সৌগতর কাছে দাদার মানসিক অবস্থার ব্যাখ্যা বিশদভাবেই ক'রল রুমি। বলল, কাল সবে বৌদিরা গেছে অথচ দাদার অবস্থা কাহিল। কাহিল অবশ্য কাল থেকেই, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি দাদার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না।

কি রকম? সৌগত জানতে চাইল।

ব্যাপারটা প্রথম বলল শোভা। ঘর পরিষ্কার ক'রে বেরিয়ে এসে বলল।

কি বলল?

দাদার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন কতদিন ধরে অসুখ হয়েছে।

বল কি? তাহ'লে তো দেখতে হয়! তা যা-ই বল তোমার দাদা জিনিষটা ভালই জুটিয়েছে।

তাই বলে তুমি ও পাগল হবে নাকি?

আমার তো পাগল হয়ে লাভ নেই! সামনে থাকলেও যার কিছু না, দূরে গেলেই বা তার কি লোকসান?

সামনে থাকলে তো তবু দেখা যায়!

ওসব দেখাদেখির মধ্যে আমি নেই। চোখে দেখা কোন দেখাই নয়, দেখা মানে চেখে দেখা।

তোমার বোধহয় কোথাও বাধে না?

বাধার জায়গা না হ'লে বাধবার কোন কারণ নেই তো!

তাহ'লে তুমি বলছ অমন বউ ব'লেই দাদা পাগল হয়েছে। অন্য বউ হলে হ'ত না?

অত কথা তোমার সঙ্গে কখন বললাম?

তা অবশ্য বলনি তবে তোমার কথার ভাবে তাই বোঝাচ্ছে।

তবে বোধহয় ঠিক বোঝাচ্ছে না।

কিছু ভেবে রুমি বলল, তবে একটা কথা ঠিক ওই মেম যদি তোমার বউ হ'ত আর যদি সে এক বছরের জন্যে বাইরে যেত তাহ'লেও তুমি এত অধীর হ'তে না। তুমি ততদিনে আর একটা কাউকে জুটিয়ে নিতে।

ভেবে দেখবার ভঙ্গি ক'রে সৌগত বলল, তা নেহাৎ মিথ্যে বলনি। পকেটমার হয়ে গেলে পকেট ধরে কান্নার লোক আমি নই।

আসলে আমার দাদার মত আন্তরিকতা কোথায় পাবে বল?

সকলে কি সব জিনিষ পায়? যার যেটা নেই সেটা বাদ দিয়েই তাকে কাজ চালিয়ে নিতে হয়। যেমন ধর একজন একনম্বর ব্যবসায়ীর মত টাকা আমার নেই কিন্তু আমাকে কম টাকাতেই কাজ চালিয়ে নিতে হচ্ছে তো?

কি কথায় কি টেনে আনছ —

সব ব্যাপারেই ওইরকম। পাওয়া না পাওয়া বস্তুটা টাকার বেলাতেও যা অন্য কিছুর বেলাতেও তাই — টক্কা আর ফক্কার ব্যবধান।

মানে?

মানে অতি সোজা। ছেলে বেলায় দু হাত মুঠোর খেলা খেলোনি? একটা জিনিষ হাতের মুঠোর মধ্যে আছে কি নেই? থাকা আর না থাকার বিরাট ব্যবধান কিন্তু মুঠো দেখে বোঝবার উপায় নেই। আর সেই মুঠোর মধ্যে হীরের আংটি থাকলেও যা আর একটা কড়ি থাকলেও তা, আসল ব্যাপার হচ্ছে আছে কি নেই?

তোমাদের মত হেঁয়ালী বাপু আমি বুঝি না।

সৌগত একটা সিগারেট মুখে লাগিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে বলল, অতসত জানবার দরকারই বা কি! বেশ তো আছ। যত জানবে ততই যন্ত্রণা বেড়ে যাবে — মনে রাখতে হবে আলাদা ক'রে।

হঠাৎ রুমির মনে পড়ে যাওয়ায় সে বলল, জান, আমার কলেজের বন্ধুরা একদিন তোমায় দেখতে চেয়েছে।

আমাকে দেখতে চাইল কেন? এমন তো কথা ছিল না?

বারে! এর আবার কথা থাকতে হয় নাকি?

দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যাপারটা আগে বুঝে নিই। আমি তাদের দেখব না তারা আমায় দেখবে ?

ওই একই হ'ল, যেটা তুমি মনে কর।

না এক হ'ল না।

কেন ?

ডাক্তার দেখলে ডাক্তারকে ফি দিতে হয়। আমি দেখতে হলেও আমাকে ফি দিতে হবে, তোমার বন্ধুদের বলে দিয়ো।

যদি তারা দ্যাখে ?

তাহ'লেও দক্ষিণা দিয়ে দেখতে হবে। পৃথিবীতে যা কিছু দেখবার আয়োজন দর্শনী দিয়েই দেখতে পাওয়া যায়।

দরকার নেই। তোমাকে দেখতে আমার বন্ধুরা আসবে না।

অতি উত্তম। আমার লাভ হ'ল এই যে আমাকে আর কষ্ট ক'রে দেখা দিতে হবে না।

রুমি হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রল, এই আমি নাকি খুব রোগা হয়ে যাচ্ছি ?

ওকথা লোকে আমাকেও বলে।

তোমাকে! খুব একচোট হেসে নিল রুমি শব্দ ক'রে। তারপর বলল, তুমি কিছু মনে ক'রো না তোমার কিন্তু পেটটা বড্ড বেড়ে গেছে!

সৌগত নিজের পেটে হাত দিয়ে বলল, পেটটা একটু বড় না হ'লে মানায় না।

ভুঁড়িদাসদের তাহ'লে খুব ভাল মানায় বল ?

ভুঁড়িদাস! তারা আবার কারা ?

পথে দেখনা এক একজন লোক ভুঁড়ির ভারে চিৎ হয়ে হাঁটে ?

অতির কিছুই ভাল নয়। তাই বলে আমার এটুকু — নিজের বিশ্রীভাবে উঁচু হয়ে ওঠা পেটটার ওপর হাত বুলিয়ে বলল — চলতে পারে।

এখন যদি বা চলছে এর পর বাড়লে একদম চলবে না।

চলবে না ? বলে মনে মনে বলল, না চললেই বাঁচি।

কিন্তু তোমার চেহারাটা কি চমৎকারই না ছিল —

এখন নেই বুঝি ? আসলে কি জান, কোন কিছুই চিরদিন থাকে না।

তাই বলে এই বয়েসেই এভাবে বুড়িয়ে যাবে ?

বুড়িয়ে! তোমার আস্পর্দা তো কম নয়! তুমি ছাড়া পাবার জন্যে কাকুতি মিনতি করনি একটিবার এমন গেছে ?

ওকথা বাদ দাও!

এখনই তোমার এই অবস্থা পাঁচ বছর বাদে যে তোমার দশা কি হবে তাই আমি ভেবে পাচ্ছি না।

কি আর হবে ?

যা হবে তা হোক। আমি অত ভবিষ্যৎ হিসেব ক'রে চলি না।

তবে কি ক'রে চল ?

মন যেমন চায় তেমনি চলি।

রুমি আর কোন কথা বলল না। সৌগতও অন্য কথা পাড়ল, তোমার দাদার কথা বলছিলে না ? আসলে তোমার দাদাটা একজন স্ত্রৈণ। — স্ত্রৈণ শব্দটার ইংরিজি ব্যবহার ক'রল সে হয়ত বাংলা শব্দ জানা ছিল না বলেই। এমিলি কথাটা মানতে না চেয়ে প্রতিবাদ ক'রল, কেন ?

তোমার দাদার ওই মেমটার কি একটা কেস আছে বলছিলে না একদিন ? তোমার দাদাতো জানে। জেনেও দেখ কেমন ন্যাওটা হয়ে আছে। বউ না হলে একটা রাত কাটছে না।

তুমি হলে কি ক'রতে ?

আমি হলে অমন সাত হাত ঘোরা মেয়েকে বিয়েই ক'রতাম না। এহাতে নিয়ে ওহাতে ছেড়ে দিতাম।

রুমি বলতে চাইল, যদি কোন মেয়ে তোমার সম্বন্ধে ও কথা বলে ? কিন্তু কথাটা সে বলল না। সৌগতকে একথা বললে সে চটবে, এই রকম একটা রূঢ় সত্য সে সহ্য ক'রতে পারবে না। রুমি এরকম অপ্রিয় পরিস্থিতি সৃষ্টি ক'রতে চায় না। তাই চুপ ক'রে রইল। তা ছাড়া সৌগত তো ঠিকই বলেছে, ওরকম মেয়েকে বিয়ে করা তো সত্যিই উচিত নয়। তার দাদাকে সরল ছেলে পেয়ে তার ঘাড়ে চড়ে বসেছে আর ওই যে লোকটির গল্প করেছিল এমিলি সে চালাক বলে বুঝতে পেরেই সরে পড়েছে। উনি এসেছেন তাকে খুঁজতে। ধরবেন। কি ক'রবি তুই তাকে ধরে ? একজন পুরুষ মানুষের কি ক'রতে পারে একজন মেয়েতে ? কাঁচকলা করবি তুই তাকে ধরে! মনে মনে এমিলিকে খুব দুয়ো দিতে লাগল রুমি। অকারণেই বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল তার প্রতি।

মার গলা শুনে রুমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল পর্দা ঠেলে, জানতে চাইল, মা কিছু বলছ ?

দরজায় পর্দা ছাড়া আর কোন আগল ছিল না তাই সুপ্রীতি সেদিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার রুমির দিকে ফিরে বললেন, সৌগতকে বল যেন এখানেই খেয়ে যায়।

তুমিই ভেতরে এসে বল না মা — আবেদনের সুরে রুমি বলল। তার ইচ্ছে মার সঙ্গে সৌগতর একবার কথা হোক। যেন তাদের একবার কথা হ'লেই ওদের বিয়েটা হয়ে যাবে। অথবা সব সমস্যা মিটে যাবে।

সুপ্রীতি কথান্তর না ক'রে পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকেই বললেন, সৌগত আজ ডিনার টেবিলে তুমিও থাকবে। চলে যেয়ো না যেন।

সৌগতর কোন তাড়া ছিল না। তবু সে অভ্যাস বশে হাত ঘড়িটা দেখে নিল। তাই সুপ্রীতি বললেন, কোন তাড়া আছে না কি ?

না। দেখলাম কটা বেজেছে।

সে রকম হলে বলবে এখনই টেবিল সাজাতে বলব। সব রেডি। শুধু তোমার জন্যে একটু চাইনিজ স্যুপ তৈরী ক'রতে বললাম।

চমৎকার ভাবনা — ইংরিজিতে বলল সৌগত, তারপর বলল, চাইনিজ যেকোন স্যুপ সত্যিই পৃথিবীর সেরা খাবারগুলোর একটা।

সুপ্রীতি কথাটি শুনে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রলেন। গর্বিত স্বরে ঘোষণা ক'রলেন, তোমার পছন্দ যে আমি জানি —। যার রুচি থাকে খাবার দাবার সব ব্যাপারেই থাকে। — শেষ কথাগুলো সৌগতর সম্পর্কে বললেও তার মধ্যে দিয়ে নিজের গরিমা প্রকাশ ক'রতেই চাইলেন। তার পরই অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, যা-ই বল রুমি, রুচি জিনিষটা পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে হয়।

রুমি একথার কোন জবাব দিল না। সৌগতও নয়। সুপ্রীতি কোন জবাব প্রত্যাশাও করেন নি। তিনি অন্য কথায় গেলেন, কথায় কথায় ভুলে যাচ্ছি তোমার বাবা মার শরীর কেমন আছে ?

ভাল।

ভাবছিলাম একবার ফোন করি। ভুলে গেছি।

সবাই ভালই আছে।

তুমি কি এরমধ্যে বাড়ী গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ। গত বৃহস্পতিবার।

সুপ্রীতি হিসেব কষে নিলেন সাত দিন আগে। অতএব ঠিকই আছে। আর কি বলা যায় ? আসলে তিনি বলার মত কথা চাইছিলেন। কিছু এমন কথা যাতে সৌগতর পারিবারিক প্রসঙ্গ আছে তাহ'লে কৌশলে ওর বাবার সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে সৌগতর মত করিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু সৌগতর সীমিত জবাবের জন্যে সেটা সম্ভব হচ্ছিল না। হ'লও না শেষ পর্যন্ত।

পরীক্ষিতের অনুরোধে মনোহরলাল যা ব্যবস্থা ক'রলেন তা'তে পরীক্ষিৎ গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। সুপ্রীতিকে কথাটা জানালেন তাঁর স্বামী। দিল্লী অফিস থেকে প্রত্যেকদিন টেলেক্সে খবর পাঠাচ্ছে এমিলিদের। আর এখানকার অফিস সেটি নিয়মিত পরিবেশন ক'রে যাচ্ছে পরীক্ষিৎকে। তবু প্রসেনজিৎ মধ্যে মধ্যেই ট্রাঙ্ক টেলিফোন না ক'রলে শান্তি পাচ্ছে না। ব্যাপারটায় প্রথম দিকে সামান্য হাসলেন পরীক্ষিৎ কিন্তু সুপ্রীতি বললেন, তুমি হাসছ ?

কেন, হেসে দোষটা কি ক'রলাম ?

ছেলেটা যে পাগল হয়ে যাবে মনে হচ্ছে !

অল্প বয়সী যত ছেলে পাগল হয় সব তো মেয়েদের জন্যেই হয় —

বাঃ ব্যাপারটাকে তুমি যেন গুরুত্বই দিচ্ছ না !

লাভ কিছু হবে ? গুরুত্ব দিয়ে কিছু ক'রতে পারব ? আজ মাত্র দশদিন হ'ল তারা গেছে ফেরবার এখনও ঢের দিন বাকী। তোমার ছেলেকে বল ছুটি

নিয়ে চলে যাক।

আমি বাপু এরকম দেখিনি। — সুপ্রীতি ক্ষোভ প্রকাশ ক'রলেন। পরীক্ষিৎ আবার সেটি খুব হালকা ভাবে ধরলেন, বললেন, তুমি অসহিষ্ণু হ'চ্ছ কেন?

সুপ্রীতি জবাব দিলেন না। পরীক্ষিৎই আবার বললেন, এখন ওরা হরিদ্বারে আছে। হরিদ্বার ছেড়ে গেলেই তো আর ওদের এরকম দৈনিক খবর পাওয়া যাবে না। নির্ভর ক'রতে হবে শুধুমাত্র ওদের চিঠির ওপরে।

এর মধ্যে অবশ্য এমিলি তিনখানা চিঠি লিখেছে মনে ক'রে।

কা'কে লিখেছে?

একটা আমাকে, একটা খোকাকে আর একখানা খুব সুন্দর চিঠি লিখেছে রুমিকে।

মেয়েটি কিন্তু খুবই ভাল, পরীক্ষিৎ মন্তব্য ক'রলেন।

তোমার মা-ও তো প্রতিদিন একবার ক'রে বউ বউ ক'রছে — আমাকে অবশ্য বেশী জিজ্ঞেস করে না রুমিকেই করে।

তার মানে মার সঙ্গেও আলাপ ক'রে ফেলেছে মেয়েটা? — পরীক্ষিৎ যেন এমিলির আরও গুণের পরিচয় পেলেন।

এক একজনের অমন থাকে। সকলের প্রিয় হতে পারে। ভাগ্যই অমনি হয়। কিছু না ক'রলেও যশ।

তা বটে — স্ত্রীর কথায় সায় দিলেন পরীক্ষিৎ। কিন্তু অনুভব ক'রলেন সুপ্রীতির কথার মধ্যে ক্ষোভের সুর। কেন এই ক্ষোভ? ক্ষোভের কোন কারণ তো তিনি রাখেন নি। সংসার আপন মনের মত সাজিয়েছেন সুপ্রীতি। ছেলে-মেয়েদের গড়ে তুলেছেন নিজের মনের মত ক'রে, যখন যেটি ইচ্ছে ক'রেছেন আপন ইচ্ছাতেই যেন ধরা দিয়েছে সেটি। জীবনে এমন তো কোন প্রতিকূলতা আসে নি যে জন্যে চিত্তবিক্ষোভ থাকতে পারে তাঁর। তবু কেন সামান্য কারণে অকারণেই বলা যায় ক্ষোভ প্রকাশ হচ্ছে তাঁর কথার মধ্যে থেকে? পরীক্ষিতের মনে পড়ে একমাত্র বিয়ের পর বাপের বাড়ী ছাড়বার সময়েই যা কাঁদতে দেখেছিলেন সুপ্রীতিকে দ্বিতীয়বার আর কাঁদতে দেখেন নি। অবশ্য সেটা তাঁর পক্ষেই গৌরবের, স্ত্রীকে যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পেরেছেন তাঁর সংসারে। তবে ক্ষোভটা কিসের? অকারণ? তবে কি ক্ষোভও মানুষের মনের একটা বিলাস? মানুষ অবিচ্ছিন্ন সুখ চায় না, সইতে পারে না? মানুষ বরং নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখ সইতে পারে, সে তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। সে কষ্ট পায় কিন্তু সয় কারণ দুঃখের প্রতিকল্প নেই কিন্তু সুখের আছে। নিশ্ছিদ্র সুখের মাঝে দুঃখের চাটনি এমনি অকারণ ক্ষোভ দিয়ে মানুষ তৈরী ক'রে নিতে পারে। হয়ত এ-ও সেই রকমই। মনে মনে দ্রুত এগুলো ভেবে নিলেন পরীক্ষিৎ। ফলে তাঁর মনে কোন চিন্তা রইল না, অকারণ চিন্তার অশান্তি রইল না। আর প্রসেনজিৎ-এর আগ্রহে কোন অস্বাভাবিকতা আছে বলেও তিনি ভাবতে পারলেন

না। তার অবশ্য আরও একটা কারণ এই যে প্রসেনজিতের সঙ্গে তাঁর দেখা ইদানীং দৈবাৎই হয়। অফিস থেকে সন্ধ্যে লাগতেই বাড়ী ফিরে আসে প্রসেনজিৎ, তিনি আসেন পরে। তিনি যখন বাড়ী ফেরেন ততক্ষণে প্রসেনজিৎ হয়ত খাওয়া সেরে নিজের ঘরে ঢুকে গেছে। ডেকে বলার মত কথা না থাকায় প্রয়োজন হয় না। এমিলিরা যাবার পর একদিনই দেখা হয়েছিল রাত্রে খাবার টেবিলে, সেদিন অন্য প্রসঙ্গ তুলেছিল প্রসেনজিৎ। বলেছিল, বুঝলে ড্যাডি, তোমরা যতই চেষ্টা করনা কেন এদেশ গেছে। এখানে কোন কাজ করা অসম্ভব। আমাদের কারখানায় তো দেখছি কাজ করানো প্রায় অসম্ভব। যারা কাজ ক'রবে তারা যদি সব সময় মাথার মধ্যে রাখে কাজ ক'রব না তাহ'লে মূল ব্যাপারটাই তো বিপরীত হয়ে যায় কি না।

পরীক্ষিৎ প্রত্যক্ষভাবে কোন উৎপাদন ব্যাবস্থার সঙ্গে জড়িত নন কিন্তু অফিসে কাছারীতে সাধারণ কেরাণীবাবুদের দেখে ব্যাপারটা অনুমান ক'রতে পারলেন। বললেন, সর্বত্রই তাই। অফিসেও তো তাই। অফিস বসবার একঘন্টা বাদ পর্যন্ত কেউ কাজ সুরু ক'রবে না। অফিস ছুটি হবার আধঘন্টা আগেই সব হাত মুখ ধুয়ে উঠে পড়বে।

আর সারাদিন ? — প্রসেনজিৎ জানতে চাইল।

সারাদিন তো আর আমরা সামনে বসে থাকি না তবে কাজ দেখে বুঝি একজন লোক সারাদিনে যতটা কাজ ক'রতে পারে ততটা কাজ ক'রলে সরকারী কাজ আরও অনেক দ্রুত হ'তে পারত।

ঠিক তাই, ইংরিজি ব্যবহার ক'রল প্রসেনজিৎ, তারপর বলল, এখানে যা দেখছি মানুষের চরিত্রই নষ্ট হয়ে গেছে। কারখানাতেও ঠিক তাই দেখছি। একজন মানুষের যতটা কাজ করা উচিত তার অর্ধেক করে। কাজের কথা বললে এমন সব অসম্মানজনক ব্যবহার করে আর গালাগালি দেয় যে কাজ করানোই মুস্কিল। আমাদের তো খারাপ লাগে। ওদের এরকম ফাঁকি দেবার জন্যে আমাদের দায়িত্বও তো আমরা ঠিকমত পালন ক'রতে পারছি না।

সে আর কে ভাবছে ?

আমরা তো ভেবে অভ্যস্ত হয়েছি। অমন চোখ কাণ বুঁজে থাকতে পারি না। তাই অসম্মান হতে হচ্ছে। এখানে আবার শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়াও যায় না। — শেষ কথাগুলো যেন অনেকটা বিরক্ত হয়েই বলল প্রসেনজিৎ, কিছু শব্দ ইংরিজি ব্যবহার করল যথাযথ অর্থ বোঝাবার জন্যে। তারপর বলল, এখানে কোন কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যদি কিছু কাজ করবার সুযোগই না থাকল তাহ'লে বিদেশ থেকে এই শিখে পড়ে এসে শেখাটাও তো কোন কাজে লাগল না। অকারণ কোম্পানীর ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকতেও লজ্জা করে।

প্রসেনজিৎ-এর কথা শুনে তার দিকে তাকালেন পরীক্ষিৎ। দেখলেন মুখ নিচু ক'রে খেতে খেতে কথা বলে যাচ্ছে প্রসেনজিৎ। তার কথার দৃঢ়তার

জন্যে তাঁর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছিল। তিনি প্রসেনজিৎ-এর মনটাকে হালকা করবার জন্যে বললেন, এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।

প্রসেনজিৎ শীতল স্বরে বলল, বোধহয় সম্ভব নয়।

মনে মনে স্বীকার ক'রলেন পরীক্ষিৎ নিজেও। মুখে বললেন, এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে তো সব ধ্বংস হবে যাবে।

কি হবে তা জানি না তবে পরিবর্তন এখন অসম্ভব এটা বেশ বুঝতে পারছি। সমস্ত সমাজটা না বদলালে এই অবস্থা কিছুতেই বদলাবে না।

ছেলের কথা শুনে পরীক্ষিতের মনে হ'ল কাজ ক'রতে গিয়ে বিরক্ত যে তিনিও হন না এমন নয়। বিশেষ করে অবস্থা যখন এই রকম হয়ে উঠছে সেই সময় বিরক্ত হতেন তিনিও। এখন সয়ে গেছে। উপায় নেই বলে না দায় না দায়িত্বের চুক্তি ক'রে নিয়েছেন। তাতে যা হয় হোক। কাজ এবং কর্তব্যের সংজ্ঞা হচ্ছে আপন চাকরী বাঁচানো। কাজ যা হয় হোক। নিজেকে বাঁচিয়ে কাজ, নিজের সম্মান বাঁচিয়ে কাজ। একমাত্র কাজ চাকরী বাঁচানো। কাজেই শঙ্কিত হলেন না, স্থির জানলেন প্রসেনজিৎ-ও একদিন চাকরী বাঁচানোর কায়দাটা শিখে যাবে, সেদিন এই বিক্ষোভ আর থাকবে না। সদ্য এদেশে এসেছে তো আবহাওয়া সহ্য হচ্ছে না আর কি। সয়ে যাবে, ধীরে ধীরে সয়ে যাবে। তবু তিনি ছেলেকে একটু পথ দেখাতে চাইলেন, বললেন, তুমি তোমার কাজ ক'রে যাবে। কে কি ক'রল কি ক'রল না সে দিকে মাথা ঘামাবে না।

সেটাও যে আমার কাজ! আমার কাজটা তো আমাকে ক'রতে হয় অন্যের হাত দিয়ে! তারা সবাই না ক'রলে যে আমার কাজটা হয় না, দেরী ক'রলে আমারই কাজে দেরী হয়ে যায়!

অত ভাবলে চলবে না —

প্রসেনজিৎ বাবার সঙ্গে একমত হতে না পেরে চুপ ক'রে রইল। পরীক্ষিৎ ছেলেকে আবার পরামর্শ দিলেন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। কাজ করিয়ে নেবার দায়িত্ব মালিকদের, ঠিক হচ্ছে কিনা দেখে নেবার দায়িত্ব তোমার।

যারা ক'রবে কাজ করবার দায়িত্ব তাদের নয়? — ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রল প্রসেনজিৎ। তার কথায় বিরক্তির প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট।

তারা যদি দায়িত্ব পালন না করে তো তুমি কি করতে পার?

আমরা তো আছি কাজ দেখে নেবার জন্যে। কাজ করাবার দায়িত্ব তো আমাদেরও—আমরাও তো সমস্ত উৎপাদন যন্ত্রের অংশ।

পরীক্ষিৎ বাদ প্রতিবাদ বন্ধ ক'রতে চাইলেন। তিনি বুঝলেন এদেশের মানসিকতায় অনভ্যস্ত প্রসেনজিৎকে যতই বোঝান সে বুঝবে না, থাকতে থাকতেই ঠিক হয়ে যাবে, আপনি বুঝে যাবে। সে যা বলছে তা তো ঠিকই, ন্যায্য কথাই সে বলছে, কিন্তু এদেশে তা শুনছে কে? শুধু শুধু অনর্থ ঘটিয়ে কি লাভ? যে দেশে কেউ কর্তব্য বলতে কিছু বোঝে না সে দেশে কি হবে একা একটা

নীতিবোধ নিয়ে অশান্তি ক'রে আর অশান্তি পেয়ে? যেখানে রাজনৈতিক নেতা থেকে সুরু ক'রে রাস্তার ঝাড়ুদার পর্যন্ত সবাই নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, কর্তব্য যেখানে কেবল নিজেরটা গুছিয়ে নেওয়া সেখানে ব্যতিক্রম কিছু চিন্তা ক'রে লোকসানটা তো নিজেরই। প্রসঙ্গত মনে পড়ল নকশাল ছেলেগুলোর কথা। পুলিশের জেরার মুখে, অত্যাচারের মুখে সব নকশালই এক কথা বলেছে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়, সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা চায়। চলতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা। কিন্তু চলতি ব্যবস্থার সঙ্গে বিরোধিতা ক'রে কি পাচ্ছে? নিজের লোকসানই কি ডেকে আনছে না? কত ভাল ছেলে নষ্ট ক'রে ফেলছে না নিজের ভবিষ্যৎ? এটাই নিয়ম। পৃথিবীর চিরন্তন সূত্রই এটা, চলতি অবস্থার সঙ্গে মিশে না চলতে পারলে নিজের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। অযথা গোঁয়ার্তুমী না ক'রে যারা মেনে নেয়, বেয়াড়াপনা না ক'রে যারা বশ্যতা স্বীকার করে তারা জেতে। এতো বহু পুরাতনকাল থেকেই চলে আসছে, এর ইতিহাস আছে, তবু চিরদিনই কিছু লোক বেয়াড়াপনা ক'রে লাঞ্ছিত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে। পরাজয়ের গ্লানি, নিন্দার অলঙ্কার, অপযশের অপমান ছাড়া আর যা তারা লাভ ক'রেছে তার নাম হতাশা। এ ইতিহাস কি অজানা প্রসেনজিতের? সে কি জানে না যীশুখ্রীস্টের নাম, সক্রেটিসের নাম, কোপারনিকাসের নাম, আরও লক্ষ লক্ষ কমবেশী খ্যাত ইতিহাস পুরুষদের? আমাদের দেশের হালফিল ইতিহাসেই তো অসংখ্য নাম আছে; রাণাপ্রতাপ যিনি চলতি অবস্থাকে মেনে নিলে রাজসুখ পেতেন মানসিংহের, তার বদলে বরণ ক'রে নিয়েছেন বনবাস; সুভাষ বসু — অহিংসার অবতারের গতানুগতিকতাকে না মেনে আবেদন নিবেদনের আনুগত্যের চেয়ে বরণীয় মনে ক'রেছেন স্বেচ্ছা নির্বাসনকে। যে মাতৃভূমির জন্যে শেষবিন্দু রক্তের আহ্বান তাঁর, ফিরতে পারেন নি সেই প্রিয় স্বদেশভূমিতে, মায়ের কোলে। সহজ পথ মেনে নিয়ে তাঁরই এক বিশ্বাসঘাতক সহকর্মী বসেছে প্রধান মন্ত্রীত্বের সিংহাসনে ক'রেছে আসমুদ্র হিমাচলের ব্যর্থ রাজত্ব। এক লহমায় নামগুলো মনে এল পরীক্ষিতের, ভাবলেন উদাহরণ হিসেবে প্রসেনজিতের সামনে সেগুলো উপস্থিত করেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্তই অতিরিক্ত ভেবে তা ক'রলেন না।

প্রয়োজন সত্যিই ছিল না, কারণ প্রসেনজিৎ দুর্বল মনের সামান্য মানুষ, বড়র নজীর তার সাধ্যের থেকে অনেক দূরত্বে তাই সাধেরও অধিকার সে চায় না ওই সবের। সে বীরত্ব বোঝে না, বিদ্রোহ বোঝে না, ব্যতিক্রম সৃষ্টির প্রয়াসী নয়, সে শুধু প্রার্থী একটু অনায়াস শান্তি আর সুখী জীবনের। তবে সেই সামান্য চাওয়াটুকুর বেলায় সে ঐকান্তিক। সে দুঃখ ক'রে বলল, ওখানে থাকতে আমরা এদেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনতাম তবে এরকম ভাবতেও পারিনি। নিজের দেশের উৎপাদন ঠিক রাখতে না পারলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তো দাঁড়াতেই পারবে না।

পরীক্ষিৎ স্বীকার ক'রে নিলেন যে এদেশে মালিকেরা বা শ্রমিকেরা কেউই

উৎপাদনের গুণগত মানের দিকে নজর দেয় না। মালিকেরা চায় পরিমাণ আর শ্রমিকেরা চায় বাড়তি মজুরী।

প্রসেনজিৎ-ও তার কর্মস্থলে এই ছবি স্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছিল তাই সে বলল, সত্যিই এ অবস্থা চলতে থাকলে একটা দেশ কিছুতেই এগোতে পারে না। সবচেয়ে বড় এই যে কাজের পরিবেশ গড়ে না উঠলে কাজ করাও সম্ভব নয়।

ঘুরে ফিরে সেই একই প্রসঙ্গ আসছে দেখে পরীক্ষিৎ কথার ধারা বদল ক'রে বললেন, মিস্টার স্টুঘাণ ভারতবর্ষেই থাকতে চান, তোমার কি মত?

তাঁর ব্যাপারে আমার মতে কি হবে, তিনি যদি চান তো থাকবেন।

আমি ভেবে পাচ্ছি না অমন দেশ ছেড়ে এখানে এসে কোথায় থাকবেন।

প্রসেনজিৎ বলল, ওদেশের মানুষগুলো বড়ই অদ্ভুৎ। ওদের কাজের হিসেব পাওয়া মুস্কিল। উনি আবার একটু বেশী বিচিত্র। এমিলির ঠাকুরদা দুবার বিয়ে ক'রেছিলেন বলে উনি আর বিয়েই ক'রলেন না।

সে আবার কি?

হ্যাঁ। ওই এক রকম। বললেন, বিয়ে করাটা এমন একটা কি জিনিষ যে না ক'রলেই চলবে না? দেখতে চাই।

নিজের ব্যবসাও তো ছেড়ে দিয়ে এসেছেন শুনলাম —

হ্যাঁ। ওঁর অংশীদারকে দিয়ে এসেছেন।

বিক্রি ক'রে দিয়েছেন?

না না এমনি।

সে কি?

কি হবে? ওঁর যত টাকা আছে খেয়ে ফুরোতে পারবেন না সারাজীবনে, আর পয়সা দিয়ে কি হবে?

তাই বলে কেউ কি ছেড়ে দেয়?

প্রসেনজিৎ একথার জবাব দিল না। মনে মনে বলল, ওদেশে দেয়।

ছেলেকে কিছু না বলতে শুনে পরীক্ষিৎ-ই বললেন, উনি যখন এসে পড়েছেন তখন আমাদের ওপর কিছুটা দায়িত্ব তো পড়ছেই —

একথারও কোন জবাব দিল না প্রসেনজিৎ। ব্যাপারটা পরীক্ষিৎ ঠিক বুঝলেন না। অনেক কিছুই তিনি আজকাল বুঝতে পারেন না। বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন দিনকাল কেমন যেন বদলে গেছে। মানুষের, বিশেষ ক'রে তরুণদের যেমন সহজ হবার কথা এখনকার যুবকেরা কেউ যেন তা নয়। সব যেন কি রকম। স্বাভাবিকভাবে চিন্তা ক'রে তাদের কাজের কারণ বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যেমন এই রুমির কথা, বিয়েটা যে কেন ওরা আটকে রাখছে তিনি বুঝতে পারেন না। সৌগতর তো একবার এসে ওঁকে বলা উচিত, সেটা স্বাভাবিক কিন্তু কিছুতেই তা ঘটছে না। সুপ্রীতি একবার বলেছিলেন, একদিন সৌগতর বাবার কাছে যাই চল। মেয়ে আমাদের, কাজেই আমাদেরই

যাওয়া উচিত। — সেই বলাই শেষ বলা, উদ্যোগ করেন নি। তিনি নিজেই তাই গৃহিণীকে প্রশ্ন ক'রেছিলেন একদিন, সদুত্তর পান নি। সুপ্রীতি জবাব দিয়েছিলেন, কি জানি সৌগত কেন গরজ ক'রছে না। বিয়েটা যে ক'রবে সে নিজে গরজ না ক'রলে কি ক'রে এগোন যায়? কথাটা ঠিক। তবে ওদের বিয়েটা হবে না? পরীক্ষিতের মাথায় এ প্রশ্নও এসেছিল, জেনেছিলেন হবে। কবে হবে বলা যায় না। কেন যে বলা যায় না এটাই পরীক্ষিতের কাছে রহস্য। আবার তাঁর ছোট ছেলে বিশ্বজিৎ, ইদানীং তিনি লক্ষ্য ক'রেছেন পরিবারের সকলের সঙ্গেই যেন সম্পর্কটা মিটিয়ে ফেলেছে সে। কারও সঙ্গে কোন সংযোগ নেই, বাড়ীর মধ্যে হোটেলের বাসিন্দার মত থাকে। নিজের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে রাখুক কিন্তু কারও সঙ্গে সংযোগ না রাখা, সকলকে এড়িয়ে একা থাকার চেষ্টা, এগুলোর তিনি অর্থ খুঁজে পান না। স্ত্রীকে এবিষয়ে প্রশ্ন করেন না তিনি, কেমন যেন একটা লজ্জা করে তাঁর, আপন সন্তান সম্পর্কে কি তিনি প্রশ্ন ক'রবেন? কি জানবেন, কেন সে কথা বলে না? কেন সে সকলের সঙ্গে মেশে না? একথা কি জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নেওয়া যায়? সুপ্রীতিও তো বলতে পারেন। তিনিও নিজে থেকে কিছু বলেন না। রুমি বলতে পারে সে-ও বলবে না। সবাই আপন অস্তিত্ব নিয়ে মগ্ন। তিনিও তাই থাকেন। শুধু জিজ্ঞাসা থাকে মনের মধ্যে। চাপা থাকে। বুঝতে না পারার দরুণ থাকে বিস্ময়। আবার কখনো মনে হয় সকলের সঙ্গে হয়ত বিশ্বজিৎ স্বাভাবিক ব্যবহারই, করে তাঁকে সমীহ ক'রেই কথা বলতে চায় না। এতে মনে মনে পুলকিতই হন তিনি, তাঁর ছেলে বিচক্ষণ এবং মার্জিত হবে এটাই তো স্বাভাবিক। ছেলেদের ব্যাপারে তাঁর মনে কোন অভিযোগ নেই, দ্বন্দ্ব নেই। এমনকি এই প্রসেনজিৎ যে অল্পবয়সে বিদেশে চলে গিয়ে একবারও দেশে আসে নি, তার সম্পর্কেও তাঁর কোন অভিযোগ নেই। বার কয়েক তাঁরা আসতে লিখেছেন আসেনি। বারংবারই সে জবাব দিয়েছে পড়াশোনা শেষ ক'রে একেবারে ফিরবে। ভাল আছে, জীবনে উন্নতির চেষ্টা ক'রছে এবং উন্নতি ক'রবে এটা নিশ্চিত হয়েই তাঁরা শান্তিতে থেকেছেন। পরে যখন প্রসেনজিৎ বিয়ের কথা লিখেছে তখন পরীক্ষিৎ কিছুটা ব্যাথা পেলেও নিজেই হাল্কা ক'রে নিয়েছেন সেই ব্যাথা। মনে মনে ভেবেছেন ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। এখন দিন বদলে গেছে, পুরাণো রক্ষণশীল চিন্তাধারা ধরে থাকার কোন মানেই হয় না। ছেলে তার নিজের জীবনের জন্যে যদি ভাল মনে করে থাকে তবে এ বিয়ে করে ভালই ক'রেছে। তারপর অনেকটা সৌজন্য রাখবার জন্যেই লিখেছেন সস্ত্রীক একবার আসতে। প্রসেনজিৎ এসেছে, পরীক্ষিৎ খুশী হয়েছেন। খুশী দুটি কারণে হয়েছেন, স্ত্রী নির্বাচন প্রসেনজিৎ নিখুঁতভাবেই ক'রেছে। ভাল ঘরের অতি চমৎকার মেয়ে এমিলি — রূপে এবং ব্যবহারেও। এমনটি হয়ত এদেশে তিনি নিজেও খুঁজে নিতে পারতেন না ছেলের বউ হিসেবে।

সব ঠিক আছে। ঠিক চলছে। দেশে শুধু অশান্তি। অশান্তি কর্মক্ষেত্রে। তবে দেশের অশান্তি নিয়ন্ত্রণ ক'রে এনেছে পুলিশে। মিলিটারী দিয়ে ঘিরে ঘিরে ধরে আনা হচ্ছে সেইসব গুণ্ডাগুলোকে যারা দেশের শান্তি নষ্ট ক'রছে, তারজন্যে আলাদা দপ্তর হয়েছে, কাজ চলছে, দিনরাত কাজ চলছে। মাঝে মাঝে সে খবর গল্প হিসেবে শোনেন অফিসে। সেদিনই তো বসু সাহেব বলছিল, মিলিটারীকে কাজে লাগিয়ে খুব ভাল হয়েছে। পুলিশকে পুরো ক্ষমতা দিয়ে দেওয়াতেও ভালই হয়েছে। ওইসব সমাজবিরোধীগুলোকে ধরে ধরে শেষ ক'রে উপড়ে ফেলা হচ্ছে সমাজ থেকে। কাগজওয়ালারা যা লিখছে তাতে তো দেখা যায় ছেলেগুলো সব স্কলার, অনেকগুলোই। ওরা অনেক মিথ্যে লেখে। পরীক্ষিৎ কাগজের এই কথাগুলো বিশ্বাস ক'রতে পারেন না। এসব ওরা লেখে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। ভাল ভাল ছেলেরা নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছেড়ে খুন জখম ক'রতে যাবে কেন? পুলিশ যা বলছে ওটাই ঠিক, এসব চোর গুণ্ডা বদমাসদেরই কাজ। পুলিশ যা ক'রছে সেটাও ঠিক, নইলে এদের দমন ক'রে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে না। সব ঠিক আছে, ঠিক চলছে।

তারই মধ্যে দিন কয়েক বাদে একদিন বেশ ভোরে টেলিফোন বেজে উঠল। কৃচিৎ এরকম হয়। ভুল নম্বর চলে আসে। অত সকালে বাড়ীর ঝি-চাকররাই ওঠে। সাধারণত বসুদেবই ধরে সেই ফোন বলে দেয় নম্বর ভুল হয়েছে। আজও ধরল বসুদেব। ওপাশ থেকে প্রশ্ন এল, এটা বিশ্বজিৎদের বাড়ী?

হ্যাঁ — বসুদেব জানাল।

আপনি কে বলছেন?

আমি এবাড়ীতে কাজ করি।

আমি বিশ্বজিতের বন্ধু দীপু বলছি, ওর মাকে একবার খুবশীঘ্রি ডেকে দিন।

উনি এখন উঠবেন না।

খুব জরুরী। কাল রাত্রে বিশ্বজিৎকে পুলিশে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছে। ডেকে দিন।

টেলিফোনের স্বরে একটা কাঠিন্য, রুক্ষতা। বসুদেব সংবাদের আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেল। মনে পড়ল কাল রাতে শুতে যাবার সময় সে বাড়ীর গিন্নিকে খবর দিয়েছিল যে বিশ্বজিৎ তখনও ফেরেনি। সুপ্রীতি ঈষৎ চিন্তিত হয়ে জানতে চেয়েছিলেন, কিছু বলে গেছে ফিরবে না বলে?

না তো! বসুদেব জানিয়েছিল।

বাবুটিকে জিজ্ঞেস করতো!

জিজ্ঞেস ক'রেছি, বলেন নি।

কোথাও যদি গেল তো বলে গেলে কি হ'ত? দিন কাল খারাপ বলেই চিন্তা। নইলে আরও তো দুএকবার রাত্রে আসে নি।

বসুদেব-এর মনে পড়ল মাঝে মধ্যে দু এক রাত ফেরেনি বিশ্বজিৎ, পরের সকালে উঠে খাবার ঘরের টেবিল থেকে বিশ্বজিৎ-এর জন্যে গুছিয়ে রাখা খাবার সরিয়েছে। কিন্তু আজ? এ কি খবর এল? না। এ কখনই হতে পারে না। কি শুনতে সে কি শুনেছে, কার কথা শুনতে কার কথা শুনেছে খামোকা গিন্নিকে ডেকে তুলে এই সাত সকালে বিপত্তি ঘটাতে সে রাজী নয়। পর মুহূর্তে ভাবল ছোট সাহেব-এর নাম ক'রেই তো জিজ্ঞেস ক'রল ছেলেটি, বলল তার বন্ধু — ডেকেই দিল সে সুপ্রীতিকে। বিবরবস্তু না বলে জানাল খুব জরুরী টেলিফোন। বাইরে থেকে কে যেন ডাকছে।

বিরক্ত গলায় সুপ্রীতি বললেন, হ্যালো!

আপনি কি বিশ্বজিতের মা বলছেন? — আমি বিশ্বজিৎ-এর বন্ধু। আমাকে চিনবেন না। কাল রাত দুটোর সময় বিশ্বজিৎকে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছে পুলিশে।

কি! — অবিশ্বাস, আকস্মিকতা, বিস্ময় সমস্ত অভিব্যক্তি ওই একটি অক্ষরের মধ্যে দিয়েই ফুটে বেরোল প্রচণ্ড শব্দের অভিঘাতে।

সেই উদ্‌ভ্রান্ত শব্দের ধ্বনি তরঙ্গের মধ্যেই ওপাশের স্বর বলল, বেলেঘাটায় খবর নিন। পুলিশ ওদের নিয়ে গেছে।

ফোন নামিয়ে রাখবার শব্দের সঙ্গে হতভম্ব হয়ে গেলেন সুপ্রীতি। এই খবর তিনি বিশ্বাস ক'রবেন কি ক'রবেন না সেই সংশয়ের মধ্যে পড়ে স্থির হয়ে রইলেন। তাঁর দুটি পায়ের পাতায় নিবিড় কোন আঠা দিয়ে কেউ যেন এঁটে দিয়েছে মেঝের সঙ্গে, অথবা প্রচণ্ড ভারী পা দুটো তুলতেই পারছেন না এমনি অবস্থা। সামান্য পরেই পরীক্ষিৎ এলেন। সুপ্রীতিকে বসুদেব ডাকায় তাঁরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সুপ্রীতি এতক্ষণ না ফেরাতে তিনি উঠে এসেছেন। স্ত্রীকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কাছে এসে প্রশ্ন ক'রলেন, কে ফোন ক'রেছিল?

সুপ্রীতি প্রথমটায় কোন জবাব দিলেন না। শব্দগুলো তাঁর কাণে ঢুকে কোন অজানা জায়গায় চলে যাচ্ছিল যেন তার তিনি আর হদিশ পাচ্ছেন না। পরীক্ষিৎ আর একবার প্রশ্ন ক'রলেন, কি হ'ল? কে ফোন ক'রেছিল? রিসিভারটা সুপ্রীতির হাতে ধরা ছিল পরীক্ষিৎ হাতে নিয়ে নিজের কাণে লাগালেন, তাতে অপরপক্ষের নামিয়ে দেওয়ার দরুণ ফোনের স্ব-শব্দ মাত্র। নিজেকে একটু সামলে সুপ্রীতি জানতে চাইলেন, বিশ্ব কি রাতে আর বাড়ীতে আসেই নি?

না মেমসাহেব — বসুদেব জানাল।

দেখেছ?

হ্যাঁ! ঘরে তালা লাগানো।

কি ব্যাপার বল তো — পরীক্ষিৎ অসহিষ্ণু স্বরে জানতে চাইলেন, কার ফোন এসেছিল?

জানি না — বললেন এবং মাথা নাড়লেন সুপ্রীতি।

পরীক্ষিৎ জীবনে কখনও সুপ্রীতিকে এমন বিচলিত দেখেন নি! তাই নিজেও চঞ্চল হয়ে পড়লেন, জানতে চাইলেন, কি বলল টেলিফোনে?

সুপ্রীতি নিজের মুখে কথাটা কিছুতেই বলতে পারছিলেন না। মুখে আঁচলটাকে গুঁজে দিয়ে শক্ত ক'রে কামড়ে ধরলেন। পরীক্ষিৎ ধমকে উঠলেন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা বসুদেবকে। কিন্তু যেখানে গিন্নি নিজেই কিছু বলছেন না সে কি সাহসে বলবে, এত বড় একটা সাংঘাতিক কথা! হঠাৎ সে কেঁদে উঠল প্রবল উচ্ছ্বাসে। তাদের অবস্থা দেখে পরীক্ষিতের ধারণা হ'ল যে এমিলিদের কিছু হয়ে থাকবে হয়ত। তিনি একটু চড়া সুরেই প্রশ্ন ক'রলেন, কি হয়েছে বল না?

অতিকষ্টে নিজেকে একটু সামলে সুপ্রীতি জানালেন, কে একটা ছেলে জানি না টেলিফোন ক'রছিল বলল বিশ্বর বন্ধু। বলল বিশ্বকে নাকি কাল রাত্রে পুলিশে গুলি ক'রেছে। বেলেঘাটায় খবর নিতে বলল।

হোয়াট! — চিৎকার ক'রে উঠলেন পরীক্ষিৎ। তাঁর প্রচণ্ড অভিব্যক্তি ইংরিজি শব্দেই ফুটে বেরোল, সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁর ধারণা কেউ বজ্জাতি ক'রে ফোন ক'রেছে। দৃঢ়পায়ে পরীক্ষিৎ বিশ্বজিতের ঘরের দিকে চললেন।

তাঁর প্রচণ্ড চিৎকারে থমকে গিয়েছিল সুপ্রীতির মনের অনুভূতিকেন্দ্র, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল নিজের ভাবনার ধারা। তিনি বললেন, বিশ্ব কাল রাতে আসে নি।

শুনেও দাঁড়ালেন না পরীক্ষিৎ, বললেন, ওর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা নিয়ে এস। — দেখতে চান পরীক্ষিৎ। বুঝতে চান। বিশ্বজিতের মত ছেলেদের — তাঁর ছেলেকে পুলিশে মারবে তিনি জানতে পারবেন না এ হতেই পারে না। পুলিশ নিশ্চয়ই তাঁকে বলত যে বিশ্বর সম্পর্কে কোন অভিযোগ আছে। ঘুণাক্ষরেও কেউ কিছু বলেনি কোনদিন আর আজ কিনা হঠাৎ এক উড়ো টেলিফোনে বলে তাকে গুলি ক'রেছে! গুলির লিস্টে যাদের নাম থাকে তাদের নাম অন্তত সরকারী মহলে গোপন থাকে না। তাদের খুঁজে পেতেই হয়রাণ হ'তে হয় পুলিশকে। আর বিশ্ব একটা বিশিষ্ট পরিবারের এমন শিক্ষিত একজন সেরা ছেলে —! অ্যাবসার্ড। কিন্তু কাল সে এল না-ই বা কেন? কোথায় গেল? সুপ্রীতি চাবি নিয়ে এলে প্রশ্ন ক'রলেন, বিশ্ব কাল কোথায় গেছে?

কি ক'রে বলব? বিকালবেলা তো বেরোল —

বিকালে বেরোল রাত্রে বাড়ী ফিরল না তুমি একবার খবর নিলে না?

কোথায় খবর নেব? সে তো কোন কোন দিন বেশী রাত্রেও ফেরে।

পরীক্ষিৎ আর কথা বললেন না। চাবি লাগিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। ইতিমধ্যে রুমি জেগে গিয়েছিল। সে-ও ঢুকল বাবা-মার পেছনে। পরীক্ষিৎ প্রথমেই এগিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যেকার বই-এর স্তূপের দিকে। সারি সারি পাঠ্য বই। তারপরেই পেলেন চীন দেশ থেকে ছেপে আসা লাল রঙের সুন্দর সুদর্শন কতগুলো বই, মা-ও সে তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী ইত্যাদি। তার

পাশে একগাদা ইংরিজি পত্রিকার একই সংখ্যা যা সর্বৈবভাবে নিষিদ্ধ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। দেখেই হতাশ হয়ে পড়লেন পরীক্ষিৎ, ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর মনের অমিত বিশ্বাস এক নিমেষেই চুপসে গেল। তিনি মুষড়ে পড়লেন। তাহ'লে সত্যি। সত্যি হতে পারে। তবে কি পুলিশ তাঁকে গোপন ক'রে গেছে। এতদিন কিছুমাত্র বলে নি তাঁকে সে কি ইচ্ছা ক'রে? তাঁর এতদিনের সহকর্মী — প্রায় বন্ধুস্থানীয় সি, পি, বেইমানী ক'রল। তাঁর ছেলের প্রাণটা বাঁচাল না তারা! পরক্ষণে মনে হ'ল বিশ্বজিৎ — বিশ্বজিতের মত ছেলে কি ক'রে জড়িয়ে গেল এমন একটা নোংরা রাজনীতির মধ্যে যার নীতি হ'ল খুন সন্ত্রাস। এতদিন নিঃশব্দে যে আগুন জ্বলছে তাই আজ পোড়াল; কিন্তু পুলিশ নিশ্চয়ই জানত — তবে কেন একবার তাঁকে সাবধান ক'রে দিল না কেউ? কেন একবার গল্পের মধ্যেও বলল না, তোমার ছেলেকে সামলাও বা তোমার ছেলে বিপথে যাচ্ছে! তাহ'লে তিনি যা করবার ক'রতে পারতেন, সুযোগ পেতেন ছেলেকে ফেরাবার, সে না ফিরলে নিজের মান বাঁচাবার ব্যবস্থা তো অন্তত ক'রতে পারতেন? এখন ছেলে তো গেলই তাঁর চাকরীস্থলে সারাজীবনের সঞ্চিত সম্মান ধুলোয় মিশে গেল। এখন তিনি কি ক'রে মুখ দেখাবেন সমাজে? সবাই জানবে পরীক্ষিৎ মুখার্জীর ছেলে একটা গুণ্ডার দলের সদস্য ছিল বলে তাকে পুলিশে গুলি ক'রতে বাধ্য হয়েছে। সে ছিল একজন সমাজ বিরোধী। কোথায় মুখ লুকোবেন তিনি?

কিন্তু বিপদে যখন বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয় মানুষ, সেই সময় কর্তব্যে ভুল ক'রতে নেই। প্রচণ্ড অভিমান সত্ত্বেও সেই সদ্য সকালেই ফোন ক'রলেন পুলিশ কমিশনারকে।

কি ব্যাপার, এত ভোরে? — ওপাশ থেকে শোনা গেল।

আচ্ছা কাল রাত্রে কি বেলেঘাটায় কোন এনকাউন্টার হয়েছে?

ও তো দৈনিক ক'রতে হচ্ছে। নিয়ম ক'রে।

না যাতে কেউ মারা গেছে এমন কোন অভিযান হয়েছে কি?

খবর নিয়ে বলতে হবে।

বিশেষ প্রয়োজন। আমি অপেক্ষা ক'রছি।

অল্পক্ষণ বাদেই ফোন বাজল। পরীক্ষিৎ রিসিভার কাণে লাগিয়েই বললেন, হ্যাঁ, বলছি।

গতকাল রাত্রে যে অপারেশান হয়েছে তাতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকশেস হ'ত সামান্যের জন্যে ফস্কে গেছে। খবর ছিল আর আর ওয়ান ওখানেই আছে। ছিলও তাই। কিছুক্ষণ আগেই সরে গেছে।

অতকথা শোনবার মন ছিল না পরীক্ষিতের। তিনি ভেতরে প্রচণ্ড অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন, অনেক চেপে রাখা সত্ত্বেও কিছুটা তাঁর স্বরে প্রকাশ হয়ে পড়ল, কেউ মারা গেছে কি?

তিনজন। তার মধ্যে দুজনকে অনেকদিন ধরে খোঁজা হচ্ছিল। একটি ছেলে একেবারে আনকোন। তবে আমাদের অন্য এলাকার ইনফরমার বলছে ওই ছেলেটি নাকি দলের মধ্যেকার একজন ইনটেলেকচুয়াল ছিল। খুব দামী ছেলে।

দেখতে কেমন ?

কান্তি বলছিল ফর্সা লম্বা ধরণের ছেলে, চোখে চশমা ছিল।

ছবি হয়েছে আমার কাছে এখনই পাঠানো সম্ভব ?

কোন পরিচিতের কোন খবর এসেছে কি ? আমি এখনই বলে দিচ্ছি।

দরকার নেই আমি এখনই যাচ্ছি। নিজের কাছে আনিয়ে রাখলেই চলবে।

আমার বাড়ীতে ? আমি আনিয়ে রাখছি। অপেক্ষা ক'রছি।

অন্যান্য সহকর্মীদের ধরবার সুবিধের জন্যে অপরিচিত মৃত যুবকের ছবি তুলে রাখা হয়েছিল তাই দেখেই সনাক্ত করা গেল বিশ্বজিৎকে। দীর্ঘদিনের সহকর্মী হিসেবে দুঃখ এবং সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে নগর কোতোয়াল জানাল আরক্ষী মহলও বিস্মিত হয়েছে এই গোপনীয়তার ঘটনায়। বিশ্বজিৎকে সেই বিশ্বাসঘাতক ইনফরমারটি ছাড়া আর কেউ জানত না। নগর পালের বিবৃতি অনুসারে পরীক্ষিৎ জানলেন নকশালদের প্রধান নেতার খবর পেয়ে পুলিশ ওখানে একটা বাড়ী ঘিরে ফেলে। সেখান থেকে পুলিশের ওপর আক্রমণ চালানো হলে আত্মরক্ষার জন্যে গুলি চালাতে ওই যুবকটি যাকে পরীক্ষিৎ ছেলে হিসেবে সনাক্ত ক'রছেন এবং আর দুজন উগ্রপন্থী মারা যায়। সমস্ত শুনেও পরীক্ষিতের সন্দেহ হ'ল কথাগুলো যেন সব সত্যি বলছে না নগরপাল। ঘটনাটা সাজিয়ে বলছে অন্য রকম ক'রে। গুলির লড়াই ব্যাপারটা মিথ্যে। চক্ষুলজ্জার জন্যেই এই মিথ্যের অবতারণা ক'রছে সেন। কিন্তু এই অবিশ্বাস গোপন ক'রে রাখলেন ভদ্রতার খাতিরে। তাঁর কল্পনার ছায়ালোকে সত্য ঘটনা অন্য মূর্তি পাচ্ছে। হয়ত ওখানে ছিল বিশ্বজিৎ আর সকলকে যেমন গুলি ক'রেছে তাকেও ক'রেছে। অসৎ সঙ্গের মাশুল দিয়েছে সে হিসেব ক'রেই। তিনি কেবল একটি প্রশ্নই ক'রলেন, আচ্ছা সেন একটা কথা আমাকে ঠিক ঠিক বল, আমার প্রয়োজন সে তুমিও বুঝবে — সত্যিই ওর নামে পুলিশের খাতায় কোন রেকর্ড আছে কিনা।

আমি সত্যিই বলছি ভালভাবে খবর নিয়েছি পুলিশ ওকে জানতই না। যদি ওই ইনফরমারটি না চিনত তাহ'লে ওকে আমরা নতুন ছেলে হিসেবে ধরে নিতাম।

পরীক্ষিৎ চিন্তা ক'রছিলেন, প্রশ্ন ক'রলেন, এখন কি করব ?

নগরপালের কথা যেন সাজানোই ছিল, সে আমি ভেবেই রেখেছি। অফিসে গিয়েই সব কাগজে একটা সংশোধিত বিবৃতি পাঠিয়ে দিচ্ছি উগ্রপন্থীদের গুলিতে একজন পথচারী যুবক নিহত হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ গুলি ক'রতে বাধ্য

হয় এবং দুজন উগ্রপন্থী সমাজ বিরোধী নিহত হয়, বাকী সকলে অন্ধকারে সরে পড়ে।

ব্যস। পরীক্ষিৎ নিশ্চিত হলেন। মৃত ছেলের রাজনৈতিক চিন্তার এবং কাজকর্মের দায় তাঁকে বইতে হবে না। নইলে এতদিনের অর্জিত যশ এক নিমেষেই উবে যেত। শুধু তাই নয় দেশের যা অবস্থা, ওপর মহলের যা চাপ তাঁর চাকরী রাখাই দায় হ'ত।

নগরপালের পরামর্শ অনুসারেই বাড়ী ফিরে প্রথমে ঢুকলেন বিশ্বজিতের ঘরে। প্রমাণ লোপ ক'রতে হবে। কারণ এখন পুলিশের কর্তা-ই সর্বময় কর্তা নয়। যদি তাঁর কর্মস্থলের শত্রুরা কোন আঁচ পেয়ে লাগিয়ে দেয় তো তাঁর বাড়ী তল্লাসী হয়ে যাবে, সে অপমান সহ্য হবে না। কেউ চিনত না বিশ্বজিৎকে সে একরকম ছিল, এখন তিনি স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হবেন। উপায় নেই। লাশ কেটে পরীক্ষা ইত্যাদি ব্যাপার তো এই জরুরী কালীন অবস্থায় কিছুই নয়। সবাই কথা শুনে চলবে। পুলিশ যেমন চাইবে তেমনি চলবে সমস্ত বিভাগ কারণ এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এই উগ্রপন্থীদের উৎপাত বন্ধ করা। ওপরের নির্দেশ। সহযোগিতা কর। যেমন সহযোগিতা যার কাছে প্রয়োজন তেমনি। আর এই সহযোগিতা ক'রতে কেউ দ্বিধান্বিতও নয়। অতএব অন্য কোন চিন্তা আর নেই, চিন্তা শুধু ফাঁস না হয়ে যাওয়া। বেড়া দিতে হবে সেই হিসেব করেই, যাতে কোথাও কোন ফাঁক না থাকে।

সমস্যা হ'ল এই বিশাল বই-এর স্তুপ কি ক'রবেন তিনি? কোথায় ফেলবেন? আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবেন? রান্নাঘরে অত বই জ্বালানো তো সাংঘাতিক ব্যাপার। বাড়ীর চাকর বাকর কেউ আর জানতে বাকী থাকবে না। তাছাড়া ইলেকট্রিক আর গ্যাসের আগুনে রান্না হয় যে ঘরে সেখানে ছাই-এর কোন বালাই নেই। হঠাৎ এত ছাই — গল্পের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না ঝি চাকরদের? ছাদে নিয়ে গিয়ে গোপনে জ্বালিয়ে দেবেন নিজেরা? পাশের বাড়ীর লোকজন দেখবে না? অত বই পোড়াবার আগুন জ্বাললে চোখে পড়বে না প্রতিবেশীদের? হঠাৎ জ্বালতে গেলেই সন্দেহ হবে। তবে? ক'রতে হবে সবাইকে লুকিয়ে, এমন কি বাড়ীর চাকর-বাকরদেরও। কিভাবে? ভেবে পেলেন না পরীক্ষিৎ। আর এটা এমনই সময় যে স্ত্রীর পরামর্শ নেবেন সে-ও মনের দিক থেকে সম্ভব হচ্ছে না। শোক বা অনুতাপ-এর মতই বড় প্রশ্ন এখন আত্মরক্ষার। নিজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে যে মরেছে সে তো মরেছেই বাকী সকলকে তো বাঁচতে হবে। তার জন্যেই বাঁচাতে হবে নিজের সম্মান। সম্মান তো কোন একক ভোগের বস্তু নয় সে সকলের, পরিবারের — বংশের — উত্তরাধিকারীদের। অতএব সম্মান বাঁচাতেই হবে। একমাত্র নগরপাল নৃপেন সেন ছাড়া আর কেউ জানে না পরিচয়, সে সম্মান বাঁচাবে, হয়ত জেনে গেলেও বাঁচিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রবে অন্য সহকর্মীরাও, তবে কেউ এমনও থাকতে

পারে যে প্রকাশ্যে কিছু করল না কিন্তু ভেতরে ভেতরে সর্বনাশ ক'রে দিল ওপর মহলে খবরটা ফাঁস ক'রে দিয়ে যে পরীক্ষিৎ মুখার্জীর ছেলে উগ্রপন্থীদের দলের একজন পাণ্ডা। তাহলে ? এত সব ভেবে নিতে হয়েছিল। সেন বলেছে আসবে। ভাবনা চিন্তা ক'রে নিতে কিভাবে কি তিনি ক'রবেন জেনে নিয়ে তারপর সব ব্যবস্থা ক'রবে। যথেষ্ট উপকার ক'রেছে বেচারী, আর কি ক'রবে ? এর জন্যে তিনি নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকবেন। যে কোন প্রয়োজনে তিনি নিশ্চয়ই সাহায্য ক'রবেন এই ঋণ পরিশোধের জন্যে।

যেখানে প্রমাণ পাবার জন্যে তৎপরতা কারও নেই সেখানে প্রমাণলোপ কোন কঠিন ব্যাপার নয়। আর সেই প্রমাণ লোপের তল্লাসীতে অংশ গ্রহণের সময় রুমির নজর পড়ল একটা সুন্দর ডায়রীর দিকে। এসব কাজের গুরুত্ব সে সামান্যই বোঝে বলে নেহাৎ কৌতুহলের বশেই সে সেটি সবার অসাক্ষাতে লুকিয়ে ফেলল। ওর সম্পর্কে কি লিখেছে বা সৌগত সম্পর্কেই বা কি যে লিখেছে এই ওর কৌতুহল। বাবা যখন কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটিতে ব্যস্ত সেই সময় রুমি সরিয়ে নিল। তার মা নিঃশব্দে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তাঁর দিকে তাকাল রুমি। তিনি দেখছেন কিনা বুঝতে পারল না। মুখ নিচু ক'রে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ দাঁড়িয়ে আছেন দরজার ঠিক ওপরটায়। মার পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল রুমি, নিজের ঘরে গিয়ে ডায়রীটা একবার খুলল, না থাক! সারা বাড়ী ঘিরে এখন একটা নিঝুম নীরবতা। এই নীরবতার মধ্যে নিজেকে কেমন অসহায় মনে হচ্ছে রুমির। কি যেন একটা থমথমে ভয়ার্ততা অকস্মাৎ মেঘলা অন্ধকারের মত চেপে বসেছে সমস্ত বাড়ীটা ঘিরে। বসুদেব নিঃশব্দে কাজ ক'রে যাচ্ছে বাবার সঙ্গে। বাবা বই বাছছেন আর বসুদেব সেগুলো জড়ো ক'রছে। প্রসেনজিৎ নিজের ঘরে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। তার মনের ভাব বুঝতে পারা কঠিন। বাড়ীর পুরাণো ঝি ঠাকুমার ঘরের ওপাশে কি যেন কাজ ক'রছে, রুমির মনে হয় কাজ সে ক'রছে না। কেউ কাউকে ডেকে কিছু বলে নি তবু সবই যেন হাওয়ার শব্দে, নিঃশব্দ ফিসফিসানিতে জেনেছে কি ঘটেছে। অথচ সবই তো গতকাল সকালের মত। সেইরকমভাবেই সব রোদটা এসে ঘরে ঢুকেছে অগ্নিকোণের জানালা দিয়ে, রোদের আলো এসে ভরিয়ে দিয়েছে বারান্দা। তেমনিভাবেই পাশের বাড়ীতে তপতী রেডিওটা চালিয়ে দিয়েছে প্রচণ্ড জোরে, গান হচ্ছে, সকাল বেলার গান। দেশাত্মবোধক গান। যুবশক্তির জয়গান। বাইরের দরজায় খবরের কাগজ রেখে গেছে কাগজওয়ালা। রোজ বসুদেব তুলে আনে আজ সে আনে নি, প্রত্যক্ষ ব্যতিক্রম কেবল এইটুকুই। এইটুকু ? ভাবল রুমি। না আর একটাও, ছোটদাকে দেখা যাচ্ছে না। দেখা তো কোনদিনই যায় না। সকালে কখন একবার উঠে কলঘরের কাজ সেরে নেয় আবার ঢুকে যায় নিজের ঘরের মধ্যে। এসময় দেখা যায় না কোন দিনই। আজও দেখা যাচ্ছে না —

এ আবার ব্যতিক্রম কি ? তবু মনে হচ্ছে এদিনটি অন্য রকম। রোজ যেমন তেমনটি এ বাড়ীতে নয়। কোথাও একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে সকলের অলক্ষ্যে! অন্যদিন অন্য সকালগুলোতেও বিশ্বজিৎ চোখের আড়ালে থাকে কিন্তু সে থাকে। আজও চোখের আড়ালে, কিন্তু নেই। বিশ্বজিৎ অনস্তিত্ব হয়ে গেছে। এই থাকা এবং না থাকার কি সামান্য ব্যবধান —! দেখে অবাক হয় রুমি।

সুপ্রীতি হতবাক। প্রত্যুষে টেলিফোন পেয়ে তিনি হয়েছিলেন সংশয়াকীর্ণ, দ্বিধান্বিত। বিশ্বাস হচ্ছিল না। সামান্য বিশ্বাসের বুকের ওপর এসে চেপে বসতে চাইছিল প্রবল অবিশ্বাস। অসম্ভাব্যতা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে কে বিশ্বাস ক'রবে অস্বাভাবিক সামান্য সম্ভাবনাকে ? সম্ভাবনা ? হতেই পারে না। পরীক্ষিৎ মুখার্জীর ছেলেকে গুলি ক'রবে পুলিশ! বিশ্বাস ক'রতে হবে ? তারপর যে ছেলে জাতীয় বৃত্তি পাওয়া, উচ্চ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত! পুলিশ কেন এ কাজ ক'রতে যাবে ? যে বলছে সে ভুল ক'রছে তা ছাড়া দীপু নামে বিশ্বজিতের কোন বন্ধু আছে কেউ শোনে নি। হয়ত শত্রুতা ক'রে কেউ এই ভোরে এসব বলছে। কার সঙ্গে শত্রুতা ক'রবে ? কার শত্রু বিশ্বজিতের ? কি জানি কেন তার সঙ্গে শত্রুতা ক'রবে লোকে ? শত্রুতা ক'রে এই খবর বলেই বা কি লাভ হবে তার ? সেটাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হ'ল না। অবিশ্বাস —— অবিশ্বাস — অবিশ্বাস। অবিশ্বাস স্বাভাবিক ভাবের — অবিশ্বাস চেষ্টা ক'রে আনা — অবিশ্বাস জোর ক'রে ধরে রাখা। কিন্তু ক্রমাগত ঘটনার চাপে সেই সামান্য বিশ্বাস — বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে কিশলয়, কিশলয় থেকে মহীরূহ হ'ল। সুপ্রীতি হলেন হতবাক।

এরকম যে হতে পারে কোন দুঃস্বপ্নের অতীত ছিল তাঁর। সারাজীবন যে নিবিড় ঐকান্তিকতায় গড়ে তুলেছেন নিজের সংসার সেই সংসারের গঠনমূলে আছে শৃঙ্খলা, শক্ত বাঁধুনি। কোথাও কোন ত্রুটি নেই, বিচ্যুতি নেই, স্খলন নেই অথচ একেবারে মহাপাত! কোথাও কোন হিসেব মিলছে না সুপ্রীতির। কিসে এমন গরমিল হল ? ভুল হয়ে গেল কোথায় ? কেন এমন হ'ল ? এমন কথা তো ছিল না! পরীক্ষিৎ কি ক'রছেন দেখবার জন্যে নয়, তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্যেও নয়, না কোন উদ্দেশ্য নিয়েও নয়, অকারণেই সুপ্রীতি বিশ্বজিতের দরজার ওপরে একপাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘরের মধ্যে পরীক্ষিৎ ব্যস্তভাবে নড়াচড়া ক'রছেন, চলাফেরা ক'রছে বসুদেব, রুমিও আছে তাদের সঙ্গে তবু সুপ্রীতির মনে হচ্ছে ঘরটা ফাঁকা, শূন্য। বিশাল এক শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। অথচ কি ? কিছুই নয়। কারণ এই যে প্রসেনজিৎ এতগুলো বছর সামনে ছিল না তাতে তো তাঁর কিছু মনে হয় নি! অন্য সবাই হলে এই বছরগুলোয় কতবার যাতায়াত ক'রত, প্রসেনজিৎ একবারও আসে নি! সে বহুবার গেছে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে, কেবল নিজের দেশেই আসে নি বাবা-মার কাছে। তাতে কি ক্ষতি বৃদ্ধি হয়েছে ? বহুবার ছেলেকে আসতে লিখেছেন,

উত্তর এসেছে আসবে। কিন্তু বিশ্বজিৎ তো আর আসবেই না! সে তো কখনও লিখবে না সামনের সেপ্টেম্বরে ফিরবে! বেশী চিন্তা ক'রতে পারছেন না সুপ্রীতি। তাঁর মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে, শরীর ঝিম ঝিম ক'রছে, ভাবতে গেলেই বুক ধড়ফড় ক'রছে একটু বাদে।

সামনে সাজানো রাশি রাশি বই। এগুলো নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত থাকত নিজের ঘরে? পরীক্ষিৎ খুঁজে খুঁজে কিছু কাগজও বের ক'রলেন বিশ্বজিতের নিজের লেখা। শ্রেণী সংগ্রাম, শোষণহীন সমাজপ্রতিষ্ঠা, দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছে সে ইংরিজি ও বাংলায়। প্রবন্ধগুলোকে খুঁজে বের ক'রলেন পরীক্ষিৎ। ভাবলেন পড়ে দেখবেন। কিন্তু মাথাটা একেবারেই বিগড়ে গিয়েছিল যে ছেলের তার লেখা আর কি পড়বেন? নিজের শিক্ষার বিষয় ছিল বিজ্ঞান, সে সব বাদ দিয়ে দিনরাত যখন এই নিয়েই পড়ে থাকত তখন কি আর পড়বেন সে লেখা? বরং এখন দ্রুত প্রয়োজন এগুলো নষ্ট করা। বসুদেবকে নির্দেশ দিলেন, ছাদের সিঁড়ির ঘরের মধ্যে দু চারখানা ক'রে কাগজ সমানে পুড়িয়ে যেতে, একসঙ্গে যাতে বেশী আগুন না হয়। বইগুলোও সেইভাবে পোড়াতে হবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

শেষ বইগুলোর সঙ্গে পরীক্ষিৎও বেরিয়ে গেলেন। তাঁর প্রাথমিক কাজ শেষ। তিনি বেরিয়ে যেতেই সুপ্রীতি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। রুমির ঘরের টেবিলে তার নিজের একটা ছবি আছে ফ্রেমে বাঁধানো, তাঁদের ঘরে আছে নিজেদের বিয়ের সময়কার ছবি, ছেলেমেয়েদের ছবি প্রসেনজিতের ঘরে এমিলি-প্রসেনজিতের ছবি আছে আমেরিকায় তোলা, বিশ্বজিতের ঘরে কিছু নেই। দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে — তারিখ। সুপ্রীতি হুড়মুড় ক'রে ঢুকে ভেঙে পড়লেন বিছানার ওপরে। গতকাল যেভাবে পাতা হয়েছিল সেভাবেই আছে — ছেলে শুয়েছে পথের ধুলোয় লক্ষ লক্ষ মানুষের মুছে যাওয়া পদচিহ্নেরও পরে। সেখানেই তার রাত কেটেছে জীবনের শেষ রাত, দীর্ঘতম রাতটি, সে ঘুমোচ্ছে। সেই ঘুম ভেঙে আর সে উঠে আসবে না এখানে, এই ঘরে, এই বিছানায়, কোনদিন। তার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রিয়তম বইগুলো কাগজপত্রগুলো, যা সে বুকের মধ্যে আগলে রাখত, চলে গেল এই বাড়ী থেকে। হয়ত তার ভালবাসার সমস্ত চিহ্ন মুছে নিয়ে সে এমনি ক'রেই মুছে গেল। কিন্তু কেন? কেন কেন কেন? সুপ্রীতি বিছানায় প্রচণ্ড বেগে মুখ ঘষতে লাগলেন উত্তরের অধীরতায়।

রুমি দরজার কাছে এসে দেখল মা ছোটদার বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ছটফট ক'রছে। বাবাকে গিয়ে জানাতে পরীক্ষিৎ সামান্য শব্দ ক'রে বললেন, থাক; ডিসটার্ব ক'রো না।

ঘুম থেকে উঠে অন্যদিনের মতই প্রাতঃকালীন কাজগুলো শেষ ক'রে নিয়েছিল প্রসেনজিৎ। তখনো কিছু বোঝে নি। বুঝল কিছুক্ষণ বাদে, বাড়ী নিঃস্তব্ধ দেখে। চেঁচামেচি হৈ চৈ এবাড়ীতে কোনদিনই হয় না, করবার লোকও

নেই তবু আজকের স্তব্ধতা যেন কেমন অন্যধরণের মনে হ'ল। সবাই যেন ঘুমিয়ে আছে। তাই কি? বসুদেবকে ঘর থেকেই ডাকল প্রসেনজিৎ। পরপর দুবার ডাকল। কোন সাড়া নেই। তাই মনে কিঞ্চিৎ বিরক্তি নিয়ে সে দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখল রুমি আসছে। জানতে চাইল, বসুদেবকে এত ডাকছি কি ব্যাপার বল তো?

রুমি গম্ভীর মুখ তুলে দাদার দিকে তাকিয়ে বলল, সে ব্যস্ত আছে ছোটদার ঘরে।

ওঃ, প্রসেনজিৎ শব্দ ক'রল।

রুমি আবার বলল, ছোটদার একটা খবর এসেছে।

কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখ তুলে ধরল প্রসেনজিৎ রুমির চোখের ওপর। রুমি নিজের চোখ নামিয়ে বলল, ছোটদাকে কাল রাত্রে পুলিশে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছে।

য়্যাঁ! আঁতকে উঠল প্রসেনজিৎ। তার মুখ থেকে শব্দটা আপনি যেন ছিটকে বেরোল। ব্যাপারটা এমনই আকস্মিক যে কথাটা প্রসেনজিৎ কি শুনেছে সেটা অনুধাবন করবার জন্যেই কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর ইংরিজিতে বলল, কি বলছ তুমি?

হ্যাঁ। ভোরে একটা টেলিফোন এল। বসুদেব ধরেছিল। তারপর বাবা পুলিশ কমিশনারকে ফোন ক'রে দেখা ক'রে জেনে এসেছে কথাটা ঠিক।

কি ঠিক? — উত্তেজিত প্রসেনজিৎ ইংরিজিতেই কথা বলে যাচ্ছিল অত্যন্ত তীব্র স্বরে। রুমি সে কথার উত্তর শান্তভাবেই দিল, ছোটদাকে ওরা মেরে ফেলেছে।

কেন? কেন মেরেছে?

মনে হচ্ছে ছোটদা ভেতরে ভেতরে নকশালপন্থী ছিল।

তাতে কি? প্রত্যেক মানুষের একটা মত থাকতে পারে। নিজস্ব বিশ্বাস থাকতে পারে! এটা তো মানুষের অধিকার।

পুলিশ বলছে ওকে মারবে বলে মারেনি অন্য যাদের মারতে গিয়েছিল ঘটনাচক্রে ছোটদাও কাল তাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

এখানে কি শিকারের পাখি মারার মত যখন খুশি মানুষ মারা যায়? পুলিশ ইচ্ছে ক'রলেই যাকে খুশি মেরে দিতে পারে?

এখন পারছে।

কোন কৈফিয়ৎ নেই?

এখন লাগছে না।

ধিক এই প্রশাসন।

দাদা, শান্ত সংযত গলায় রুমি বয়স্ক মানুষের মত বলল, ঘরে বলছ বল। বাইরে খবরদার ব'লো না। শুনলে তোমাকে নিয়ে গিয়ে পুলিশে অত্যাচার

ক'রবে, কেউ ছাড়াতে পারবে না। আমাদের ক্লাসের একটি মেয়েকে ছ মাস হ'ল পুলিশে তার বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে গেছে, প্রচুর অত্যাচার ক'রে জেলে পুরে দিয়েছে।

অপরাধ?

সে নকশালপন্থী।

কেন এমন ক'রছে?

নকশালপন্থীরা নাকি বিপ্লবী। তারা এই সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে দিতে চায় নতুন সমাজ গড়বার জন্যে।

তাতে ক্ষতি কি?

কিছুই জানি না। ক্লাসে মেয়েরা বলাবলি করে শুনেছি।

কিন্তু এভাবে মানুষকে গুলি ক'রে মারা যায়? আইন লাগে না? বিচার নেই? প্রশাসন যদি এমনি করে সাধারণ মানুষ তাহ'লে প্রশাসনের প্রতি আস্থা হারাবে। সেই অনাস্থা দেশকে কোথায় নিয়ে যাবে কেউ কি সেকথা ভাবছে?

রুমি কোন কথা বলল না। সে ভাবছিল সৌগতকে টেলিফোন ক'রে খবরটা বলবে কিনা। ইদানীং সৌগত এবং বিশ্বজিৎ কেউ কাউকে পছন্দ ক'রত না, তবু একদিন ওরা পরস্পরের বন্ধু ছিল, তাই খবরটা দেওয়া উচিত। তার চেয়ে বড় কথা সৌগত এই পরিবারের একজন, খবরটা তাকে দেওয়া উচিত নইলে সে কি ভাববে।

প্রসেনজিৎ অবস্থাটা দেখবার জন্যে বিশ্বজিতের ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ব্যস্ত বাবাকে, বসুদেবকে আর পাথরের প্রতিমার মত মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একবার শুধু প্রশ্ন ক'রল, খবরটা কি ঠিক বাবা? বিশ্বকে কি দেখতে পেলে?

দেখিনি, তবে খবরটা ঠিক। তাছাড়া ঘরের যা অবস্থা দেখছি তাতে মিলে যাচ্ছে — পরীক্ষিৎ আপন মনে কাজ ক'রতে লাগলেন। কি বলবার থাকতে পারে? বলবার প্রসেনজিতেরও কিছু ছিল না বলেই সে নিঃশব্দে সরে এল। এসেই ঘরে। নিজের ঘরে ঢুকে সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ ক'রতে বসল। যতদিন হ'ল সে এসেছে তা একজন মানুষকে দেখবার এবং বোঝবার পক্ষে যথেষ্ঠ। বিশ্বজিতের রাজনৈতিক আনুগত্যের খবর না পেলেও এই দেড় বছরে এটা সে স্পষ্ট বুঝেছে যে বিশ্বজিৎ এদেশের আর দশজন মানুষের থেকে আলাদা। এখানে বেশীর ভাগ লোকের রূপ যা সে দেখছে তার সঙ্গে মেলে না বিশ্বজিতের। একজন প্রকৃত ভদ্রলোক সে, তাকে ইংলণ্ড বা আমেরিকাতেই মানায়, এ দেশে নয়। সেখানে সে শান্তিতে থাকতে পারবে, সুন্দরভাবে জীবন যাপন ক'রতে পারবে এখানে নয়। কারণ সে তো এই কিছুদিনের অভিজ্ঞতাতেই দেখতে পাচ্ছে ভদ্রজীবন এখানে প্রতি মুহূর্তে বিপর্যস্ত হয় অন্যায়, অবিচার, নীচতার কাছে। অর্থের প্রাচুর্য না থাকলে এখানে স্বস্তিতে থাকা যায় না অথচ প্রচুর অর্থার্জনের

পথ ভদ্রলোকেদের নেই, সে পথ খোলা অসৎ লোকেদের জন্যে। এমিলির সঙ্গেও এবিষয়ে আলোচনা হয়েছে তার, এমিলি প্রস্তাব ক'রেছে বিশ্বজিতের কাছে, চলো আমেরিকা। উচ্চতর শিক্ষা, উচ্চতর কাজ, জ্ঞানের দরজা সেখানে খোলা। বিশ্বজিৎ নাকি রাজী হয়নি। সবাই যদি দেশ ছেড়ে যায় তবে নাকি দেশ কদর্যে ভরে থাকবে, এখানে থেকেই নাকি কাজ ক'রতে হবে, নিজের দেশকে এমনি ক'রে গড়ে তোলার কাজ। এসব সে এমিলিকে বুঝিয়েছিল। এখন বুঝছে সত্যিই কথাটা বিশ্বাস ক'রত সে নিজে। বক্তব্যে আন্তরিকতা ছিল। রাজনীতি সমাজনীতি দর্শন — এসব বোঝে না প্রসেনজিৎ, তবু আজ বুঝল বিশ্বজিৎ ঠিক চিন্তাই ক'রেছিল, পুরাণো জীর্ণ ইমারত না ভাঙ্গলে নতুন সৌধ গড়া যায় না, কারণ নতুন সৌধের জন্যে লাগে মজবুত ভিত্তিভূমি।

কিন্তু সেই শুভচিন্তার মানুষগুলোকেই যেখানে নির্বিচারে নির্দ্বিধায় হত্যা করা হচ্ছে সেখানে কিসের আশা? ভরসা কি? আইনের স্রষ্টারা যেখানে আইনকে মাড়িয়ে যাবার নির্দেশ দেয়, আইনের রক্ষকেরাই যেখানে আইনের মুখে থুথু ছিটোয় অবহেলায়, সেখানে বাস করা কি ভদ্রজনের সম্ভব? ঠিকই বলেছিল ওখানকার এদেশী বন্ধুরা, নিষেধ ক'রেছিল আসতে। অভিজ্ঞতা ছিল না প্রসেনজিতের, ধারণা ছিল না এমিলির; এই তিক্ত রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। আর এক মুহূর্ত এদেশ ভাল লাগছে না, ইচ্ছে ক'রছে না একটা ঘন্টা থাকতে। জাতির জীবনে যখন চরম দুর্দিন আসে তখনই যীশুরা খুন হন। এখন বহু অন্ধকার পার হতে হবে এই জাতিকে, সে অন্ধকার তার মত দুর্বল মানুষের সহ্য হবে না।

বহুক্ষণ চিন্তাভাবনা ক'রে টেলিফোন তুলে বলল, একটা টেলিগ্রাম ক'রতে চাই। প্রচণ্ড জরুরী। হ্যাঁ। এমিলি মুখার্জী, হোটেল উত্তরতীর্থ, ঋষিকেশ। হ্যাঁ, লিখুন —

লক্ষ্মণঝোলাতে তারবার্তাটি পেলেন স্টুঘাণ লোক মারফৎ। একজন টাঙ্গাওয়ালাকে দিয়ে হোটেল থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রসেনজিৎ এমিলিকে তার ক'রে জানিয়েছে, বাড়ীতে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটেছে সমস্ত কর্মসূচী বাতিল ক'রে ফিরে এসো।

দিন তিনেক আগে লক্ষ্মণঝোলা এসে যখন পৌঁছোলেন ঝোলানো সেতুর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে প্রাণময় এক অবতরণ প্রত্যক্ষ ক'রতে লাগলেন নিচে বহমানা গঙ্গার। রাশি রাশি পাথরের পথ বেয়ে চঞ্চল কিশোরীর সিঁড়ি ভাঙ্গার মত চপল জলরাশি নেমে আসছে নিখিল শূন্যের ধ্বনি তরঙ্গে নতুন শব্দ সংযোগ ক'রে। অনন্ত নীল জল অনাবিল আনন্দের মূর্তিতে কোন মায়াময় লোক থেকে

যেন নেমে আসছে। সেই স্বচ্ছ জলরাশির ওপর আলোর নাচানাচি, বিশাল পাথরখণ্ডের ছায়াপাত, নীল আকাশ আর ঘনসবুজ অরণ্যময় পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে এক অদৃশ্যপূর্ব মূর্তির মত। সত্যিই এ এক রূপ। এই রূপ যদি ক্রমাগত কোন মানুষের চোখের ওপর দীর্ঘদিন লেগে থাকে আর যদি সেই মানুষের কিছু থাকে শিল্প চেতনা তবে সে নিশ্চয়ই তার মনের রঙে রাঙিয়ে কোন নূতনতর রূপের কল্পনা ক'রতে বাধ্য হবে। এই সৌন্দর্য মূর্ত হবে, হতেই হবে। আলোর চেতনা মানুষের মনে নূতনতর চেতনার জন্ম দিয়েছে। সে চেতনা বিকশিত হয়েছে জ্ঞানে, জ্ঞানের পরিণতি বিজ্ঞান কিন্তু এইসব ক্রম পরিবর্তনের মূল যে আলো সে অপরিবর্তিত, সে আবহমান, সে আদি।

হরিদ্বার থেকে যে পথে এসেছেন লক্ষ্য ক'রেছেন সে পথ ক্রমাগত উঁচু হয়ে উঠে এসেছে পাহাড়ী পটভূমিতে। আবার এই ঝোলা সাঁকো পার হ'লেই পাহাড়ের খাড়াই। সেই খাড়াই-এর গা বেয়ে নদীর ধারে ধারে সারি সারি মন্দির আর বাড়ীঘর। সবে দেখছেন একজন লোক দৌড়ে এল, গাইড চাই ? সমস্ত লক্ষ্মণঝোলা দেখিয়ে দেব, ওই সামনেই মহেশযোগীর আশ্রম। তোমরা তো মহেশ যোগীকে চেন, বহুবার তোমাদের দেশে গেছে। আমেরিকাতে তো অফিস আছে, বহু শিষ্য আছে — তোমরা বোধহয় জান, ওই দ্যাখ দেখা যাচ্ছে ওই বিরাট উঁচু মন্দিরটা হচ্ছে ওঁর আশ্রম। সেই লোকটির কথা বলার মধ্যেই গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে ছুটে এল অন্য একজন, ইংরিজিতেই জানতে চাইল, এই সাঁকোর ওপর ওদের একখানা ছবি তুলে দেবে কিনা কারণ সে ছবি চিরদিনের সুন্দর ছবি হবে — স্ট্রঘাণ ধন্যবাদ দিয়ে জানালেন তার প্রয়োজন হবে না। তাঁর নিজের হাতেও একটা ক্যামেরা ছিল সেটি দেখিয়ে অল্পে পার পেলেন। প্রদর্শক লোকটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে কিছুক্ষণ থামলেন, তারপর ভাবলেন আজ থাক। প্রথমে এমনি দেখা যাক তারপর কারও সাহায্য নেওয়া যাবে। বললেন, ধন্যবাদ, এখন কোন সাহায্য প্রয়োজন নেই।

লোকটি জানাল সে ভাল ক'রে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবে।

স্ট্রঘাণ ধন্যবাদ জানালেন তার আন্তরিকতার জন্যে এবং এগিয়ে চললেন। এই সুন্দর পরিবেশে যে মনোরম তৃপ্তি পেয়েছিলেন এরা সবাই মিলে তা নষ্ট ক'রে দিল। তিনি আর একটা ব্যাপারে প্রকৃতই বিরক্ত বোধ ক'রছিলেন, এই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে মাছি যেমন উৎপাত করে তেমনি উৎপাত ক'রছে ভিখারীরা। কোথাও শান্তিতে ঘুরতে দিচ্ছে না। দিল্লিতে শর্মার পরামর্শ মনে রেখে করুণা হ'লেও কাউকে একটা পয়সাও দিচ্ছেন না তবু সমানে ঘ্যান ঘ্যান ক'রে চলেছে বীভৎস দৃশ্যের মত একদল কদর্য দর্শন আধা-মানুষ তাঁদের ঘিরে। এবং যখন যেখানেই যাচ্ছেন একদল না একদল ঘিরছেই। এক একসময় তাদের গায়ের নোংরা গন্ধ তাঁকে বিব্রত ক'রছে কিন্তু এ অবস্থা থেকে সহজে পরিত্রাণ পাচ্ছেন না। সেই ঘটনা আবার ঘটল সাঁকোটা পার হতেই।

পার হয়েই একটা মন্দির। বহুতল বিশিষ্ট উঁচু মন্দির। লোকজন তার মধ্যে ঢুকছে, সামনেই পথ থেকে দৃশ্যমান মূর্তিগুলো দেখছে তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে। তাঁরা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে দেখলেন কাঁচের আলমারীতে পুতুল সাজানোর মত ক'রে চারপাশে অনেকগুলো বিশাল বিশাল মূর্তি রাখা আছে। স্টুঘাণ চেয়ে দেখলেন মন্দিরের ভেতরটা, এবং নিচে দাঁড়িয়ে ওপরটাও। কোন আকর্ষণ বোধ ক'রলেন না। ডান দিকেই নদী, সেই প্রচণ্ডস্রোত অধোবাহিনী নদী। নদীকে আড় ক'রে পাহাড়ের ঢালুতেই গড়ে উঠেছে ঘর, ইমারত। স্টুঘাণ একটা ঘরের পাশ দিয়ে দেখতে পেলেন আকাশের ছায়া বুকে জড়িয়ে স্কুল ফেরৎ বালিকার মত নীল জল ছুটছে। আরও দূরের আরও উঁচু পর্বতমালার ভেতর দিয়ে ছুটে এসেছে এখানে, এই শেষ পাহাড়ের পদভূমিতে। বাঁদিকে মন্দিরটার ওপাশেই পর্বতগাত্র। ক্রমাগত উঠে গেছে সবুজ সমাকীর্ণ পাহাড়। পায়ের তলায় বাঁধানো পথ। শহরের রাজপথের মতই সমান এবং সরল। ওঁরা সেই পথ ধরে নদীর ধারে ধারে এগিয়ে চললেন। দুদিকে ছোটবড় মন্দির আর ঘর বাড়ী। রাশি রাশি মানুষের মিছিলের মধ্যে মিশে তাঁরা চলেছেন, সবাই এদিকে সেদিকে মন্দিরের মধ্যে ঢুকছে বেরোচ্ছে, তাঁরা শুধু চলছেন। কিছুটা চলবার পর মন্দির শেষ হ'ল, সুন্দর একটা বাগানের মধ্যে পড়লেন তাঁরা। মন প্রাণ ভরে চারপাশে তাকালেন স্টুঘাণ। কি চমৎকার। মাঝারি আকারের গাছের সারি বেশ বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে। তার তলা দিয়েই চলে গেছে পথ। পথের ধারে ধারে সিমেন্টের তৈরী বেঞ্চ, তাতে বসছে ক্লান্ত যাত্রীরা। যার ভাল লাগছে সে-ও হয়ত বসছে। এমিলি বলল, কি সুন্দর জায়গা দেখছ। সত্যিই একটা সুন্দর দেশে এসেছি আমরা।

অনবরতই চারপাশে দেখছিলেন স্টুঘাণ। মন বিভোর হয়ে গিয়েছিল এই রম্য দৃশ্যের মাধুর্যে। বাঁদিকে পাহাড়ের দেয়াল, ডান দিকে কয়েক পা হাঁটলেই নদীর ঢালু। তারই মধ্যে এই অল্পপরিসর স্থানটুকুকে নাগরিক চোখে বিশাল আর প্রসারিত বলে মনে হচ্ছে। তবে সবচেয়ে যা মনোরম তা হ'ল প্রশান্তি। শব্দহীন, তাপহীন, ছায়ানিবিড় জায়গাটুকুতে ধীর বাতাসের মমতাময়তা। এ ছিল সেই আদিম বনভূমিরই অংশ, কেউ কিছু কিছু আমগাছ লাগিয়ে বনকে বাগান ক'রেছে কিন্তু স্তব্ধ পর্বতদেহের ওপরে আত্মমগ্ন নদীস্রোতের ধারের এই বাগানের সঙ্গে সেই বনের একাত্মতা অনেকটাই স্পষ্ট। মাঝখান দিয়ে নদীর সমান্তরাল যে পথ চলে গেছে সেই পথের ওপর সুস্পষ্ট মানুষের হাতের ছাপ। তবু এই পথ বনের সঙ্গে মানিয়ে গেছে, যেন মিলে মিশে আছে। স্টুঘাণ দেখলেন এখানেও পথের ওপর দোকান বসিয়েছে লোকেরা, রকমারী জিনিষ পথের ওপরই মেলে ধরেছে বিক্রির জন্যে। বেশীর ভাগই কমদামী সামান্যবস্তু। কিন্তু সারা দেশময় দোকান বাজার ক'রেও হ'ল না এখানেও সেই বেচা-কেনা। স্টুঘাণ কেমন যেন দুঃখ পেলেন। এখানে এই শান্ত বনময় পরিবেশে এই দোকান বাজার যেন

নেহাৎই বেমানান। এখানে দূর থেকে ভেসে আসা পাখির ডাক সুন্দর, জলস্রোতের শব্দ সুন্দর, সুবিশাল গাছের তলায় ছোট্ট একটা কাঠবিড়ালীর ভয়চকিত ব্যস্ত চলাফেরা সুন্দর। দু চারজন ভিখারী নিঃশব্দ প্রার্থনা পেতে বসে আছে সে-ও বরং সহ্য করা যায়, দোকানদারী নয়। সামনে একটা ফাঁকা বেঞ্চ পেলেন যার ওপর ছায়া মেলে রেখেছে এক বনতরু, যার চার পাশে কোন ভিখারী নেই, দোকানী নেই, পথিক যার সামনে দাঁড়াচ্ছে না গতিভঙ্গ ক'রে — সেখানটায় পৌঁছে শত্রুঘ্ন ভাইঝিকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, এখানটায় বসবে?

এমিলি চারপাশের নীরবতা দেখে নিয়ে বলল, খুব সুন্দর। বলেই সে বসে পড়ল বেঞ্চটায়। তারপর বলল, কাকা তুমি কিন্তু একটাও ছবি তুললে না।

তুমি তোল। আমার ছবি তুলতে ইচ্ছে ক'রছে না।

এত সুন্দর জায়গা ছবি তুলতে কেন ভাল লাগছে না বলতো?

কাকা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর খুব ধীরস্বরে বললেন, সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। এর কতটুকু ছবি তুলব বল? বরং মনের মধ্যে যে ছবি ধরা পড়ছে সে বিশাল, এই অসীম সৌন্দর্যের মতই বিরাট। পৃথিবীতে কিছুই তো চিরদিনের নয়, মনের মধ্যে যে স্মৃতি থাকছে তা-ই যে কদিন থাকে থাক। যখনই ইচ্ছে হবে দেখব। সে দেখার জন্যে কোন আয়োজন লাগবে না, ধরে রাখবার জন্যে বিশেষ কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাগবে না, যতদিন থাকবার থাকবে, নইলে পৃথিবীর নিত্যগতিতে বিস্মৃতির স্রোতে যাবে মিলিয়ে। ক্ষতি কি?

এমিলি বেঞ্চএর হেলানপিঠে মাথা এলিয়ে দিয়ে আকাশ দেখছিল, আকাশের দিকে তাকিয়েই কথাগুলো শুনল সে। যেমন আকাশ তার চোখের সামনে স্নিগ্ধ দৃশ্যের মত মেলা ছিল, যেমন বাতাস তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল পরম স্নেহের মত, অবসাদ তার সমস্ত দেহে ছড়িয়ে রেখেছিল রমণীয় তৃপ্তি, তেমনিভাবেই কথাগুলো তার কাণে গিয়ে ঢুকছিল — একটা নিটোল সুখাবেশের মত। প্রত্যুত্তর দেবার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রল না। উপরন্তু তার মনে হ'ল অকারণ বাক-বিস্তারের চেয়ে নীরবতা এখানে প্রয়োজনীয়। মাঝে মাঝে কি সব পাখির কণ্ঠস্বর উড়ে আসছে সেগুলো শোনা যেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সে উৎকর্ণ হয়ে রইল সেই শব্দ শোনবার জন্যে। আর শত্রুঘ্ন দেখছিলেন ক্লান্ত পায়ে যাত্রীরা সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়সের কত রকম যাত্রী, কত বিচিত্র তাদের পোষাক, কতরকম তাদের হাঁটা চলা, কত রকম তাদের মুখভঙ্গী — তিনি মনযোগ সহকারে সব চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ একটি শিশুর দিকে তাঁর নজর পড়ল বছর ছয়েক বয়েস খুব বেশী হ'লে হবে, একটা দলের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে আসছে। ছেলেটির গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, গোলগাল মুখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, মনে হচ্ছে যেন পাথরের তৈরী একটা মূর্তি কোন রকমে প্রাণ পেয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। যতক্ষণ ধরে ছেলেটি সামনে এল সামনে দিয়ে হেঁটে মিলিয়ে গেল অন্য দিকে, তিনি দেখলেন। এমন উজ্জ্বলতা মানুষের গায়ের রঙে বড় একটা দেখা যায় না।

নিগ্রো শিশু অনেক দেখেছেন তাঁদের দেশে, তারাও কালো কিন্তু সেই কালো রঙের মধ্যে থেকে কেমন যেন একটা পোড়া লাল উঁকি দিতে থাকে। এই ছেলেটি কালো তো কালোই, উজ্জ্বলতাও কালো। তাছাড়া ছেলেটির মুখের গড়নও আশ্চর্য, ছুরির মত, দীপ্তিময়। ছেলেটি চলে যাবার পর স্টুয়ার্ট ভাবলেন এই পরিবেশে ছেলেটিকে যেন অদ্ভুৎ মানিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ছেলেটি এই মাটিরই সন্তান।

ছেলেটির দিকে নজর পড়েছিল এমিলিরও। তার মনে হ'ল কল্যাণের কথা। এই রকম গায়ের রঙ ছিল কল্যাণেরও, আর তার মুখমণ্ডলেও ছিল এই শিশুটির মতই সরলতা। যুবা বয়সে শিশুর মত মুখ সে যে কোথায় পেয়েছিল! শিশুটিকে দেখেই সঙ্গের লোকজনকে ভাল ক'রে দেখল এমিলি। না। তাদের পুরুষ-মানুষদের মধ্যে সকলেরই মাথায় বিশাল পাগড়ী, মনে হচ্ছে গোটা একখানা ধুতিকেই তারা মাথায় জড়িয়ে রেখেছে। তাদের মুখে কাঠিন্য এবং রুক্ষতা। মেয়েদের পোষাক আরও অদ্ভুৎ। এমিলি বুঝল এরা কলকাতার ওই দিকের লোক নয়। কলকাতার কথা মনে পড়ে বিশ্বজিৎকে মনে পড়ল। গায়ের রঙে নয়, চেহারায় নয়, তবু যেন কল্যাণের সঙ্গে আশ্চর্য রকম মিল বিশ্বজিতের। সে বোধহয় চরিত্রে। কারণ অমনি শিশুর মুখের নিষ্পাপ পবিত্রতা সে বিশ্বজিতের মুখেও মাখানো দেখতে পায়। প্রসেনজিৎ সুদর্শন। কিন্তু বিশ্বজিতের মত দীপ্তিময় সে নয়। কিসের দীপ্তিতে যেন ঝক ঝক করে বিশ্বজিৎ। সদ্যফোটা ফুল যেমন, সন্ধ্যাকাশের তারা — তেমনি। শুধু একটু দুঃখ ছেলেটি যদি একটু সহজ হ'ত! যদি সে আপনজনের মত, নিজের ছোট ভাইয়ের মত এসে দাঁড়াত সামনে —! হয় না। কেন যেন সকলের সঙ্গেই ব্যবধান রেখে চলতে চায়। রুমি বলে কারও সঙ্গেই ওর নাকি মেলে না। কেন মেলে না? মিলত কি কল্যাণেরও? সে-ও তো ছিল একা, অনেকটা নিঃসঙ্গ। এমিলির সঙ্গে তার ব্যবহারই কি আর সকলের মত? অন্য কেউ হলে কি এমনিভাবে নিঃশব্দে চলে আসত কাউকে কিছু না বলে? তার সঙ্গে কি বজায় রাখত এতটা ব্যবধান? এখনও কি তেমনি আছে কল্যাণ? কোন পরিবর্তন হয়নি তার? হয়নি কি কোন অনুশোচনা? অনুশোচনা কেন হবে? না না। একবারও কি তার মনে হয় না এমিলির কথা? না হয় না-ই হয়েছে উচ্চারিত, স্পষ্ট ভাষণে মুখরিত না হয় হয়নি, তাই বলে প্রতিদিনের নীরব সান্নিধ্য আর নিরুত্তাপ সাহচর্য দিয়েও কি হয়নি প্রকাশ ভালবাসার? তবে কি ক'রে সব মুছে দিয়ে একেবারে শেষ ক'রে দিল কল্যাণ! কি ক'রে এমন নিঃশেষে ভুলে গেল?

ইচ্ছা করে। প্রশ্ন ক'রতে ইচ্ছা করে। আর কিছু নয় শুধু একটিবার প্রশ্ন ক'রতে ইচ্ছা করে কল্যাণকে। একটি প্রশ্ন। বিশ্বজিৎ-ও তো কল্যাণেরই মত, ভেবেছে বিশ্বজিতের কাছেই জানতে চাইবে কখনও সে কোন মেয়েকে ভাল বেসেছে কি না। যেন সে বিশ্বজিতের জবাবে কল্যাণেরই জবাব পেয়ে যাবে এমনি তার ভাবনা। এবার নিশ্চয়ই বিশ্বজিৎকে প্রশ্ন ক'রবে সে, নিশ্চয়ই

ক'রবে। সে তো পারে, এ প্রশ্ন করবার অধিকার তো তার আছে ।

হঠাৎ কাকার কথায় চিন্তাধারা কেটে গেল, শুনল, আমার যেন খাপছাড়া মনে হচ্ছে। এই রকম সুন্দর জায়গায় ঘরবাড়ী ক'রতে গেল কেন? তুমিই দ্যাখ, ওই ঘরবাড়ীগুলোর চেয়ে কি এই গাছপালাগুলোকে এখানে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না?

আচমকা প্রশ্নটা শুনে প্রথমটা জবাব এল না এমিলির মুখে তারপরই বলল, যা-ই বল কাকা আমার কিন্তু মন্দ লাগছে না। নদীর ধারে ধারে একদম জলের ওপর বাড়ীগুলোকে দেখতে সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে যেন জল থেকেই উঠেছে ওগুলো। জলদেবতাদের ঘরবাড়ী।

স্ট্রঘাণ সামান্য একটু হাসলেন, বললেন, মন্দ বলনি। জলদেবতাদের বাড়ী। জান এক একসময় প্রাচীন গ্রীকদের আর হিন্দুদের এই দেবদেবী কল্পনা ভারী ভাল লাগে। যেমন এই জায়গায় তুমি বললে। কিন্তু তবু আমি বলব প্রকৃতি এখানে অনেক বেশী সুন্দর। এবং তাকে হত্যা করা হয়েছে।

প্রতিবাদ ক'রল না এমিলি। এই নির্জন দুপুরে এমন বিজন জায়গায় বসে অকারণ বাক্যব্যায়ে তার অনিচ্ছা। স্ট্রঘাণও চাইছিলেন না অহেতুক বাদ-প্রতিবাদের বিরক্তি। যা তিনি কখনও দৈবাৎ বলে ফেলছিলেন সে তাঁর একান্ত অনুরাগের প্রকাশমাত্র। কাজেই আবার নীরবতা নেমে এসে ঘিরে ধরল তাদের।

অনেকক্ষণ বাদে স্ট্রঘাণ বললেন, চল এগোই।

চল। উঠে পড়ল এমিলি।

সামনে কিছুদূর চলেই দেখা গেল সেই বাগানের মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘর। এখানে সেখানে দূরে দূরে ছড়ানো। গাছপালা ঝোপঝাড়ের মাঝখানে এমন পাকা ইঁট-সিমেন্টের ঘর কেন? মনে মনে ভাবতে লাগলেন। যত পথ চলছেন ততই ঘর। তবে এই পথ থেকে অনেকটা দূরে পাহাড়ের ঢালুতে নিচের দিকে অথবা বাঁ দিকে পাহাড়ের উঁচু গায়ে লতাপাতার ঝোপে ঢাকা ঘরগুলো যেন নিঃসঙ্গ। কোন ঘরে যে মানুষ বাস করে এমন লক্ষণ নেই। অথচ ঘরগুলো এমন জীর্ণ দীনদশার নয় যে মনে হবে পরিত্যক্ত। ব্যাপারটা কি? কৌতুহল সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন স্ট্রঘাণ। আরও কিছুদূর চলবার পর বাগান শেষ হয়ে গেল। এবার বাঁ পাশে ঘরবাড়ী। ডানদিকে ঝোপঝাড় তাও বড় ক্ষীণ, পাতলা। আর একটু পর ডানদিকে বাঁ দিকে দু দিকেই বাড়ীঘর। বাঁ দিকে একটা বাড়ীর সামনে স্থানীয় ভাষায় কি সব লেখা। সাধারণ যাত্রীদের অনেকেই সেখানে ঢুকছে বেরোচ্ছে। কি দেখছে দেখবার জন্যে ওঁরাও উৎসুক হলেন। একটা লম্বা ঘর। সেখানে গদীপাতা, লোকজন বসে কাজ কর্ম ক'রছে পেছনে একজন সাধুর বিরাট একটা ছবি বাঁধানো। ঘরের ভেতরেও সমস্ত লেখা স্থানীয় ভাষাতে যার মর্ম বুঝলেন না ওঁরা। কার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হবে বুঝতে না পেরে কিছুটা অসহায় ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। চারদিকে বোবা

দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে অবশেষে একসময় যেমন জনস্রোতের সঙ্গে ঢুকেছিলেন তেমনি খড়কুটোর মত বেরিয়ে এলেন। এবং সেই জনস্রোতই তাঁদের নিয়ে হাজির ক'রল নদীর ঘাটে। দেখলেন সেই ঘাট থেকে খরস্রোতা নদী পেরিয়ে স্পীড বোট প্রচুর লোককে ওপারে পার ক'রে দিচ্ছে। নৌকাগুলো এদেশী কিন্তু তার পেছনে যে মোটর তার ওপরে লেখা হল্যাণ্ডের এক সংস্থার নাম যারা এগুলো দান ক'রেছে।

পার হয়ে ওপারে চলে যাবার কোন আগ্রহ ছিল না তাঁদের। এই নীল কাঁচের মত স্রোতস্বিনী জলরাশিকে দেখতে লাগলেন পরম প্রীতিতে। আর এই পারাপার এ যেন এক অনৈসগিক দৃশ্য। একপাশে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন দুজনে অকস্মাৎ শুনলেন ওঁরই ভাষায় কে একজন শান্ত স্বরে প্রশ্ন ক'রল, কোথা থেকে আসছেন ?

পেছন ফিরে দেখলেন খুব সাধারণ দেখতে একজন সাধু, যাকে গেরুয়া কাপড় জামা পরা না থাকলে কোনভাবেই সাধু বলে মনে হতে পারে না। মাথার চুল একসময় চাঁছা হয়েছিল বোঝা যাচ্ছে। একেবারে সাধারণ চেহারা, মনে কোন রকম ছাপ ফেলতে পারে না, তবু খুবই ভাল লাগল স্টুঘাণের। ওঁর যেন দীর্ঘদিনের বন্দীত্ব ঘুচে গেল এক নিমেষেই। খুবই আনন্দ হ'ল। ভদ্রলোক বেশ বয়স্ক কিন্তু স্বাস্থ্যটি সুন্দর। স্টুঘাণ জানালেন, আমেরিকা থেকে আসছি।

এ দেশ কেমন লাগছে ? — সাধুটি সৌজন্যমূলক প্রশ্ন ক'রলেন।

এক কথায় জবাব দেওয়া যাবে না।

সাধু কৌতুহলী হয়ে উঠলেন, জানতে চাইলেন, কেন ?

এ দেশের এক একটা অংশ এক এক রকম। যদি বলেন এই দিকটা, বলব পরম রমণীয়। অবশ্যই তার অর্থ এই নয় যে অন্য দিকটা খারাপ।

সাধু প্রীত হলেন, বললেন, একটু ব্যক্তিগত প্রশ্ন ক'রব। এমিলিকে দেখিয়ে বললেন, এই মা-টি তো আপনাদের একজন তবে এঁর এমন শাড়ী-সিঁদুর কেন ?

স্টুঘাণ খুব আন্তরিকভাবে বললেন, আমার ভাইঝি, আমার মেয়েই বলতে পারেন কারণ ও ছাড়া আমার আর কোন ছেলে মেয়ে নেই। ও এখন শ্রীমতী এমিলি মুখার্জী। কলকাতায় থাকে। এদেশে এসে ওকে প্রদর্শক ক'রে বেরিয়েছি।

কলকাতা শুনে সাধু জানতে চাইলেন, কলকাতা কোথায় ?

নিউ আলিপুর।

ও, বলে সাধু থামলেন। এমিলি প্রশ্ন ক'রল, আপনি কি কলকাতা চেনেন ?

ওপর নিচে মাথা নেড়ে বোঝালেন চেনেন। সে প্রসঙ্গ ছেড়ে বললেন, কতদূর দেখলেন, ওদিকটা গেছেন, গীতা ভবন ?

না। — স্টুঘাণ জানালেন, জানতে চাইলেন, আচ্ছা ওই রকম ঘর তো ওদিক থেকে আসতে সারা পথ ধরে দেখলাম। ওগুলো কি বলুন তো ?

সাধু সামনেই একটু উঁচুতে একটা বাঁধানো বেঞ্চ দেখিয়ে বললেন, আসুন

বসে কথা বলছি। বাতের ব্যাথার জন্যে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারি না।

সেখানে তিনজনে বসতে সাধু জানালেন, এই যে এখানটায় যত ঘরবাড়ী দেখছেন আর ওই যে বাগানের মধ্যে দিয়ে এলেন এসবই হচ্ছে এক সাধুর তৈরী। ওই ছোট ছোট ঘরগুলো সব সাধুদের থাকবার জন্যে। প্রাচীনকালে যে সব কুটির ছিল তপোবনে সেই চিন্তাধারায় তৈরী করা হয়েছে। যে কোনও সাধু ইচ্ছা ক'রলে এখানে স্বাধীনভাবে বাস ক'রতে পারেন, ট্রাস্ট আছে সেখান থেকে অনুমতি নিয়ে। আপন সাধন ভজনের জন্যে খুব সুন্দর নিরিবিলি জায়গা। এক একজন সাধু এক একটায় বাস করেন। আমিও একটিতে বাস ক'রছি।

সাধুর পরিষ্কার ইংরিজি কথা শুনে স্ট্রঘাণ একদিকে তৃপ্তি পাচ্ছিলেন অন্যদিকে তাঁর আরাম হচ্ছিল মন খুলে কথা বলতে পেরে। তাই তিনি জানতে চাইলেন, আপনার ঘরটা কোথায় ?

ওই ওদিকে — আঙুল দিয়ে দেখালেন সাধু।

নদীর ধারে কি ? — স্ট্রঘাণের প্রশ্নে কৌতুহলের সঙ্গে আরও এমন কিছু মিশে ছিল যাতে সাধু তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রতে বাধ্য হলেন, ওদিকটা কি দেখতে চান ?

খুব খুশী হতাম সে সুযোগ পেলে — স্ট্রঘাণ জানালেন।

তবে চলুন। — উঠে দাঁড়ালেন সাধু, তারপর বললেন, আমরা সাধারণত কাউকে নিয়ে যাই না। তবে আপনারা বিদেশী, আপনাদের কথা আলাদা।

কেন ? কাউকে যেতে দেন না কেন ?

যেতে দিই না এমন নয়, সঙ্গে নিয়ে যাই না।

কারণ কি ?

কত রকম অসুবিধে হয়। একজনের জন্যে আর একজনের বিপদ হয়ে যায়। — কথাটা শুনে কিছু বুঝলেন না স্ট্রঘাণ। বোঝবার জন্যে যে আবার প্রশ্ন ক'রবেন তাও ক'রলেন না অসৌজন্যের ভয়ে।

ওই রকম কয়েকটি একা ঘর আর তার সংলগ্ন ছোট ছোট বাগান পেরিয়ে নদীর ঠিক পাড়ের ওপরটাতেই একটা ঘরের সামনে নিয়ে এলেন সাধু। দরজাটা বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। খুলে ভেতরে যে বসতে বলবেন তার উপায় নেই সে ঘর এতই ছোট। দরজা খোলাতে দেখা গেল ঘরে রান্নার দুচারটে বাসন ছাড়া কম্বল, চাদর, গেরুয়া কাপড় ইত্যাদি বেশ যত্ন করে গোছানো আছে। ঘরটা একজন মানুষের শোবার মত মাত্র। এমিলি ঘরটি ভাল ক'রে দেখছে, সাধু বললেন, এর বেশী জায়গা লাগে না।

এমিলি একটু লজ্জিত হ'ল। বলল, তা ঠিক।

কিছুক্ষণ ওখানে কাটিয়ে নিচেই নদীতে নামলেন ওঁরা। বালি আর পাথরে তৈরী তীরভূমি বড় মনোরম। দূর থেকে যেমন দেখাচ্ছিল কাছে নেমে দেখতে আরও ভাল লাগল। এমিলি বলল, এমন জলে স্নান ক'রতে খুব ভাল লাগে। ইচ্ছে ক'রছে স্নান করি। বিশাল বিশাল পাথরের ফাঁকে যে সামান্য জায়গা আছে সেখানে স্নান করা চলে, হঠাৎ নজরে পড়ল একজন সাধুর প্রতি। বিশাল জটা মাথায়, খালি গা, একটিমাত্র কৌপিন পরণে। আপন মনে স্তোত্র পাঠ ক'রতে ক'রতে একটি বিশাল পাথরের ওপাশে স্নান ক'রছিলেন। প্রথম নজরে পড়ল এমিলির। সে কোন কথাই বলল না। স্টুঘাণের নজরে পড়াতে বললেন, এ দেশের সাধরা সত্যিই অন্যধরণের জীবন যাপন করেন। তাঁদের জীবনে কোন কিছুরই প্রয়োজন বিশেষ থাকে না।

এমিলি বলল, হরিদ্বারে যে বৃদ্ধকে দেখলাম উনিও তো একজন সাধু।

আমার মনে হয়েছে প্রকৃতই একজন সাধু উনি। কিন্তু এঁর সঙ্গে চেহারার কোনই মিল নেই। — বলে স্নানরত জটাধারীকে দেখালেন স্টুঘাণ।

এমিলি বলল, সবাই একরকম হবে তার তো কোন কথা নেই।

ঠিক। — কথা বলতে বলতে চারদিকে তাকাচ্ছিলেন স্টুঘাণ। হঠাৎ বললেন, দাঁড়াও ওই পাথরটার একটা ছবি তুলে নিই। দূরে জলের মধ্যে একটা বিশাল পাথর পড়েছিল সেটির ছবি তুললেন। ইতিমধ্যে সাধুর স্নান হয়ে গিয়েছিল। সাধু যাবার পথে এমিলিদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেই ভিজে কাপড় চোপড় পরেই আসছেন, কেবল হাতে একটা জলের পাত্র এবং একটি শ্লেট। সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে সাধু জলের পাত্র একটি পাথরের ওপর নামিয়ে শ্লেটে ইংরিজিতে লিখলেন, ইংরিজি জান ? কোন দেশ থেকে আসছ ?

স্টুঘাণ পড়ে নিয়ে বললেন, আমেরিকা থেকে আসছি। যুক্তরাস্ট্র।

শ্লেট মুছে আবার সাধু লিখলেন, আমার একটি ছবি তুলে দাও।

ছবি তোলবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন সাধু। এক হাতে জলের পাত্র অন্য হাতে শ্লেট, যেমনভাবে স্কুলের ছেলেরা বই ধরে।

স্টুঘাণ ছবি তুললেন। সাধু অমনি নিজের ঠিকানা লিখলেন, আর লিখলেন এই ঠিকানায় আমাকে একটা ছবি পাঠিয়ে দেবে। তোমরা আমার ওখানে আসতে পার। ওই পাহাড়ের ওপরে আমি থাকি। এই পথ ধরে গেলেই দেখতে পাবে।

স্টুঘাণ কথা দিলেন ছবি তিনি তাড়াতাড়িই ডাকে পাঠিয়ে দেবেন।

সাধু চলে যেতে এমিলি বলল, কলকাতা গিয়ে পাঠিয়ে দিলেই চলবে। কিন্তু উনি হঠাৎ এমন অনুরোধ ক'রলেন কেন ?

স্টুঘাণ বললেন, উনি এখনও নিজের সব বিসর্জন দিতে পারেন নি হয়ত। অথবা ছবির কোন প্রয়োজন আছে।

এমিলির মনে এল হরিদ্বারের বৃদ্ধের কথা। ছবি তোলাতে আপত্তি ক'রে

ছিলেন। তিনি যে কেন আপত্তি ক'রেছিলেন আর ইনি যে কেন নিজে থেকে অনুরোধ ক'রলেন দুটোই রহস্য। এ রহস্যের উদ্ঘাটন কোনদিনই করা যাবে না।

পৃথিবীতে সকল রহস্যের উৎসই মানুষের মন। অথবা মানুষের মন হয়ত চির রহস্যের আকর। এমিলির কাছে মনের রহস্যোদ্‌ঘাটনই সবচেয়ে জটিল সমস্যা বলে মনে হয়। কল্যাণে এই রহস্যের সুরু হয়েছে মাঝে রুমি, বিশ্বজিৎকে রেখে এই দুই সাধু পর্যন্ত যেন সেই একই রহস্যের কুজ্‌ঝটিকা বয়ে চলেছে। কাউকেই সে সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি, এদের এক একটি ক্ষণের ব্যবহার এক একটি দুর্ভেদ্য রহস্যের দুর্গ।

সত্রঘাণ সব দেখে শুনে সিদ্ধান্ত ক'রলেন ঋষিকেশ-এ না থেকে এখানেই থাকবেন। এই মনোরম স্থানে এত বাড়ীঘর মন্দির না ক'রলেই ভাল ছিল। যে সাধুরা এখানে এসব গড়ে তুলেছেন তাঁরা মনের আবেগে সব ক'রেছেন এটা ঠিক কিন্তু নিজেদের অজ্ঞাতে নিজের নিজের মনের প্রতিকূল কাজই ক'রেছেন সবাই। যে স্থান প্রাকৃতিক পরিবেশ-এর জন্যে তাঁদের প্রিয় মনে হয়েছে এই ভূমির সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট ক'রে হয়ত একভাবে নষ্ট ক'রেছেন এদের পবিত্রতাও। তবু এখনও মনোরম। হয়ত এই মনোরম পরিবেশ আর কিছুদিন বাদে থাকবে না তখন এ শুধু বাসভূমি হবে মানুষের, দেবলোক আর আদৌ থাকবে না। তিনি সুযোগ যখন পেয়েছেন এখানেই বাস ক'রবেন।

ওপর দিকে প্রায় অরণ্যের কাছাকাছি নতুন একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে, সেইখানে মনোভাব পেশ ক'রতেই আশ্রমবাসীরা রাজী হয়ে গেলেন। থাকুন। আমাদের অতিথিশালা আছে ওই পাশে, থাকুন সেখানে। যে ক'দিন খুশী থাকুন।

রইলেন। কিন্তু পরের দিন সকালেই ঋষিকেশ-এর হোটেল থেকে একজন লোক খুঁজতে খুঁজতে আশ্রমে এসে হাজির। তারবার্তা। ক'লকাতা থেকে তার এসেছে হোটেলের ঠিকানায়। ম্যানেজার এখানে পাঠিয়েছে। হঠাৎ তারবার্তা? ব্যাপারটা বিস্ময়ের। আরও বিস্মিত হলেন বিষয়বস্তুতে। বার্তা পাঠমাত্র ফিরে যাবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে প্রসেনজিৎ। কি একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

অতএব সঙ্গে সঙ্গেই সব গোছানো শেষ হ'ল। কি ঘটনা বা দুর্ঘটনাটা কি কোন আভাস নেই। কি হতে পারে এই জিজ্ঞাসা এমিলির মনের মধ্যে তোলপাড় ক'রতে লাগল। সমস্ত কাজের মধ্যে থেকেও অস্থির হ'ল মন। কি এমন দুর্ঘটনা যা জানানো গেল না? কি হ'তে পারে? রুমির কিছু হল? তা ছাড়া আর কারই বা কি হ'তে পারে? মেয়েটাকে দেখে বিপন্ন বলেই মনে হচ্ছিল এমিলির। কারণ সৌগত মানুষ হিসেবে যে ভাল নয় সে কথা তার চোখই বলে, বলে তার আচরণ। এমন একজন খারাপ লোকের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে পারা কিছুতেই সম্ভব নয়। অশেষ দুঃখ মেয়েটির। কি হল তার? কি হয়ে থাকতে পারে? মৃত্যু? অতটা হবার কি কারণ থাকতে পারে?

নিশ্চয়ই নয়। তবে কি ? দুর্ঘটনাটা কি হ'তে পারে ?

ঋষিকেশ থেকে টেলিফোন করবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল ট্রেন। তারবার্তার জোরে চট ক'রে ব্যবস্থা হয়ে গেল। তাই সরাসরি কলকাতা। স্টেশন থেকে বাড়ী এসে বোঝা গেল দুর্ঘটনা সত্যিই ঘটেছে। কারণ গম্ভীর বাড়ীটা বোবা হয়ে আছে। সমস্ত ঘটনা যেন থমকে আছে বাড়ীটার প্রতি কোণে, ঝিম ধরে আছে বাড়ীর আবহাওয়া। অস্বাভাবিক থমথমে বিমর্ষতা বাড়ীটার সারা অঙ্গ জুড়ে। বসুদেব প্রথমে বেরিয়ে এসে জিনিষপত্র নিয়ে গেল ভেতরে। তার মুখ চোখ মনে হ'ল ফুলে আছে। এমিলি তাকে প্রশ্ন ক'রতে গিয়ে থমকে গেল। সে নিজে থেকে একটি শব্দ উচ্চারণ ক'রল না। অভ্যর্থনা ক'রতে বেরিয়ে এল না কেউ। এতে আশ্চর্যের হবার চেয়ে দুর্ঘটনার গভীরতা সম্পর্কে বেশী অবহিত হ'ল এমিলি। পথে তার মনে হচ্ছিল ঠাকুমার কিছু হয়ে থাকতে পারে। এখানে এসে সে কথা মনে হ'ল না। তবে কি ? কি হয়েছে ! পথে কাকাও বারংবার একই প্রশ্ন ক'রছিলেন, কি হয়ে থাকতে পারে ?

এখানেও সেই প্রশ্ন নিয়ে চারপাশে দেখতে দেখতে বাড়ীর ভেতরে ঢুকলেন স্টুঘাণ, ঢুকলেন অস্বাভাবিক নীরবতার মধ্যে। এই নীরবতার অর্থ জানতে পারার জন্যে তাঁর অত্যন্ত সুস্থির মনও প্রচণ্ড ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সে ব্যাকুলতা শুধু দুই চোখের জিজ্ঞাসায় প্রকাশ পাচ্ছে অথচ উত্তর দেবার একজনও নেই। এমিলির ঘরেই ঢুকলেন তার আহ্বানে। শূন্য ঘরে। অল্পক্ষণ বাদেই প্রসেনজিৎ বিরস মুখে এসে দাঁড়াল। স্টুঘাণ উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন ক'রলেন, কি হয়েছে বল তো ?

প্রসেনজিৎ জবাব না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন ক'রল, তারবার্তা ঠিকমত পেয়েছিলেন তা'হলে ? আমি ভাবছিলাম সময়মত পাবেন কি না —

পেয়েছি। পেয়েই রওনা হয়েছি — কাকার আগেই জবাব দিল এমিলি। খুব উত্তেজিতভাবে সে প্রশ্ন ক'রল, আগে কাকার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন ?

সে তো জানবেই আগে তোমরা বিশ্রাম ক'রে নাও —

কিন্তু আমরা অত্যন্তই উৎকণ্ঠিত। — স্টুঘাণ জানালেন, সেই পরশু থেকে আমরা বহুরকম ভাবছি —

ব্যাপারটা খুবই দুঃখের এবং সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক — প্রসেনজিৎ দুঃসংবাদটা দেবার আগে ভূমিকা ক'রতে চাইল মানসিক প্রস্তুতির জন্যে। তারই জের টেনে বলল, আমরা তো বিশ্বাসই ক'রতে পারিনি।

এই পর্যন্ত বলে সে ঘরময় একবার ঘুরে নিল। তারপর স্টুঘাণকে বলল,

আমাদের পরিবারে এটা একটা প্রচণ্ড আঘাত। আমার ভাই বিশ্বজিতের সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিল? একটা দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে।

হোয়াট! আর্তনাদ ক'রে উঠল এমিলি। তার সেই প্রচণ্ড আর্তনাদে প্রসেনজিৎ নিজেও চমকে উঠল। স্ট্রঘাণ সংবাদে হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। সমবেদনা জানাবার কথা তাঁর মনে রইল না।

এমিলির প্রচণ্ড জিজ্ঞাসার পর নিঝুম নীরবতা সমস্ত ঘর জুড়ে মৃত্যুর মত বসে রইল, এমিলি যেন ঝিমিয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন ক'রল, দুর্ঘটনা! সে কি ক'রে সম্ভব?

হ্যাঁ। একটা অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা। অচিন্তনীয়। —প্রসেনজিৎ জানাল।

মৃত্যু! এমন একটা তাজা যুবক! তার মৃত্যু! অসম্ভব। অসম্ভব। মাথার মধ্যে শুধু অসম্ভব কথাটাই ভীমরুলের পাখার শব্দের মত ঘুরতে লাগল। না না সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেন মনের অবিশ্বাস দিয়েই প্রবল সত্য এই দুর্ঘটনাটি সে মিথ্যা ক'রে দেবে। এমনি ক'রতে ক'রতে সে অনুভব ক'রল দুঃসহ একটা যন্ত্রণা তার মনের ওপর চেপে বসছে। দারুণ দ্বন্দ্ব তার মনের মধ্যে সব কিছু তছনছ ক'রে দিচ্ছে। অবিশ্বাস আর সংবাদ দুই-এ প্রাণপণ সংগ্রাম ক'রছে তার মনের মধ্যে। সেই প্রবল যুদ্ধের চাপ সহ্য ক'রতে পারছে না তার মন।

অনেকক্ষণ পর স্ট্রঘাণ বললেন, অত্যন্তই দুঃসংবাদ। আমাদের চিন্তার ক্ষমতার বাইরে ছিল এমনই ঘটনা ঘটল। আমি তো ছেলেটিকে দেখেছি সুন্দর ছেলে। ওঃ কি ভয়াবহ দুর্ঘটনা! কেমন ক'রে ঘটল?

প্রসেনজিৎ এ প্রশ্নের জন্যে তৈরী ছিল না। মিস্টার স্ট্রঘাণের কাছে বা বাইরে যতদূর সম্ভব গোপন করা হবে — এই রকমই বাড়ীর সবাই ভেবে রেখেছে কারণ যেভাবেই ঘটে থাকুক এ বাড়ীর ছেলেকে পুলিশে গুলি ক'রে মেরেছে এটা পরিবারের সকলের পক্ষে লজ্জার বলেই তাদের বিশ্বাস। পুলিশও সেইভাবেই সাজিয়ে দিয়েছে ঘটনাটিকে। একদল উগ্রপন্থীকে পুলিশ যখন গ্রেপ্তার ক'রতে যায় তখন তারা এলোপাথাড়ি গুলি চালানোতে একজন পথচারী নিহত হয়। সেই পথচারীই বিশ্বজিৎ। সেই কথাটাই প্রসেনজিৎ জানাল স্ট্রঘাণকে।

একটা খুবই দুঃখজনক মৃত্যু — স্ট্রঘাণ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মন্তব্য ক'রলেন।

এমিলি শুধু শুনল। এই মৃত্যু বিশ্বাস ক'রতে তার ইচ্ছা ক'রছিল না। কিছুতেই নয়। হতেই পারে না। বিশ্বজিৎ-এর কি চমৎকার স্বাস্থ্য কি উজ্জ্বল মুখশ্রী। একটা সবুজ গাছের মত প্রাণবন্ত! যার সামনে জীবন বিশাল প্রান্তরের মত প্রসারিত সেই ছেলে —! না না এ কখনই সত্য হতে পারে না। তার মৃত্যু এমন অমোঘ হবে কেন যে সেই সময় সে-ই হবে সেই পথের পথিক? তার গায়েই গুলি এসে কেন লাগবে? কেন বিঁধবে তাকে এক লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি! কত লোক তো পথ চলছে কই কারও তো এমনিভাবে গুলি এসে লাগছে না? ওই রকম একটা সুন্দর ছেলেরই বা লাগল কেন? কোন সে রাস্তা যেখানে

নিয়তি তাকে হাত ধরে ডেকে নিয়ে গেল ?

এমনি হাজার প্রশ্ন এসে ভিড় ক'রতে লাগল এমিলির সমস্ত মন জুড়ে। সারাক্ষণ তাকে উতলা ক'রে রাখল। সে উঠল না, কাপড় ছাড়ল না একই ভাবে বসে রইল দুঃসহ মানসিক ভারে। স্ট্রঘাণ মাথাটা নিচু ক'রে উঠে গেলেন তাঁর জন্যে সংরক্ষিত ঘরে। তিনি একবার কেবল প্রসেনজিৎকে প্রশ্ন ক'রলেন তাঁর বাবা মা কোথায়। তিনি দেখা ক'রতে চান। এমিলি কারও সঙ্গে দেখা ক'রতে চায় না, কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না, সে উঠে গিয়ে বিশ্বজিতের ঘরের সামনে দাঁড়াল। তালাবন্ধ। অকারণেই দরজায় হাত রাখল। তারপরই কোথা থেকে প্রবল বেগে তার শরীর অভ্যন্তর মুচড়ে ভূমিকম্পের মত তার অন্তস্তল কাঁপিয়ে এল কান্না। বন্ধ দরজার ওপর মাথা রেখে নিজের দেহের ভারসাম্য রক্ষা ক'রল সে। রুমির চোখে পড়তে সে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যেতে চেষ্টা ক'রল নিজের ঘরে। অপারগ হয়ে বলল, অনেক কথা আছে বউদি। চল।

কথা শোনবার জন্যে নয়, অনন্যোপায় হয়েই এমিলি রুমির ঘরে এসে তার বিছানার ওপর বসল। রুমি তার বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে বলল, আমরা কেউই কিছু জানি না বউদি যেমন তুমি জান না এখনও — সব ব্যাপারটাই এমন আকস্মিক যে কেউ সাবধান হবার সুযোগও পায়নি, নইলে এরকম কখনও হয় ? বাবার সব সহকর্মীরা, পুলিশ কমিশনার নিজে এসে দুঃখ প্রকাশ ক'রে গেলেন। ছোটদাকে কেউই চিনত না।

অত দুঃখের মধ্যেও এমিলি নিজেকে সংযত ক'রে রুমির কাছে ঘটনার বিবরণ শুনতে চাইল নিঃশব্দে তার মুখের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু তার বাক্‌শক্তি যেন লোপ পেয়ে গেছে সামান্য শব্দ ক'রতে গিয়ে সে সেটা উপলব্ধি ক'রতে পারল। রুমি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, ছোটদার ঘরটা ড্যাডি তালা দিয়ে রেখেছে। এই ক'দিন যে কি ধকল গেল — ড্যাডি বড় মুষড়ে পড়েছে। যা মানসিক চাপ সব তো তাকে একা সামলাতে হয়েছে ! সবচেয়ে বড় অসুবিধে হয়েছে সম্মানের প্রশ্নে। যারা জেনেছে তাদের সামনে দেখাবার মত মুখ নেই।

কেন ! প্রশ্নটা চাবুকের শব্দের মত মনের মধ্যে হঠাৎ ফুটে উঠল। একথা কেন বলছে রুমি ? চোখ তুলল এমিলি। জলে ভেজা চোখের তারায় ফুটে উঠল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দুর্ঘটনায় সম্মান নষ্ট হ'ল কেন তার বাবার ? রুমি কেন এ প্রশ্ন তুলল ? বিশ্বজিতের মৃত্যু বেদনার, যাতনার, কষ্টের, দুঃসহ দুঃখের, কিন্তু লজ্জার হবে কেন ? তার নীরব তীব্র প্রশ্নের উত্তরে রুমি খুব নিচু স্বরে বলল, ছোটদাকে পুলিশে গুলি ক'রে মেরেছে না চিনেই। চিনলে নিশ্চয়ই মারত না। বাবার জন্যে ওকে না মেরে হয়ত জেল দিত !

কেন ? জেল কেন ? — এবার যেন আপনা থেকেই মুখ ফুটে শব্দগুলো বেরিয়ে গেল যেমনভাবে শিশুর মুখে কথা ফোটে।

ছোটদার সঙ্গে ভেতরে ভেতরে নকশালপন্থীদের যোগ ছিল। ওর ঘরে

রাশি রাশি বইপত্র বেরিয়েছে। ও যে গাদা গাদা বই আনত, পড়ত, নিয়ে যেত তার বেশীর ভাগই উগ্রপন্থী রাজনীতির। মাও-সে-তুং, চারু মজুমদার — সব সাম্যবাদী দর্শনের বই। ওর নিজের লেখা বহু কাগজপত্রও ছিল। সব ড্যাডি পুড়িয়ে ফেলেছে। সে কি কম ঝামেলা? অত বই কাগজ পোড়ানো — বাবাঃ।

এমিলি হতভম্ব হয়ে গেল। তার চোখের জল শুকিয়ে গেল। মনের বেদনার চাপ ফুঁড়ে উঠল বিস্ময়। সেই অতুল বিস্ময় এক প্রকাণ্ড মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তার নীরব অস্তিত্বের সামনে। এদেশে এসে অবধি সে এই উগ্রপন্থী রাজনীতির সংবাদ নানাভাবে শুনছে কিন্তু তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানা হয়নি তার। জানবার কৌতুহল হয়েছে, আতংকে সে কথা কাউকে বলতে পারে নি। বাড়ীতে সকলের মুখে শুনেছে তাদের সম্পর্কে নিন্দাবাদ আর কটূক্তি। কখনও সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি তাদের বক্তব্য বরং তাদের সম্পর্কে যাদের বক্তব্য যখনই ছাপা হয়েছে তাতে পড়েছে তারা সমাজ বিরোধী গুণ্ডা ইত্যাদি। আর ব্যাপারটা যেহেতু রাজনীতির, তাই স্বাভাবিক অনাগ্রহে সে গভীরে যেতে চায় নি ওটাকে কোন বিষবস্তু হিসেবে ধরে নিয়ে। আজ পরম বিস্ময়ের শব্দ হয়ে দাঁড়াল এই সংবাদ যে বিশ্বজিৎ ছিল একজন উগ্রপন্থী — বা তাদের সহযোগী। যারা এ পরিবারে ঘৃণার পাত্র তাদেরই প্রতি বিশ্বজিতের ছিল অসীম সমর্থন। একাত্মতা।

কেন? শোক সরে গেল। যেমন ভাবে জমাট বাঁধা মেঘ আপনি কেটে যায় তেমনিভাবেই শোক সরে গিয়ে এসে দাঁড়াল ওই জিজ্ঞাসা, কেন সে ওইরকম আত্মধ্বংসী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল, কি প্রয়োজনে? তার তো ছিল সুখী জীবন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল তার সুনিশ্চিত তবে কেন এমনিভাবে মৃত্যুকে বরণ ক'রল সে? যদি সত্যিই সে নীতি অন্যায়ের হ'ত, যদি তাতে থাকত কোন মিথ্যার আশ্রয় তাহ'লে নিশ্চয়ই বিশ্বজিৎ যেত না সেখানে? বিশ্বজিৎ, এমিলি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, ছিল সৎ এবং নীতিনিষ্ঠ। তার আন্তরিকতা, সহানুভূতি, স্পষ্টবাদিতা — সব মনে পড়তে লাগল এমিলির। কল্যাণের সঙ্গে মিলত তার স্বদেশপ্রেম কিন্তু — বিশ্বজিৎ তার তারুণ্যের জন্যে ছিল আরও বলিষ্ঠ। বলিষ্ঠ তো কল্যাণও ছিল। সে তো কোন লোভের কাছেই বিক্রি করেনি নিজেকে। ভোলেনি কর্তব্যের আহ্বান। তবে কি এই সমাজ তাকেও এমনিভাবে পুরস্কৃত ক'রবে যেভাবে বিশ্বজিৎকে ক'রল! এই সমাজে সৌগতরাই হবে কি তবে আদৃত!

তার স্বগত প্রশ্নের মধ্যে রুমি অতি সন্তর্পণে বলল, তোমার ঘরে বিছানার নিচে ছোটদার ডায়রীটা লুকিয়ে রেখেছি। পড়বার সুযোগ পাইনি, দেখো তো।

ডায়রী! বিশ্বজিতের! — উঠে দাঁড়াল এমিলি। তবে তো এখনও দেখা মিলবে তার, শোনা যাবে তার কথা, তার মনের কণ্ঠস্বর! ধন্যবাদ রুমি, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি না জেনে যে উপকার ক'রেছ সেজন্যে অপর্যাপ্ত ধন্যবাদ। আন্তরিক ধন্যবাদ তোমাকে। — মনে মনে কথাগুলো উচ্চারণ

ক'রতে ক'রতে বেরিয়ে গেল এমিলি রুমির ঘর থেকে।

রুমি পেছন পেছন বেরিয়ে এসে বলল, এখন বের করো না বউদি, পরে এক সময় দেখে নিয়ো। আমি পড়ব বলে রেখেছিলাম, সময় পাইনি। বাড়ীর কেউ যেন না জানতে পারে, সাবধান।

প্রতিদিনের মতই সময় গড়িয়ে চলল আলো থেকে রাতের অন্ধকারের দিকে। বেলা বাড়ল, প্রাত্যহিক কাজকর্ম ক'রে যেতে হ'ল প্রত্যেককেই নিজের মত। দু-একবার সুপ্রীতিকে দেখা গেল। প্রথমবার মুখোমুখি হ'তে তিনি খুব সঙ্গত গাম্ভীর্যে প্রশ্ন ক'রলেন, কখন এলে? — স্বাভাবিক সৌজন্য রক্ষা ক'রতে পর্যন্ত ভুললেন না, কাকার কথা জিজ্ঞাসা ক'রবার। — এমিলি জবাব দিল কিন্তু লক্ষ্য ক'রল তিনি যেন শুনেও শুনলেন না অন্যমনস্কতার জন্যে। সুপ্রীতি বরাবরই স্বল্পবাক্। কিন্তু আজ তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই পারল না এমিলি। কেমন ভয়, অস্বস্তি, সংকোচ সব মিলিয়ে মিশ্র এমন এক অনুভূতি তার মনের মধ্যে ছায়া বিস্তার ক'রল যে সুপ্রীতিকে সে এড়িয়ে যেতে চাইল। শুধু সুপ্রীতিই নয় কারও সামনেই গিয়ে দাঁড়াতে এমিলির কেমন যেন ভয় ভয় ক'রতে লাগল। কেন এই ভয় সে ব্যাখ্যা ক'রতে পারল না। এই ভয় থেকে পরিত্রাণ পেতে মনে মনে অনেক চেষ্টা ক'রল, পারল না। তাই ইচ্ছে হলেও ঠাকুমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারল না এমিলি। এই রকম শোকে কি সান্ত্বনা হতে পারে জানা নেই তার। সান্ত্বনা হয় কি? এমন হৃদয়বান ছেলে — তার এই রকম মৃত্যু — তার কি কোন সান্ত্বনা হতে পারে? যে বুলেট বিদ্ধ ক'রেছে সে বেচারীকে সেই রকম লক্ষ বুলেট-এর যন্ত্রণা প্রত্যেকটি স্বজনকে জ্বালাবে যারা তাকে জানে।

অফিসে যায়নি প্রসেনজিৎ। এ ক'দিনই যায় নি। শোক। এমিলি এটাকে খুব স্বাভাবিক মনে ক'রল। প্রসেনজিৎ দুপুর বেলা বলল, এইসব জন্যে আমি তোমাকে এদেশে আসতে নিষেধ ক'রেছিলাম।

তুমি না এলে কি ভাই এভাবে মরত না? এমিলি প্রশ্ন ক'রল।

তা নয়। এ দেশ বাস করবার উপযোগী নয়। শান্তিতে বাস করা এদেশে অসম্ভব।

এমিলি একথার জবাব দিল না। বিশ্বজিৎকে যেভাবে মৃত্যু বরণ ক'রতে হ'ল তাতে এ দেশ সম্বন্ধে কোন আশা ক'রতে তারও কেমন দ্বিধা হচ্ছে। হয়ত কল্যাণকেও এইভাবেই বরণ ক'রে নিতে হবে যীশুর মৃত্যু! এতদিনে ঘটেই গেছে কে জানে?

কিন্তু কেন? এভাবে এমন সব ছেলেদের মারল কেন? এতদিন তো শোনা গেছে যারা গুলি লেগে মরছে তারা গুণ্ডা বদমায়েস। তাহ'লে প্রশ্ন বিশ্বজিৎ কি গুণ্ডা? সে কি বদমায়েস? সমাজ বিরোধী? তবে কেন তাকে এভাবে মারল? প্রশ্নটা ক'রল সে প্রসেনজিৎকে, কিভাবে ঘটল এটা?

বললাম তো দৈবাৎ-ই ঘটে গেছে ঘটনাটা। ওই সময় ওদিকে যাওয়া

বিশ্বজিতের উচিৎ হয়নি, প্রসেনজিৎ মত প্রকাশ ক'রল।

কিন্তু ওকে মারল কেন? এমিলি জানতে চাইল। বলল, আমি জেনেছি পুলিশ-ই ওকে মেরেছে।

প্রসেনজিৎ তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল, যেভাবেই হোক তুমি যখন জেনেইছ তখন বলি ওই সব জায়গায় যাওয়া সত্যিই উচিৎ হয় নি বিশ্বর। অসৎসঙ্গের ফল সে পেয়েছে।

এ জবাব এমিলির মনঃপুত হ'ল না। তবু সে চুপ ক'রে রইল। জানতে হবে তাকে, এ রহস্যের উৎস কি? বিশ্বজিতের সঙ্গে কথা বলে সে বুঝেছিল যে এই সমাজের অন্যায়, অসত্য, নোংরামীকে সে প্রচণ্ড ঘৃণা ক'রত। তবে কি সেই তার অপরাধ? তার চরিত্রের সততার জন্যেই তাকে পেতে হ'ল এমন এক প্রাণদণ্ড যা এসেছে চোরাপথ ধরে? এ তো দণ্ড নয়? দণ্ড তো বিচারের পথ ধরে আসে? সে কি আসে এমনিভাবে প্রবলের স্বেচ্ছাচারে, আপন ক্ষমতার অন্যায় প্রয়োগে? যে শক্তি সুবিচারে সহায়তার জন্যে সেই শক্তির জঘন্য প্রয়োগ যখন বাধাহীন, স্পর্ধাহীন, ন্যায়নীতিহীন তখন তার চেয়ে অপরাধ আর কি থাকতে পারে পৃথিবীতে? রাজশক্তি যখন অন্যায়কে জীইয়ে রাখবার জন্যে সত্যের বুক বিদ্ধ করে আরক্ষার বারুদে তার চেয়ে ভ্রষ্টাচার কি থাকতে পারে তখন! কি আর তখন অবশিষ্ট থাকে সেই দেশে?

ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, যন্ত্রণায় মথিত এমিলির মনের কথা না বুঝলেও প্রসেনজিৎ বলল, আমি এই কদিনে ভেবে দেখলাম এদেশে বাস করা অনেকগুলো কারণেই অসম্ভব। এখানে কাজের পরিবেশ পর্যন্ত প্রতিকূল। এখানকার কারখানাগুলোয় কাজ করার জন্যে বিশেষ অভ্যাস প্রয়োজন যা একমাত্র এদেশেই গড়ে উঠতে পারে। আমি পারছি না। আমি, ঠিকভাবে বলতে গেলে, ক্লান্ত।

এমিলি প্রসেনজিতের দিকে চোখ তুলে দেখল সেই চিরদিনের শান্ত, নির্দ্বন্দ্ব প্রসেনজিৎ অকস্মাৎ যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তার চোখের তারায় সংকল্পের স্থিরতা এবং সেই স্থিরতার মধ্যে থেকে ফুটে উঠছে এমন অনমনীয় মনোভাব যা এমিলির কাছে অপরিচিত। তাই সে জানতে চাইল, তুমি কি ক'রতে চাও?

আমি অন্য কোথাও চলে যেতে চাই। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, স্টেটস যেখানে হোক — সোজা সরলভাবে জানাল প্রসেনজিৎ। আরও যোগ ক'রল, যত শীঘ্রি সম্ভব ততই মঙ্গল।

এমিলি মাথা নিচু ক'রল। তারপর খুব শান্ত স্বরে বলল, ভেবে দেখি। প্রসেনজিৎ-এর সামনেই সে বিছানার তলা থেকে বের ক'রল কালচে মোটা একটা ডায়রী। খুলে দেখল তাকে দিনলিপি না বলে খাতা বলাই সঙ্গত। বেশীর ভাগ লেখা ইংরিজিতে, কিছু বাংলায়। একটু চোখ বুলিয়ে দেখল সমাজ ব্যবস্থার ওপরে লেখা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রবন্ধ সব। একটা ছোট্ট প্রবন্ধ লেখবার চেষ্টা ক'রেছিল যার প্রথমে আছে — দেবাসুরের সংগ্রাম

একটা রূপক মাত্র। আসলে সেটা শুভ ও অশুভ শক্তির সংগ্রাম যা সর্বকালে চলে আসছে, আজ সেই সংগ্রামই রূপ নিয়েছে শ্রেণী সংগ্রামে। — অসমাপ্ত প্রবন্ধটা পড়ে ফেলল এমিলি একজন বিজ্ঞানের গবেষক ছাত্রের পক্ষে এমন চমৎকার সামাজিক দর্শন লেখা যে কিভাবে সম্ভব সে ভেবে পেল না। সমস্তটা পড়ে বোঝা গেল সত্যিই বিশ্বজিৎ এই সংগ্রামের একজন অংশীদার ছিল, সে বদলাতে চেয়েছিল এই অবস্থা, চলতি ব্যবস্থা। সত্যিই সে ঘৃণা ক'রত, আন্তরিক ভাবে। নিস্পৃহ উদাসীন ঘৃণা নয়, সক্রিয় সোচ্চার। আর তার মূল্য দিয়েছে সে, দেশ যখন দানবের দ্বারা অধিকৃত হয়, তখন দেবকুল হয় পরাজিত, লাঞ্ছিত। সমস্ত শুভ শক্তির শবদেহের ওপরেই তো অশুভর চলে উদ্দাম নৃত্য। পদদলিত শুভ তখন হয় বিদ্ধ মাংসপিণ্ড, বিশ্বজিৎ-এর, যীশুর সক্রেটিসের, আরও হাজার হাজার জানা না জানা দেবতাত্মার, যাঁরা চেয়েছেন মুক্তি, মানবাত্মার মুক্তি, গণমুক্তি। শস্ত্রশক্তির সামনে মানুষ চিরদিনই নতজানু তাই তারা অবিচার সহ্য করে, অত্যাচার সহ্য করে, তাদের মুক্তির জন্যে যারা সংগ্রাম করে তাদের হত্যার জন্যে মনোবিকারও তারা নিঃশব্দেই সহ্য করে বুক চেপে। এ তো চিরন্তন। এ তো চিরদিনই অন্ধকারের সত্য। অতএব প্রসেনজিৎই ঠিক বলেছে। চল। কল্যাণের মৃত্যু সংবাদ ভোরবেলাকার কাগজের পাতায় দেখবার আগে চল এদেশের মাটি ছেড়ে। স্বর্গ হয়ত কল্যাণের স্বর্গ ছিল, হয়ত স্বর্গ গড়তে চেয়েছিল বিশ্বজিৎ কিন্তু এখন এভূমি তো তাদের নয় যারা স্বর্গ রচনা করে নিজেদের মনের রঙে রাঙিয়ে। বরং তারা হবে বিতাড়িত, ধিকৃত। তাদের সুন্দর মুখমণ্ডল হবে বিকৃত, তারা পরিণত হবে অবহেলিত অসম্মানিত শবে। এমনি একদিন হয়েছিল উদ্ধত রোমক প্রশাসকের বিচারে এক বিশ্বপ্রেমিক মানুষ।

রাত্রির অবসরে কাকার ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রল, তুমি কি স্থির ক'রলে কাকা? এখানে থাকবার কথা ভাবছিলে যে —

একটা চিঠি লিখছিলেন কাকা। মুখ তুলে বললেন, আমি তো ফিরে যাবার কথা বলে চিঠি লিখলাম ভিকিকে। এখানে ঠিক দেখতে পারলাম না, ভাবছি স্টেটসে ফিরে গিয়ে কোন গ্রামে বা সমুদ্রের ধারে কোথাও বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব। সেখানেও শান্তিতে বাস করা সম্ভব।

আমরাও ভাবছি ফিরে যাব। সেন এখানে একদমই থাকতে চাইছে না।

সেনকে পেলে যে কোন দেশ খুশী হবে। প্রতিভাবান ছেলে যে কোন দেশের পক্ষে একটা বিশেষ মূলধন।

তা হ'লে একসঙ্গেই ফেরবার ব্যবস্থা করার কথা সেনকে বলি?

বল, চন্দ্রঘাণ মত দিয়েও বললেন, এই সময় সেন কি মা-বাবাকে ছেড়ে যেতে পারবে? আমি বলছি যাওয়াটা উচিত হবে কি?

এসব আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। ও বলেছে আমি ইচ্ছে ক'রলে এখানে

থেকে যেতে পারি। ও চলে যাবেই কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা অন্য কোন দেশে।

সত্যপ্রাণ গম্ভীর হলেন। এমিলি বলল, আমিও দেখলাম এরপর এখানে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আবার সেই বিমান বন্দর। কিন্তু বিদায় জানাবার জন্যে বিমান কর্মীরা ছাড়া কেউ নেই। ক'দিন ধরে সমানে কেঁদেছেন সুপ্রীতি। নিজের ঘর থেকে বেরোন নি বললেই চলে। রুমি অনেক অনুরোধ করেও নরম ক'রতে পারে নি প্রসেনজিৎকে। নির্মমভাবেই প্রসেনজিৎ সিদ্ধান্ত ক'রেছে, কঠোরভাবে সে আঁকড়ে থেকেছে সেই সিদ্ধান্ত। আশ্চর্য এই যে সুপ্রীতি একবারও অনুরোধ করেন নি থাকবার জন্যে, এমিলিকে পর্যন্ত বলেন নি কোন কথা। বিশ্বজিৎ-এর মৃত্যুর পর ক'দিন যদিও বা তাঁকে দেখা যাচ্ছিল প্রসেনজিৎ-এর সঙ্গে চলে আসবার কথা হবার পর থেকে আর কেউ তাঁকে সংসারের কোন কাজে পায় নি। রুমি কেবল একদিন বলল, জীবনে কোনদিন মাকে কাঁদতে দেখিনি বউদি, ক'দিন ধরে সমানেই কাঁদছে। দাদাকে বলে তুমি রাজী করাও, এখনও সময় আছে। অথচ এমিলি রুমিকে বোঝাতে পারে নি যে সে সময় অনেক আগেই উৎরে গিয়েছিল। সময় আছে বলে যেটা রুমি মনে ক'রছিল সেটা ভুল। আর যে ঠাকুমাকে কেউ কিছু বলে না সেই ঠাকুমার কাছে বিদায় নিতে যেতেই সব চেয়ে বেশী ভয় ক'রেছিল এমিলির। কোনদিন এই চলে আসবার কথা তাঁকে সে বলে নি, তবু প্রণাম ক'রতে ক্লান্তভাবে ভারাক্রান্ত মুখ তুলে তাকালেন, শুধুমাত্র আমারই যাবার সময় এল না দিদু। এত পাপই কি আমি ক'রেছিলুম? — আর কথা বলতে পারেন নি তিনি, সহ্য ক'রতে পারে নি এমিলিও, পালিয়ে এসেছে। হ্যাঁ পালিয়েই সে এসেছে। এ মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়বার আগে অকারণেই একবার তাকিয়ে নিল দূরে অপেক্ষমান কয়েক শো অপরিচিত মানুষের অস্পষ্ট আকৃতির দিকে। বিমান ঘাঁটির শক্ত মাটি থেকে সিঁড়িতে পা দিয়ে মনে মনে বলল, তোমার স্বর্গ আবার হয়ত দেবতাদের হাত থেকে দানবে ছিনিয়ে নিয়েছে কল্যাণ। আমি এই ভ্রষ্ট স্বর্গে তোমার চিতায় জল ঢালবার জন্যে থাকতে পারলাম না, আমায় মার্জনা ক'রো।